বকুল কথা
আশাপূর্ণা দেবী

ধ্বনিটা অতি-পরিচিত, শব্দগুলোও বহু-পরিচিত, চেয়ার থেকে উঠে জানলার ধারে না গেলেও বোঝা যেত কারা চলেছে মিছিল করে, আর কী বলে চলেছে তারা। মিছিল তো চন্দ্র-সূর্যের মতই নিত্য ঘটনা। কানের পর্দায় যেন লেগেই থাকে ধ্বনিটা—'চলবে না! চলবে না!'...যেন অহরহই মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধাক্কা মারে, 'মানতে হবে, মানতে হবে, আমাদের দাবী মানতে হবে।'

তবু হাতের কলম নামিয়ে রেখে জানলায় এসে দাঁড়ালেন অনামিকা দেবী।

কিন্তু কেন দাঁড়ালেন?

মিছিলের ওই উচ্চরোলে লেখার ব্যাঘাত ঘটছিলো বলে? না কি নেহাৎই অকারণ কৌতূহলে? হয়তো তাই। অকারণ কৌতূহলেই। শুধু জেনে নেওয়া, নতুন কোন অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিবাদ। নইলে রাস্তার গোলমালে লেখার ব্যাঘাত ঘটলে চলে না।

কলকাতা শহরের এমন একটি জনবহুল রাস্তার একেবারে মোড়ের ধারের বাড়িতে যাদের আজন্মের বাস, এই কোলাহলের মাঝখানে বসেই যার কলম ধরার শুরু, তার কি করে এ আবদার করা সম্ভব—নিঃশব্দে নির্জনতার গভীরে বসে লিখতে চাই আমি!

বিচিত্র শব্দ, বিরক্তিকর কোলাহল আর অগণিত মানুষের আনাগোনার মধ্যে থেকেই তো সাধনা করে যেতে হয় শহুরে সাহিত্যিকদের। প্রতিক্ষণই করতে হয় প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম।

কিন্তু একেবারে স্তব্ধ শান্ত স্তিমিত পল্লীজীবনের পরিবেশই কি সাধনার নিতান্ত অনুকূল? তেমন পরিবেশ পেলেই অনামিকা দেবী আরো অধিক লিখতে পারতেন? অধিকতর উচ্চমানের? অধিকতর মননশীল?

অপরাপর শহরবাসী কবি সাহিত্যিকরা কী বলেন, কী মনোভাব পোষণ করেন, অনামিকা দেবীর জানা নেই, মনের কথার আদান-প্রদান হবে এমন অন্তরঙ্গতাই বা কার সঙ্গে আছে? তবে নিজে তিনি তা বলেন না। তা ভাবেন না।

তাঁর মনে হয়—শহরের মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল উত্তাল জীবনরঙ্গের মধ্যেই সাহিত্যের তীব্র তপ্ত জীবনরস। শহরের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেই সাহিত্যের অফুরন্ত উপাদান।

নির্জনতার শান্তিতে 'গতিবেগ' কোথায়? শহরের নাড়ি সর্বদাই জ্বর-তপ্ত চঞ্চল। সেই জ্বর ছাড়াবার ওষুধ জানা নেই কারো, তবু একথা সবাই জানে ওই জ্বরটাই প্রেরণা দিচ্ছে শিল্পকে, সাহিত্যকে, জীবন-চিন্তাকে। এই জ্বরটাই বরং রোগীকে চাঙ্গা করে রেখেছে।

তাই কোলাহলকে কখনো বাধা স্বরূপে মনে হয় না অনামিকা দেবীর। তিনি সর্বদা এই কথাই বলেন, 'আমি জনতার একজন। আমি জনতার সাহিত্যিক। কোলাহল থেকেই রস আহরণ করে নেওয়া আমার কাজ।'

কিন্তু অনামিকা দেবীর সেই কবি সেজদি? তিনি কিন্তু অন্য কথা বলেন। তিনি বরং বলেন, 'ধন্যবাদ দিই তোকে। এই কলরবের মধ্যে লিখিস!'

তা তিনি একথা বলবেন সেটাই স্বাভাবিক। অনামিকা দেবী যদি জনতার

তো তিনি নির্জনতার।

তিনি কবি।

ইচ্ছের কবি।

তিনি তাঁর সেই মফঃস্বলের বাড়িটিতে নিঃসঙ্গতায় নিমগ্ন হয়ে ব
ইচ্ছার ফুলগুলি ফোটান। সেইগুলিই হয়তো তাঁর সঙ্গী।

অনামিকা দেবীর ভূমিকা আলাদা।

এ যুগের আরো সকলের মতই—অহরহ পরের ইচ্ছের বায়না মেটা
তাঁকে। পরের ইচ্ছেয় পরিচালিত হতে হয়।

মনের মধ্যে ওই মিছিলের ধ্বনি উঠলেও মেটাতে হয়।

জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন অনামিকা দেবী, নীচের দিকে তা
মানুষের প্রাচীর এগিয়ে চলেছে একটা অখন্ড মূর্তিতে, আর যান্ত্রিক এক
উঠছে তা থেকে 'চলবে না! চলবে না!'

হঠাৎ অদ্ভুত একটা কৌতুক বোধ করলেন অনামিকা দেবী।

একদিক থেকে অবিরাম প্রতিবাদ উঠবে 'চলবে না চলবে না', আর এ
অব্যাহত গতিতে চলেই চলবে সেই অসহনীয়।

কোটি কল্পকালের পৃথিবীর বুকে কোটি কোটি বছর ধরেই চলে
লীলা। পাশাপাশি চলেছে অন্যায় আর তার প্রতিবাদ। আজকের মিছি
বিশেষ একটা কিছু, তা বোঝা যাচ্ছে তার দৈর্ঘ্যে, শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না।
স্তিমিত হয়ে আসছে আওয়াজ, আবার পিছন থেকে আসছে নতুন আও
...।

অবশেষে, অনেকক্ষণের পর হালকা হয়ে এল দল, ফিকে হয়ে এল ধ্বনি
পিছিয়ে পড়েছিল তারা ছুটে ছুটে আসছে, তাদের ফাঁকে ফাঁকে অন্য অ
চারীর চেহারা দেখা যাচ্ছে।

দূরে এগিয়ে যাওয়া আওয়াজটা নিয়মমাফিক কমে কমে আসছে।

জানলা থেকে আবার ফিরে এলেন অনামিকা দেবী। চেয়ারে এসে
কলমটা হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু চট করে যেন মনে এল না কি লিখ
অন্যমনস্কের মত সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা মনে এল। লেখার কথা ন
মিছিলের কথা নয়, দেশের বহুবিধ অন্যায় অনাচার দুর্নীতি আর রাজ
কথাও নয়, মনে এল এই বাড়িটা যখন তৈরী হয়েছিল তখন এপাশে-ওপা
ফাঁকা মাঠ পড়ে ছিল।

এখন সমস্ত রাস্তাটা যেন দম আটকে দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু বাড়িটা কি আজ তৈরী হয়েছে? কত দিন মাস বছর পার হ
তার হিসেব করতে হলে বুঝি খাতা পেনসিল নিয়ে বসলে ভাল হয়।

অনামিকা দেবী ভাবলেন, আমি এর শৈশব বাল্য যৌবন আর এই প্রৌ
সব অবস্থার সাক্ষী। অথবা এই বাড়িটাই আমার সমস্ত দিন মাস
সাক্ষী। এর দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা আছে আমার সব কথা।

আচ্ছা, দেওয়াল কি সত্যি সাক্ষ্য দিতে পারে? সে কি সব কথা ধরে
পারে অদৃশ্য কোনো অক্ষরে? বিজ্ঞান এত করছে, এটা করতে পারে না
দিন? মৌন মূক দেওয়ালগুলোকে কথা কইয়ে ইতিহাসকে পুরে ফেলবে
মুঠোয়! নির্ভুল ইতিহাস!

টেলিফোনটা ডেকে উঠলো ঘরের কোণ থেকে। আবার চেয়ার ছেড়ে

অনামিকা দেবী, রিসিভারটা তুলে নিলেন হাতে।

টেলিফোনটা লেখার টেবিলে রাখাই সুবিধে, সময় বাঁচে, পরিশ্রম বাঁচে, তবু কোণের ওই ছোট্ট টেবিলটার উপরেই বসিয়ে রাখেন সেটা অনামিকা দেবী। এটা তাঁর এক ধরনের শখ। বার বার উঠতে হলেও।

থেমে থেমে কেটে কেটে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি কথা বলছি, বলুন কি বলছেন? ...নতুন পত্রিকা বার করছেন? শুনে খুশি হলাম। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, সাফল্য কামনা করছি।...লেখা? মানে গল্প? পাগল হয়েছেন?...কী করবো বলুন? অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব।...উপায় থাকলে 'না' করতাম না।...বেশ তো চলুক না কাজ, পরে হবে। কী বলছেন? 'আপনি' বলব না? বয়সে আপনি আমার থেকে অনেক ছোট? ঠিক আছে, না হয় তুমিই বলা যাবে। কিন্তু গল্প তো দেওয়া যাচ্ছে না।...কী? কী বলছেন? কথা দিয়ে রাখবো?...না না ওইটি পারবো না, কথা দিয়ে বসে থাকতে পারবো না। সে আমাকে বৃশ্চিক-যন্ত্রণা দেবে।...তা বটে। বুঝছি তোমার খুব দরকার, কিন্তু উপায় কি?'

'উপায় কি?' অপর অর্থ 'নিরুপায়'। তা সত্ত্বেও ও-পক্ষ তার নিজের নিরুপায়তার কথা ব্যক্ত করে চলে এবং কথার মাঝখানে এমন একটু কমা সেমিকোলন রাখে না, ফাঁকটুকুতে 'ফুলস্টপ' বসিয়ে দিতে পারেন অনামিকা দেবী।

অতএব শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়, 'আচ্ছা দেখি।'

ও-পক্ষের উদ্দণ্ড কণ্ঠের ধ্বনি এ ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা মারে, 'না না, দেখি-টেখি নয়। আমি নাম অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি।'

ছেড়ে দিলো এবার।

অনামিকা দেবীকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে।

অনামিকা দেবী জানেন, এরপর যদি তিনি সময়ে লেখা দিয়ে উঠতে না পারেন, তা'হলে ওই ভাবী সম্পাদক ভদ্রলোক এখানে সেখানে সকরুণ গলায় বলে বেড়াবেন, 'কী করবো বলুন, কথা দিয়ে যদি কথা না রাখেন! এই তো আমাদের দেশের অবস্থা। কেউ একটু নাম করলেন কি অহংকার! আমাদেরও হয়েছে শাঁখের করাত। ওনাদের লেখা না নিলেও নয়—।'

বলেন বটে 'না নিলেও নয়', কিন্তু আসল ভরসা রাখেন তাঁরা সিনেমাস্টারদের ছবির উপর। তাঁরা কী ভাবে হাঁটেন, কী ভাবে চলেন, কোন্ ভঙ্গীতে কলা ছাড়িয়ে মুখে ফেলেন, কোন্ ভঙ্গীতে দোলে আবীর ছড়ান, ইত্যাদি প্রভৃতি সব। ওই ভঙ্গীগুলিই ওঁদের পত্রিকার মূল জীবনীরস, তা ছাড়া তো আছে 'ফিচার'। তথাপি গল্প-উপন্যাসও আবশ্যক, সব শ্রেণীর পাঠককেই তো মুঠোয় পুরতে হবে। আর সেক্ষেত্রে ওই 'নাম করে' ফেলা লেখকদের লেখা নেওয়াই নিরাপদ, পাণ্ডুলিপিতে চোখ বোলাতে হয় না, সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। নতুন কাগজের সম্পাদকও এ ছাড়া নতুন কিছু করবেন কি?

আগে নাকি সাংবাদিকতার একটি পবিত্র দায়িত্ব ছিল। সম্পাদকেরা নাকি লেখক তৈরী করতেন, তৈরী করতেন পাঠকও। অনামিকা দেবী যে সে বস্তু দেখেননি তা নয়। তাঁর জীবনেই তিনি একদা সেই উদার আশ্রয় পেয়েছেন।

কিন্তু ক'দিনের জন্যেই বা?

সেই মানুষ চলে গেলেন।

তারপর কেমন করে যেন অনামিকা দেবী এই হাটে দাঁড়িয়ে গেছেন, চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা অনামিকা দেবীকে ভালবাসে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার এসে কলম নিয়ে বসলেন অনামিকা দেবী।

আর ওঁর ভাইঝি শম্পার কথাটা আবার নতুন করে মনে এল।

'আচ্ছা পিসি, এতবার ওঠাউঠি করতে হয়, ওটাকে তো তোমার লেখার টেবিলে রেখে দিলেই পারো।'

অনামিকা দেবী নিজের উত্তরটাও ভাবলেন, 'নাঃ! টেবিলে টেলিফোন বসানো থাকলে, ঘরটাকে যেন অফিসঘর অফিসঘর লাগে।'

হ্যাঁ, এই কথাই বলেন বটে, কিন্তু আরও কারণ আছে। আর হয়তো সেটাই প্রকৃত কারণ। মাঝে মাঝেই একটি তাজা আর সপ্রতিভ গলা কথা কয়ে ওঠে, 'শম্পাকে একটু ডেকে দিন তো।'

ডেকে দেন অনামিকা দেবী।

শম্পা আহ্লাদে ছলকাতে ছলকাতে এসে ফোন ধরে। পিসির দিকে পিঠ আর দেওয়ালের দিকে মুখ করে গলা নামিয়ে কথা বলে মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টায় গিয়ে পেঁছিয়।...

টেবিলে রাখলে অসুবিধে উভয় পক্ষেরই। শম্পার জীবনে এখন একটি নতুন প্রেমের ঘটনা চলছে। এখন শম্পা সব সময় আহ্লাদে ভাসছে।

অনামিকা দেবী সঠিক খবর জানেন না, সত্যি কিছু আর সব খবর রাখেনও না, তবু যতটুকু ধারণা তাতে হিসেব করেন, শম্পার এ ব্যাপারে এই নিয়ে সাড়ে পাঁচবার হলো। সাড়ে অর্থে এটা এখনও চলছে, তার মানে অর্ধপথে।

প্রথম প্রেমে পড়েছিল শম্পা ওর দূর-সম্পর্কের মামাতো দাদা বুবুলের সঙ্গে। শম্পার তখন এগার বছর বয়েস, বুবুলের বছর সতেরো।

মফঃস্বলের কোনো স্কুল থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাস করে, জায়গার অভাবে এই দূর-সম্পর্কের পিসির বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তে এসেছিল বুবুল।

চাঁদের মত ছেলে, মধুর মত স্বভাব, নিঃস্বও নয়। বাপ টাকা পাঠায় রীতিমত। কার আর আপত্তি হবে ? পিসিরও হল না। মানে অনামিকার ছোটবৌদির।

কিন্তু জোরালো আপত্তি হল তাঁর ভাইপোর সঙ্গে মেয়ের প্রেমে পড়ায়, তিনি প্রথমে বিনিপয়সায় বাড়িতে এসে-পড়া (যেগুলোর জন্যে অনামিকা দেবী দায়ী) রাশি রাশি সিনেমা পত্রিকার দোষ দিলেন, অনামিকা দেবী রচিত প্রেম-কাহিনীগুলির প্রতি কটাক্ষপাত করলেন, তারপর মেয়েকে তুলো ধুনলেন এবং ভাইপোকে পথ দেখতে বললেন।

এগারো বছরের মেয়ের উপর এ চিকিৎসা চালানো গেল, অনামিকা দেবীর ছোটবৌদি ভাবলেন, যাক, শিক্ষা হয়ে গেল। আর প্রেমে পড়তে যাবে না মেয়ে।

কিন্তু কী অলীক সেই আশা!

সাড়ে বারো বছরেই আবার প্রেমে পড়ল শম্পা, পাড়ার এক স্টেশনারী দোকানের সেল্‌সম্যান ছোকরার সঙ্গে। খাতা পেনসিল রবার আলপিন চকোলেট ইত্যাদি কিনতে গিয়ে আলাপের শুরু, তারপর কোন ফাঁকে আলাপ গিয়ে প্রেমালাপের পর্যায়ে উঠে বসলো। বিনা পয়সায় চকোলেট আসতে লাগলো।

এটা বেশ কিছুদিন চাপা ছিল, উদ্‌ঘাটিত হলো একদিন পাড়ার আর একটি ছেলের দ্বারা। হয়তো নিজে সে প্রার্থী ছিল, তাই বলে দিয়ে আক্রোশ মেটালো।

খবরটা বাড়িতে জানাজানির পর দিনকতক শম্পার গতিবিধির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হলো, শম্পার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে এনে দেওয়ার ভার নিলো তার বাবা। কিন্তু প্রয়োজন তো শম্পার জিনিসের নয়, প্রেমের।

অতএব কিছুদিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো শম্পা, তারপর আবার নতুন গাছে বাসা বাঁধলো। এবারে এক সহপাঠিনীর দাদা।

এ খবরটা বাড়িতে এসে পেঁছিবার কথা নয়। কারণ সহপাঠিনী সহায়িকা। সে তার বান্ধবীকে এবং দাদাকে আগলে বেড়াতে যত রকম বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব তা করতে ত্রুটি করেনি।

কিন্তু খবরটা তথাপি এলো।

এলো অনামিকা দেবীর কাছে।

প্রণয়ভঙ্গের পর।

শম্পা নিজেই তার লেখিকা পিসির কাছে ব্যক্ত করে বসলো। কারণ শম্পার তখন বয়স বেড়েছে, সাহস বেড়েছে। একদিন অনামিকা দেবীর এই তিনতলার ঘরে এসে বললো, 'পিসি, একটা গল্পের প্লট নেবে ?'

তারপর সে দিব্যি একখানি প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করার পর প্রকাশ করলো প্লটের নায়িকা সে নিজেই। এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে সব কিছু বলার পর হেসে কুটিকুটি হয়ে বলতে লাগলো, 'বল তো পিসি, এরকম বুদ্ধুমার্কা ছেলের সঙ্গে কখনো প্রেম চালানো যায়? না তাকে সহ্য করা যায় ?'

অনামিকার নিজের গল্পের অনেক নায়িকাই দুঃসাহসিকা বেপরোয়া, মুখরা প্রখরা। তথাপি অনামিকা তাঁর নিজের দাদার মেয়ে, নিজের বাবার নাতনীর এই স্বচ্ছন্দ বাক্‌ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রইলেন অভিভূত দৃষ্টি মেলে।

শম্পা বললো, 'লিলি তো আমার ওপর মহা খাপ্‌পা, ওর দাদার নাকি অপমান হয়েছে।'

'তা সেটাই স্বাভাবিক।'

বলেছিলেন অনামিকা দেবী।

শম্পা হেসে হেসে বলেছিল, 'তা কি করা যাবে ? উনিশ বছর এখনো পার হয়নি, সবে থার্ড ইয়ারে ঢুকেছে, বলে কি না তোমার পিসিকে বলে-কয়ে—হি হি হি,—বিয়ের কথাটা পাড়াও।'

অনামিকা দেবী মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তা তুমিও তো এখনো স্কুলের গণ্ডি ছাড়াওনি, সবে পনেরো বছরে পা দিয়েছ—'

'তা আমি কি, হি হি, বিয়ের চিন্তা করতে বসেছি ?'

'প্রেম করছো !'

শম্পা লেশমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেছিল, 'সে আলাদা কথা। ওটা হচ্ছে একটা চার্ম। একটা থ্রিলও বলতো পারো। তা বলে বিয়ে? হি হি হি !'

তা সেই বুদ্ধুটাকে ত্যাগ করার পর শম্পা অন্ততঃ মন-মরা হয়ে বেড়ালো না। সাঁতার ক্লাবে ভর্তি হলো, আবদার করে সেতার কেনালো।

মা পিসি বাপ ঠাকুমা সবাই ভাবলো, এটা মন্দ নয়, বেটাছেলেদের সঙ্গে হৈ-চৈ করে বেড়ানোর থেকে ভাল। দাদা তখন নিজের ব্যাপারেই মগ্ন, একটা স্কলার-শিপ যোগাড় করে বিলেত যাবার তাল করছে, তুচ্ছ একটা বোন আছে কিনা তাই মনে নেই। তাছাড়া শম্পার মাও মেয়ের ব্যাপারটা সাবধানে ছেলের জ্ঞান-গোচর থেকে তফাতেই রাখতে চেষ্টা করতেন। যা কিছু শাসন চুপি চুপি।

কিন্তু শম্পা 'চার্ম' চায়।

তাই শম্পা তাদের ওই সাঁতার ক্লাবের এক মাস্টার মশায়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করলো। বোধ করি তিনিও এর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন।

সাঁতারের ঘণ্টা বেড়েই চলতে লাগল এবং বেড়ে চলতে লাগলো শম্পার সাহস।

অতএব ক্রমশঃ মা বাবা শাসন করবার সাহস হারাতে লাগলো। দাদা তো

তখন পাড়ি দিয়েছে সমুদ্রপারে। শম্পার বাড় আরো বেড়ে যায়। শম্পাকে এক কথা বললে,—একশো কথা শুনিয়ে দেয়, বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে বলে রাগারাগি করলে পরদিন আরো বেশী রাত্তির করে, 'বেরোতে হবে না' বললে তৎক্ষণাৎ চটি পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে যায়। বলে, 'হারেমের যুগে বাস করছো নাকি তোমরা?'

বাবা রাগ করে বললো, 'মরুকগে। যা খুশি করুকগে।'

অনামিকা দেবী বললেন, 'ভাল দেখে একটা বর খোঁজো বাপু, সব ঠিক হয়ে যাবে। সময়ে বর না পেয়েই মেয়েগুলো আজকাল বর্বর হয়ে উঠছে।' লেখিকার মতো নয় অবশ্য কথাটা, নিতান্তই মাসি-পিসির মত কথা।

শম্পার মা কথাটা নস্যাৎ করলেন। বললেন, 'সবে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে, এক্ষুনি বিয়ে দিতে চাইলে লোকে বলবে কি? তাছাড়া কৃতী ছেলেই বা পাবো কোথায় বয়সের সঙ্গে মানানো? আমাদের আমলের মতো দশ-বারো বছরের বড় বর তো আর ধার দিতে পারি না?'

কি আর করা তবে?

শম্পাই ছেলে ধরে বেড়াতে লাগলো। সাঁতারুকেও ত্যাগ করলো একদিন লোকটার কথাবার্তা বড় একঘেয়ে বলে।

তারপর কিছুদিন খুব উঠে পড়ে লেগে লেখাপড়া করলো শম্পা, মনে হলো এইবার বুঝি বুদ্ধি থিতিয়েছে।

কিন্তু নিজে মুখেই স্বীকার করে গেল একদিন শম্পা পিসির কাছে, 'একটা প্রেম-ট্রেম থাকবে না, কেউ আমার জন্যে হাঁ করে বসে থাকবে না, আমায় দেখলে ধন্য হবে না, এ ভালো লাগে না বুঝলে পিসি? কিন্তু সত্যি প্রেমে পড়তে পারি এমন ছেলে দেখি না।'

তা যখন 'সত্যি প্রেমে'র প্রশ্ন নেই, তখন আজেবাজেতেই শুধু 'চার্ম' খুঁজলে বা ক্ষতি কি? সেই সময়টায় শম্পা একজন ক্যাবলা-মার্কা প্রফেসারের প্রেমে পড়লো।

প্রফেসারটি যদিও বিবাহিত।

'কিন্তু তাতে কি?' শম্পা বললো, 'আমি তো আর তাকে বিয়ে করতে চাইছি না! শুধু একটু ঘোল খাওয়ানো নিয়ে কথা!'

সেই ঘোল খাওয়ানো পর্বটার পর কলেজ-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান ছোকরার সঙ্গে কিছুদিন এখন শম্পার আর একটি চলছে।

অনামিকা আর একবার লেখায় মন দেবার চেষ্টা করেছিলেন, ফোনটা আবার বেজে উঠলো।

একটি তাজা সপ্রতিভ কণ্ঠ বলে উঠলো, 'শম্পাকে একটু ডেকে দিন তো!'

ডেকে দিলেন।

শম্পা উঠে এল।

বললো, 'বাবাঃ, তোমার এই তিনতলায় উঠতে উঠতে গেলাম। কই দেখি আবার কে বকবকাতে ডাকছে!'...এই নাও, নীচে তোমার একটা চিঠি এসেছিল—'

টেবিলের ওপর খামের চিঠিটা রেখে পিসির দিকে পিঠ আর দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো শম্পা রিসিভারটায় কান-মুখ চেপে।

অনামিকা দেবী খামের মুখটা না খুলেই হাতে ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। সেজদির চিঠি।

অনেক দিন পরে এসেছে। সেজদি আর চিঠিপত্র লেখে না।

কিন্তু অনামিকাই বা কত চিঠি দিচ্ছেন? শেষ কবে দিয়েছেন মনেও পড়ে

না। অথচ কত চিঠিই লিখে চলেছেন প্রতিদিন। রাশি রাশি। আজেবাজে লোককে। সেজদি বড় অভিমানী। কাজসারা চিঠি চায় না সে।

॥ ২ ॥

সেজদি বড় অভিমানী।

সে অভিমানের মূল্যও আছে অনামিকা দেবীর কাছে। অনেকখানি আছে। তবু সেজদির চিঠির উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে না। নিজে থেকেও একখানা চিঠি সেজদিকে দেওয়া হয়ে ওঠে কই ? অথচ সেই না হয়ে ওঠার কাঁটাটা ফুটে থাকে মনের মধ্যে। আর সেই কাঁটা ফোটা মন নিয়েই হয়তো অন্য সাতখানা চিঠি লিখে ফেলেন। মানে লিখতে হয়।

বাংলা দেশের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা অনামিকা দেবীর লেখা ভালবাসে, তাই অনামিকা দেবীকেও ভালবাসে, সেই ভালবাসার একটা প্রকাশ চিঠি লিখে উত্তর পাবার প্রার্থনায়। সেই প্রার্থনায় থাকে কত বিনয়, কত আবেগ, কত সংশয়, কত আকুলতা!

অনামিকা দেবী তাদের বঞ্চিত করবেন ?

তাদের সেই সংশয় ভঞ্জন করবেন না?

সামান্য একখানি চিঠি বৈ তো নয় ?

চিঠিও নয়, চিঠির উত্তর। কিঞ্চিৎ ভদ্রতা, কিঞ্চিৎ মমতা, কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা, মাত্র এইটুকু। সেটুকু দিতে না পারলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবেন কি করে অনামিকা দেবী ? তাছাড়া তাদের কাছেই বা অনামিকা দেবীর মূর্তিটা কোন্ ভাবে প্রকাশিত হবে?

হয়তো ওই কয়েক ছত্র লেখার অভাবে তাদের ক্যামেরায় অনামিকা দেবীর চেহারাটা হয়ে দাঁড়াবে উন্নাসিক অহঙ্কারী অভদ্র!

অনামিকা দেবী তা চান না।

অনামিকা দেবী নিজের বাইরের চেহারাটা নিজের ভিতরের মতই রাখতে চান। সামান্য অসতর্কতায়, ঈষৎ অবহেলায় তাতে ধুলো পড়তে দিতে চান না। এছাড়া প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের সংখ্যাও তো কম নয়? গতানুগতিক সাধারণ জীবনের বাইরে অন্য কোনো জীবনের মধ্যে এসে পড়লেই তার একটা আলাদা দায়িত্ব আছে।

সে সব দায়িত্ব সম্ভবমত পালন করতেই হয়। অন্ততঃ তার চেষ্টাটাও করতে হয়। ব্যবহারটা যেন ত্রুটিহীন হয়।

অতএব কিছুই হয় না শুধু একান্ত প্রিয়জনের ক্ষেত্রে।

সেখানে ত্রুটির পাহাড়।

সেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ভারী হয়ে ওঠে অপরাধের বোঝা। তবু 'হয়ে ওঠে না'।

কিন্তু কারণটা কি? ওই সাতখানার সঙ্গে আর একখানা যোগ করা কি এতই অসম্ভব?

হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু আবার অসম্ভবও। প্রিয়জনের পত্র দায়সারা করে লেখা যায় না। অন্ততঃ অনামিকা দেবী পারেন না। অনামিকা দেবী তার জন্যে

চান একটুকরো নিভৃতি। একমুঠো অবকাশ। 'অনামিকা দেবী'র খোলসের মধ্যে থেকে নিজেকে বার করে এনে খোলা মনের ছাদে এসে বসা।

কিন্তু কোথায় সেই নিভৃতি?

কোথায় সেই অবকাশ?

কোথায় সেই নিজেকে একান্তে নিয়ে বসবার খোলা ছাদ?

নেই। মাসের পর মাস সে অবস্থা অনুপস্থিত।

তাই ত্রুটির পাহাড় জমে। তাই প্রিয়জনের খামের চিঠি খোলার আগে বুকটা দুরু দুরু করে। মনে হয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে থেকে টুক্ করে যেটুকু খসে পড়বে, সে হচ্ছে একখন্ড উদাসীন অভিমান।

কিন্তু প্রিয়জনের সংখ্যা অনামিকা দেবীর কত?

খামখানা খোলার আগে তার উপর মৃদু একটু হাত বোলালেন অনামিকা। যেন সেজদির অভিমানের আবরণটুকু মুছে ফেলতে চাইলেন, তারপর আস্তে খামের মুখটা খুললেন।

আর সেই সময় টেলিফোনটা আবার ঝনঝনিয়ে উঠলো।

'অনামিকা দেবী আছেন?'

'কথা বলছি।'

'শুনুন আমি বাণীনগর বিদ্যামন্দির থেকে বলছি—'

বললেন তিনি তাঁর বক্তব্য। অনামিকা দেবীর কথায় কানমাত্র না দিয়ে জোরালো গলায় যা জানালেন তা হচ্ছে, এই উচ্চ আদর্শপূত বিদ্যামন্দিরের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে ইতিপূর্বে অনেক মহা মহা ব্যক্তি এসে গেছেন, এবার অতঃপর অনামিকা দেবীর পালা।

অতএব ধরে নিতে হয় এই সূত্রে অনামিকা দেবী মহামহাদের তালিকায় উঠলেন। অথবা ইতিপূর্বে উঠেই বসেছিলেন, শুধু 'পালা'টা আসতে বাকি ছিল।

অনামিকা দেবীর ক্ষীণ প্রতিবাদ 'মৃদু আপত্তি' বানের জলে ভেসে গেল। ওপিঠ থেকে সবল ঘোষণা এল, 'কার্ড ছাপতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সেজদির চিঠিটা অনেকক্ষণ আর পড়তে ইচ্ছে হল না। যেন একটা কোমল সুরের রেশের উপর কে তবলা পিটিয়ে গেল।

তারপর খুলে পড়লেন।

সেজদি লিখেছে—

'অনেক তো লিখেছো। কাগজ খুললেই অনামিকা দেবী, কিন্তু সেটার কি হল? সেই বকুলের খাতাটার?

খাতাখানা পোকায় কেটে শেষ করেছে? নাকি হারিয়ে গেছে? কিন্তু—'

'কিন্তু' বলে ছেড়ে দিয়েছে সেজদি।

আর কোনো কথা লেখেনি।

শুধু তলায় নাম সই—'সেজদি'।

চিঠি লেখার ধরনটা সেজদির বরাবরই এই রকম। চিঠির রীতিনীতি সম্পর্কে মোটেই নিষ্ঠা নেই তার। বাড়ির যাকেই চিঠি দাও, বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের 'যথাবিহিত' সম্মান ও আশীর্বাদ জানানো যে একান্ত আবশ্যক, চিঠিটা যে প্রধানত কুশল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে, আর পরিচিত জগতের সব কিছু খবরের আদান-প্রদানটাই যে আসল প্রসঙ্গ হওয়া সঙ্গত, এ বোধ নেই সেজদির। চিঠিতে সেজদি

হঠাৎ যেন কথা কয়ে ওঠে। আর কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাওয়াটা যেমন স্বভাব তার, তেমনিই হঠাৎ থেমে যায়। তাই 'কিন্তু' বলে থেমে গেছে।

কিন্তু বক্তব্যটা শেষ করলে বুঝি অনামিকার মনের মধ্যে এমন একটা কণ্টক প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রাখতে পারতো না সেজদি।

অনামিকা চিঠিটা শেষ করে তার সেই অশেষ বাণীটি চিন্তা করতে লাগলেন।

বকুলের খাতার কি হল!

অনামিকা দেবী কি সেটা হারিয়েই ফেলেছেন? না সত্যিই অবহেলায় ঔদাসীন্যে পোকায় কাটিয়ে শেষ করেছেন?

কোথায় সেই খাতা?

অনামিকা কি খুঁজতে বসবেন?

কিন্তু সেই অনেকদিনের আগের অনাদৃত খাতাটা খোঁজবার সময় কোথায় অনামিকার? আজই একটা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে উত্তরবঙ্গে যেতে হচ্ছে না তাঁকে? গোটাতিনেক দিন সেখানে যাবে, তারপর ফিরে এসেই ওই বাণীনগর বিদ্যামন্দির, তার পরদিন বিশ্বনারী প্রগতি সংঘ, তার পরদিন যুব উৎসব, তারপর পর পর তিন দিন কোথায় কোথায় যেন। ডায়েরি খাতা দেখতে হবে।

বকুলের খাতা তবে কখন খোঁজা হবে? ধুলোর স্তর সরিয়ে কখন খুলে দেখা হবে? দিন যাচ্ছে ঝড়ের মত, সেই ঝড়ের ধুলো গিয়ে গিয়ে জমছে সমস্ত পুরনোর উপর, সমস্ত তুলে রাখা সঞ্চয়ের উপর।

সেজদির সেই 'এখানে বাতাস নেই' নামের কবিতায় লেখা চিঠিটার কথা মনে পড়লো। বরের উপর, অথবা জীবনের উপরই অভিমান করে সেজদি একদা কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রেমের কবিতা আর লিখতো না।

সেজদির বর অমলবাবুর ধারণা ছিল, ভিতরে ভিতরে একটি 'প্রণয়কান্ড' আর গোপন কোনো প্রেমাস্পদ না থাকলে এমন গভীর প্রেমের কবিতা লেখা সম্ভব নয়।

আদি অন্তকালের সমস্ত মানুষের মধ্যেই যে অল্প বিস্তর একটি 'প্রণয়কান্ড' থাকে, আর চিরন্তন এক প্রেমাস্পদও অবিনশ্বর মহিমায় বিরাজিত থাকে, হৃদয়ের সমস্ত আকৃতি সেখানে গিয়েই আছাড় খায়, একথা বোঝবার মনটা ছিল না অমলবাবুর।

তাই অমলবাবু তাঁর আপন হৃদয়ের অধীশ্বরীর হৃদয়ের উপর কড়া নজর রাখতেন, সে হৃদয়ের জানলা দরজার খিল ছিটকিনি যেন কোনো সময় খোলা না থাকে। যেন বাইরের ধুলো জঞ্জাল এসে ঢুকে না পড়ে, অথবা 'ভিতর'টাই ফসকে বেরিয়ে না পালায় কোনো ফাঁক দিয়ে।

খিলছিটকিনিগুলো তাই নিজের হাতে বন্ধ করতে চেষ্টা করতেন।

সেজদিও চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়েছিল। সেজদি প্রেমের কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর তো—

হ্যাঁ, তারপর তো অমলবাবু মারাই গেলেন।

কিন্তু তারপর সেই নিঃসঙ্গতার ভূমিতেও আর 'গভীর গভীর' প্রেমের কবিতা লেখেনি সেজদি, বরং তলিয়ে গেছে আরো গভীরে। সেখানে বুদ্বুদ ওঠে না। অথবা 'হৃদয়' নামক বস্তুটা একতলার ঘরটা থেকে উঠে গেছে মস্তিষ্কের চিলে-কোঠায়।

নামকরা লেখিকা অনামিকা দেবীও বলেন, 'তোর কবিতা এখন আর পড়ে বুঝতে পারিনে বাবা!'

দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় নেই, সেজদি জীবনে আর বাপের বাড়ি আসবো না প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছে দূরে, অথচ অনামিকা দেবীর সেই বাপের বাড়িটাই একমাত্র ভরসা। অনামিকার নিজের কোন বাড়ি নেই। সেজদির কাছে তাই কদাচ কখনো নিজেই যান। তা সে কদাচই—চিঠির মধ্যেই সব। নতুন কবিতা লিখলে লিখে পাঠায় সেজদি। মন্তব্য পাঠান অনামিকা দেবী।

তবে আবার মাঝে মাঝে খুব সরল ভাষায় আর সাদাসিধে ছন্দে কবিতায় চিঠি লেখে সেজদি, অনামিকাকে আর তার সেই ছোট্ট বন্ধু মোহনকে। অসমবয়সীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে সেজদির। আর সেই অসমরাও দিব্যি সহজে নির্দ্বিধায় সেজদির সঙ্গে সমান হয়ে গিয়ে মিশে যায়।

এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, এ ক্ষমতা দুর্লভ। 'শিশুর বন্ধু' হতে পারার ক্ষমতাটা ঈশ্বরপ্রদত্ত।

একদা নাকি সেজদিদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিল মোহনরা। অর্থাৎ তার মা বাবা। অবাঙালী সেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে সেজদিদের পরিচয় স্বল্পই ছিল, কিন্তু তাদের বছর চার-পাঁচের ছেলেটা সেজদির কাছেই পড়ে থাকতো। সেজদির সঙ্গে গল্প করে করে বাংলায় পোক্ত হয়ে গিয়েছিল সে।

কবেই তারা অন্যত্র চলে গেছে, মোহন স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে হয়তো কলেজেই উঠে গেছে এখন, তবু 'আণ্টি'র সঙ্গে সম্পর্কটা রেখেছে বজায়।

সেজদিকে নাকি তাকে মাঝে মাঝে ছন্দবন্ধে পত্র লিখতে হয় সেই তার ছেলেবেলার মত। সেও নাকি আজকাল বাংলা কবিতায় হাত মক্শ করছে। আর সেটা সেজদির উপর দিয়েই। অতএব ওটা চলে।

আর চলে অনামিকা দেবীর সঙ্গে।

'এখানে বাতাস নেই' লিখেছিল কবে যেন। একটু একটু মনে পড়ছে—

> 'এখানে বাতাস নেই, দিন রাত্রি স্তব্ধ হয়ে থাকে,
> ওখানে উন্মত্ত ঝড় তোমারে আচ্ছন্ন করে রাখে।
> তোমার কাজের ডানা অবিশ্রাম পাখা ঝাপ্টায়,
> আমার 'বিশ্রাম সুখ' সময়ের সমুদ্রে হারায়।
> এখানে বাতাস নেই, দেয়ালের ক্যালেণ্ডার চুপ,
> তোমার তারিখ পত্র ঝড়ে উড়ে পড়ে ঝুপঝুপ।
> ঘণ্টামিনিটেরা যেন—'

নাঃ, আর মনে পড়ছে না। আরো অনেকগুলো লাইন ছিল। অনামিকা দেবী সেই তুলনামূলক ভঙ্গীতে লেখা কবিতাপত্র পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সেজদির সঙ্গে আমার কতদিন দেখা নেই, সেজদি আমার এই 'ঝড়'টা তো চোখেও দেখেনি, তবু এত পরিষ্কার বুঝলো কি করে? শুধু নিজের বিপরীতে দেখে?

অথচ এই ঝড়ের গতিবেগটা সর্বদা যারা দেখে, তারা তো তাকিয়েও দেখে না। বরং বলে, 'বেশ আছো বাবা। দিব্যি টেবিল চেয়ারে বসে বানিয়ে বানিয়ে যা ইচ্ছে লেখো, আর তার বদলে মোটা মোটা চেক্—'

যাক্ গে, থাক্ তাদের কথা, বকুলের খাতাটা খুঁজতে হবে। কিন্তু কোথায় সেই খোঁজার ঠাঁইটা? বাক্স? আলমারি? পুরনো সিন্দুক? না আরো অন্য কোনোখানে?

সেই অন্য কোনোখানটা কি আছে এখনো অনামিকা দেবীর?

তিনতলা থেকে নেমে এলেন অনামিকা দেবী। কারা যেন দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এমন অবস্থা সারাদিনে অনেকবার ঘটে, তিনতলা থেকে নেমে নেমে আসতে হয়। মেজদা বলে, 'তার থেকে বাবা তুই নীচের তলার একটা ঘরেই পড়ে থাক। এতবার সিঁড়ি ভাঙার চেয়ে ভাল।'

ভালবেসেই বলে, অন্য কোনো মতলব নয়। তিনতলার লোভনীয় ঘরখানা বোন আগলে রেখেছে বলে কৌশলে তাকে নীচে নামাতে চাইবে, এমন নীচ ভাবা উচিত নয় দাদাদের। এটা ঠিক বাবার উইলের অধিকারেই আছেন তিনি, তথাপি দাদারা তেমন হলে টিকতে পারা সম্ভব ছিল কি?

না, অনামিকার প্রতি কোনো দুর্ব্যবহার হয় না। এই যে রাতদিন বাড়িতে লোকজন আসছে, এই যে যখন তখন মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, বৌদিরা তাকে কিছু বলতে আসেন?

না। অনামিকা দেবীকে কেউ কিছু শোনাতে আসেন না। যে যা শোনান নিজ নিজ স্বামী-পুত্রকে অথবা ভগবানের খাতাসকে।

বড় তরফের অবশ্য দাদা বেঁচে নেই, আর বড় বৌদি থেকেও নেই। তবে বড়র অংশটুকু আগলে বাস করছে তার ছেলে অপূর্ব। আছে, তবে অপূর্ব তার স্ত্রী-কন্যা নিয়ে বাড়ির মধ্যেই আলাদা।

অপূর্বর স্ত্রীর রুচিপছন্দ শৌখিন, মেয়েকে আধুনিক স্টাইলে মানুষ করতে চায়, খুড়শাশুড়ীদের সঙ্গে ভেড়ার গোয়ালে থাকতে রাজী নয় সে। তাই বাড়ির মধ্যেই কাঠের স্ক্রীন্ দিয়ে নিজের বিভাগ ভাগ করে নিয়েছে অপূর্ব।

দোতলার দক্ষিণের বারান্দাটা অপূর্বর ভাগে। বারান্দাটাকে অবশ্য আর বারান্দা রাখেনি অপূর্ব, কাচের জানলা আর গ্রীল বসিয়ে সুন্দর একখানি 'হল'এ পরিণত করে ফেলেছে। সেখানে তার খাবার টেবিল আর বসবার সোফাসেট দুভাগে সাজানো।

অপূর্বর স্ত্রী অলকার 'মাথা'টা চমৎকার। তার মাথা থেকেই তো বেরিয়েছে এসব পরিকল্পনা। তা নইলে এই চিরকেলে সনাতনী বাড়িটি তো সেই সনাতন ধারাতেই চলে আসছিল।

সেই মাটিতে আসন পেতে খাওয়া, সেই মাটিতে সরঞ্জাম ছড়িয়ে এলোমেলো করে চা বানানো, কোথাও কোনো সৌকুমার্যের বালাই ছিল না।

বাড়িখানা নেহাৎ ছোট নয়, কিন্তু সবটাই কেমন একাকার। ফ্ল্যাটবাড়ির স্টাইল নেই কোনোখানে। তাই বাড়ি থেকে কোনো আয়ের উপায়ও নেই। ভবিষ্যৎ-বুদ্ধি ছিল না আর কি বাড়ি-বানানেওয়ালার!

এসব দেখেশুনে অলকা হতাশ হয়ে নিজের এলাকাটুকু নিজের মনের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। তার মেয়ে অভিজাতদের স্কুলে পড়ে, তার চাকর বুশ শার্ট আর পায়জামা পরে, চটি পায়ে রাঁধে।

অনামিকা দেবীর মেজ বৌদি আর সেজ বৌদি প্রথম দিকে ভাসুরপো-বৌয়ের অনেক সমালোচনা করেছিলেন, অনেক বিদ্রুপের ফুলঝুরি ছড়িয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ নিজেরাই ওই আধুনিকতার সুবিধেগুলো অনুধাবন করছেন এবং কখন অলক্ষ্যে সেগুলির প্রবর্তনও করেছেন। এখন ওঁরা পুরুষদের অন্ততঃ টেবিলে খেতে দেওয়াটা বেশ ভালো মনে করেন।

অনামিকা দেবী অবশ্য এসবের মধ্যে ঢোকেন না কখনো। না মন্তব্য, না মত-প্রকাশে। আজীবনের এই জায়গাটায় তিনি যেন আজীবনই অতিথি।

অতিথির সৌজন্য, অতিথির কুণ্ঠা এবং অতিথির নির্লিপ্ততা নিয়েই বিরাজিত তিনি।

নীচে নেমে এসে দেখলেন, জনা তিন-চার বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভদ্রলোক। অনামিকাকে দেখে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। প্রতি-নমস্কারের পালা চুকলো। তারপর কাজের কথায় এলেন তাঁরা।

একটি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করাতে এসেছেন। দেশের সমস্ত মান্যগণ্য, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্‌ শিক্ষাবিদ্‌ সমাজকল্যাণী আর শুভবুদ্ধি-সম্পন্নদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে নেমেছেন তাঁরা। অনামিকা দেবীকেও ফেলেছেন সেই দলে।

কিন্তু আবেদনটা কিসের?

আবেদনটা হচ্ছে দুর্নীতির বিরুদ্ধে।

এই দুর্নীতিসাগরে নিমজ্জিত দেশের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখে বিচলিত বিপর্যস্ত এঁরা সে সাগরে বাঁধ দিতে নেমেছেন।

ওজস্বিনী ভাষায় এবং বিক্ষুব্ধ গলায় বলেন তাঁরা, 'ভাবতে পারেন কোথায় আজ নেমেছে দেশ? খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে, ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে, শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—'

এমন ভাবে বলেন, যেন এইমাত্র টের পেয়েছেন তাঁরা দেশে এইসব ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটছে।

অনামিকা দেবী মনে মনে বলেন, 'খোকাবাবুরা এইমাত্র বুঝি স্বর্গ হতে টসকে পড়েছো! এ মর্তভূমে বিধাতার হাত ফসকে?' কিন্তু সে তো মনে।

মুখে শান্ত সৌজন্যের পালিশে ঈষৎ দুঃখের নক্সা কেটে বলেন, 'সে তো করছেই।'

'করছেই বলে তো চুপ করে থাকলে চলবে না অনামিকা দেবী। সমাজের দুর্নীতিতে আপনাদের দায়িত্ব সর্বাধিক। শিল্পী-সাহিত্যিকরা যদি দায়িত্ব এড়িয়ে আপন উচ্চমানসের গজদন্তমিনারে বসে শুধু কল্পনার স্বর্গ গড়েন, তাহলে সেটা হবে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।'

অনামিকা দেবী চমকিত হন।

না, ভয়ংকর নতুন এই কথাটায় নয়, ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে। ওঁর মনে হয় বাড়ির লোকেরা শুনলে ভাববে, কেউ আমাকে ধমক দিতে এসেছে।

চমকিত হলেও শান্ত স্বরেই বলেন, 'কিন্তু আবেদনটা কার কাছে?'

'কার কাছে?'

ভদ্রলোক উদ্দীপ্ত হন, 'মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে।'

'মানুষ? মানে ওই সব ভেজালদার চোরাকারবারীদের কাছে?'

খুব আস্তে, খুব নরম করেই কথাটা বললেন অনামিকা দেবী, ভদ্রলোকরা যেন আহত হলেন, আর সেই অপ্রকাশও রাখলেন না। ক্ষুব্ধ গলাতেই বললেন, 'আপনি হয়তো আমাদের প্রচেষ্টাকে লঘুচক্ষে দেখছেন, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, মানুষের শুভবুদ্ধি কোনো সময় না কোনো সময় জাগ্রত হয়।'

'সে তো নিশ্চয়।' অনামিকা দেবী নম্র গলায় বলেন, 'দেখি আপনাদের আবেদনপত্রের খসড়া।'

ব্যাগ খুলে সন্তর্পণে বার করেন ভদ্রলোক।

জোরালো গলায় বলেন, 'দেশের এই দুর্দিনে আপনাদের উদাস থাকলে চলবে না অনামিকা দেবী। অন্ধকারে পথ দেখাবে কে? কল্যাণের বাতি জেবলে ধরবে কে? যুগে যুগে কালে কালে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজকে পঙ্কশয্যা থেকে আবার টেনে তুলেছে সাহিত্য আর শিল্প।'

অনামিকা দেবী মৃদু হেসে বলেন, 'তাই কি ঠিক?'

'ঠিক নয়? বলেন কি?'

'তাহলে তো 'সম্ভবামি যুগে যুগে' কথাটার অর্থই হয় না—' বলে মৃদু হেসে কাগজটায় চোখ বুলোন অনামিকা দেবী।

ভাষা সেই একই। যা ভদ্রলোকরা আবেগদীপ্ত গলায় বলছেন।

'দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, মানুষের মধ্যে আর আদর্শ নেই, বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রেম নেই, পরার্থপরতা নেই, মানবিকতা বোধ নেই, সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে। কিন্তু চলেছে বলেই কি চলতে দিতে হবে? বাঁধ দিতে হবে না?'

অনামিকা দেবী মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন আমার একটি স্বাক্ষরেই যদি এতগুলো 'নেই' হয়ে যাওয়া দামী বস্তুকে ফিরিয়ে আনার সাহায্য হয় তো দেব বৈকি সেটা।

তবে 'বিশ্বাস' জিনিসটা যে সত্যিই বড্ড বেশী চলে গেছে তাতে আর সন্দেহ কি? নচেৎ তোমাদের এই সব মহৎ চিন্তা আর মহৎ কথাগুলির মধ্যে কোনো আশার রস পাচ্ছি না কেন? কেন মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষকে শুভবুদ্ধির শুভ্র আলোক দেখাবার ব্রত নিয়েই তোমরা এই দুপুর রোদে গলদঘর্ম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো, এ কি আর সত্যি? এটা বোধ হয় তোমাদের কোনো মতলব-গ্রন্থের সুচারু মলাট!

তারপর ভাবলেন, মলাট নিয়েই তো কারবার আমাদের। এই যে 'সাহিত্য' নিয়ে এত গালভরা কথা, সে-সাহিত্যও বিকোয় তো মলাটের জোরে। যার 'গেট আপ্' যতো জমকালো তার ততো বিক্রী।

কলমটা তুলে নিয়ে বসিয়ে দিলেন স্বাক্ষর।

ওঁরা প্রসন্ন মুখে ফিরে গেলেন।

অনামিকা দেবী তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ সেই চলে যাওয়া পথের দিকে। তারপর ভাবলেন, মতলবী যদি না হও তো তোমরা অবোধ। তাই চোরাকারবারীর শুভবুদ্ধির দরজায় হাত পাততে বসেছ।

যাক, যাই হোক, উদ্দেশ্যসিদ্ধির খুশি দেখা গেল ওদের মুখে। সেদিন দেখা যায়নি তাদের, সেই আর এক মানবকল্যাণ-ব্রতীদের।

তিন-চারটি রোগা রোগা কালো কালো ছেলে আর একটি মেয়ে এসেছিল সেদিন এই একই ব্যাপারে।

আবেদনপত্রে স্বাক্ষর।

তাদের চিন্তা শুধু দেশের গন্ডীতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা তাদের। এই যুদ্ধোন্মাদ পৃথিবীকে শান্তির মন্ত্র দেবার জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে তারা।

অনামিকা দেবী বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় না যে এই পদ্ধতিতে সত্যকার কাজ হবে।'

ওরা ক্ষুব্ধ হয়নি, আহত হয়নি, ফোঁস করে উঠেছিল।

বলেছিল, 'তবে কিসে সত্যকার কাজ হতে পারে বলে মনে হয় আপনার?'

অনামিকা দেবী হেসে উঠেছিলেন, 'আমার এমন কি বুদ্ধি যে চট্ করে একটা অভিমত দিই! তবে মনে হচ্ছিল উন্মাদের কাছে শান্তির আবেদন পত্রের মূল্য কি?'

ওরা যুক্তি ছেড়ে ক্রোধের শরণ নিয়েছিল। বলেছিল, 'তাহলে আপনি যুদ্ধই চান? শান্তি চান না?'

তারপর দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পরই, 'আচ্ছা ঠিক আছে। সই দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছে। তবে এই থেকে আপনাদের সাহিত্যিকদের মনোভাব বোঝা যাচ্ছে।' বলে ঠিকরে বেরিয়ে গিয়েছিল।

শান্তির জন্য দরজায় দরজায় আবেদন করে বেড়াচ্ছে ওরা, কিন্তু 'সহিষ্ণুতা' শব্দটার বানান ভুলে গেছে।

সেদিন তারা রাগ করে চলে গিয়েছিল।

অনামিকা দেবী অস্বস্তি বোধ করেছিলেন।

আজ আর অস্বস্তি নেই। আজ এঁরা প্রসন্ন মুখে বিদায় নিয়েছেন। স্বস্তি কেনবার এই উপায়!

অন্যের বাসনা চরিতার্থের উপকরণ হও, অন্যের মতলবের শিকার হও, আর তাদের ওই উপরের মলাটটা দেখেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হও। ভিতর পৃষ্ঠায় কী আছে তা বুঝতে পেরেছো, একথা বুঝতে দিও না। ব্যাস, পাবে স্বস্তি। নচেৎ বিপদ, নচেৎ দুঃখের আশঙ্কা।

বাইরে এখনো রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, গরমের দুপুর কেটেও কাটে না। কত কাজ জমানো রয়েছে, কত তাগাদার পাহাড় গড়ে উঠছে, তবু এই সময়টাকে যেন কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সেজদিকে কি চিঠি লিখবেন এখন?

সেজদির চন্দননগরের সেই গঙ্গার ধারের বাড়িটা মনে পড়লো। অমলবাবু সেজদির জীবনে আর কোন সঞ্চয় রেখে গেছেন কিনা জানা নেই, তবু স্বীকার না করে উপায় নেই, এই এক পরম সঞ্চয় রেখে গেছেন তিনি সেজদির জীবনে। গঙ্গার ধারের সেই ছোট্ট বাড়িটি।

সেখানে একা থাকে সেজদি।

শুধু নিজেকে নিয়ে।

দুই কৃতী ছেলে, থাকে নিজ নিজ কাজের জায়গায়। তাদের মস্ত কোয়ার্টার, মস্ত বাগান, আরাম আয়েস স্বাচ্ছন্দ্য।

কিন্তু সেজদিকে সেখানে ধরে না।

সেজদির চাই আরো অনেকখানি আকাশ, আরো অনেকখানি বাতাস। তাই গঙ্গার ধারের বারান্দা দরকার তার।

তবু সেজদি লেখে—'এখানে বাতাস নেই'।

বাতাসের যোগানদার তবে কে?

॥ ৩ ॥

শম্পা সেজেগুজে আনন্দে ছল্‌ছল করতে করতে এসে দাঁড়ালো, 'সিনেমা যাচ্ছি পিসি! মার্ভেলাস একখানা বই এসেছে লাইটহাউসে। যাচ্ছি, বুঝলে? দেরি হয়ে গেল সাজতে। সেই হতভাগা ছেলেটা টিকিট নিয়ে হাঁ করে বসে আছে তীর্থের কাকের মত, আর বোধ হয় একশো শাপমন্যি দিচ্ছে। চললাম। মাকে বলে দিও, বুঝলে?'

ওর ওই আহ্লাদে-ভাসা চেহারা কি কোনদিন দেখেননি অনামিকা দেবী? রোজই তো দেখছেন। তবু হঠাৎ কেন আজ 'বহু যুগের ওপার হতে' আষাঢ় এসে আড়াল করে ফেললো ওঁকে? সেই ছায়ায় হঠাৎ শম্পাকে বকুল মনে হল অনামিকা দেবীর।

ওর ওই হাওয়ায় ভাসা দেহটার সঙ্গে খাপ খাওয়া হাওয়া শাড়িটার জায়গায় একটা 'স্বদেশী মিল'-এর মোটা শাড়ির একাংশ দেখতে পেলেন যেন।

বকুলের সেই শাড়িটা চাবিবাঁধা আঁচলের ধরনে ঘরোয়া করে পরা, বকুলের চুলের রাশ টান টান করে আঁচড়ে তালের মত একটা খোঁপা বাঁধা, বকুলের পা খালি। বকুলের হাতে দুটো বই।

কিন্তু শম্পাকে হঠাৎ বকুল মনে হচ্ছে কেন? বকুলের তো শম্পার মত এমন আহ্লাদে-ভাসা চেহারা নয়?

বকুল ভীরু কুণ্ঠিত নম্র।

বকুলের মধ্যে দুঃসাহসের ভঙ্গী কোথায়?

নেই।

তবু শম্পাকে আড়াল করে বকুল এসে দাঁড়াচ্ছে। আর সেই ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা বকুলকে কারা যেন ধমক দিচ্ছে, 'খবরদার' আর ওদের বাড়িতে যাবে না তুমি। খবরদার নয়। এত বড় ধিঙ্গী মেয়ে হয়েছ, রাতদিন নাটক-নভেলের শ্রাদ্ধ করছো, আর এ জ্ঞান নেই কিসে নিন্দে হয়?'

বকুলের চেহারায় দুঃসাহসের ভঙ্গী নেই, তবু বকুল একটা দুঃসাহসিক কথা বলে বসলো। হয়তো এই জন্যই শম্পার থেকে কেমন একটা মিল মনে হচ্ছে হঠাৎ।

বললো, 'হঠাৎ নিন্দে হবে কেন? চিরকালই তো যাই।'

'চিরকালের সঙ্গে এখনকার তুলনা কোরো না—', একটা ভাঙা-ভাঙা প্রৌঢ় গলা বলছে, 'এখন তোমার মাথার ওপর মা নেই। তাছাড়া ওদের ঘরে বড় ছেলে—'

হ্যাঁ, এমন একটা অ-সভ্য কথা অনায়াসেই উচ্চারণ করেন তিনি।

বকুলের ক্ষীণ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, 'আচ্ছা বেশ, আর যাবো না, আজ শুধু এই বই দুটো ফিরিয়ে দিয়ে আসি।'

'কি বই?'

'এমনি।'

'এমনি মানে? নাটক-নভেল?'

বকুল চুপ।

'ওই তো, ওইটিই হয়েছে কুয়ের গোড়া? তিন পুরুষে একই রোগ। শুনতে

পাই দিদিমার ছিলো, মার তো ষোলো আনা ছিলো; তারপর আবার মেয়েরও—দেখি কি বই!'

বকুলের হাত থেকে বই দুটো প্রায় কেড়ে নেন তিনি। খুলে ধরেন। তারপর বিদ্রুপের গলায় বলেন, 'ওঃ, পদ্য! রবি ঠাকুর! সাধে আর বলছি তিন পুরুষের একই রোগ!—হুঁ, ঠিক আছে। আমি দিয়ে দেব। বই কার? ওই নির্মলটার নিশ্চয়?'

বকুল পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বকুল উত্তর দিতে পারে না।

প্রৌঢ়ের গলা থেকে একটি একাক্ষর শব্দ বেরোয়, 'হুঁ।'

সেই শব্দের অন্তর্নিহিত ধিক্কারে পাথরের বকুল আষাঢ়ের ছায়ার আড়ালে মিলিয়ে যায়।...শম্পার আহ্লাদে-ভাসা মূর্তিটা ঝলসে ওঠে সেই শূন্যতার উপর।

ঝলসে-ওঠা শম্পা বলে, 'যাচ্ছি তাহলে। মাকে একটু মুড্ বুঝে বোলো।'

অনামিকা দেবী ঈষৎ কঠিন স্বরে বলেন, 'তুই নিজেই বলে যা না বাপু। আমি তোর মার মুড্‌ফুড্ বুঝতে পারি না।'

'তুমি পারো না?' শম্পা হি হি করে হেসে ওঠে, 'তুমি বলে ওই করেই খাচ্ছো। দোহাই পিসি! এখন মাকে বলতে গেলে, সিনেমার বারোটা বেজে যাবে। হত-ভাগাটা হয়তো কাটা টিকিট ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে রেলে কাটা পড়তে যাবে।'

হাসতে হাসতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় শম্পা পিসিকে 'টা-টা'করার ভঙ্গী করে।

অনামিকা দেবী অপলকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ভাবেন, আশ্চর্য! ও এ বাড়িরই মেয়ে? কত যুগ পরের মেয়ে?

শম্পা যখনই একটু দুঃসাহসিক অভিযানে বেরোয়, পিসিকে জানিয়ে যায়। পিসির সঙ্গে তার 'মাই-ডিয়ারি' ভালবাসা।

তাই তার প্রেমাস্পদের গল্পগুলো পিসির সঙ্গেই জমাতে আসে।

হয়তো অনামিকা দেবী সময়ের অভাবে ছটফটিয়ে মরছেন। হয়তো প্রতিশ্রুত লেখা প্রতিশ্রুতিমত সময় দিয়ে উঠতে না পারায় তাগাদার উপর তাগাদা আসছে, একটুমাত্র সময় সংগ্রহ করে বসেছেন খাতা কলম নিয়ে, তখন শম্পা তিনতলায় উঠে এসে জাঁকিয়ে বসলো, 'বুঝলে পিসি, "হতভাগা" বলেছি বলে বাবুর কী রাগ! বলে কিনা "ভবিষ্যতেও তুমি তাহলে আমাকে এইরকম গালাগাল দেবে?" বোঝো। এ অবতারও সেই "ভবিষ্যতে"র স্বপ্ন দেখছেন। অর্থাৎ একটু "প্রেম প্রেম" ভাব দেখেছে কি বিয়ের চিন্তা করতে শুরু করেছে। ছেলেগুলো যে কেনই এত বোকা হয়! তা বুঝলে পিসি, আমিও ওকে বলে দিলাম, "হতভাগা নয় তো কি? হতভাগা নইলে আমি ছাড়া আর ভালমত একটা সুইট-হার্ট জুটলো না তোমার?" ঠিক বলিনি পিসি?'

অনর্গল কথা বলে যায়।

অনামিকা তাকে শাসন করতে পারেন না। অনামিকা দেবী বলতে পারেন না, এত বাচালতা করে বেড়াস কেন?

না, বলতে পারেন না। বরং প্রশ্রয়ই দেন বলা যায়।

প্রশ্রয় দেন হয়তো নিজেরই স্বার্থে। এই মেয়েটার কাছাকাছি এলেই যেন অনামিকা দেবীর খাঁচার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে একটি বন্দী পাখী, এসে আলোর দরজায় উঁকি মারে।

ও যে 'অনামিকা দেবী'কে নস্যাৎ করে দিয়ে তার 'পিসি'র কাছে এসে দাঁড়ায়, এটাই যেন সর্বাঙ্গে ভালবাসার হাত বুলিয়ে দেয় অনামিকার।

জিনিসটা বড় দুর্লভ।

কিন্তু অনামিকার এমন হ্যাংলামি কেন?

কি নেই তাঁর জন্যে?

যশ আছে, খ্যাতি আছে, শ্রদ্ধা-সম্মান আছে, ভালবাসাও আছে। অজস্রই আছে। কিন্তু এ সবেরই 'হেতু'ও আছে।

অহেতুক ভালবাসাই বড় দুর্লভ বস্তু। তাছাড়া যা আছে, সব তো আছে অনামিকা দেবী নামক খোলসটার জন্যে।

তাই শম্পার ওই বাচালতা, ওই বেপরোয়া ভঙ্গী, ওই লাজলজ্জার বালাইহীন কথাবার্তা, সব কিছুই সহ্য হয়ে যায়। বরং ভালই লাগে। মনে হয়, যেন শম্পাকে এ ছাড়া আর কোন ভঙ্গীতে মানায় না।

বাড়ির লোক অন্য অনেক কিছু না বুঝুক, এটা বোঝে।

তাই প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে অনামিকা দেবীকেই দায়ী করে শম্পার বেচালের জন্যে।

'বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে যে—', ছোট বৌদি দেওয়ালকে উদ্দেশ করেই বলেন, 'ভয় কেন থাকবে? শুধু আমার নিজের হাতে মেয়ে থাকলে, কেমন না টিট্ করতাম দেখতো সবাই!' ছেলে জন্মাবার পর অনেকগুলো বছর বাদে শম্পার আবির্ভাব হয়েছিল। বড়ো বয়সের এই মেয়েটাকে এঁটে উঠতে কোনো দিনই পারেন না ছোট বৌদি, কিছু দোষারোপটা করেন অনামিকাকে।

অনামিকা দেবী তাই মাঝে মাঝে বলেন, 'তোর মাকে জিজ্ঞেস কর না বাবা? তোর মাকে বলে যা না বাবা?'

শম্পা চোখ গোল করে বলে, 'মাকে? তা'হলে আজকের মত বেরোনোর মহানিশা। "কেন", "কি বৃত্তান্ত", "কোথায়", "কার সঙ্গে?" ইত্যাদি, প্রভৃতি সে কী জেরা! উঃ, কী একখানা ব্রেন! মার বাবা যদি মাকে লেখাপড়া শিখিয়ে উকিল করে ছেড়ে দিতো, তাহ'লে দেশের দশের উপকার হতো, আর এই শম্পাটারও প্রাণ বাঁচতো। কেন যে সে বুদ্ধিটা মাথায় আসেনি ভদ্রলোকের!'

অনামিকা ওর এই কথার ফুলঝুরিতে হাসেন, কিন্তু অনামিকার সেই হাসির অন্তরালে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস স্তব্ধ হয়ে থাকে।

তোরা আজকের মেয়েরা জানিস না, খেয়ালও করিস না, তখন কোনো ভদ্রলোকের মাথাতেই ও বুদ্ধিটা আসতো না। আর যদি বা দৈবাৎ কারো মাথায় আসতো, লোকে তাকে তখন আর "ভদ্রলোক" বলতো না।

তাই এমন কত 'মস্তিষ্ক'ই অপচয় হয়েছে, কত জীবনই অপব্যয়িত হয়েছে। আজ পৃথিবী তোদের পায়ের তলায়, আকাশ তোদের মুঠোয়, তোরা নিজের 'জীবন'কে নিজের হাতে পাচ্ছিস, আর তার আগে সেটা গড়ে দিচ্ছে তোদের গার্জেনরা।

তোরা কি বুঝবি গড়নের বালাইহীন একতাল কাদার জীবনটা কেমন? তাও সেই বাঁকাচোরা অসমান ডেলাটাও অন্যের হাতে।

সেই অন্যের হাতের চাপে বিকৃত অসমান কাদার জীবনকে দেখেছি আমরা, তাই ভাবি তোরা কত পেয়েছিস! কত পাচ্ছিস! কিন্তু সে বোধ কি আসে কোনোদিন তোদের? কিন্তু কেনই বা আসবে? প্রাপ্য পাওনা পাওয়ার জন্যে কি কৃতজ্ঞতা আসে?

বুকভরা নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাস থাকলে কি কেউ ভাবতে বসে কে কবে কোথায় বাতাসের অভাবে দম আটকে মরেছে?

বকুলের ছবিটা একবার ভেসে এসেছিল বহু যুগের ওপার থেকে, কিন্তু তার খাতাটা ? সেটা যে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না অনামিকা দেবী। খোঁজবার জায়গাটাই খুঁজে পাচ্ছেন না।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, আর মনে হচ্ছে, এই সব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর উপাদানের মধ্যে বকুলকে কোথায় পাবো ?

বকুল বাপ-ভাইয়ের কঠোর শাসনে তার ভালবাসাকে লোহার সিন্দুকে পুরে ফেললো, এটুকু তো দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটা কি একটা বলবার মত উপকরণ ?

অথচ বকুলের কথা লেখবার জন্যে কোথায় যেন অঙ্গীকার ছিল। সে অঙ্গীকার কি ভুলে গেছেন অনামিকা দেবী ?

ভুলে হয়তো যাননি, তবু কত হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা হল জীবনে, কত হাজার হাজার বানানো মানুষের কথা, অথচ সেই কথাটা চাপা পড়ে রইল।

কিন্তু ও নিয়ে এখন আর ভাবনার সময় নেই। 'বনবাণী'র সম্পাদক টেলিফোন-যোগে হতাশ গলায় জানাচ্ছেন, 'আপনার কপিটার জন্যে কাগজ আটকে রয়েছে অনামিকা দেবী। সামনের সপ্তাহে বেরোবার কথা, অথচ—'

'বনবাণী'র পরেই 'সীমান্তে'র কপি, তারপর 'অন্তহীন সাগরে'র প্রুফ। তার ভিতরেই তো উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন।

দিন আষ্টেক পরে সেজদির চিঠির উত্তর দিলেন, 'বকুলের খাতাটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। মনে হচ্ছে হারিয়েই ফেলেছি। আর তার সঙ্গে মনে হচ্ছে, হয়তো তোর কাছেই আছে। দেখ্ না খুঁজে।'

॥ ৪ ॥

আগেকার দিনে মেয়েরা শাড়ি কুঁচিয়ে নিয়ে পরতো। হালকা মিহি 'খড়কে ডুরে' 'চাঁদের আলো' 'গঙ্গাজলী'। কড়া করে মোচড় দিয়ে দিয়ে পাকানো সেই কোঁচানো শাড়িকে বাঁধন খুলে বিছিয়ে দিলে, তার ছোট ছোট ঢেউতোলা জমিটা যেমন দেখাতো, গঙ্গাকে এখন যেন তেমনি দেখতে লাগছে। জোয়ার নেই, ভাঁটা নেই, স্থির গঙ্গা।

শুধু বাতাসের ধাক্কায় ছোট ছোট তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ কোঁচানো গঙ্গাজলী শাড়ীর মত একূল ওকূল আঁচল বিছিয়ে তির্ তির্ করে কাঁপছে।

এখন পড়ন্ত বিকেল, এখন গঙ্গা আর গঙ্গাতীরের শোভার তুলনা নেই, এই শোভার শেষবিন্দুটুকু পান করে তবে এই বারান্দা থেকে উঠবেন সেজদি। যাঁর, নাম পারুল, আর যাঁকে নাম ধরে ডাকবার এখানে কেউ নেই।

এই তাঁর পুজো, এই তাঁর ধ্যান, এই তাঁর নেশা। রোদ পড়লেই গঙ্গার ধারের বারান্দায় এসে বসে থাকা। হাতে হয়তো একটা বই থাকে, কিন্তু সে বই পড়া হয় না। এ সময়টা যেন নিজেকে নিয়ে ওই গঙ্গারই মত কোনো অতল গভীরে ডুবে যান তিনি।

ফর্সা রং, ধারালো মুখ, ঈষৎ কোঁকড়ানো হালকা রুক্ষ চুলে রুপোলি ব্রাশের টান। সম্পূর্ণ নিরাভরণ হালকা পাতলা দেহটি ঘিরে যে সাদা থান আর ব্লাউজ, তার শুভ্রতা যেন দুধকেও হার মানায়। সাদা ফুলের সঙ্গেই বরং তুলনীয়।

পাড়ার মহিলারা কখনো কখনো বেড়াতে আসেন, সধবা বিধবা দু দলই

আর পথে বেরোলে অবশ্যই ফর্সা কাপড় পরেন, কিন্তু এখানে এসে বসলে তাঁদের সে শুভ্রতা সম্ভ্রম হারায়।

মহিলারা বিস্ময়-প্রশ্ন করে বসতেও ছাড়েন না, 'কোন্ ধোবায় আপনার কাপড় কাচে দিদি ? কী ফর্সা করে! আর বাড়িতেও যে আপনি কি করে কাপড় এত ফর্সা রাখেন! আমাদের তো বাবা রান্নাঘরে গেলাম, আর কাপড় ঘুচে গেল।'

সেজদি এতো কথার উত্তরে শুধু মৃদু হেসে বলেন, 'আমার রান্নার ভারী বহর!'

সেজদি অল্প কথার মানুষ।

অনেক কথার উত্তরে ছোট দু'একটি লাইনেই কাজ সারতে পারেন। মহিলারা নিজেই অনেক কথা বলে, তারপর 'যাই দিদি, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম' বলে চলে যান।

সেজদি এ কথাতেও হৈ-হৈ করে প্রতিবাদ করে ওঠেন না। শুধু তেমনি হাসির সংগে বলেন, 'আমার আবার সময় নষ্ট! সারাক্ষণই তো সময়।'

গমনোন্মুখ মহিলাকুল আবার থমকান, ঈষৎ ঈর্ষা আর ঈষৎ প্রশংসায় বলে ওঠেন, 'কি জানি ভাই, কি করে যে আপনি এতো সময় পান। আমরা তো এতোটুকু সময় বার করতে হিমসিম খেয়ে যাই। ইহ-সংসারের খাজনা আর শেষ হয় না।'

সেজদি এ উত্তর দিয়ে বসেন না, খাবেন না কেন হিমসিম, কাজের তালিকা যে আপনাদের বিরাট! নিত্য গঙ্গা নাইবেন, নিত্য যেখানে যত বিগ্রহ আছেন তাঁদের অনুগ্রহ করতে যাবেন, নিত্য ভাগবত পাঠ শুনতে বেরোবেন। তাছাড়া বাড়িতেও কেউ এক ডজন ঠাকুর নিয়ে ফুলচন্দন দিতে বসবেন, কেউ তুলসীর মালা নিয়ে হাজার জপ করতে বসবেন।

নিত্য এতগুলি 'নিত্যের নৈবেদ্য' যুগিয়ে তবে তো আপনারা অনিত্য ইহ-সংসারের খাজনা দিতে বসেন? তার মধ্যেও আছে ইচ্ছাকৃত কাজ বাড়িয়ে তোলার ধরন! ভরা জল আবার ভরা, মাজা কলসী আবার মাজা, কাচা কাপড়কে আকাচা সন্দেহে আবার কাচা, এসব বাদেও—তুচ্ছ জিনিসকে উচ্চমূল্য দিতে অবকাশকে গলা টিপে মারেন। একমুঠো কাঁকর-ভর্তি চাল, একমুঠো কয়লার গুঁড়ো, এ যে আপনাদের কাছে সময়ের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

না, এসব কথা বলেন না সেজদি।

তিনি শুধু হেসে বলেন, 'আপনাদের সংসার করা, আর আমার সংসার করা! কীই বা সংসার!'

নিজের আর নিজের দিন নির্বাহের আয়োজনের সম্পর্কিত কথায় ভারী কুণ্ঠা সেজদির। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'কী রাঁধলেন' ? উত্তর দিতে সেজদি যেন লজ্জায় মরে যান। তাছাড়া রান্নার পদ সম্পর্কে বলতে গেলেই তো বিপদ। সেজদির অন্নপাত্রে একাধিক পদের আবির্ভাব দৈবাতের ঘটনা। শুধু যখন ছেলেরা কেউ ছুটিতে বেড়াতে আসে তখনই—

বাইরে থাকে ছেলেরা। ছুটি হলেই কলকাতা তাদের টানে। ছুটি হলেই বৌ-ছেলে নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসে মনকে বলে, 'চলো কলকাতা'। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে দুই ছেলেরই শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় বলে। তা নইলে হয়তো বলতে হতো —'চলো মধ্যপ্রদেশ', 'চলো উত্তরবঙ্গ'।

স্বামীর ছুটির সুযোগে বৌদের গন্তব্যস্থল আর কোথায় হবে বাপের বাড়ি ছাড়া ? আদি-অন্তকালই যে এই নিয়ম চলে আসছে, স্বয়ং মা দুর্গাই তার প্রমাণ। বৃন্তচ্যুত ফুলের মর্মকথা কারো জানা নেই, কিন্তু বৃন্তচ্যুত নারী-সমাজের মর্ম-

কথা ধরা পড়ে তাদের এই পিত্রালয়-প্রীতিতে।

থাকবেই তো প্রীতি।

শৈশবের সোনার দিনগুলি যেখানে ছড়িয়ে আছে স্মৃতির সুরভি হয়ে, কৈশোরের রঙিন দিনগুলি যেখানে বিকশিত হয়েছে, কম্পিত হয়েছে, আশা-আনন্দে দুলছে, সেখানটার জন্যে মন ছুটবে না? যেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই একান্ত প্রিয়জনের মুখ, সেখানের আকর্ষণ দুর্বার হবে না?

হয়।

তাই বৌরা স্বামীর ছুটি হলে বলে, 'ছুটিতে কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার কথা বলছো? কিন্তু মা অনেকদিন থেকে বলছেন—'

ছেলেরা অতএব বাক্সবিছানা বেঁধে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শিবঠাকুরের মতো গিরি-রাজের গৃহেই এসে উদিত হয়। শ্বশুরের বাড়ি ছোট, ঘর কম, কি অন্য অসুবিধে, এসব চিন্তা বড় করে না। শুধু হয়তো ছুটির তিরিশ দিনের মধ্যে থেকে তিন-দিন কেটে বার করে নিয়ে নিজের মায়ের কাছে ঘুরে আসে।

এটা অবশ্য শুধু অনামিকা দেবীর সেজদির ঘরেই ঘটছে তা নয়, ঘরে ঘরেই এই ঘটনা। মেয়েরা অনেক কিছু বোঝে, বোঝে না শুধু স্বামীরও 'হৃদয়' নামক একটা বস্তু আছে।

প্রবাসে চলে গেলে পুরুষ বেচারীদেরও যে শৈশব-বাল্যের সেই স্মৃতিময় ঘরখানির জন্যে হৃদয়ের খানিকটা অংশে থাকে একটি গভীর শূন্যতা, তা মেয়েরা বুঝতে চায় না। পুরুষের আবার 'মন কেমন' কি? তাই ওই তিনদিনের বরাদ্দে যদি আর দুটো দিন যোগ হয়ে যায়, বৌ অনায়াসেই ঝঙ্কার দিয়ে বলতে পারে, 'তুমি তো ছুটির সবটাই ওখানে গিয়ে কাটিয়ে এলে!'

অনেক কিছু প্রোগ্রাম থাকে তাদের, তিরিশ দিনের ঠাসবুনুনি। সেই বুনুনি থেকে দু'একটা সুতো সরিয়ে নিলেও ফাঁকটা প্রকট হয়ে ওঠে।

সেজদির দুই বৌ দু'ধরনের, কিন্তু ছুটিতে বাপের বাড়ির ব্যাপারে প্রায় অভিন্ন। তবু বড় বৌ কদাচ কখনো চন্দননগরে আসে, ছোট বৌ কদাচ না।

ওরা এলে সেজদির সংসারটা 'সংসারে'র চেহারা নেয় দু'তিন দিনের জন্যে। তাছাড়া সারা বছর শুধু একটি অখণ্ড স্তব্ধতা।

পাড়ার মহিলারা দৈবাৎই আসেন, কারণ 'মোহনের মা'র সঙ্গে ওঁদের সুরে মেলে না। যেটুকু আসেন, নিতান্তই কৌতূহলের বশে। নিতান্তই সংবাদ সংগ্রহের আশায়, নচেৎ বলতে গেলে সেজদি তো জাতিচ্যুত।

গঙ্গাবক্ষে বাস করেও মোহনের মা নিত্য তো দূরের কথা, যোগেযাগেও গঙ্গা-স্নান করেন না, পুজো করেন না, হিন্দু বিধবা-জনোচিত বহুবিধ আচারই মানেন না। এমন কি জানেনও না। বিধবাকে যে হরির শয়ন পড়ার পর পটল আর কলমি শাক খেতে নেই, একথা জানতেন না তিনি, তারকের মা সেটা উল্লেখ করায় হাসি-মুখে বলেছিলেন, 'তাই বুঝি? কিন্তু হরির শয়নকালের সঙ্গে পটল-কলমির সম্পর্ক কি?'

তারকের মা গালে হাত দিয়েছিলেন। 'ওমা শোনো কথা! বলি মোহনের মা, কোন্ বিলেতে মানুষ হয়েছিলে তুমি গো? শ্রীহরি যে কলমি শাকের বিছানায়, পটলের বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোন, তাও জানো না? সেদিনকে—ইয়ে তোমার সেই অম্বুবাচীর দিনকের কথায় আমরা তো তাজ্জব! দত্তদিদি ফুলকুমারী আর আমি হেসে বাঁচি না। অম্বুবাচীতে বিধবাকে আগুন স্পর্শ করতে নেই শুনে তুমি আকাশ থেকে পড়লে!...যাই বলো ভাই, তোমার চোখ-কান বড় বন্ধ! ঘরে না হয়

শাশুড়ী-ননদ ছিল না, পাড়াপড়শীর সংসারও তো দেখে মানুষ!'

সেজদির বড় ছেলের নাম মোহন।

তাই সেজদি এই মহিলাকুলের অনেকের কাছেই 'মোহনের মা' নামে পরিচিত।

সেজদির স্বামী অমলবাবুর বদলির চাকরি ছিল, জীবনের অনেকগুলো দিনই সেজদির বাইরে বাইরে কেটেছে, শেষের দিকে অমলবাবু দেশের পোড়ো ভিটের সংস্কার করে, গঙ্গার ধার ঘেঁষে এই বারান্দাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এ বারান্দা তোমার জন্যে। তুমি কবি মানুষ!' স্বামী সেজদিকে ভালবাসতেন বৈকি, খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধরনের সেই ভালবাসা —কিন্তু ও কথা থাক। পৃথিবীতে কত মানুষ, কে কার ছাঁচে ঢালা?

কেউ না।

তবু যারা বুদ্ধিমান, তারা সুবিধে আর শান্তির মুখ চেয়ে নিজের ধারালো কোণগুলো ঘষে-ক্ষইয়ে ভোঁতা করে নিয়ে অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। নিয়ত সংঘর্ষের হাত এড়ায়।

তারা জানে 'সংসার' করার সাধ থাকলে, ওই ধারালো কোণগুলো তো থাকবে না, যাবেই ক্ষয়ে। শুধু সেটা যাবে নিয়ত সংঘর্ষের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতায়। তার থেকে নিজেই ঘষে নিই।

আর যারা বুদ্ধিমান নয় এবং সংঘর্ষকে ভয় পায়, তারা একপাশে সরে থাকে, নিজেকে নিয়ে গুটিয়ে থাকে। তারা কদাচ কখনো একটি মনের মতো 'মন' পেলে, তবেই সেখানে নিজেকে খোলে।

সেজদি বুদ্ধিমতী নয়।

সেজদি এদের দলে।

সেজদি তাই ওই তারকের মা, ফুলকুমারীদের সঙ্গে একথা বলে তর্ক করতে বসেন না, 'আপনাদের শ্রীহরির গোলোক বৈকুণ্ঠে কি অন্য বিছানা জোটেনি? মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ফাঁকা? তাই ভদ্রলোককে কলমি-পটলের শরণাপন্ন হতে হয়?' ...অথবা এ তর্কও করেন না, 'বাড়িতে যদি শুধু বিধবা মা আর ছেলেরা থাকে, মা ওই আগুন-নিষেধ পালন করতে না খাইয়ে রাখবে তাদের? রেঁধে দেবে না?' কথাগুলো তো মনে এসেছিল সেজদির।

হয়তো সেজদি এই তর্ককে বৃথা শক্তিক্ষয় বলে মনে করেন, অথবা সেজদি ওই 'মহিলা' দলের সমালোচনাকে তেমনি গুরুত্ব দেন না। হয়তো তাদের তেমন গ্রাহ্য করেন না।

সেজদিকে বাইরে যতই অমায়িক মনে হোক, ভিতরে ভিতরে হয়তো দস্তুর-মতো উন্নাসিক।

তাই তিনি ছেলেদের বিদায়দানকালে কখনো চোখের পাতা ভিজে করেন না, কখনো 'আবার শীগ্‌গির আসিস' বলে সজল মিনতি জানান না।

হাসি-কথার মধ্য দিয়েই তাদের বিদায় দেন।

নাতি-নাতনীদের যে তাঁর দেখতে খুব ইচ্ছে হয়, তারা এলে যে মনটা ভরে ওঠে, একথা সেজদির মোহন শোভন জানে না। তাই তারা খেয়ালও করে না, মায়ের কাছে নিয়ে যাই ওদের।

শুধু শোভনের মেয়েটা বড় বেশী সুন্দর দেখতে হয়েছে বলে একবার দেখাতে নিয়ে এসেছিল। শুধু মোহনের ছোট ছেলের একবার 'পক্স' হওয়ায় বড়টিকে মার কাছে কিছুদিনের জন্য রেখে গিয়েছিল। ছেলের দিদিমারা তখন সপরিবারে তীর্থে গেছেন।

আসানসোলে থাকে মোহন, খুব একটা দূরত্ব তো নয়।

শোভন অনেক দূরে।

শোভনের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। মাইলের হিসেব দিয়ে সে দূরত্বকে আর মাপা যাচ্ছে না।

অথচ আগে শোভনই মার বড় 'নিকট' ছিল। শোভনই প্রথম ভাল আর বড়ো কোয়ার্টার পাওয়া মাত্রই মাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।...বলেছিল, 'তোমার একা পড়ে থাকা চলবে না।'

কিন্তু শোভনের এই বোকাটে সেন্টিমেন্ট শোভনের বৌ সহ্য করবে কেন? বরের ওই আহ্লাদেপনার তালে তাল দিতে গেলে তার নিজের জীবনের সব তাল বেতাল হয়ে যাবে না? সব ছন্দপতন হয়ে যাবে না?

তার এই ছবির মতো সাজানো সংসারে 'শাশুড়ী' বস্তুটা একটা অদ্ভুত ছন্দ-পতন ছাড়া আর কি?...দু'চার দিনের জন্যে এসে থাকো, আদর করবো যত্ন করবো, 'ব্যবহার' কাকে বলে তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু শেকড় গাড়তে চাইলে?

অশ্বত্থের চারাকে চারাতেই বিনষ্ট করতে হয়।

আদুরে বেড়ালকে পয়লা রাত্তিরেই কাটতে হয়।

শোভনের বৌ জানতো একথা।

শোভনের বৌ তার জানা বিদ্যেটা প্রয়োগ করতে দেরি করেনি।

হয়তো কিছুটা দেরি করতো, হয়তো একবারও শোভনতা-অশোভনতার মুখ চাইতো, যদি শাশুড়ী তার সাধারণ বিধবা বুড়ীর মত ভাঁড়ার ঘর পুজোর ঘরের মধ্যেই নিমগ্ন থাকতো। যদি কৃতী ছেলের বৌয়ের সঙ্গে যেমন সসম্ভ্রম ব্যবহার করতে হয় তা করতো, যদি ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার পদ্ধতিতে বৌকে ডিঙিয়ে ছেলের সঙ্গে বসে গল্প না জুড়তো।

কিন্তু শোভনের নির্বোধ মা 'সাহেব' ছেলেকে 'সাহেবে'র দৃষ্টিতে না দেখে ছেলের দৃষ্টিতে দেখতে গেলেন। শোভনের মা ভাঁড়ার ঘর পুজোর ঘরের ছায়াও না মাড়িয়ে ড্রইংরুমে এসে সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন, পশম বুনতে শুরু করলেন।

বুনলেন অবশ্য শোভনের জন্যেই, কিন্তু কে চায় সে জিনিস? বৌ কি বুনতে জানে না? আর সেই জানাটা জানাবে না?

সেজদি তাই ছেলেকে বললেন, 'বললে তুই আমায় মারবি শোভন, আমার কিন্তু গঙ্গার ধারের সেই বারান্দাটার জন্যে বেজায় মন-কেমন করছে। আমায় বাবু একটু পৌঁছে দিয়ে আয়। তোর ছুটি না থাকে তোর চাপরাসী-টাসী কাউকে দিয়ে—'

শোভন হয়তো ভিতরে ভিতরে কিছুটা টের পাচ্ছিল, শোভন হয়তো একটা অদৃশ্য উত্তাপের মধ্যেই কাটাচ্ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। মায়ের শক্তির উপর আস্থা ছিল তার।

শোভনের অতএব অভিমান হল।

হয়তো শোভন তার মায়ের প্রকৃতিই বেশী পেয়েছে। তাই শোভন 'হাঁ হাঁ' করে উঠলো না। শোভন শুধু বললো, 'আজই যেতে চাও?'

'কী মুশকিল! আজই কি রে! কাল পরশু তোর সুবিধে মতো—'

'থাকাটা একেবারেই অসম্ভব হলো?'

শোভনের মা হালকা গলায় হেসে বললেন, 'নাঃ, তুই দেখছি বড্ড রেগে যাচ্ছিস। কিন্তু সত্যিই রে, কদিন ধরে কেবলই সেই গঙ্গা-গঙ্গা মন করছে।'

শোভন বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে।' মানে সব চেয়ে বৈঠিকের সময় যে কথাটা বলে লোকে। 'ঠিক আছে'—অর্থাৎ 'ঠিক নেই'।

সেজদির ছেলে কি মাকে নিষ্ঠুর ভাবলো না ? সে কি মনে করলো না—মা আমার মনের দিকটা দেখলেন না ? মার অহমিকাটাই বড় হলো ? জানি রেখা তেমন নম্র নয়, কিন্তু করা যাবে কি ? সবাই কি সমান হয় ? আমি ওকে নিয়ে ঘর করছি না ?

হয়তো শোভনের মা ছেলের মুখের রেখার এই ভাষা পড়তে পারলেন, কিন্তু তিনি বলে উঠতে গেলেন না, 'ওরে তুই যতটুকু দেখতে পাস, সেইটুকুই সব নয়।'

শোভনের মা সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে হাসামুখে ছেলের বাড়ি থেকে সরে এলেন। এই সরে আসাটা কি অপরাধ হলো পারুলের ? অনামিকা দেবীর সেজদির ? মোহন-শোভনের মার ?

তা অপরাধ বৈকি।

ছেলে-বৌয়ের একান্ত ভক্তির নৈবেদ্য পায়ে ঠেলে একটা তুচ্ছ মান অভিমান নিয়ে খরখরিয়ে চলে যাওয়াটা অপরাধ নয় ?

আশেপাশে সমস্ত কোয়ার্টারের বাসিন্দারা এই হঠাৎ চলে যাওয়ায় অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে আরো অবাক হল।

একদিন বৌ শাশুড়ীর রাত্রের আহারের ক্ষীর করে রাখতে ভুলে গিয়ে বেড়াতে চলে গিয়েছিল বলে, চলে যাবে মানুষ ছেলের বাড়ি ছেড়ে ? ছিঃ!

কেউ কেউ বললো, 'দেখলে কিন্তু ঠিক এরকম মনে হতো না।'

রেখা মুখের রেখায় অপূর্ব একটি ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে বললো, 'বাইরে থেকে যা দেখা যায় তার সবটাই সত্যি নয়।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কিছুই নয়, বড়ছেলের সংসারেও তো ঠিক এই করেছিলেন।'

যারা পারুলকে ভালবাসতো, তারা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল, যারা বান্ধবীর শাশুড়ীকে বা বন্ধুর মাকে ভলাবাসার মতো হাস্যকর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা শুধু খানিকটা নিন্দে করলো।

তারপর আর শোভনের সংসারে শোভনের মার অস্তিত্বের কোনো স্মৃতি রইল না। শোভনের জন্যে সেই আধবোনা সোয়েটারটা অনেকদিন পর্যন্ত ট্রাঙ্কের উপর পড়ে থাকতে থাকতে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

শোভনের দামী কোয়ার্টারে সুন্দর 'লন' গেঞ্জি-ট্রাউজার পরা 'সাহেব'দের এবং কোমরে আঁচল জড়ানো মেমসাহেবদের টেনিস-কল্লোলে-মুখরিত হতে থাকলো, শোভনের খাবার টেবিল প্রায়শই নিমন্ত্রিত অতিথির অভ্যর্থনার আয়োজনে প্রফুল্লিত হতে থাকলো, শোভনের ঘর যখন তখন রেখার উচ্ছ্বসিত হাসিতে মুখরিত হতে থাকলো।

তবে আর শোভন তার ভিতরের একটি বিষণ্ণ শূন্যতাকে লালন করে করে দুঃখ পেতে যাবে কেন ?

হৃদয়ভারাবনত জননী, আর অভিমানউত্তপ্ত স্ত্রী, এই দুইয়ের মাঝখানে অপরাধীর ভূমিকা নিয়ে পড়ে থাকায় সুখই বা কোথায় ? একটাকে তো নামাতেই হবে জীবন থেকে ?

॥ ৫ ॥

ফেরার পথে পারুল ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে বাইরের গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভেবেছিল, ধারণা ছিল যুগের নিয়ম অনেকটা সিঁড়ির নিয়মের মত। সে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হতে হতে চলে...তা হলে কি আমার অন্যমনস্কতার অবকাশে একটা যুগ তার কাজ করে চলে গেছে, আমি খেয়াল করিনি?

নইলে সে যুগটা কোথায় গেল?

আমার যুগটা?

আমি আমার মাকে দেখেছি—দেখেছি জেঠিমা কাকিমা পিসিমাদের, দেখেছি আমার শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীদের। ওপরওয়ালার জাঁতার তলায় নিস্পিষ্ট সেই জীবনগুলি শুধু অপচয়ের হিসেব রেখে চলে গেছে...আমরাও আমাদের বধূ-জীবনে সেই অপচয়ের জের টেনেই চলে এসেছি আর ভেবেছি আমাদের 'কাল' আসতে বুঝি বাকি আছে এখনো। সেই আসার পদধ্বনির আশায় কান পেতে বসে থাকতে থাকতে দেখছি আমরা কখন যেন বাতিলের ঘরে আশ্রয় পেয়ে গেছি!

সে 'কাল'টা তবে গেল কোথায়?

যেটার জন্যে আমাদের আশা ছিল, তপস্যা ছিল, স্বপ্ন ছিল।

এখন যাদের 'কাল' তারা একেবারে নতুন, একেবারে অপরিচিত। তাদের কাছে গিয়ে খোঁজ করা যায় না, 'হ্যাঁ গো সেই "কাল"টা কোন্ ছিদ্র দিয়ে গলে পড়লো? দেখতে পাচ্ছি না তো?' আমার তপস্যাটা তাহলে স্রেফ্ বাজে গেল?

'আমরা মেয়েরা লড়াই করেছিলাম—'

মনে মনে উচ্চারণ করেছিল পারুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, অযথা শাসনের বিরুদ্ধে, পরাধীনতার বিরুদ্ধে—আমি, আমার পূর্বতনীরা।...

সেই লড়াইয়ে তবে জিত হয়েছে আমাদের।

সব শক্তি হাতে এসে গেছে মেয়েদের। সব অধিকার।

...শুধু প্রকৃতির অসতর্কতায় আমাদের ভাগটা পেলুম না। আমার যুগটা কখন স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে।

তবে আর কী করবো?

প্রত্যাশার পাত্রটা আর বয়ে বেড়াবো কেন?

জানলাটা বন্ধ করে একখানা বই খুলে বসেছিল পারুল, তার মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেছিল্। ভেবেছিল, এ যুগের নাটকে তবে আমাদের ভূমিকা কি? কাটা সৈনিকের? স্টেজে আসবার আগেই যাদের মরে পড়ে থাকতে হয়?

কিন্তু ওসব তো অনেকদিন আগের কথা। তখন তো শোভনের ওই 'ডল্' পুতুলের মত মেয়েটা জন্মায়নি। যাকে নিয়ে এসে দেখিয়ে গেল সেবার শোভন আহ্লাদে গৌরবে জ্বল-জ্বল করতে করতে। কত বকবক করে গেল মেয়ের অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে।

মেয়েটাকে দেখে সত্যিই বুক ভরে উঠেছিল পারুলের। মনে হয়েছিল এমন একটা অনিন্দ্যসুন্দর বস্তুর অধিকারী হতে পারা কী সৌভাগ্যের!

কিন্তু চলে যাবার সময় তো কই বলে ওঠেনি, 'আবার আনিস রে'! চলে যাওয়ার পর এই এতোদিনের মধ্যে তো কই চিঠিতে অনুরোধ জানায়নি, 'আর একবার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে রে!'

শোভন নিজে ইচ্ছে করে মেয়ের নতুন নতুন অবস্থার আর বয়সের ফটো মাকে পাঠায়। তাই থেকেই জেনেছে পারুল মেয়েটা এখন ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

সুখে থাক, ভাল থাক, তবু তো এই ভালবাসাটুকুও রেখেছে শোভন মার জন্যে।

পারুল ওদের কাছে কৃতজ্ঞ।

পারুল তার পরলোকগত স্বামীর প্রতিও কৃতজ্ঞ, এই বারান্দাটির জন্যে।

এইখানে—

যখন পড়ন্ত বিকেলের আলো মুখে মেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিল, কী আশ্চর্যের তুলনাই রেখে গেছেন কবি!

'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।'

দিনের চিতা! কী অভাবনীয় মৌলিক!

আগে কী কেউ কখনো দেখেছিল এই 'চিতা'কে?

বহুদিনের পড়া, মুখস্থ করা এই কবিতাটাই হঠাৎ যেন নতুন একটা অর্থ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে, পারুল সে অর্থকে কোথায় যেন মিলোচ্ছে, সেই সময় অনামিকা দেবীর চিঠিখানা এলো।

'বকুলের খাতাটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তুই খুঁজে দেখিস।'

বকুলের সেজদিকে কিছু খুঁজে দেখতে হয় না।

সেজদির সিন্দুকে সব তোলা থাকে। কে জানে সিন্দুকটা সেজদির কত বড়!

সেজদির চিঠিটা হাতের মুঠোয় চেপে রেখে মনে মনে বললেন, 'আছে আমার কাছে, তবে সবটা নয়, অনেকটা। কিন্তু আমি সেটা বার করে কী করবো? আমি কি লিখতে পারি?'

লিখতে পারেন না সেজদি।

কবিতা পারেন, গদ্য নয়।

তাই মনে মনে উচ্চারণ করেন, 'আমি খুঁজে পেয়ে কী করবো?'

তারপর বলেন, 'বকুল বলেছিল নিজেদের কথা আগে বলতে নেই। আগে পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণ শোধ করতে হয়।'...সে ঋণ তবে শোধ করছে না কেন বকুল? না কি করেছে কখন, সেও আমার অসতর্কতায় চোখ এড়িয়ে গেছে?

॥ ৬ ॥

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হলো।

'তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনে'র প্রথম দিনেই অধিবেশনের মধ্যকালে প্রধান অতিথির ভাষণ উপলক্ষ করে উদ্দাম এক হট্টগোল শুরু হয়ে সভা পন্ড হয়ে গেল।

আর শুধু যে সেদিনের মতই গেল তা নয়, আগামী কাল পরশুর আশাও আর রইল না। কারণ পরিস্থিতি শোচনীয় তো বটেই, আশঙ্কাজনকও। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই সভা সজ্জা ভেঙেচুরে পুড়ে এমনই তছনছ হয়ে গেছে যে, তার থেকে সম্মেলনের ভবিষ্যৎ ললাটলিপি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ভয়ঙ্কর হৈ-চৈটা কমলে দেখা গেল সভায় সাজানো ফুলদানি ভেঙেছে, মঙ্গল-ঘট ভেঙেছে, বরেণ্য মনীষীদের ছবি ভেঙেছে, কাঁচের গ্লাস ভেঙেছে, সেক্রেটারীর বাড়ি থেকে সভাপতি প্রধান অতিথি আর উদ্বোধকের জন্য আনীত চেয়ার টেবিল ভেঙেছে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির নাকের হাড় ভেঙেছে।

পুড়েছে প্যান্ডেলের বাঁশ, ডেকরেটারের পর্দা চাঁদোয়া, স্থানীয় এক তরুণ শিল্পীর বহু যত্নে তৈরী মন্ডপের রূপসজ্জা এবং পরোক্ষে, সম্মেলন আহ্বান-কারীদের কপাল। এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অর্থ এবং সামর্থ্য তো কম ব্যয় করেননি তাঁরা!

আয়োজনে ত্রুটিমাত্র ছিল না।

'বিশেষ আমন্ত্রিত'দের সময় ও শ্রম বাঁচাতে, এঁরা তাঁদের কলকাতা থেকে আনার জন্যে আকাশযানের ব্যবস্থা করেছিলেন, আকাশ থেকে 'ভূমিষ্ঠ' হবামাত্র উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা রেখেছিলেন, মাল্যে চন্দনে তিলকে ভূষিত করে সসম্মানে গাড়িতে তুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বিশ্রাম নিকেতনে।

তাঁদের শ্রম না হলেও শ্রম অপনোদনের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল, আর তার সঙ্গে ছিল কৃতকৃতার্থের ভঙ্গী।

বাংলা সাহিত্যের ওই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দিকপালেরা যে নিজ নিজ বহু মূল্যবান সময় ব্যয় করে উত্তর বাংলার এই সাহিত্য-সম্মেলনকে গৌরবান্বিত করতে এসেছেন এতে স্থানীয় আহ্বানকারীদের যেন কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

প্রধান অতিথিই অবশ্য মধ্যমণি, বাকিরাও সংগগুণে প্রাপ্যের অতিরিক্তই পেয়েছেন। অন্ততঃ অনামিকা দেবী তাই মনে করেছেন—'এ নৈবেদ্য অমলেন্দু ঘটকের জন্যে—আমরা "সর্বদেবতা"র একজন।'

তা সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, এ তো শাস্ত্রের বচন।

অনামিকা দেবী নিজে একথা ভাবলেও স্থানীয়রা তাঁকে অমলেন্দু ঘটকের থেকে কিছু কম স্তব করছিল না। বিশেষ করে মহিলা-পাঠিকা কুল। অনামিকা দেবীর লেখায় নাকি তাঁরা অভিভূত, বিচলিত, বিগলিত। তিনি নাকি মেয়েদের একেবারে হৃদয়ের কথা বুঝে লেখেন। মেয়েদের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-হতাশা, ব্যর্থতা-সার্থকতা অনামিকা দেবীর লেখনীতে যেমন ফোটে তেমন বুঝি আর কারো নয়।

উচ্ছ্বাসের ফেনাটা বাদ দিলেও, এর কিছুটা যে সত্যি, সে কথা অনামিকা দেবী কলকাতার বাইরে সুদূর মফস্বলে সভা করতে এসে অনুভব করতে পারেন। যারা দূর থেকে শুধু লেখার মধ্যে তাঁকে চিনেছে, ভালবেসেছে, তাদের ভালবাসাকে একান্ত মূল্য দেন অনামিকা দেবী।

কলকাতায় থাকেন, সেখানেও অজস্র পাঠিকা, কে বা তাঁকে দেখতে আসে, কিন্তু এসব জায়গায় যেন এরা তাঁকে একবারটি শুধু 'চোখে' দেখবার জন্যেই পাগল।

এই আগ্রহে উৎসুক মুখগুলির মধ্যেই অনামিকা দেবী তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সার্থকতা খুঁজে পান। মনে মনে বলেন, হ্যাঁ আমি তোমাদেরই লোক। তোমাদের নিভৃত অন্তরের কথাগুলি মেলে ধরবার জন্যেই আমার কলম ধরা। আমি যে দেখতে পাই ভয়ঙ্কর প্রগতির হাওয়ার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় বন্দী হয়ে আছে সেই চিরকালের দুর্গতির রুদ্ধশ্বাস। দেখতে পাই আজও লক্ষ লক্ষ মেয়ে—সেই আলোহীন বাতাসহীন অবরোধের মধ্যে বাস করছে। এদের বাইরের অবগুণ্ঠন হয়তো মোচন হয়েছে, কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল আজও অটুট।

কলকাতার বাইরে আসতে পেলে খুশী হন অনামিকা দেবী।

কিন্তু এবারের পরিস্থিতি অন্য হয়ে গেল।

অবশ্য সভায় এসে বসা পর্যন্ত যথারীতিই সুন্দর সৌষ্ঠবযুক্ত পরিবেশ ছিল। এয়ারপোর্ট থেকে আলাদা আলাদা গাড়িতে করে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সভানেত্রীকে আলাদা আলাদা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সভানেত্রীকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বাড়িতে, উদ্বোধককে একটি বিশিষ্ট স্কুলবাড়িতে এবং প্রধান অতিথিকে স্বয়ং সেক্রেটারীর বাড়িতে!

আলাদা আলাদা করে রাখার কারণ হচ্ছে সম্যক যত্ন করতে পারার সুযোগ পাওয়া। তা সারাদিন যত্নের সমুদ্রে হাবুডুবুই খাচ্ছিলেন অনামিকা দেবী। বাড়ির একটি বৌ কলকাতার মেয়ে, সে-এতো বেশী বিগলিত চিত্তে কাছে কাছে ঘুরছিল, যেন তার পিত্রালয়ের বার্তা নিয়েই এসেছেন অনামিকা দেবী!

উত্তরবঙ্গে ইতিপূর্বে আসেননি অনামিকা দেবী, ভালই লাগছিল বেশ। অধিবেশনের পালা চুকলে যথারীতি আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে 'বহির্দৃশ্য' দেখিয়ে আনার ব্যবস্থা আছে। সেটাও ভাল লাগছিল।

মোট কথা, কলকাতা থেকে আসার সময় যে ক্লান্তি এবং অবসাদ ধরনের একটা অনিচ্ছা গ্রাস করেছিল, এখানে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সহসা অন্তর্হিত হয়ে ভালই লাগছিল আগাগোড়া। আর অবিরত একটা কথা মনে হচ্ছিল—কতখানি আগ্রহ আর উৎসাহ থাকলে এমন ভাবে 'হরিদ্বার-গঙ্গাসাগর এক করে' এহেন একটি সম্মেলনের আয়োজন ঘটিয়ে তোলা সম্ভব হয়!

সেই আয়োজন ভয়ঙ্কর একটা নিষ্ঠুরতায় তছনছ হয়ে গেল।

এ নিষ্ঠুরতা কার?

মানুষের?

না—ভাগ্যের?

গোলমাল শুরু হওয়ার প্রথম দিকে সম্পাদক এবং স্বয়ং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিও, একে একে 'মাইকে' মুখ দিয়ে অমায়িক কণ্ঠে করজোড়ে প্রার্থনা করেছিলেন, 'আপনারা ক্ষান্ত হোন, আপনারা শান্ত হোন। আপনাদের যা বক্তব্য তা বলবার সুযোগ আপনাদের দেওয়া হবে। প্রতিনিধি-স্থানীয় কেউ মঞ্চে উঠে আসুন'।

কিন্তু সে আবেদন কাজে লাগেনি।

বাঁধ একবার ভেঙে গেলে কে রুখতে পারে উদ্দাম জনস্রোতকে?

প্রধান অতিথির ভাষণের সুরে ক্ষিপ্ত হয়ে যারা সভায় একটা ঢিল নিক্ষেপ করে চিৎকার করে উঠেছিল, 'বন্ধ করে দেওয়া হোক, বন্ধ করে দেওয়া হোক, এ কথা চলবে না', তারা ছাড়াও তো আরো অনেক ছিল। যাদের বক্তব্যও নেই, প্রতিবাদও নেই, আছে শুধু দুর্দম মজা দেখার উন্মাদ উল্লাস।

ভাঙবার এবং পোড়াবার কর্তব্যভার এরাই গ্রহণ করেছিল।

হয়ত বরাবর তাই করে।

এ দায়িত্ব এরাই নেয়।

সাদা-পোশাক-পরা পুলিসের মতো সর্বত্রই বিরাজ করে এরা শান্ত চেহারায়। 'প্রয়োজন' না ঘটলে হয়তো দিব্য ভদ্রমুখে তারিয়ে তারিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত উপভোগ করে, অথবা যন্ত্রসঙ্গীতে তাল দেয়। বড়জোর কোন গায়িকার গানটা ভাল লাগলে, ভিড়ের মধ্যে থেকে—'আর একখানা হোক না দিদি—' বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝুপ করে আবার বসে পড়ে। এর বেশী নয়।

কিন্তু 'প্রয়োজন' ঘটলে?

বাঁধ ভাঙলে?

মুহূর্তে ওদের কর্তব্যবোধ সজাগ হয়ে ওঠে। ওরা সেই ভাঙা বাঁধ আরো ভেঙে বন্যার স্রোতকে ঘরের উঠোনে ডেকে আনে। রেলওয়ে স্টেশনের কুলিদের মতো নিজেরাই হট্টগোল তুলে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে যায় চেয়ার ভাঙতে, টেবিল ভাঙতে, মণ্ডপে আগুন ধরাতে।

ও রাস্তা শুধু ওই প্রথমটুকুর।

সেটুকু করেছিল বোধ হয় অতি প্রগতিবাদী কোনো দুঃসাহসিক দল। তারপর যা হবার হলো।

মাইকের ঘোষণা, করজোড় প্রার্থনা কিছুই কাজে লাগলো না, ঢিলের পর ঢিল পড়তে লাগলো ঠকাঠক।

অতএব উদ্যোক্তারা তাঁদের পরম মূল্যবান অতিথিদের নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। সেক্রেটারীর বাড়ি মণ্ডপের কাছে. সেখানে এই বিশেষ তিনজন এবং 'অবিশেষ' কয়েকজন এসে আশ্রয় নিলেন, এবং সেখান থেকেই মণ্ডপের মধ্যেকার কলরোল শুনতে পেলেন।

যাঁরা অনেক আগ্রহ নিয়ে, অনেক আয়োজন করে হয়তো দূর-দূরান্ত থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেন, শিশু বৃদ্ধ মহিলা নির্বিশেষে দিগ্বিদিকে ছুটলেন।

কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাঙা-পর্ব শেষ করে জ্বালানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তারা।

যাদের মাইক তারা বেগতিক দেখে দড়িদড়া গুটিয়ে নিয়ে সরে পড়ছিল, তাদেরই একজনের হাত থেকে একটা মাইক কেড়ে নিয়ে কোনো একজন 'কর্তব্যনিষ্ঠ' তারস্বরে গান জুড়েছিল, 'জীর্ণ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালো ...আগুন জ্বালো...আগুন জ্বালো'।

এখান থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল সে গান।

অমলেন্দু ঘটক ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললেন, 'রবীন্দ্রনাথ সকলের, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।...সকলের জন্যেই তিনি গান রেখে গেছেন।'

তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে নামতে গিয়ে কোঁচায় পা আটকে হোঁচট খেয়ে তাঁর চশমাটা ছিট্‌কে কোথায় পড়ে গিয়েছিল, তাই চোখ দুটো তাঁর কেমন অদ্ভুত অসহায়-অসহায় দেখতে লাগছে।

উদ্বোধক বললেন, 'আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ পলিটিক্‌স্‌।'

সেক্রেটারীর কান এবং প্রাণ সেই উত্তাল কলরোলের দিকে পড়েছিল, তবু তিনি এ'দের আলোচনায় যোগ দেওয়া কর্তব্য মনে করলেন। শুকনো মুখে বললেন, 'ঠিক তা মনে হচ্ছে না। পাড়ায় কতকগুলো বদ ছেলে আছে, তারা বিনে পয়সায় জলসার দিনের টিকিট চেয়েছিল, পায়নি। শাসিয়ে রেখেছিল, "আচ্ছা আমরাও দেখে নেব। সভা করা ঘুচিয়ে দেব।"—তখন কথাটার গুরুত্ব দিইনি, এখন বুঝছি শনি আর মনসার পুজো আগে দিয়ে রাখাই উচিত।'

সম্মেলনে আগত কয়েকজন কিন্তু ব্যাপারটাকে পাড়ার কতকগুলো বদ ছেলের অসভ্যতা বলে উড়িয়ে দিতে রাজী হলেন না, তাঁরা এর থেকে 'শোলমারী'র গন্ধ পেলেন, 'নকশালবাড়ি'র পদধ্বনি আবিষ্কার করলেন। অর্থাৎ ব্যাপারটাকে জুড়িয়ে দিতে রাজী হলেন না তাঁরা।

সেক্রেটারীর বড় বাড়ি, দালান বড়।

অনেকেই ঢিল থেকে আত্মরক্ষা করতে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ আলোচনার ধারা অন্য খাতে বওয়ালেন।

গলার স্বর নামিয়ে বলাবলি করতে লাগলেন তাঁরা, প্রধান অতিথি অবিমৃষ্য-কারিতা করেছেন, এরকম সভায় ফট্‌ করে আধুনিক সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক হয়নি ওঁর। মৌচাকে ঢিল দিতে গেলে তো ঢিল খেতেই হবে, সাপের ল্যাজে পা দিলে ছোবল।...

আরে বাবা বুঝলাম তুমি একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, বাজারে তোমার চাহিদা আছে, যথেষ্ট নামডাক আছে, মানে মানে সেইটুকু নিয়ে টিকে থাকো না বাবা! তা নয়—তুমি হাত বাড়িয়ে হাতী ধরতে গেলে। যুগকে চেনো না তুমি? জানো না এ যুগ কাউকে 'অমর' হতে দিতে রাজী নয়, সব কিছু ঝেঁটিয়ে সাফ্‌ করে নিজের আসন পাতবার সংকল্প নিয়ে তার অভিযান।

অনামিকা দেবী ঘরের ভিতরে বসেছিলেন 'ভি আই পি'-দের সঙ্গে, তিনি বাইরের ওই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলেন না। তিনি শুধু ওই রাজনীতিই শুন-ছিলেন, আর ভাবছিলেন, আগুন ধূমায়িত হয়েই আছে, যে কোনো মুহূর্তে জ্বলে ওঠবার জন্যেই তার প্রস্তুতি চলছে, শুধু একটি দেশলাই-কাঠির ওয়াস্তা।

হয়তো ওই প্রস্তুতিটা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আগুন যখন জ্বলে ওঠে তখন সব আগুনের চেহারাই এক।

সেই ভাঙচুর, তছনছ।

কার জিনিস কে ভাঙছে, কে কাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, হিসেবও নেই তার।

হঠাৎ এই সময় ওই খবরটা এসে পৌঁছলো। মাইকের ডান্ডা ঠুকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির নাকের হাড় ভেঙে গেছে।

॥ ৭ ॥

খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন অনামিকা দেবী।

সেই সদাহাস্যমুখ প্রিয়দর্শন ভদ্রলোকটি।

তাঁর বাড়িতেই অনামিকা দেবী রয়েছেন। আর একদিনেই যেন একটি আত্মীয়তা-ভাব এসে গেছে।

ভদ্রলোকের নাম অনিল, তাঁর মা কিন্তু তাঁকে ডাকছিলেন 'নেনু নেনু' বলে। ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, 'না, তুমি আমার মানসম্মান কিছু রাখতে দেবে না মা! দেখুন—এতো বড়ো ছেলেকে আপনার মতো একজন লেখিকার সামনে, এই রকম একটা নামে ডাকা!'

সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ।

এটা প্রীতিকর।

অন্ততঃ অনামিকা দেবীর কাছে। অনেক সময় অনেক বাড়িতে দেখেছেন. অদ্ভুত আড়ষ্ট একটা কৃত্রিমতা। অনামিকা দেবী যে একজন লেখিকা, এটা যেন [illegible] অহরহ মনে জাগরূক না রেখে পারছেন না। বড় অস্বস্তিকর।

অনামিকা দেবী তখন অনিলবাবুর কথায় হেসে বলেছিলেন, 'ওতে অবাক হচ্ছি না আমি। আমারও একটি ডাকনাম আছে, যা শুনলে মোটেই একটি লেখিকা মনে হবে না।'

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'অধিবেশন হয়ে যাক, আপনার লেখার গল্প শুনবো।'

'লেখার আবার গল্প কি?' হেসেছিলেন অনামিকা দেবী।

অনিলবাবু বলেছিলেন, 'বাঃ গল্প নেই? আচ্ছা গল্প না হোক ইতিহাসই। কবে থেকে লিখছেন, প্রথম কী ভাবে লেখার প্রেরণা এলো, কী করে প্রথম লেখা ছাপা হলো, এই সব।'

অনামিকা দেবী বলেছিলেন, 'বাল্মীকির গল্প জানেন তো? "মরা মরা" বলতে বলতে রাম। আমার প্রায় তাই। "লেখা শব্দটা তখন উল্টো সাজানো ছিল। ছিল "খেলা"। সেই খেলা করতে করতেই দেখি কখন অক্ষর দুটো জায়গা বদল করে নিয়েছে। কাজেই কেন লিখতে ইচ্ছে হলো, কার প্রেরণা পেলাম এসব বলতে পারবো না।'

অনিলবাবুর স্ত্রী বলেছিলেন, 'আচ্ছা ওঁকে নাইতে খেতে দেবে না? যাও এখন পালাও। গল্প পরে হবে।'

সেই 'পর'টা আর পাওয়া গেল না।

সমস্ত পরিবেশটাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা কুণ্ঠা আসে অনামিকা দেবীর, নিজেকেই যেন অপরাধী অপরাধী লাগছে।

এই অনিলবাবুর বাড়িতেই তো তাঁর থাকা। এই বিপদের সময় অনিলবাবুর মা আর স্ত্রী হয়তো অনামিকা দেবীর সুবিধে অসুবিধে নিয়ে, আহার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হবেন। হয়তো অনামিকা দেবীকে—

না, ওঁরা যদিও বা না ভাবেন, নিজেই নিজেকে 'অপয়া' ভাবছেন অনামিকা দেবী। ভাববার হেতু না থাকলেও ভাবছেন।

আর ভেবে কুণ্ঠার অবধি থাকছে না। এখনই অনামিকা দেবীকে ওঁদের

বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে, খেতে হবে, শুতে হবে।

ইস! তার থেকে যদি তাঁকেও সেই স্কুলবাড়ির কোনো একটা ঘর দিতো!

কিন্তু তা দেবে না।

মহিলাকে মহিলার মত সসম্ভ্রমেই রাখবে। তাই স্বয়ং মূল মালিকের বাড়িতেই।

অথচ অনামিকা দেবীর মনে হচ্ছে, আমি কী করে অনিলবাবুর মার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো!

হঠাৎ কানে এলো কে যেন বলছে, 'নাকের হাড়! আরে দূর! ও এমন কিছু মারাত্মক নয়।'

শুনে খারাপ লাগলো।

মারাত্মক নয় বলেই কি কিছুই নয়?

যে আঘাতে উৎসবের সুর যায় থেমে, নৃত্যের তাল যায় ভেঙে, বীণার তার যায় ছিঁড়ে—সেটাও দুঃখের বৈকি।

কতো সময় ওই তুচ্ছ আঘাতে কতো মুহূর্ত যায় ব্যর্থ হয়ে!

মারাত্মক নয়, কিন্তু বেদনাদায়ক নিশ্চয়ই।

বাড়িটা যেন থমথম করছে।

যেন শোকের ছায়া কোথায় লুকিয়ে আছে। অপ্রত্যাশিত এই আঘাত যে সেই উৎসাহী মানুষটার মনের কতখানি ক্ষতি করবে তাই ভেবে শঙ্কিত হচ্ছেন জননী-জায়া।

হাসপাতাল থেকে রাত্রে ছাড়েনি, কাল কেমন থাকেন দেখে ছাড়বে। মন-ভাঙা মা আর স্ত্রী অনামিকা দেবীর সঙ্গে সামান্য দু-একটি কথা বলেন, তারপর সেই বৌটির হাতে ওঁকে সমর্পণ করে দেন। যে বৌটি কলকাতার মেয়ে, যে অনামিকা দেবীর পায়ে পায়ে ঘুরছে আজ সারাদিন।

'খিদে নেই' বলে সামান্য একটু জল খেয়ে শুয়ে পড়লেন অনামিকা দেবী। বৌটি ওঁর মশারি গুঁজে দিতে এসে হঠাৎ বিছানার পায়ের দিকে বসে পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আপনি এতো নতুন নতুন প্লটে গল্প লেখেন, তবু আপনাকে একটা প্লট আমি দিতে পারি।'

শুনে অনামিকা দেবীর মনের মধ্যে একটু সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠলো। প্লট!

তার মানে আপন জীবনকাহিনী!

যেটা নাকি অনেকেই মনে করে থাকে আশ্চর্য রকমের মৌলিক, আর পৃথিবীর সব থেকে দুঃখবহ।

হ্যাঁ, দুঃখই।

সুখী সন্তুষ্ট মানুষেরা নিজের জীবনটাকে 'উপন্যাসের প্লট' বলে ভাবে না। ভাবে দুঃখীরা, দুঃখ-বিলাসীরা।

বৌটিকে তো সারাদিন বেশ হাসিখুশি লাগছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখলেন তার মুখে বিষণ্ণতা, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে, 'আমি আপনাকে একটি প্লট দিতে পারি।'

তবে দুঃখবিলাসী!

নিজের প্রতি অধিক মূল্যবোধ থেকে যে বিলাসের উৎপত্তি।

'আমি আমার উপযুক্ত পেলাম না।'

এই চিন্তা নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সমস্ত পাওয়াটুকুকেও 'বিস্বাদ' করে তুলে এরা অহরহই দুঃখ পায়।

বৌটির নাম নমিতা।

অনিলবাবুর ভাগ্নেবৌ।

কিন্তু মামাশ্বশুরের বাড়িতে থাকে কেন সে? তার স্বামী কোথায়?

এ প্রশ্ন অনামিকা দেবীর মনের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু এ প্রশ্ন উচ্চারণ করা যায় না। তবু ভাবেননি হঠাৎ এক দীর্ঘশ্বাস শুনতে হবে।

শুনে না বোঝার ভান করলেন।

বললেন, 'আমাদের এই জীবনের পথের ধুলোয় বালিতে তো উপন্যাসের উপাদান ছড়ানো। প্রতিনিয়তই জমেছে প্লট! এই যে ধর না, আজকেই যা ঘটে গেল, এও কি একটা নাটকের প্লট হতে পারে না?'

নমিতা যেন ঈষৎ চঞ্চল হলো।

নমিতার এসব তত্ত্বকথা ভাল লাগলো না তা বোঝা গেল। অথবা শোনেওনি ভাল করে। তাই কেমন যেন অন্যমনস্কের মতো বললো—'হ্যাঁ তা বটে। কিন্তু এটা তো একটা সাময়িক ঘটনা। হয়তো আবার আসছে বছর এর থেকে ঘটা করেই সাহিত্যসভা হবে। কিন্তু যে নাটক আর দুবার অভিনয় হয় না? তার কী হবে?'

অনামিকা দেবী ঈষৎ চকিত হলেন। যেন ওই রোগা পাতলা সুশ্রী হলেও সাদাসিধে চেহারার তরুণী বৌটির মুখে এ ধরনের কথা প্রত্যাশা করেননি।

আস্তে বললেন, 'তারও কোথাও কোনো সার্থক পরিসমাপ্তি আছেই।'

'নাঃ, নেই।'

নমিতা খাট থেকে নামলো।

মশারি গুঁজতে লাগলো।

যেন হঠাৎ নিজেকে সংযত করে নিলো।

অনামিকা দেবী মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'এক্ষুনি ঘুম আসবে না, বোসো, তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।'

'না না, আপনি ঘুমোন। অনেক ক্লান্তি গেছে। আমি আপনাকে বকাচ্ছি দেখলে মামীমা রাগ করবেন।'

'বাঃ, তুমি কই বকাচ্ছো? আমিই তো বকবক করতে উঠলাম। বসো বসো! নাকি তোমারই ঘুম পাচ্ছে?'

'আমার? ঘুম?' মেয়েটি একটু হাসলো।

অনামিকা দেবী আর ঘুরপথে দেরি করলেন না।

একেবারে সোজা জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আচ্ছা, তোমার স্বামীকে তো দেখলাম না? কলকাতায় কাজ করেন বুঝি?'

নমিতা একটু চুপ করে থাকলো।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, 'কলকাতায় নয়, "কাজ" করেন হৃষিকেশে। পরকালের কাজ! সাধু হয়ে গেছেন।' বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্লটটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল অতএব।

যদিও এমন আশ্চর্য একটা প্লটের কথা আদৌ ভাবেননি অনামিকা দেবী।

ভেবেছিলেন সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতের অতি গতানুগতিক কোনো কাহিনী বিস্তার করতে বসবে নমিতা। অথবা জীবনের প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার! যেটা আরো অমৌলিক।

প্রথম প্রেমে ব্যর্থতা ছাড়া সার্থকতা কোথায়?

কিন্তু নমিতা নামের ওই বৌটি যেন ঘরের এমন একটা জানলা খুলে ধরলো, যেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

অনামিকা দেবী অবাক হয়ে ভাবলেন, সেই ছেলেটা যদি এতোই ইঁচড়ে পাকা তো বিয়ে করতে গিয়েছিল কেন?

ক'দিনই বা করেছে বিয়ে?

এই তো ছেলেমানুষ বৌ!

আহা ওকে আর একটু স্নেহস্পর্শ দিলে হতো। ওকে আর একটু কাছে বসালে হতো।

ওকে কি ডাকবেন?

নাঃ, সেটা পাগলামি হবে। তা ছাড়া আর হয়তো একটি কথাও মুখ দিয়ে বার করবে না ও। কোন্ মুহূর্তটা যে কখন কী কাজ করে বসে!

এমনি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মুহূর্ত এরাই তো জীবনের অনেকখানি শূন্য করে দিয়ে যায়।

আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা দৃশ্য।

নিরন্ধ্র অন্ধকার, মাথার উপর ক্ষীণ নক্ষত্রের আলো। সমস্ত পটভূমিকাটা যেন বর্তমানকে মুছে নিচ্ছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বিছানায় এসে বসলেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বকুল এসে সামনে দাঁড়ালো। সেই অন্ধকারে।

অন্ধকারে ওকে স্পষ্ট দেখা গেল না। কিন্তু ওর ব্যঙ্গ হাসিটা স্পষ্ট শোনা গেল।

'কী আশ্চর্য! আমাকে একেবারে ভুলে গেলে? স্রেফ্ বলে দিলে খাতাটা হারিয়ে ফেলেছ?'

... ...

অনামিকা দেবী ওই ছায়াটার কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'না না! হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, হারিয়ে ফেলিনি। রয়েছে, আমার কাছেই রয়েছে। তোমার সব ছবিগুলোই দেখতে পাচ্ছি।'

ওই যে তুমি নির্মল নামের সেই ছেলেটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছো, ওই যে তুমি তোমার বড়দার সামনে থেকে মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছো, ওই যে তোমার সেজদি পারুল আর তুমি কবিতা মেলানো-মেলানো খেলা খেলছো, ওই যে তোমার মৃত্যুশয্যাশায়িনী মায়ের চোখবোজা মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছো, সব দেখতে পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছি মাতৃশোকের গভীর বিষণ্ণতার মধ্যেও তোমার উৎসুক দৃষ্টির প্রতীক্ষা। ওই মৃত্যুর গোলমালে দুটো পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গিয়েছে বেড়ে, বাঁধটা খানিক গেছে ভেঙে। বকুলের বড়দা তখন আর সর্বদা তীব্র দৃষ্টি মেলে দেখতে বসছেন না, বেহায়া বকুলটা পাশের বাড়ির ছেলেটার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে কিনা।

॥ ৮ ॥

হ্যাঁ, বকুলের বড়দাই ওই গুরুদায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিল। বকুলের বাল্যকাল থেকেই। বকুলটা কোনো ফাঁকে পিছলে সরে গিয়ে পাশের বাড়ির ছেলেটার মুখোমুখি হচ্ছে কিনা তা দেখার।

আচ্ছা বাল্য আর কৈশোরের সীমারেখাটা বয়সের কোন্ রেখায় টানা হত সে যুগে!

বকুল জানে না সে কথা।

বকুল দশ-এগারো বছর বয়েস থেকেই শুনে আসছে, 'ধাড়ি মেয়ে, তোমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবার এতো কী দরকার?...ধিঙ্গী অবতার! এবাড়ি ওবাড়ি বেড়িয়ে বেড়ানো হচ্ছে। যাও না সংসারের কাজ করগে না।...ছাতে ঘোরা হচ্ছিল? কেন? বড় হয়েছো, সে খেয়াল কবে হবে?'

বড়দা বলতো, বাবা বলতেন।

বড়দাই বেশী।

আর বড়দার ওই শাসন-বাণীর মধ্যে যেন হিতচেষ্টার চাইতে আক্রোশটাই প্রকট ছিল। পাশের বাড়ির ওই নির্মলটার যে এ বাড়ির 'বকুল" নামের মেয়েটার প্রতি বেশ একটু দুর্বলতা আছে, সে সত্য বড়দার চোখে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। অতএব এদিক ওদিক কিছু দেখলেই বড়দার দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত 'সনাতনী রক্ত' উত্তপ্ত হয়ে উঠতো এবং শাসনের মাত্রা চড়ে উঠতো। বড়দা নির্মলকেও দুচক্ষের বিষ দেখতো। সে কি নির্মল বড়লোকের একমাত্র ছেলে বলে?

বকুলের মা বেঁচে থাকতে তবু বকুলের পৃষ্ঠবল ছিল। মা তাঁর বড় ছেলের এই পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার কর্তব্যপালন দেখে রেগে উঠে বলতেন, 'তোর অতো সব দিকে নজর দিয়ে বেড়াবার কী দরকার? যা বারণ করবার আমি করবো।'

'তুমি দেখলে তো কোনো ভাবনাই ছিল না—' বলতো বড়দা, অম্লান বদনে মার মুখের উপরেই বলতো, 'তা দেখতে তো দেখি না। বরং আমাদের ওপর টেক্কা দিয়ে মেয়েকে আস্কারা দেওয়াই দেখি। খু-ব মনের মতন মেয়ে কিনা!'

মা চুপ করে যেতেন।

শুধু কখনো কখনো মায়ের চোখের মধ্যে যেন আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠতো। তবু মা বকুলকেই কাছে ডেকে বলতেন, 'দাদা যা ভালবাসে না, তা দাদার সামনে কোরো না।'

ছেলেবেলা থেকে মা বকুলদের শিখিয়েছেন, 'যা করবে সাহসের সঙ্গে করবে। লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ে কিছু করতে যেও না।' অথচ মা তাঁর বড় ছেলের তীব্র তিক্ত ব্যঙ্গের মুখটা মনে করে বলতেন, 'ওর সামনে কোরো না।" বলতেন না, 'কোনো সময়ই কোরো না।'

কিন্তু মা আর বকুলের ভাগ্যে কতোদিনই বা ছিলেন? মৃত্যুর অনেক দিন আগে থেকেই তো সংসারের দৃষ্টিতে 'মৃত' হয়ে পড়েছিলেন। ছায়া দিতে পারতেন কই?

তারপর তো প্রখর সূর্যালোকের নীচে, 'সনাতনী সংসারের' জাঁতার তলায় বড়দার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো বকুলের।

অকারণেই হঠাৎ-হঠাৎ বলে বসতো বড়দা, 'ওদের বাড়ির জানলার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কী করছিলি?...বলতো—'বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে ইশারায় কথা হচ্ছিল?'

অপরাধটা সত্যি হোক বা কাল্পনিক হোক, প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না বকুলের। বকুল শুধু মাথা হেঁট করে অস্ফুটে বলতো, 'কার সঙ্গে আবার, বাঃ!'

বলতো, 'জানলার দিকে দাঁড়াতে যাবো কেন?'

এর বেশী 'জবাব' দেবার সাহস ছিল না বকুলের। বকুলের ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করতো।

এ যুগের মেয়েরা যদি বকুলের সেই অবস্থাটা দেখতে পেতো, না জানি কতো জোরেই হেসে উঠতো!

অনামিকা দেবীর ভাইঝিটাই যদি দর্শক হত সেই অতীতের ছবির?

তা ও হয়তো হেসে উঠতো না।

ওর প্রাণে মায়া-মমতা আছে।

ও হয়তো শুধু মুখের রেখায় একটি কৃপার প্রলেপ বুলিয়ে বলতো, 'বেচারা!'

তা শুধু ভাইঝি কেন, অনামিকা দেবীরও তো ওই ভীরু নির্বোধ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে—'বেচারা! কী ভীরু! কী ভীরু!'

কিন্তু ভীরু হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল বকুলের? কার ভরসায় সাহসী হবে? পাশের বাড়ির সেই ছেলেটার ভরসায়? অনামিকা দেবীর মুখে সূক্ষ্ম একটি কৃপার হাসি ফুটে ওঠে।

হাতে একবার হাত ছোঁয়ালে শীতের দিনে ঘেমে যেতো ছেলেটা। একটু 'ভালবাসা' মত কথা কইতে গেলে কথাটা জিভে জড়িয়ে যেতো তার। আর জেঠি-পিসির ভয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখতো।

তা জেঠি-পিসিদেরও তো ভীষণ ভাবে 'রাইট' ছিল তখন শাসন করবার। নির্মল নামের সেই ছেলেটা তার দুর্দান্ত এক জেঠির ভয়ে তটস্থ থাকতো। জেঠির ঘ্রাণশক্তিটাও ছিল তীব্র। বিড়ালরা যেমন মাছ বস্তুটা বাড়ির যেখানেই থাকুক তার আঘ্রাণ পায়, জেঠিরও তেমনি বাড়ির যেখানেই কোনো 'অপরাধ' সংঘটিত হোক তার আঘ্রাণ পেতেন।

অতএব নির্মলদের তিনতলার ছাতের সিঁড়ির ঘরটাকে অথবা সাতজন্ম ধুলো হয়ে পড়ে থাকা বাড়ির পিছনদিকের চাতালটাকে যখন বেশ নিশ্চিন্ত নিরাপদ ভেবে ওরা দু'মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলছে, হঠাৎ জেঠির সাদা ধবধবে থানধুতির আঁচলের কোণটা ওদের চোখের সামনে দুলে উঠতো।

'ওমা নির্মল তুই এখানে? আর আমি তোকে সারাবাড়ি গরু খোঁজা করে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

ওই দু'মিনিটের আগের মিনিটটায় নির্মল জেঠিমার চোখের সামনেই ছিল, মানে আর কি ইচ্ছে করেই চোখের সামনে ঘোরাঘুরি করে এসেছিল, যাতে তার অনুপস্থিতির 'পিরিয়ডটা' 'অনেকক্ষণে'র ধূসরতায় ছড়িয়ে না পড়ে। তবু জেঠিমা ইতিমধ্যেই নির্মলকে গরুখোঁজা খুঁজে ফেলে বাড়ির এই অব্যবহৃত অবান্তর জায়গাটায় খুঁজতে এসেছেন!

কিন্তু খোঁজার কারণ?

সেটা তো অনুক্তই থেকে যায়।

জেঠিমার বিস্ময়োক্তিটাই যে শ্রোতাযুগলের বুকের মধ্যেটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নুন দেয়।

'ওমা! বকুলও যে এখানে? কতক্ষণ এলি মা? আহা মা-হারা প্রাণ, বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারে না, ছুটে ছুটে পাড়া বেড়িয়ে বেড়ায়। আয় মা আয়, আমার কাছে এসে বোস।...'

অতএব মাতৃহীনা বালিকাকে ওই মাতৃস্নেহ-ছায়ায় আশ্রয় নিতে গুটিগুটি এগোতে হয়। নির্মল তো আগেই হাওয়া হয়ে গেছে, কোনো বানানো কৈফিয়তটুকু পর্যন্ত দেবার চেষ্টা না করে।

জেঠিমা বালবিধবা, জেঠিমা অতএব নিঃসন্তান। কিন্তু জেঠিমার সীমাহীন স্নেহসমুদ্র সর্বক্ষণ অভিষিক্ত করছে দেবর-পুত্রকন্যাদের। সেই অভিষিক্ত প্রাণী-গুলো কি এমনই অকৃতজ্ঞ হবে যে তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ সমীহশীল হবে না? বকুলেরই বা উপায় কি সেটা না হবার?

বকুলকেও জেঠির সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাঁর নিরিমিষ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে বসতে হত এবং জেঠি শাক বাছতে বাছতে, কিংবা খুন্তি নাড়তে নাড়তে সুমধুর প্রশ্ন করতেন, 'তা হ্যাঁরে বকুল, তোর বাবা কি নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে? তোর বিয়ের কিছু করছে না?'

বলা বাহুল্য বকুলের দিক থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব যেতো না। জেঠি পুনঃপ্রশ্ন করতেন, 'হচ্ছে কোনো কথাবার্তা? শুনতে পাস কিছু?'...তারপর ওই নিরুত্তর প্রাণীটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্মলের মায়ের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'বুঝলে ছোটবৌ, মেয়ের বিয়েটিয়ে আর দিচ্ছে না বকুলের বাবা, লাউ—কুমড়োর মতো 'পাঁড়' রাখবে।'

নির্মলের মা মানুষটা বড় সভ্য ছিলেন, এ ধরনের কথায় বিব্রত বোধ করতেন, কিন্তু দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড় জায়ের কথার উপর কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

তিনি অতএব শ্যাম কুল দুই রাখার পদ্ধতিতে বলতেন, 'মা-টি মারা যাওয়াতে আরো গড়িয়ে গেল। নইলে দিদি, হয়ে যেতো এতোদিনে। ভদ্দরলোক আরও তিন-তিনটে মেয়ে তো পার করেছেন!'

জেঠিমা এ যুক্তিতে থেমে যেতেন না, তেতো-তেতো গলায় বলতেন, 'করেছেন, তখন সময়কালে। মেয়েরা নিজেরা ছক্কাপাঞ্জা হয়ে ওঠবার আগে। এবার ক্রমশঃ যতো শেষ, ততো বেশ। বকুল হল নভেলপড়া একেলে মেয়ে, ও হয়তো একখানা 'লভ'-টভ করে বসে বাপকে বলে বসবে, "বাবা, হাড়ি ডোম বামুন কায়েত যাই হোক, 'অমুক' লোকটার সঙ্গেই বিয়ে করতে চাই।"...কী রে বকুল, বলবি নাকি?'

জেঠিমা হেসে উঠতেন।

জেঠিমার সামনের একটা দাঁত ভাঙা ছিল, সেই ভাঙা দাঁতের গহ্বর দিয়ে হাসিটা যেন ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসতো।

কিন্তু জেঠি স্নেহময়ী।

তাই জেঠি মিনিট কয়েক পরেই বলে উঠতেন, 'বকুল, কুমড়োফুলের বড়া-ভাজা খাবি?...কেন, "না" কেন? পিটুলীবাটা দিয়ে মুচমুচে করে ভেজেছি। নে এক-খানা ধর্। তোরা যখন এ বাড়িতে প্রথম এলি, তুই তো তখন কাঁথায় শোওয়া মেয়ে, তোর মা মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতো। তা একদিন এমনি কুমড়োফুলের বড়া ভাজছি, বললাম, "গরম গরম ভাজছি, খাও দুখানা।" খেয়ে অবাক, বলে পিটুলীবাটা দিয়ে যে এমন বড়া হয় এ তো কখনো জানি না, ডাল-বাটা দিয়ে হয়

তাই জানি।'

বকুলের সেই এক আবেগ-থরথর মুহূর্তের উপর চিলের ডানার ঝাপটা বসিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এইরকম সব আলাত-পালাত অবান্তর কথা বলতে শুরু করতেন জেঠি, হয়তো বা কিছু খাইয়েও ছাড়তেন। অবশেষে বকুলকে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে তবে ফিরতেন।

আর শেষবেশ আর একবার বলতেন, 'তোর বাপকেই এবার ধরতে হবে দেখছি। সোমত্ত মেয়ে শূন্যপ্রাণ নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াবে, ঘর সংসারে মাথা দেবে না, আর বাপ বসে বসে পরিবারের শোকে তুষ হতে থাকবেন এটা তো নেয্য নয়।'

বকুল মরমে মরে যেতো, বকুল লজ্জায় লাল হয়ে যেতো, বকুল মাথা তুলতে পারতো না।

ওই মাথা-নীচু চেহারাটার দিকে তাকিয়ে অনামিকা দেবীর আর একবার মনে হল, 'বেচারা!'

জেঠির এই 'নেয্য' কথার হুলটির জ্বালা সহজে মিটতো না, অনেকদিন ধরেই তাই ওবাড়ির চৌকাঠে বকুলের পদচিহ্ন পড়তো না। সমস্ত আবেগ আকাঙ্ক্ষাকে দমন করে বকুল আপন খাতাপত্রের জগতে নিমগ্ন থাকতে চেষ্টা করতো। কিন্তু সে তপস্যা কি স্থায়ী হত? দুর্বার একটা আকর্ষণ যেন অবিরত টানতে থাকত বকুলকে, ওই বাড়িটার দিকে। তাছাড়া ও বাড়ির রাস্তার দিকের জানলায় ছাতের আলসে ধরে একখানি বিষণ্ণ-বিষণ্ণ মুখ মিনতির ইশারায় তপোভঙ্গ করে ছাড়তো।

ভাবলে হাসি পায়, একটা পুরুষ ছেলে প্রায় একটা ভীরুলাজুক তরুণী মেয়ের ভূমিকায় রেখে দিতো নিজেকে।

বকুল ওই আবেদন-ভরা চোখের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারতো না। বকুল আবার একদিন কোনো একটা ছুতো করে আস্তে ও-বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতো।

বকুলের সেই ছুতোটা হয়তো আদৌ জোরালো হত না, কাজেই ছুতোটা অতি সহজেই 'ছুতো' বলেই ধরা পড়তো।

কিন্তু অবোধ বকুল আর তার অবোধ প্রেমাস্পদ দু'জনেই ওরা ভেবে নিতো বড়দের বেশ ফাঁকি দেওয়া গেল।

যেমন একদিনের কথা—বাবার আবার হাঁপানির টানের মত হয়েছে আর হোমিওপ্যাথির ওপর বকুলের বাবার আস্থা, এবং পাশের বাড়ির নির্মল নাকি কোন্ একজন ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের নাম জানে। এ কি একটা কম বড় ছুতো?

অতএব বকুল এসে অনায়াসেই নির্মলের মার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারে, "কাকিমা, নির্মলদা কি বাড়ি আছেন? বাবা বলছিলেন নির্মলদা নাকি কোন একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—মানে সেই হাঁপানি মতনটা আবার একটু—'

স্পষ্ট স্পষ্ট করে 'নির্মলদা' নামটা উচ্চারণ করতে হয়, যেন কিছুই না। যেন ওই নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ওর গলা কাঁপে না, ওর বুকের মধ্যেটা কেমন যেন ভয়-ভয় করে না। তবে নির্মলের মা মানুষটি নিতান্তই ভালমানুষ, অতএব সরলচিত্ত। ওই ছেলেবেলা থেকে পরিচিত ছেলেমেয়ে দুটো যে আবার কোনো নতুন 'পরিচয়ের' মধ্যে 'নতুন' হয়ে উঠতে পারে এমন সম্ভাবনা তাঁর মাথায় আসতো না। এবং তাঁর ভালমানুষ ছেলেটা এবং পাশের বাড়ির এই নিরীহ মেয়েটা যে তাঁর সঙ্গে এমন চাতুরী খেলতে পারে, তা ভাবতেও পারতেন না।

কাজে কাজেই জানলা থেকে 'চোখের ডাক' পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে চলে আসা

বকুল ওঁর সামনে বেশ সপ্রতিভ গলায় বলতে পারতো, 'কাকিমা, নির্মলদা কি বাড়ি আছেন?'

কাকিমার এক মস্ত বাতিক চটের আসন বোনা, তাই তিনি সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রখরা বড় জা ও দজ্জাল ননদের চোখ এড়িয়ে যখন-তখনই ওই চটের আসন নিয়ে বসতেন। সেই আসনের 'ঘর' থেকে চোখ না তুলেই তিনি জবাব দিলেন, 'নির্মল? এই তো একটু আগেই ছিল। আছে বোধ হয়। দেখগে দিকি তার পড়ার ঘরে। বাবার আবার শরীর খারাপ হল?'

'হুঁ।'

'আহা তোর মা গিয়ে অবধি যা অবস্থা হয়েছে! মানুষটা আর বোধ হয় বাঁচবে না। যা দেখগে যা। কোন্ ডাক্তার কে জানে? আমাদের অনাদিবাবু তো—'

ততক্ষণে বকুল হাওয়া হয়ে গেছে। পৌঁছে গেছে নির্মলের 'পড়ার ঘর', মানে এদের তিনতলার ছাদের চিলেকোঠার ঘরে।

কিন্তু এসে কি বকুল তার প্রেমাস্পদের বুকে আছড়ে পড়তো? না কি নিবিড় সান্নিধ্যের স্বাদ নিতো?

কিছু না, কিছু না।

এ যুগের ছেলেমেয়েরা সেকালের সেই জোলো জোলো প্রেমকে শহুরে গোয়ালার দুধের সঙ্গে তুলনা করবে।

ধর সেদিনের কথাই—

বকুল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো, 'বলতে হল বাবার হাঁপানিটা আবার বেড়েছে, সেই পাপে নিজেরই হাঁপানি ধরে গেল।'

নির্মল এগিয়ে এসে হাতটাও ধরলো না, শুধু কৃতার্থম্মন্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'কাকে বললে?'

'বললাম কাকিমাকে। এই মিছে কথা বলার পাপটি হল তোমার জন্যে।'

নির্মলের মুখে অপ্রতিভের ছাপ।

'খুব মিছে কথা আর কি! মেসোমশাই তো ভুগছেনই।'

নির্মলের মাকে বকুল 'কাকিমা' বলে, নির্মলের জেঠাইমাকে 'জেঠাইমা', কিন্তু নির্মল বকুলের মাকে যে কোন্ নিয়মে 'মাসীমা' বলতো, আর বাবাকে 'মেসোমশাই',—কে জানে! তবে বলতো তাই।

'ডাকা হচ্ছিল কেন?'

'এমনি। দেখা-টেখা তো হয়ই না আর। অথচ লাইব্রেরী থেকে সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়ের একখানা নতুন বই আনা পড়ে রয়েছে।'

বকুল উৎসুক গলায় বলে, 'কই?'

'দেব পরে। আগে একটু বসবে, তবে।'

'বসে কি হবে?'

'এমনি।'

'খালি "এমনি আর এমনি"। নিজে যেতে পারেন না বাবু!'

'নিজে?'

নির্মল একটা ভয়ের ভান করে বলে, 'ও বাবা! তোমার বড়দার রক্তচক্ষু দেখলেই গায়ের রক্ত বরফ হয়ে যায়। যা করে তাকান আমার দিকে!'

'বড়দা তোমার থেকে কী এমন বড় শুনি যে এতো ভয়! বাবা তো কিছু বলেন না। মা তো—তোমাকে কতো—'

'হ্যাঁ, মাসীমা তো কত ভালোবাসতেন। গেলে কতো খুশি হতেন। কিন্তু

বড়দা? মানে বেশী বড় না হলেও, সাংঘাতিক ম্যান! পুলিস অফিসার হওয়াই ওঁর উপযুক্ত পেশা ছিল।'

'তা আমারই বুঝি খুব "ইয়ে"? পিসি আর জেঠির সামনে পড়ে গেলে—

'এই, আজকে পড়নি তো?'

'নাঃ। জেঠিমা বোধ হয় পুজোর ঘরে। আর পিসি রান্নাঘরে।

'সত্যি ওঁদের জন্যে তোমার—'

নির্মল একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে।

বকুলের চোখে আবেগের ছায়া।

বকুল ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় বলে, ' "সত্যি ওঁদের জন্যে তোমার—" বলে নিঃশ্বাস ফেললেই তোমার সব কাজ মিটে গেল, কেমন?'

'কী করবো বল?'

'ঠিক আছে। আমি আর আসছি না।'

'না না, লক্ষ্মীটি, রাণীটি। অত শাস্তি দিও না।'

ওই!

প্রেম সম্বোধনের দৌড় ওই পর্যন্তই।

আর প্রেমালাপের নমুনাও তো সেই লাইব্রেরীর বই, আর "কেউ আসছে" কিনা এইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কেউ এসে তো কোনো 'দৃশ্য'ই দেখবে না, তবু ভয়।

ভয়—ভয়! ভালবাসা মানেই ভয়।

বারেবারেই মনে হয় পিছনে বুঝি কেউ এসে দাঁড়ালো।' বারেবারেই মনে হয় বাড়িতে হঠাৎ খোঁজ পড়লেই ধরা পড়বে বকুল নির্মলদের বাড়ি গেছে।

সেই ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো ধরা পড়ে যাবে ওই ছুতোটা ছুতোই।

বাবা বলবেন, 'কই নির্মলকে বলতে যেতে তো বলিনি। শুধু বলেছিলাম, নির্মলদের বাড়িতে তো বড় বড় অসুখেও হোমিওপ্যাথি চালায়।'

আর দাদা বলবে, 'ও বাড়িতে গিয়েছিলি কী জন্যে? ও বাড়িতে? কী দরকার ওখানে? ধিঙ্গী মেয়ের এতো স্বাধীনতা কিসের?'

তবু না এসেও তো পারা যায় না।

তবে এ বাড়িতে মুখোমুখি কেউ বলে ওঠে না, 'এ বাড়িতে এসেছো কি জন্যে? এ বাড়িতে? এতো বেহায়ামি কেন?'

এ বাড়িতে যেন সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

দৈবাৎ যদি জেঠি এসে উপস্থিত নাও হন, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় তো কারুর-না-কারুর সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে। হয়তো পিসিরই সঙ্গে।

পিসিও ভুরু কুঁচকে বলবে, 'বকুল যে! কতক্ষণ এসেছিস?'

বকুলকে বলতে হবে, 'এই একটু আগে।'

'কোথায় ছিলি? কই দেখিনি তো?'

'ইয়ে—নির্মলদা লাইব্রেরীর একটা বই দেবেন বলেছিলেন—'

'ওঃ বই! তা ভাইপোটাকে একটু পাঠিয়ে দিলেও তো পারিস বাছা! বাপের এই অসুখ, আর তুই ডাগর মেয়ে বই বই করে তাকে ফেলে রেখে এসে—আবার সেই হাঁপাতে হাঁপাতে তিনতলার ছাদে যাওয়া। নির্মল ছিল বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

গলার মধ্যে মরুভূমি, চোখের সামনে অথই সমুদ্র। তবু সেই গলাকে ভিজিয়ে নিয়ে বলতে হয়—'হ্যাঁ। এই যে দিলেন বই।'

'নভেল-নাটক?'

'ইয়ে, না। গল্পের বই।'

'ওই একই কথা! তা এ বয়সে এতো বেশী নভেল-নাটক না পড়াই ভালো মা, কেবল কুচিন্তা মাথায় আসার গোড়া। বাবা গা করছেন না তাই, নচেৎ বয়সে বিয়ে হলে তো এতো দিনে দু'ছেলের মা হয়ে বসতিস।'

এই উপদেশ! এই ভাষা!

তাই বকুল বলে, 'এই ছাত থেকে ছাতে যদি অদৃশ্য হয়ে উড়ে যাওয়া যেতো!'

'প্রভাত মুখুয্যের মনের মানুষের গল্পের মতো!'

'যা বলেছ। সত্যি ভীষণ ইচ্ছে হয় স্বপ্নে কোনো একটা শেকড় পেলাম, যা মাথায় ছোঁয়ালেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। তোমার মাথায় আর আমার মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে বেশ সকলেরো নাকের সামনে বসে গল্প চালানো যায়—'

হঠাৎ ভীরু নির্মল একটা সাহসীর কাজ করে বসে।

সম্মুখবর্তিনীর একখানা হাত চেপে ধরে হেসে বলে বসে, 'অদৃশ্য হলে বুঝি শুধুই গল্পে ছাড়বো?'

'আহা! ধ্যেৎ!'

ওই 'আহা'র সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য হাত ছাড়ানো হয়ে গেছে।

'ছাত থেকে ছাতে একটা ফেলা সিঁড়ি থাকলে বেশ হত। ডিটেকটিভ গল্পে যেমন দড়ির মইটই থাকে—'

হ্যাঁ, এমনই সব কথা।

কিন্তু কেন যে ওই সব 'দুরূহ পথে'র চিন্তা, তা দু'জনের একজনও জানে না।

শুধু যেন দেখা হওয়াটাই শেষ কথা।

বকুল এ-যুগের এই অনামিকা দেবীর ভাইঝির মতো বলে উঠতে পারবার কথা কল্পনাও করতে পারতো না, 'আগে মনস্থির কর বাড়ির অমতে বিয়ে করতে পারবে এবং বিয়ে করে বৌকে রাজার হালে রাখতে পারবে, তবে প্রেমের বুলি কপচাতে এসো।'

বকুলের যুগ অন্য ছিল।

বকুল মেয়েটাও বোধ হয় আরো বেশী অন্য টাইপের ছিল।

তাই বকুলের অভিমান ছিল না, অভিযোগ ছিল না, শুধু ভালবাসা ছিল।

মানে সেই গোয়ালার দুধের জোলো ভালোবাসাই।

বকুল বললো, 'কই বইটা দাও, পালাই।'

'এসেই কেবল পালাই-পালাই!'

'তা কী করবো, বাঃ!'

'যদি যেতে না দিই, আটকে রাখি?'

'ইস! ভারী সাহস! আটকে রেখে করবে কি?'

'কিছু না এমনি।'...

সঙ্গীন মুহূর্তগুলো এইভাবেই ব্যর্থ করতো নির্মল।

কারণ ওর বেশী ক্ষমতা তার ছিল না।

ওই ছেলেটার দিকে তাকিয়েও মায়া হয় অনামিকা দেবীর।

বলতে ইচ্ছে করে, 'বেচারা!'

কিন্তু সেদিন ওই বেচারাও রেহাই পায়নি। শেষরক্ষা হয়নি। যখন বইটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, সামনেই জেঠি জপের মালা হাতে।

'ওমা, ই কি কাণ্ড! বকুল তুই এখানে? ওদিকে তোদের বাড়ি থেকে—তা বই নিতে এসেছিলি বুঝি?'

'হুঁ।'

'আমি তো তা জানি না। তাহলে বলে দিতাম তোর ভাইপোকে। আমি এসেছি ছাদটা পরিষ্কার আছে কিনা দেখতে। দুটো বড়ি দেব কাল।'

কাল বড়ি দেবেন জেঠি, আজ তাই জপের মালা হাতে ছুটে এসেছেন, ছাদ পরিষ্কার আছে কিনা দেখতে!

আর ভাইপো?

সে খবরটা সম্পূর্ণ কল্পিতও হতে পারে। জানা তো আছে বকুল বাড়ি গিয়ে 'ভেরিফাই' করতে যাবে না। অথবা সত্যিই হতে পারে। বড়দা যেই টের পেয়েছে বকুল বাড়ি নেই, চর পাঠিয়েছে।

কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের একেবারে রাস্তার উপর বয়সের ছাপধরা এই বাড়িখানার দোতলায় সাবেকি গড়নের টানা লম্বা দালানের উঁচু দেয়ালে সিঁড়ির একেবারে মুখোমুখি চওড়া ফ্রেমের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ যে মুখখানি দেদীপ্যমান, সে মুখ এ বাড়ির মূল মালিক ৺প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের।

চারিদিকে খোলা জমির মাঝখানে সস্তায় জমি কিনে তিনিই এই বাড়িখানি বানিয়ে একান্নবর্তী পরিবারের অন্ন-বন্ধন ছিন্ন করে এসে আপন সংসারটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমান মালিকরা, অর্থাৎ প্রবোধচন্দ্রের পুত্ররা এবং তাদের বড়ো-হয়ে-ওঠা পুত্ররা অবশ্য এখন প্রবোধচন্দ্রের 'দূরদর্শিতার অভাব'কে ধিক্কার দেয়, কারণ আশেপাশের সেই ফেলাছড়া সস্তা জমির দু'চার কাঠা জমি কিনে রাখলেও এখনকার বাজারে সেইটুকু জমি বেচেই 'লাল' হয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু অদূরদর্শী প্রবোধচন্দ্র কেবল নিজের মাপের মতো জমি কিনে আজেবাজে প্ল্যানে শুধু একখানা বাড়ি বানিয়ে রেখেই কর্তব্য শেষ করেছিলেন। যে বাড়িটায় তাঁর পুত্র-পৌত্রবর্গের মাথা গুঁজে থাকাটুকু পর্যন্তই হয়। তার বেশি হয় না। অথচ সুপরিকল্পিত নক্সায় ফ্ল্যাটবাড়ির ধাঁচে বাড়িটা বানালে যে একতলার খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়ে কিছুটা আয় করা যেত এখন, সেটা সেই ভদ্রলোকের খেয়ালেই আসেনি।

এদেরও অথচ খেয়ালে আসে না, ফ্ল্যাট্ শব্দটাই তখন অজানা ছিল তাঁদের কাছে। তখন সমাজে ফ্ল্যাটের অনুপ্রবেশ ঘটবার আভাসও ছিল না। 'বাসা ভাড়া, ঘর ভাড়া, বাড়ি ভাড়া' এই তো কথা।

খেয়াল হয় না বলেই যখন-তখন সমালোচনা করে।

তবে হ্যাঁ, স্বীকার করে ঘরটরগুলো ঢাউশ ঢাউশ, আর ফালতু ফালতু এদিক ওদিক ক্ষুদে ক্ষুদে ঘরের মতন থাকায় ফেলে ছড়িয়ে বাস করার সুবিধে আছে।

কিন্তু ওই যে লম্বা দালানটা একতলায়, দোতলায়? কী কাজে লাগে ও দুটো? যখন সপরিবারে পিঁড়ি পেতে 'পংক্তিভোজনে' বসার ব্যবস্থা ছিলো, তখন নীচের তলার দালানটা যদিও বা কাজে লাগতো, এখন তো তাও নেই। এখন তো আর পরিবারের সকলেই একান্নভুক্ত নয়? যাঁরা আছেন তাঁরা নিজ নিজ অন্ন পৃথক করে নিয়েছেন এবং খাবার জন্যে এলাকাও ভাগ করে নিয়েছেন।

প্রবোধচন্দ্রের বড় ছেলে অবশ্য এখন আর ইহ-পৃথিবীর অন্নজলের ভাগীদার হয়ে নেই, তাঁর বিধবা স্ত্রী একতলায় নিজস্ব একটি 'পবিত্র এলাকা' ভাগ করে নিয়ে আপন হবিষ্যান্নের শুচিতা রক্ষার মধ্যে বিরাজিতা, তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র অপূর্ব

দোতলার ঘর-বারান্দা ঘিরে নিয়ে নিজের মেলেচ্ছপনা'র গণ্ডির মধ্যে বিরাজমান।

অপূর্বর আর দুই ভাই চাকরির সূত্রে ঘরছাড়া, তারা দৈবাৎ কোনো ছুটিতে কেউ আসে, কোনোদিন মায়ের রান্নাঘরে, কোনোদিন বৌদির রান্নাঘরে, আর কোনো-কোনোদিন নেমন্তন্ন খেয়েই কাটিয়ে চলে যায়। একজন থাকে রেঙ্গুনে, একজন ত্রিপুরায়, যেতে আসতেই সময় যায়।

নেমন্তন্ন জোটে কাকাদের ঘরে, শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়দের বাড়িতে, কদাচ বড় পিসির বাড়ি। কলকাতায় বড় পিসি চাঁপাই আছে।

প্রবোধচন্দ্রের মেজ ছেলে, যাঁর ডাকনাম 'কানু', তাঁর সংসার নিয়ে দোতলার আর এক অংশে বাস করেন তিনি। তাঁর গিন্নী বাতের রোগী, নড়াচড়া কম, ছেলে-মেয়েরা চাপা আর মুখচোরা স্বভাবের, তাদের সাড়াশব্দ খুব কম পাওয়া যায়।

মেজ কানুও তাঁর বড়দা-বড়বৌদির নীতিতে বিশ্বাসী, মেয়েদের যতো তাড়াতাড়ি পেরেছেন বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন, বিবাহিতা মেয়েদের আসা-যাওয়া কম, কারণ কানু নামের ব্যক্তিটি আয়-ব্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক, হৃদয়কে প্রশ্রয় দিতে গেলেই যে পকেটের প্রতি নির্দয়তা হবে, তা তিনি বোঝেন।

বুঝতেও হয়, কারণ সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন।

আর আছেন প্রবোধচন্দ্রের সেজ ছেলে, ডাকনাম মানু, ভাল নাম প্রতুল। বর্তমানে যিনি ছোট।

এ পরিবারের পোশাকী নামের ব্যাপারে 'প্র'য়ের প্রতাপ প্রবল!

সুবল নামের যে ছোট ছেলেটি একদা প্রবোধচন্দ্রের সংসারে সম্পূর্ণ বহিরাগতের ভূমিকায় নির্লিপ্ত মুখে ঘুরে বেড়াতো, 'সংসার'-টংসার করেনি, সে অনেকদিন আগে চলে গেছে তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে।

বকুল আর সুবলে পিঠোপিঠি ছিলো, দুজনেই নাম ধরে ডাকতো। সেজ ভাই 'মানু'কেই বরাবর 'ছোড়দা' বলে বকুল।

ছোড়দার রান্নাঘরেই বকুলের ঠাঁই।

প্রবোধচন্দ্রের এই সৃষ্টিছাড়া ছোট মেয়েটা তো চিরদিনের জন্যই এই সংসারে শিকড় গেড়ে বসে আছে।

মৃত্যুকালে প্রবোধচন্দ্র তাঁর পুরনো বাড়ির নবনির্মিত তিনতলার ঘর বারান্দা ছাদ ইত্যাদি কেনই যে তাঁর চির বিরক্তিভাজন হাড়জ্বালানী ছোট মেয়ের নামে উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই এক রহস্য। তবে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর পুত্রদের চমকিত বিচলিত ও গোত্রান্তরিতা কন্যাদের ঈর্ষিত করে।

তিনতলার ওই ঘরের সংলগ্ন একটুকরো 'ঘরের মত'ও আছে রান্নাবাবদ কাজে লাগাতে, কিন্তু সে কাজে কোনোদিন লাগেনি সেটা। সেখানে অনামিকা দেবীর ফালতু বই কাগজের বোঝা থাকে স্তূপীকৃত হয়ে।

পিতৃগোত্রের মধ্যে 'অবিচল' থেকে অনামিকা অবিচল সাহিত্যসাধনা করে চলেছেন।

অনামিকার আসলে প্রবোধচন্দ্রের মত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়ে না হয়ে পড়ে থাকা মেয়ের দৃষ্টান্ত প্রায় অবিশ্বাস্য, তবু এহেন অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটেও ছিল। ঘটেছিল নেহাৎই ঘটনাচক্রে। না, কোনো উল্লেখযোগ্য কারণে নয়, স্রেফ ঘটনাচক্রেই!

নামের আগে চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া সেই প্রবোধচন্দ্রের রাশ খুব ভারী না হলেও গোঁয়ার্তুমি ছিল প্রবল, তিন-তিনটে মেয়ের যথাবয়সে যথারীতি বিয়ে দিয়ে

এতে ছোট মেয়ের বেলায় তিনি যে হেরে গেলেন, সেটা মেয়ের জেদে অথবা তার 'চিরকুমারী থাকবার বায়নায় নয়, নিতান্তই নিজের আলস্যবশতঃ।

অথবা শুধুই আলস্য নয়, আরো কিছু সূক্ষ্ম কারণ ছিল।

তাঁর চার ছেলে আর চার মেয়ের মধ্যে সাত-সাতটাই তো হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, ছেলেদের মধ্যে তিনটিকে নিয়ে নিয়েছিল বৌরা অর্থাৎ পরের মেয়েরা। সেই ছেলেদের পোশাকী এক-একটা গালভরা নাম থাকলেও ডাকনাম তো ওই ভানু, কানু আর মানু। বাকি ছেলেটাকে কোনো পরের মেয়ে এসে দখল করে নিতে পারেনি, কারণ 'সুবল' নামে সেই ছেলেটাকে তো কারো দখলে পড়ার আগে ভগবানই নিয়ে নিয়েছিলেন।

আর মেয়ে চারটের মধ্যে চাঁপা, চন্দন আর পারুল নামের বড় মেজো সেজো তিনটিকে যথারীতি হাতিয়ে নিয়েছিল পরের ছেলেরা। হয়তো সেই জন্যেই জামাইদের দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না প্রবোধচন্দ্র। স্ত্রী-বিয়োগের পর আরো। মেয়েদের আনাআনির নামও করতেন না, সঙ্গে সঙ্গে ওই জামাইরা আর তাদের ছানা-পোনারা এসে ভিড় বাড়ায় এই আশঙ্কায়।

অতএব শেষ ভরসা সর্বশেষটি।

তাকে হাতছাড়া করার ভয়ে তার বয়স সম্পর্কে চোখ বুজে থেকে থেকে, ভদ্রলোক এমন চিরতরে চোখ বুজলেন যে, তখন আর তার বিয়ে 'দেবার' প্রশ্ন ওঠে না। কাজে কাজেই তার দাদারা সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে বসলো না।

আর বসবেই বা কি? পারুলের জুড়ি 'বকুল' নামের সেই শান্ত নম্র নিরীহ মেয়েটা যে তখন অন্য নামে ঝলসে উঠে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

তাছাড়া—বাপের উইল!

সেই উইলের বলে বকুল যদি এ বাড়ির একাংশ দখল করে বসে থাকতেই পায়, তাকে আর 'বাড়িছাড়া' করবার চেষ্টায় লাভ কী? বরকে সুদ্ধু নিয়ে এসে বসলেই কি ভালো?

অতএব বিশেষ কোনো কারণে নয়, বিশেষ কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করে নয়, নিতান্ত মধ্যবিত্ত এবং নেহাৎই মধ্যবিত্ত এই পরিবারের একটা মেয়ে সেকালের সমাজ নিয়মের বজ্রআঁটুনির মধ্য থেকে ফসকে বেরিয়ে পড়ে একালের সমাজে চরে বেড়াচ্ছে।

এখন আর কে কী বলবে? একালে কেউ কাউকে কিছু বলে না।

কিন্তু একালের সমাজে পড়ার আগে?

তা তখন বলেছিল বৈকি অনেকে অনেক কথা। প্রবোধচন্দ্র অনেক দিন আগে যে-পরিবারের একান্নের বন্ধন ছিন্ন করে চলে এসেছিলেন, তারা বলেছিলো। মহিলাকুল গাড়ি ভাড়া করে কলকাতার উত্তর অঞ্চল থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে এসে হাজির হয়ে বংশমর্যাদার কথা শুনিয়ে গিয়েছিল, তবে সেই বলার মধ্যে তেমন জোর ফোটাতে পারেনি তারা, কারণ ততদিনে তো আসামী পলাতক!

প্রবোধচন্দ্রের মৃত্যুর পরই না তাদের টনক নড়েছিল? শ্রাদ্ধের সময় জ্ঞাতি-ভোজনে এসেই তো দেখে হাঁ হয়ে গিয়ে বয়েস হিসেব করতে বসেছিল এই অবিশ্বাস্য ঘটনার নায়িকার।

তাছাড়া ততোদিনে—বকুলের অন্য নামটাও দিব্যি চাউর হয়ে উঠেছে।

মোট কথা, তালগোল অথবা গোলে-হরিবোলে, বকুল রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের *এই বাড়িটায় শেকড় গেড়ে বসে থেকে চোখ মেলে দেখে চলেছে কেমন করে বাড়ির* চারিপাশের উদার শূন্যতা সংকীর্ণ হয়ে আসছে, আর সমাজের বন্ধ সংকীর্ণতা

উদার হয়ে পড়ছে।

বকুলের নিজের জীবনটার সঙ্গে বুঝি এই পাড়াটার মিল আছে। বকুলের নিজের মধ্যে কোনোখানে আর হাঁফ ফেলবার মত ফাঁকা জমি পায় না বকুল, কোনোদিন যে কোনোখানে অনেকখানি শূন্যতা ছিল, তা স্মরণে আনতেও সময় নেই তার, সবখানটাই ঠাসবুনুনিতে ভর্তি। ঠিক ওই রাস্তার ধারের বাড়ির সারির মত।

রাস্তার ধার থেকে দেখলে শুধু একসারি। আর তিনতলার ওপরের ছাদে উঠলে—তার পিছনে, আরো পিছনে শুধু বাড়ি আর বাড়ির সারি।

কিন্তু তিনতলারও ওপরের ছাদে উঠে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখার মত বিলাসিতার সময় কোথায় বকুলের? ঘরের সামনের ছাদটুকুতে একটু দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখার সময় হয় না।

আশ্চর্য!

যখন সময় ছিল, তখন এই তিনতলার ওপরের ছাদটা পেলে একটা রাজ্য পাওয়ার সুখানুভূতি হতে পারতো, তখন ওটার জন্ম হয়নি। এখন কদাচ কোনোদিন ওই ছাদটায় ওঠবার সরু লোহার সিঁড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কল্পনা করে বকুল, বকুলের কৈশোরকালে যদি এটা থাকতো!

থাকলে যে কী হতো তা জানে না বকুল, 'যদি থাকতো' ভাবতে গেলেই অন্য একটা বাড়ির ছাদে একখানা হাসি-হাসি মুখ ভেসে ওঠে।

যে মুখের অধিকারীকে সেজদি পারুল বলতো, 'বোকা, হাঁদা, নীরেট'।

অবিশ্যি সে-সব তো সেই তামাদি কালের কথা। যখন এক-আধবার আসতো পারুল বাপের বাড়িতে। অনেক দিন আগে বিয়ে হওয়া তিন মেয়ের মধ্যে পারুলই মা মারা যাওয়ার পরও মাঝে মাঝে এসেছে।

আর চাঁপা, চন্দন?

তারা তো আর মরণকালে কেঁদে কেঁদে বলেছিলই, 'মা, তুমিও চললে, আমাদেরও বাপের বাড়ি আসা ঘুচলো—'

যদিও তখন সেখানে উপস্থিত মহিলাকুল, যাঁরা নাকি ওদের খুড়ি জেঠি পিসি, তাঁরা বলেছিলেন, 'ষাঠ-ষাঠ, বাপ বেঁচে থাকুন একশ বছর পরমায়ু নিয়ে—'

ওরা সেই ক্রন্দন-বিজড়িত গলাতেই সতেজ সংসারের নিয়ম বুঝতে দিয়েছিল গুরুজনবর্গকে। বলেছিল, 'থাকুন, একশো কেন হাজার বছর, মা মরলে বাপ তালুই, এ আর কে না জানে?'

হয়তো মা থাকতেই বাপের ব্যবহারে তার আঁচ পেয়েছিল তারা। টের পেতো বাবার একান্ত অনিচ্ছার ওপরও মা প্রায় জোর করেই তাদের নিয়ে আসেন। যদিও এও ধরা পড়তে নাকি থাকতো না—এই যুদ্ধের মধ্যে স্নেহবিগলিত চিত্তটা ততো নয়, কর্তব্যবোধটাই কাজ করেছে বেশী।

সুবর্ণলতার এই প্রবল কর্তব্যবোধটাই তো প্রবোধচন্দ্রকে চিরকাল জব্দ করে রেখেছিল। প্রবোধচন্দ্র বুঝে উঠতে পারতেন না নিজের জীবনটা নিয়ে নিজে যা খুশি করতে প্যাবে না কেন মানুষ।

নেহাৎ অসচ্ছল অবস্থা না হলে—মানুষ তো অনায়াসেই খাওয়াথাকা আয়েস আরাম সুখভোগ করে কাটিয়ে দিতে পারে, তবে কী জন্যে মানুষ 'কর্তব্য' নামক বিরক্তিকর একটা বস্তুকে নিয়ে ভারগ্রস্ত হতে যাবে? সেই বস্তুটার পিছনে পিছনেই তো আসবে যতো রাজ্যের চিন্তা, আর যতো রাজ্যের অসুবিধে।

প্রবোধচন্দ্রের এই মতবাদের সঙ্গে চিরকাল লড়ালড়ি ছিল সুবর্ণলতার, কিন্তু

শেষের দিকে কতকগুলো দিন যেন সুবর্ণলতা হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে যুদ্ধ-বিরীতির অন্ধকার শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মায়ের কথা মনে করতে গেলেই বকুলের মায়ের সেই নির্লিপ্ত নিরাসক্ত হাত থেকে হাল-নামানো মূর্তিটাই মনে পড়ে।

মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই সুবর্ণলতা যেন এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে নিজেকে মৃতের পর্যায়ে রেখে দিয়েছিলেন। সেই মৃত্যুর শীতলতার মধ্যে কেটেছে বকুলের কৈশোরকাল।

তবু আশ্চর্য, সেই শীতলতার মধ্যেই ফুটেছে ফুল, জ্বলেছে আলো।

তারপর তো সুবর্ণলতা সত্যিই বিদায় নিলেন।

তার কতোদিন যেন পরে সে-বার পারুল এলো বাপেরবাড়ি।

ঠিক মনে পড়ে না কবে।

॥ ৯ ॥

অনেক দিন পরেই পারুল সেবার এসেছিল বাপের বাড়ি। এ পক্ষের আগ্রহের অভাবেই শুধু নয়, নিজেরও আসাটা তার কদাচিৎ হয়, কারণ 'শ্বশুরবাড়ি'তে থাকে না সে, থাকে বরের বাড়ি। বরের বদলীর চাকরি এবং বৌয়ের বদলে রাঁধুনী-চাকরের হাতে খেতে সে নারাজ, তাই বৌকে বাসায় নিয়ে গেছে মা বাপের সঙ্গে মতান্তর করে। ছেলে তার বৌকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখতে চাইলে কোন্ মা-বাপই বা প্রসন্নচিত্তে সে 'যাওয়া'কে সমর্থন করতেন তখন? বৌ যদি নাচতে নাচতে বরের সঙ্গে 'বাসা'য় যায়, এবং সেখানে পূর্ণ কর্ত্রীত্বের স্বাদ পায়, আর কি কখনো সে বৌ শাশুড়ী পিসশাশুড়ীর ছত্রতলে 'বৌগিরি' করতে রাজী হবে? কদাচ না।

তাহ'লে?

তাহ'লে আর কি? বাসায় যাওয়া মানেই বৌয়ের পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাওয়া। কি জন্যে তবে ছেলেকে মানুষ-মনুষ করে বড় করে তুলে তার বিয়ে দেওয়া, যদি ছেলের বৌয়ের হাতের সেবা-যত্নটুকু না পেলেন? কিন্তু পারুলের বর বৌয়ের সেই কর্তব্যের দিকটা দেখেনি, নিজের দিকটাই দেখেছে।

আর পারুল? পারুলের একটা কর্তব্যবোধ নেই? অন্ততঃ চক্ষুলজ্জা?

বকুলের সেই প্রশ্নের উত্তরে পারুল হেসে উঠে বলেছিল, 'হ্যাঁ, সেটা অবিশ্যি দেখাতো ভালো। আমি যদি শাশুড়ীর পা চেপে ধরে বলতে পারতাম, 'ওই বেহায়া নির্লজ্জ স্বার্থপরটা যা বলে বলুক, আমি আপনার চরণ ছাড়বো না', তাহ'লে নিশ্চয়ই ধন্যি-ধন্যি পড়ে যেতো। কিন্তু সেই 'ধন্যি-ধন্যি'টার মধ্যে আছে কী বল? ছদ্মবেশ ধারণ করে ধন্যি-ধন্যি কুড়োনোয় আমার দারুণ ঘেন্না। তা'ছাড়া—' পারুল আরো একটু হেসেছিল, 'লোকটাকে দগ্ধে মারতে একটু মায়াও হলো। আমায় চোখছাড়া করতে হলে ও তো অহরহ অগ্নিদাহে জ্বলতো।'

বকুলও হাসে।

কুমারী মেয়ে বলে কিছু রেখেঢেকে বলে না। 'আহা শুধু তাঁরই নিন্দে করা হচ্ছে। নিজের দিকে যেন কিছুই নেই। অমলবাবু বাক্স-বিছানা বেঁধে নিয়ে ভাগল্‌বা হলে, তুই নিজে বুঝি বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখতিস না?'

'তা তাও হয়তো দেখতাম। যতই হোক বেঘোরে বেপোটে একটা পৃষ্ঠবল তো!'

'শুধুই পৃষ্ঠবল? আর কিছু নয়?'

'আরও কিছু? তাও আছে হয়তো কিছু। চক্ষুলজ্জার মায়াটা কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারলে, অন্ততঃ রান্নাঘর ভাঁড়ার-ঘরটার ওপর তো নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকে। সে স্বাধীনতাটুকুই কি কম?'

'যাঃ, তুই বড় নিন্দেকুটে। অমলবাবু তোকে সর্বস্ব দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বসে আছেন।'

'সেই তো জ্বালা।' পারুল কেমন একটা বিষণ্ণ হাসি হেসেছিল, 'সর্বস্ব লাভের ভাবটা তো কম নয়। সেটা না পারা যায় ফেলতে, না পারা যায় গিলতে।'

'ফেলতে পারা যায় না সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু গিলতে বাধা কি শুনি?'

'আরে বাবা ও প্রশ্ন তো আমিই আমাকে করছি অহরহ, কিন্তু উত্তরটা খুঁজে পাচ্ছি কই? ভারটাই ক্রমশঃ গুরুভার হয়ে উঠছে।...কিন্তু সে যাক, আমার অমলবাবুর চিন্তা রাখ, তোর নির্মলবাবুর খবর কি বল?'

'আঃ, অসভ্যতা করিস না।'

'অসভ্যতা কী রে? এতোদিনে কতদূর কী এগোলো সেটা শুনি।'

'তুই থামবি?'

পারুল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'হতভাগাটা বুঝি এখনো সেই মা-জেঠির আঁচলচাপা খোকা হয়ে বসে আছে? কোনো চেষ্টা করেনি?'

গম্ভীর বকুলও হয়েছিল তখন, 'চেষ্টা করবার তো কোনো প্রশ্নই নেই সেজদি!'

'ওঃ, প্রশ্নই নেই? সেই গণ-গোত্র, কুল-শীল, বামুন-কায়েত, রাঢ়ী-বারেন্দ্র? তাহ'লে মরতে তুই এখনো কিসের প্রত্যাশায় বসে আছিস?'

'প্রত্যাশা? প্রত্যাশা আবার কীরে সেজদি? বসে থাকা কথাটাও অর্থহীন। আছি বলেই আছি।'

'কিন্তু ভাবছি অভিভাবককুল তবে এখনো তোকে বাড়িছাড়া করবার জন্যে উঠেপড়ে লাগছে না কেন?'

'তা আমি কি জানি?'

বলেছিল বকুল, তা আমি কি জানি?

কিন্তু সত্যিই কি জানতো না বকুল সে কথা? বকুলের বাবা তাঁর চিরদুর্বল অসহায় চিত্তের সমস্ত আকুলতা নিয়ে ওই মেয়েটাতেই নির্ভর করছেন না কি? বড় হয়ে ওঠা ছেলেরা তো বাপের কাছে জ্ঞাতির সামিল, অন্ততঃ বকুলের বাবার চিন্তা ওর ঊর্ধ্বে আর পৌঁছুতে পারে না। বিবাহিত ছেলেদের তিনি রীতিমত প্রতিপক্ষই ভাবেন। বিবাহিতা মেয়েদের কথা তো বাদ। 'আপন' বলতে অতএব ওই মেয়ে। কুমারী মেয়েটা।

যদিও মেয়ের চালচলন তাঁর দু'চক্ষের বিষ, তবু সময়মত এসে ওষুধের গ্লাসটা তো ও-ই সামনে এনে ধরে। ও-ই তো দেখে বাবার বিছানাটা ফর্সা আছে কিনা, বাবার ফতুয়াটার বোতাম আছে কিনা, বাবা ভালমন্দ একটু খাচ্ছে কিনা।

ওই ভরসাস্থলটুকুও যদি পরের ঘরে চলে যায়, বিপত্নীক অসহায় মানুষটার গতি কি হবে?

হতে পারে জাত মান লোকলজ্জা, সবই খুব বড় জিনিস, কিন্তু স্বার্থের চাইতে

বড় আর কী আছে ? আর সবচেয়ে বড় স্বার্থ প্রাণরক্ষা।

বকুল বোঝে বাবার এই দুর্বলতা।

কিন্তু এ কথা কি বলবার কথা?

নাঃ, এ কথা সেজদির কাছেও বলা যায় না। তাই বলে, 'আমি কি জানি।' কিন্তু বাবার এই দুর্বলতাটুকুর কাছে কি কৃতজ্ঞ নয় বকুল ?

পারুল বলে, 'তাহলে আপাততঃ তোমার খাতার পাতা জুড়ে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লেখাই চলছে জোর কদমে ?'

বকুল হেসে উঠে বলে, 'আমি আবার প্রেমের কবিতা লিখতে গেলাম কখন? সে তো তোর ব্যাপার ! যার জন্যে অমলবাবু—'

'দোহাই বকুল, ফি কথায় আর তোর অমলবাবুকে মনে পড়িয়ে দিতে আসিসনে, দু-চারটে দিন ভুলে থাকতে দে বাবা।'

'ছি ছি সেজদি, এই কি হিন্দুনারীর মনোভাব?'

'ওই তো মুশকিল।' পারুল হেসে ওঠে, 'কিছুতেই নিজেকে "হিন্দুনারী"র খোলসে ঢুকিয়ে ফেলতে পারছি না, অথচ খোলসটা বয়েও মরছি। হয়তো মরণকাল অবধিই বয়ে মরবো।'

পারুলের মুখটা অদ্ভুত একটা রহস্যের আলোছায়ায় যেন দুর্বোধ্য লাগছে, মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই পারুল ওই খোলসটা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। বেরোচ্ছে না, শুধু যেন নিজের উপর একটা নির্মম কৌতুকের খেলা খেলে মজা দেখছে।...

অনামিকা ওই মুখটা দেখতে পাচ্ছেন, সেদিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকা বকুলের মুখটাও। বকুল ফর্সা নয়, পারুলের রং চাঁপাফুলের মত। পারুলের বর সেই রঙের উপযুক্ত শাড়িও কিনে দেয়। সেদিন পারুল একখানা মিহি 'চাঁদের আলো' শাড়ি পরেছে, তার পাড়টা কালো চুড়ি। সেই পাড়টা মাত্র খোঁপার ধারটুকু বেষ্টন করে কাঁধের পাশ থেকে বুকের উপর লতিয়ে পড়েছে। পারুলকে বড় সুন্দর দেখতে লাগছে।

'চাঁদের আলো' শাড়িতে লালপাড় আরো সুন্দর লাগে। কিন্তু লালপাড় শাড়ি পারুলের না-পছন্দ। কোনো উপলক্ষে 'এয়োস্ত্রী' মেয়ে বলে কেউ লালপাড় শাড়ি দিলে পারুল অপর কাউকে বিলিয়ে দেয়। কারণটা অবশ্য বকুল ছাড়া সকলেরই অজ্ঞাত। কিন্তু বকুল ছাড়া আর কাকে বলতে যাবে পারুল, 'লালপাড় শাড়িতে বড্ড যেন "পতিব্রতা-পতিব্রতা" গন্ধ। পরলে মনে হয় মিথ্যে বিজ্ঞাপন গায়ে সেঁটে বেড়াচ্ছি।'

ছেলেবেলায় পারুলের এমনি অনেক সব উদ্ভট ধারণা ছিল। আর ছিল একটা বেপরোয়া সাহস।

তাই পারুল তার বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছিল, 'বকুলের তো বিয়ের বয়স হয়েছে, আমাদের হিসাবে সে বয়েস পেরিয়েই গেছে, বিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?'

পারুল-বকুলের বাবা থতমত খেয়ে বলে ফেলেছিলেন, 'তা দেব না বলেছি নাকি ? পাত্র না পেলে ? আমার তো এই অশক্ত অবস্থা, বড় বড় ভাইরা নিজ নিজ সংসার নিয়েই ব্যস্ত—'

খুব একটা 'অশক্ত' ছিলেন না ভদ্রলোক, তবু স্ত্রীবিয়োগের পর থেকেই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে 'অশক্ত' করে তুলেছিলেন। কে জানে কোন্ মনস্তত্ত্বে।

হয়তো অপরের করুণা কুড়োতে।

হয়তো বা সংসারে নিজের 'মূল্য' বজায় রাখতে। কেউ কিছু বলেনি, তবু বুঝি তখন থেকে নিজেকে তাঁর 'সংসারে অবান্তর' বলে মনে হতো, তাই যখন তখন 'মর-মর' হতেন।

সে যাক্, নিজেকে অশক্ত বলে বলে অবশেষে তাই-ই হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। কথা বললেই কাসতে শুরু করতেন।

পারুল বলতো, 'ওটা "নার্ভাসনেস", মিথ্যে কাসি কেসে শেষ অবধি—'

কিন্তু পারুল তো অমন অনেক উদ্ভট কথা বলে। সেদিনও বাপের মুখের ওপর বলে উঠেছিল, 'আপনারা স্রেফ্ চোখ থাকতে অন্ধ। পাত্র তো আপনার চোখের সামনেই রয়েছে।'

'চোখের সামনেই পাত্র!'

পারুলের বাবা আকাশ থেকে পড়েছিলেন, 'কার কথা বলছিস তুই ?'

'কার কথা আবার বলবো বাবা ? কেন—নির্মলের কথা মনে পড়লো না আপনার ?'

'নির্মল! মানে অনুপমবাবুর ছেলে সুনির্মল ?'

অশক্ত মানুষটা সহসা শক্ত আর সোজা হয়ে উঠে বলেছিলেন, 'ওঃ, ওই হারামজাদি বুঝি উকিল খাড়া করেছে তোকে ? নির্মলের বাড়ি যাওয়া বার করছি আমি ওর।'

'আর এখন যায়ও না। তাছাড়া আপনি তো জানেন পরের শেখানো কথা কখনও কই না আমি। আমি নিজেই বলছি—'

'নিজেই বলছো!'

বাবা বিবাহিত মেয়ে এবং কৃতী জামাইয়ের মর্যাদা বিস্মরণ হয়ে খেঁকিয়ে ওঠেন, 'তা বলবে বৈকি। বাসায় গিয়েছো, আপটুডেট্ হয়েছো! বলি ওদের সঙ্গে আমাদের কাজ হয় ?'

এই খেঁকিয়ে ওঠাটা যদি পারুলের নিজের সম্পর্কে হতো, অবশ্যই পারুল আর দ্বিতীয় কথা বলতো না, কিন্তু পারুল এসেছিল বকুল সম্পর্কে একটা বিহিত করতে। তাই পারুল বলেছিল, 'হয় না কথাটার কোনো মানে নেই। হওয়ালেই হয়।'

'হওয়ালেই হয় ?'

'তাছাড়া কি ? নিয়ম-কানুনগুলো তো ভগবানের সৃষ্টি নয় যে তার নড়চড় নেই! মানুষের গড়া নিয়ম মানুষেই ভাঙে।'

'বাঃ, বাঃ!' বাপ আরো খেঁকিয়ে উঠেছিলেন, 'বাক্যি তো একেবারে "মা" বসিয়ে দিয়েছে। তা বলি আমি ভাঙতে চাইলেই ভাঙবে ? ওরা রাজী হবে?'

'যদি হয় ?'

'হবে! বলেছে তোকে ?'

'আমি বলছি যদি হয়, আপনি অরাজী হবেন না তো ?'

বাপ আবার অশক্ত হয়ে শুয়ে পড়ে বলেছিলেন, 'আমার আবার অরাজী! রোগা মড়া, একপাশে পড়ে আছি, মরে গেলে একদিন ছেলেরা টেনে ফেলে দেবে। মেয়ে যদি "লভ" করে কারুর সঙ্গে বেরিয়েও যায়, কিছু করতে পারবো আমি ?'

পারুল নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল ওই বুকে হাত দিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস ফেলা লোকটার দিকে। তারপর চলে এসেছিল।

চলে এসে ভেবেছিল, হালটা কি তবে আমিই ধরবো ?

কিন্তু হাল ধরলেই কি নৌকো চলে ? যদি বালির চড়ায় আটকে থাকা নৌকো

হয় ? তবু শেষ চেষ্টা করে যাব।

নাঃ, তবু বকুলের জীবন-তরণীকে ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি পারুল, শুধু সেবার চলে যাবার সময় বলে গিয়েছিল, 'তোর কাছে আমি অপরাধী বকুল, শুধু শুধু তোকে ছোট করলাম।......আশ্চর্য, ভাবতেই পারিনি একটা মাটির পুতুলকে তুই—'

রোষে ক্ষোভে চুপ করে গিয়েছিল পারুল।

বকুল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল......

... ...

কিন্তু বকুলের সেই কথাটার শেষটুকু শোনা হল না। সেই মৃদু হাসির উপর রূঢ় রুক্ষ কর্কশ একটা ধাক্কা এসে আছড়ে পড়লো।

ঘড়ির অ্যালার্ম !

নিয়মের বাড়িতে শেষ রাত্রি থেকে কর্মচক্র চালু করার জন্যে ঘড়িতে অ্যালার্ম দেওয়া থাকে। ভারী লক্ষ্মী আর হুঁশিয়ার বৌ নমিতা। ওই অ্যালার্মের শব্দে উঠে পড়েই ও সেই চাকাটা ঘোরাতে শুরু করবে। শীতের দেশ, চাকরবাকররা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে চায় না, অথচ ভোর থেকেই বাড়ির সকলের 'বেড-টী' চাই, গরম জল চাই।

এ কাজ নমিতাকে কেউ চাপিয়ে দেয়নি, নমিতা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। আত্মনিপীড়নও এক ধরনের চিত্তবিলাস। এ বিলাস থাকে কারো কারো। কেউ না চাইলেও তারা ত্যাগস্বীকার করে, স্বার্থত্যাগ করে, অপ্রয়োজনে পরিশ্রম করে, অহেতুক সেবা করে।

নইলে অনামিকা দেবীর বন্ধ দরজায় করাঘাত করে 'বেড-টী' বাড়িয়ে ধরবার দরকার ছিল না তার, অনামিকা দেবীর দায়িত্ব তার নয়।

অ্যালার্মের শব্দে চকিত হয়ে টেবিলে রাখা হাতঘড়িটা দেখেছিলেন অনামিকা দেবী, অবাক হয়ে ভাবছিলেন, 'আমি কি তবে ঘুমোইনি ?'

চায়ের পেয়ালা দেখে আরো অবাক হয়ে ভাবলেন, 'এ মেয়েটাও কি ঘুমোয়নি।' বললেন সেকথা।

নমিতা একটু উদার হাসি হাসলো, 'ঘুমিয়েছিলাম, উঠেছি। এই সময়ই উঠি আমি। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখি।'

'কেন বল তো? এই অন্ধকার ভোর থেকে এতো কী কাজ তোমার ?'

সহজ সাধারণ একটা প্রশ্ন করেন অনামিকা দেবী। নমিতা কিন্তু উত্তরটা দেয় অসহজ। গলা নামিয়ে বলে, 'থাক ও-কথা। কে কোথা থেকে শুনতে পাবেন।'

অনামিকা গম্ভীর হয়ে যান।

বলেন, 'যাক, আজ আমারও তোমার ওই অ্যালার্মের জন্যে সুবিধে হলো। ছটার সময় তো বেরোবার কথা।'

কয়েক মাইল মোটর গাড়িতে গেলে তবে রেলস্টেশন, আর সকাল সাতটার গাড়ি ধরতে হবে।

নমিতা কিন্তু তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'সে কী, আজই চলে যাবেন কি ? আরো তো দুদিন ফাংশান আছে না ?'

অনামিকা ওর অবোধ প্রশ্নে হাসেন।

বলেন, 'কথা তাই ছিল বটে। কিন্তু এর পরও ফাংশান হবে বলে ধারণা তোমার ?'

নমিতা মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলে, 'হবে। কাল আপনি শুয়ে পড়ার পর

অনেক রাত্রে সম্মেলনের কারা এসেছিলেন এ বাড়িতে, জানিয়ে গেলেন আপনি উঠলে যেন বলা হয় অধিবেশন হবে। রীতিমত পুলিস পাহারা বসাবার ব্যবস্থ হয়েছে।'

পুলিস পাহারা!

রীতিমত পুলিস পাহারা দিয়ে সাহিত্য সম্মেলন!

অনামিকা দেবী কি হেসে উঠবেন? না কেঁদে ফেলবেন?

অবশ্য দুটোর একটাও করলেন না তিনি, শুধু বললেন, 'না, আমি আজকেই চলে যাবো। সকালের গাড়িতে হয়ে না উঠলে দুপুরের গাড়িতে। হয়ে ওঠা মানে ওঁদের তো বলতে হবে।'

হ্যাঁ, চলেই এলেন অনামিকা দেবী। অনেক অনুরোধ উপরোধ এড়িয়ে পুলিস পাহারা বসিয়ে সাহিত্য সম্মেলনে রুচি হয়নি তাঁর।

অনুষ্ঠান সমিতির সভাপতি কাতর মিনতি জানিয়েছিলেন, অনিলবাবু যে হাসপাতাল থেকেও অনুরোধ জানিয়েছেন তা বললেন, কিন্তু কিছুতেই যেন পলাতক মেজাজকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না অনামিকা দেবী।

অবশেষে বললেন, 'শরীরটাও তেমন—মানে কালকের ঘটনায় কী রকম যেন—'

'শরীর' বলার পর তবে অনুরোধ প্রত্যাহার করলেন তাঁরা। 'শরীর' হচ্ছে সর্ব দেবতার সার দেবতা, ওর নৈবেদ্য পড়বেই। মন? মেজাজ? ইচ্ছে? অনিচ্ছে? সুবিধে? অসুবিধে? ওদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলার মতো সুদর্শন চক্র আছে অনুষ্ঠানকারীদের হাতে। শুধু 'শরীরে'র কাছে তাঁরা অস্ত্রহীন। অতএব অপর পক্ষের ব্রহ্মাস্ত্রই ওই শরীর। শুধু নাম করেই ছাড়পত্র পেলেন।

কিন্তু ওদের, মানে সম্মেলন আহ্বানকারীদের এবার শনি রাহু যোগ।

সেটা টের পাওয়া গেল কলকাতায় এসে খবরের কাগজ মারফৎ।

কাগজটা পড়তে পড়তেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল শম্পা শাড়ির কোঁচা লটপটাতে লটপটাতে।

'ও পিসি, পিসি গো, তোমাদের উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সম্মেলনের এই পরিণতি? "পুলিসী শাসন ব্যর্থ! স্থানীয় যুবকদের সহিত পুলিসের সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও বাইশজন আহত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে।"...হি হি হি, কী কাণ্ড! কই কাল তুমি তো বললে না কিছু?'

অনামিকা দেবী সেই মাত্র কোনো এক সম্পাদকের তাগাদায় উত্ত্যক্ত হয়ে মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে কলম নিয়ে বসেছিলেন, ওই 'হি হি'তে প্রমাদ গনলেন। সহজে যাবে না ও এখন, জোর তলবে জেরা করে জেনে নেবে কী ঘটনা ঘটেছে আসলে।

'কাণ্ড'তে ভারী কৌতূহল শম্পার।

যেখানে এবং যে বিষয়েই হোক, কোনো একটা কাণ্ড ঘটলেই শম্পা উল্লসিত! আর সেই উল্লাসের ভাগ দিতে আসে মাই-ডিয়ার পিসিকে। অনামিকা দেবী গম্ভীর হতে চাইলেও, সে গাম্ভীর্যও নস্যাৎ করে ছাড়ে!

... ...

'পিসি, শুনেছো কাণ্ড, শিবনাথ কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রগণ কর্তৃক ঘেরাও। বেচারী প্রিন্সিপাল করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করে তবে—', হি হি করেই বাকিটা বোঝায়।

'পিসি, জানো কী কান্ড! এই সেদিন অতো ঘটা করে বিয়ে করলো। জানো, এক্ষুনি সেপ্যারেশান, দুজনেই অনমনীয়!...পিসি, যত সব বানানো মানুষ নিয়ে রাতদিন মিথ্যে কান্ডকারখানা ঘটাচ্ছো, সত্যি মানুষের দিকে দৃষ্টিই নেই তোমার। পাড়ায় কি কান্ড ঘটেছে জানো? অনিন্দ্যবাবুর গাড়ি থেকে সতীশবাবুর প্যান্টে কাদা ছিটকেছিল বলে দুজনের তুমুল একখানা হাতাহাতি হয়ে গেছে, এখন দুজনেই কেস ঠুকতে গেলেন।'

এই সব হচ্ছে শম্পার উল্লাসের উচ্ছ্বাস!

অনামিকা দেবী হতাশ-হতাশ গলায় বলেন, 'এতো খবর তোর কাছেই কি করে আসে বল্ তো?'

শম্পা দুই হাত উল্টে বলে, 'চোখ-কান খোলা থাকলেই আসে।'

'ওই সব বাজে ব্যাপারে চোখ-কান একটু কম খোলা রাখ্ শম্পা, জগতে আরো অনেক ভালো জিনিস আছে।'

'ভালো!'

শম্পা এমন কথা শুনলে আকাশ থেকে পড়ে। বলে, "ভালো" শব্দটার অর্থ কি পিসি? কোন্ স্বর্গীয় অভিধানে আছে ওটা?...যেগুলোকে তুমি বাজে বলছো, ওইগুলোই হচ্ছে আসল কাজের। এই কান্ডগুলোই হচ্ছে সমাজের দর্পণ।..."সমাজ, সংস্কৃতি" এগুলোর গতিপ্রকৃতি তুমি দেখবে কোথা থেকে, যদি 'কান্ড'গুলোকে আমল দেবে না? ডালপালা তো 'শো' মাত্র, কান্ডই আসল বস্তু। ওই কান্ড!'

স্বভাবগত ভঙ্গিমায় ঝরঝর করে অনেক কথা বলে শম্পা। সব সময় বলে।

আজও বলে উঠলো, 'কাল যে বললে, তোমার ভাষণ হয়ে গেছে বলে তুমি আর অকারণে দুদিন বসে থাকলে না! এদিকে এই কান্ড? তুমি থাকতেও তো—'

অনামিকা দেবী নিরুপায় ভঙ্গীতে কলমটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলেন, 'তা কী করবো বলো? তোমার কাছে কান্ড আওড়াতে বসলে, আমার আর কিছু কাজ হতো? জেরার চোটে এক "কান্ড"কে সাত কান্ড করে তুলতে। কিন্তু সে যাক, কী লিখেছে কাগজে? সত্যিই দুজন নিহত?'

'তাই তো লিখেছে—', শম্পা আবার হেসে ওঠে, 'অবিশ্যি খবরের কাগজের খবর। দুয়ের পিটে দুই বাইশ হতে পারে। হয় পুলিসী নির্দেশে একটা দুই চেপে ফেলা হয়েছে, নয় ছাপাখানার ভূত একটা দুই চেপে ফেলেছে। হয়তো বাইশজন নিহত, বাইশজন আহত।'

অনামিকা দেবী ওর ওই উথলে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ কঠিন গলায় বলেন, 'সেই সন্দেহ মনে নিয়ে তুমি হেসে গড়াচ্ছো? "নিহত" শব্দটার মানে জানো না বুঝি?'

'এই সেরেছে—', শম্পা তার তিনকোণা চশমার কোণকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলে চোখ উঁচিয়ে বলে, 'পিসি রেগে আগুন। মানে কেন জানবো না বাছা, এ যুগে ও শব্দটার মানে তো খুব প্রাঞ্জল হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে একখানা থান ইঁট তুলে টিপ করে ছুড়তে পারলেই তো হয়ে গেল মানে জানা!...সেদিন যেই তুমি বেরোলে, তক্ষুনিই প্রায় ঘটে গেল তো একখানি ঘটনা। পাড়ার ছেলেরা রাস্তার মাঝখানে যেমন ইঁট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলে তেমনি খেলছে, হঠাৎ কোথা থেকে এক মস্তান এসে এই তম্বি তো সেই তম্বি! "রাস্তাটা পাবলিকের হাঁটবার জায়গা, ইঁটের দেওয়াল তোলবার জায়গা নয়, উঠিয়ে নিয়ে যাও" ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে প্রতিফল। নেহাৎ বরাতজোর ছিল, তাই কারো ভবলীলা সাঙ্গ হয়নি, কপাল কাটার ওপর দিয়েই গেছে। তবে যেতে পারতো

তো ?'

অনামিকা দেবী হতাশ গলায় বললেন, 'শম্পা, আমাকে এখন খুব তাড়াতাড়ি একটা লেখা শেষ করতে হবে।'

'বাবাঃ বাবাঃ, সব সময় তোমার তাড়াতাড়ি লেখা শেষ করতে হবে! ভাবলাম এই দুদিনের ঘটনাগুলো বলি তোমাকে। যাকগে, মরুকগে, এই রইল তোমার উত্তরবঙ্গ। "পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দেখুন।" আমি বিদেয় হচ্ছি টা কথা কইবারও লোক নেই বাড়িতে। সাধে বেরিয়ে যাই—'

অনামিকা দেবী তো ওকে যেতে দিতে পারতেন। অনামিকা দেবী তো সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে লিখতে বসেছিলেন, তবু কেন ওর অভিমানে বিচলিত হলেন?

কে জানে কী এই হৃদয়-রহস্য!

ওর প্রায় সব কিছুই অনামিকা দেবীর কাছে দৃষ্টিকটু লাগে, তবু ওর জন্যে হৃদয়ে অনেকখানি জায়গা।

তাগাদার লেখা লিখতে সত্যিই কষ্ট হয় আজকাল, সত্যিই জোর করেই বসতে হয় সে লেখা লিখতে, তবু গা এলিয়ে দিলেন তিনি এখন। বলে উঠলেন, 'যেমন অসভ্য চুলবাঁধা, তেমনি অসভ্য কথাবার্তা।'

শম্পা টকটকিয়ে চলে যাচ্ছিল, এ কথায় ঘাড় ফেরালো। সতেজে বলে উঠলো, 'কেন, খোঁপার মধ্যে কি অসভ্যতা আছে শুনি?'

'সবটাই আছে।' অনামিকা দেবী ওর একটা হাত চেপে ধরে চেয়ারের কাছে টেনে এনে বলেন, 'কী আছে খোঁপার মধ্যে? আমের টুকরি? গোবরের ঝুড়ি?'

'ওর মধ্যে থাকার জন্যে বাজারে অনেক মালমশলা বিকোচ্ছে পিসি, কিন্তু কথা হচ্ছে খোঁপার গড়নটা তোমার ভাল লাগছে না?'

'লাগছে বললে হয়তো তুই খুশি হতিস, কিন্তু খুশি করতে পারছি না। ভেবে পাচ্ছি না তুই এই কিছুদিন আগেও "ঘাড়ের বোঝা হালকা করে ফেলি" বলে চুল কাটতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলি, নেহাৎ তোর মার দিব্যি-দিলেশায় কাটিসনি, সেই তুই হঠাৎ স্বেচ্ছায় মাথার ওপর এতো বড় একটা বোঝা চাপালি কি করে!'

'চাপালাম কি করে? হি হি হি. কেন পিসি, তুমিই তো যখন আমাকে ছেলে-বেলায় গল্প বলতে, বলেছিলে—যে সুয়োরানী পানের বাটা বইতে মূর্ছা গিয়েছিল, সেই সুয়োরানীই ফ্যাশানের ধুয়োয় গলায় সোনাবাঁধানো শিল ঝুলিয়েছিল।'

'মনে আছে সে গল্প?' অনামিকা দেবী মৃদু হেসে বলেন, 'গল্পগুলো কেন তৈরী হতো আর বলা হতো, বল্ দিকি?'

'আহারে! তা যেন জানি না। লোকশিক্ষার্থে, আবার কি! বিশেষ করে মহিলাকুলকে শিক্ষা দিতেই তো যত গল্পের অবতারণা।'

'সবই যদি জানিস, এটাও তাহলে জানা উচিত, "শিক্ষা" জিনিসটা নেবার জন্যেই। "ফ্যাশানে"র শিকার হয়ে মেয়েজাতটা কতো হাস্যাস্পদই হয় ভাব্।'

শম্পা অভিমান ভুলে পিসির পাশে আর একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বলে, 'এই খোঁপাটার ব্যাপারে তুমি সেটি বলতে পারবে না মহাশয়া, এ স্রেফ অজন্তা স্টাইল।'

'হতে পারে। কিন্তু অজন্তার সেই স্টাইলিস্ট মেয়েরা কি ওই খোঁপার সঙ্গে হাইহীল জুতো পরতো? হাতে ঘড়ি বাঁধতো? ছুটোছুটি করে বাস ট্রাম ধরে অফিস কলেজ যেতো? নিজে হাতে ড্রাইভ করে মাইলের পর মাইল রাস্তা পাড়ি দিতো?'

'কে জানে!'

শম্পা চেয়ারটার পিঠে ঠেস দিয়ে দোলে।

'কে জানে নয়। দিতো না। সাজের সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য থাকা দরকার, বুঝলি ?'

'বুঝলাম না—', শম্পা বলে হেসে হেসে, 'সাজ বজায় রেখেও যদি কাজ করা যায় ?'

'মানায় না।'

'ওটা তোমাদের বন্ধ দৃষ্টিতে। দৃষ্টি মুক্ত করো মহিলা, দেখবে সামঞ্জস্য কথাটাই অর্থহীন। আশ্চর্য, লেখিকা হয়েও কেন যে তুমি এতো সেকেলে! অথচ লোকে তোমার নামের আগে "প্রগতিশীল" লেখিকা বলে বিশেষণ বসায়।'

'তাতে তাহলে তোর আপত্তি ?'

'রীতিমত।'

'তবে যা, যারা বিশেষণ বসায়, তাদের বলে দিগে, যেন ওই প্রগতিটার আগে একটা 'অ' বসিয়ে দেয়। কিন্তু এই দুদিনের কী খবর বলছিলি ?'

'থাকগে সে কিছু না।'

বলে শম্পা টেবিলে টোকা দিয়ে সুর তোলে। অথচ মুখের ভাবে ফুটিয়ে রাখে 'সে'টা অনেক কিছু।

অনামিকা দেবী ওর এ ভঙ্গী জানেন।

মনে মনে হেসে বলেন, 'কিছু না ? তবে থাক। আমি ভাবছিলাম বুঝি—'

'আহা, আমি একেবারে কিছু না বলিনি। বলছি এমন কিছু না। যাক গে, বলেই ফেলি। পরশু ছোঁড়া এক কীর্তি করেছে।'

শম্পা একটু দম নেয়, তারপর ঝরঝরে গলায় বলে, 'বিয়ে বিয়ে করে আমায় তো পাগল করে মারছিলই, আবার পরশু সোজা এসে বাবার কাছে হাজির। বলে কিনা—"আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।" বোঝো ব্যাপার।'

শম্পা সহজ হাসি হেসে-হেসেই বলে কথাগুলো, কিন্তু অনামিকা দেবীর হঠাৎ মনে হয় শম্পা যেন ব্যঙ্গহাসি হাসছে। যেন বলতে চাইছে, 'দেখো দেখো, আমাদের যুগকে দেখো। ছিলো এমন সাহস তোমাদের যুগের প্রেমিকদের ? হুঁ! সে সাহসের পরাকাষ্ঠা তো 'দেবদাস', 'শেখর', 'রমেশ'। মাটির ঘোড়া, স্রেফ মাটির ঘোড়া। ছোটার ভঙ্গীটি নিয়ে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।'

মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহে গেল।

অন্য অনেক দিনের মতো আজও একবার ভাবলেন অনামিকা দেবী, আমি কি এ যুগকে হিংসে করছি ? আমার ওই না-পছন্দটা কি সেই হিংসেরই রূপান্তর?

'কী হল পিসি, অমন চুপ মেরে গেলে যে ?'

অনামিকা দেবী কলমটা আবার হাতে তুলে নিলেন এবং যে কথাটা মুহূর্ত আগেও ভাবেননি, হঠাৎ সেই কথাটাই বলে বসলেন, 'ছেলেটা তো দেখছি ভারী হ্যাংলা।'

কেন বললেন ?

ঠিক এই মুহূর্তে কি সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবনাটাই ভাবছিলেন না অনামিকা দেবী ?

ভাবছিলেন না কি, 'বকুল, তোমার নির্মলের যদি এ সাহস থাকতো ?'

কিন্তু শম্পা ওই মনের মধ্যেকার কথাটা জানে না। তাই বলে ওঠে, 'আমিও ঠিক সেই কথাটাই বলেছি হতভাগাকে। কিন্তু ও যা নাছোড়বান্দা, মনে হচ্ছে বিয়ে না করে ছাড়বে না।'

'তোর বাবা কি বললো ?'

'বাবা? বাবা আবার নতুন কি বলবেন? বাবা মাত্রেই যা বলে থাকে তাই বললেন—বললেন, "পাত্র হিসেবে তুমি কী, তোমার চালচুলো কিছু আছে কিনা সে-সব না জানিয়েই হঠাৎ আমার মেয়েকে বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেই আমি আহ্লাদে অধীর হয়ে কন্যা সম্প্রদান করতে বসবো, এই কি ধারণা তোমার?" তাতে ও—'

'তাতে ও কী? ভাবী শ্বশুরকে পিটিয়ে দিয়ে গেল?'

শম্পা হেসে উঠে বলে, 'অতটা অবিশ্যি নয়, তবে শাসিয়ে গেছে। বলেছে—দেখি কেমন না দেন।'

'চমৎকার! কোথা থেকে এসব মাল জোটাস তাই ভেবে অবাক হই।'

'ব্যাপারটা কী হচ্ছে জান পিসি—', শম্পা পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'অবস্থাটা মরীয়া। আমি আবার কিছুদিন থেকে ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে আর একটা ছেলের সঙ্গে চালাচ্ছি কিনা। অবিশ্যি সেটা একেবারেই ফল্‌স্‌। স্রেফ্‌ ওর জেলাসি বাড়াবার জন্য—'

ওকে কথা শেষ করতে দিলেন না অনামিকা দেবী, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আচ্ছা তোমার ফাজলামি পরে শুনবো, এখন আমায় এটা শেষ করতে দাও।'

শম্পা ঝপ করে উঠে দাঁড়ায়, ক্ষুব্ধ অভিমানের গলায় বলে, 'আমি চলেই যাচ্ছিলাম, তুমিই ডেকে বসালে।'

তরতর করে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

অনামিকা দেবীও সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন। বন্ধ কলমটাই হাতে ধরা থাকে, সর্বশক্তি প্রয়োগের ইচ্ছেটাকে যেন খুঁজে পান না।

খুব আস্তে, খুব গভীরে ভাবতে চেষ্টা করেন, এ যুগের কোন্‌ কর্নারে আমি আমার ক্যামেরাটা বসাবো? কোন্‌ অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নেবো?...এই বাড়িরই কোনোখানে কোনোখানে যেন এখনো ভাশুরে দেখে ঘোমটা দেওয়া হয়, ভাঁড়ারের কোণে 'ইতু' ঘট পাতা হয়, হয়তো বা বিশেষ বিশেষ দিনে লক্ষ্মীর পাঁচালিও পড়া হয়। অথচ এই বাড়িতেই শম্পা—

এর কোন্‌টা সত্য?

॥ ১০ ॥

না, এ যুগে সে যুগের কোনো স্পষ্ট অবয়ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও সে দুরন্ত সংহারের মূর্তি নিয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিচ্ছে বহুযুগসঞ্চিত সংস্কারগুলি, উড়িয়ে দিচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধগুলি, অভ্যস্ত ধ্যান-ধারণার অবলম্বনগুলি, আবার কোথাও সে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ীর মতো আজও তার বহু সংস্কারে বোঝাই ঝুলিটি কাঁধে নিয়ে শিকড় গেড়ে বসে 'পাপপুণ্য', 'ভালোমন্দ', 'ইহলোক-পরলোকে'র চিরাচরিত খাজনা যুগিয়ে চলেছে।

তাই এ যুগের মানসলোকে 'সত্যে'র চেহারাও অস্থির অস্পষ্ট। দোদুল্যমান দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতো সে চেহারা কখনো কম্পিত, কখনো বিকৃত, কখনো দ্বিধাগ্রস্ত, কখনো যেন অসহায়। যেন ঝড়ে বাসাভাঙা পাখি ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে পাক খেয়ে মরছে, এখনো ঠিক করে উঠতে পারছে না, ঝড় থামলে পুরনো বাসাটাই জোড়াতালি দিয়ে আবার গুছিয়ে বসবে, না কি নতুন গাছে গিয়ে নতুন

বাসা বাঁধবে!

কিন্তু ঝড় কি থামবে?

ভাঙনের ঝড় কি ভেঙেচুরে তছনছ না করা পর্যন্ত থামে? সে কি ওই আদ্যি-কালের বুড়ীটাকে শিকড় উপড়ে তুলে ফেলে না দিয়ে ছাড়ে?

অথবা হয়তো থামে।

হয়তো ছাড়ে।

কোথায় যেন একটা রফা হয়ে যায়। তখন বুড়ীটাকে দেখতে পাওয়া না গেলেও শিকড়টা থেকে যায় মাটির নীচে। নিঃশব্দে সে আপন কাজ করে যায়। তাই এই 'বিশবনস্যাতে'র যুগেও 'মহাত্মা' আর 'মহারাজে'র সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বেড়ে চলেছে 'ভাগ্যগণনা কার্যালয়', আর 'গ্রহশান্তির রত্ন-কবচ'।

তাই যখন 'সাম্য' 'মৈত্রী' আর 'স্বাধীনতা'র জয়ডঙ্কায় আকাশবাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে, তখনও শুধু মাত্র চামড়ার রঙের তারতম্যের ছুতোয় মানুষ মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এবং যখন মানুষের একটা দল চাঁদে পৌঁছবার সাধনায় আকাশ পরিক্রমা করছে, তখন আর একটা দল 'সভ্যতার সব পথ-পরিক্রমা শেষ করে ফেলেছি' বলে আবার গুহার দিকে মুখ ফিরিয়ে চলতে যাচ্ছে।

একটানা এতোখানিকটা বলে বক্তা একবার থামলেন। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

'বহু আসন-বিশিষ্ট বিরাট সুরম্য হল'। সভার উদ্যোক্তা মোটা টাকা দক্ষিণা এবং অক্লান্ত 'ধর্নার বিনিময়ে' একটি সন্ধ্যার জন্য সংগ্রহ করেছেন এই 'হল', 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' ও 'সাহিত্য সম্মেলনে'র জন্য। ওই ভাবেই বেশ কয়েকদিন থেকে প্রচার কার্য চলেছে। "অভিনব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' ও 'সাহিত্য সম্মেলন।' আসুন অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করুন। পঁচিশ টাকা, দশ টাকা ও পাঁচ টাকা। দুই টাকার টিকিট কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-দিবসে হল-এ বিক্রয়।...আর একটি ঘোষণা, এই অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক-তৃতীয়াংশ 'দুঃস্থত্রাণ সমিতি'র হস্তে অর্পণ করা হইবে।"

মানুষ যে যথেষ্ট পরিমাণে হৃদয়বান তা এই প্রবেশপত্র সংগ্রহের উদগ্র আগ্রহের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। তিনদিন আগেই উচ্চ মূল্যের টিকিট নিঃশেষিত, 'হল'-এ বিক্রয়ের পরিকল্পনার নিবুদ্ধিতায় বিপর্যস্ত উদ্যোক্তারা পুলিসের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন।

দুঃস্থদের জন্যে প্রাণ না কাঁদলে কি এতোটা হতো? নিন্দুকেরা হয়তো অন্য কথা বলবে, কিন্তু নিন্দুকে কি না বলে? অন্য কথা বলাই তো তাদের পেশা। যাই হোক—দুঃস্থদের জন্যেই হোক, অথবা 'দুর্লভ'দের জন্যই হোক, সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে।

আর সে সংবাদ ঢাক পিটিয়ে প্রচার করাও হয়েছে।

অতএব আশা করা অসঙ্গত নয় সামনের ওই সারিবদ্ধ আসনের সারির জম-জমাট ভরাট ভরাট রূপ দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু কোথায় সেই ভরাট রূপ?

কোথায় সেই পূর্ণতার সমারোহ?

আজকের সম্মেলনের প্রধান বক্তা সুবিখ্যাত অধ্যাপক সাহিত্যিক চক্রপাণি চট্টোপাধ্যায় তাই বক্তৃতার মাঝখানে একবার দম নিয়ে 'হল'-এর শেষপ্রান্ত অবধি তাকিয়ে দেখলেন। না, মানুষ নেই, শুধু চকচকে ঝকঝকে গদিআঁটা মূল্যবান আসনগুলি শূন্য হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে।

কেবলমাত্র সামনের কয়েকখানি আসন, যাতে নাকি 'অতিথি' ছাপমারা, তারা জনাকয়েক বিশিষ্ট অতিথিকে হৃদয়ে ধারণ করে বসে আছে। এঁদের হয়তো গাড়ি করে আনা হয়েছে, তাই এঁরা সভার শোভা হয়ে বসতে বাধ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য সাংবাদিক, বাকি সব বিশিষ্ট নাগরিক। 'এঁরা এঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন' বলে কাগজে যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়, এঁরা হচ্ছেন তাঁরা।

চক্রপাণি এঁদের অনেককেই বেশ চেনেন, অনেকের মুখ চেনেন।

কিন্তু এঁদের কাউকেই তো 'নবযুগের বাহক' বলে মনে হচ্ছে না, তবে 'যুগের বাণী' কাদের শোনাবেন চক্রপাণি ?

অথচ তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু নির্ধারিণ করে দেওয়া হয়েছে, 'যুগসাহিত্যে সত্য'। অবশ্য সত্যি বলতে, ওই শিরোনামটার প্রকৃত অর্থ তাঁর কাছে তেমন প্রাঞ্জল মনে হয়নি, খুব ভালো বুঝতে পারেননি উদ্যোক্তারা আসলে ওই শব্দটা দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন, অথবা জনা তিন-চার মহা মহা সাহিত্যরথীদের ডেকে এনে তাঁদের কাছে কী শুনতে চেয়েছেন।

তবু অধ্যাপকদের ভাষণের জন্য আটকায় না, যে কোনো বিষয়বস্তু নিয়েই তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারগর্ভ ভাষণ দিতে পারেন। চক্রপাণি আবার শুধু অধ্যাপক নন, অধ্যাপক-সাহিত্যিক! প্রৌঢ়ত্বের কাছে ছুঁই ছুঁই বয়েস, ছাত্রমহলে বিশেষ প্রীতিভাজন (যেটা নাকি এ যুগে দুর্লভ) এবং পাঠক-মহলে আজও অম্লানজ্যোতি নায়ক। 'অতি আধুনিক'দের প্রবল কল-কল্লোলেও চক্রপাণির জয়জয়কার অব্যাহতই আছে। অন্ততঃ তাঁর রচিত গ্রন্থের বিক্রয়-সংখ্যা দেখে তাই মনে হয়।

কিন্তু বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়ালে কেন সেই অগণিত ভক্ত-সংখ্যাকে দেখতে পাওয়া যায় না ? কেন গোনাগুনতি কয়েকটা চেনা-মুখের পিছনে শুধু শূন্যতার অন্ধকার ?

অথচ ওই চেয়ারগুলির ন্যায্য মালিক আছে।

এসেওছে তারা। শুধু 'ঝুটঝামেলা কতকগুলো বক্তৃতা' শোনবার ভয়ে 'হল-এর বাইরে এদিক ওদিক ঘুরছে, ঝালমুড়ি অথবা আইসক্রীম খাচ্ছে, আড্ডা মারছে।

তাছাড়া আরো আকর্ষণ আছে, গায়ক-গায়িকার সঙ্গে কিছু নায়ক-নায়িকার নামও ঘোষণা করা হয়েছে, যাঁরা নাকি দুঃস্থদের কল্যাণে বিনা দক্ষিণায় কিছু 'শ্রমদান' করতে স্বীকৃত হয়েছেন। তাঁরা যে শুধু অভিনয়ই করেন না, কণ্ঠসঙ্গীতেও সক্ষম, সেটা স্পষ্ট তাঁদের সামনে বসে দেখা যাবে। এখন কথা এই—সেই নায়ক-নায়িকারা অবশ্যই আকাশপথে উড়ে এসে মঞ্চাবতরণ করবে না। গাড়ি থেকে নেমে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়েই আসতে হবে তাঁদের। সেই অনবদ্য দৃশ্যের দর্শক হবার সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইবে, এমন মূর্খ কে আছে !

ওঁরা এসে প্রবেশ করলে উল্লাসধ্বনি দিয়ে তবে ভিতরে ঢোকা যাবে। টিকিটে সিট নম্বর আছে ভাবনা কি ?

প্রথম বক্তা চক্রপাণি বিশেষ বুদ্ধিমান হলেও অবস্থাটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে প্যারেননি। বিরাট প্রেক্ষাগৃহের বিরাট শূন্যতার দিকে তাকিয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদককে ক্ষুব্ধ প্রশ্ন করেছিলেন, 'আরম্ভ তো করবো, কিন্তু শুনবে কে ? ফাঁকা চেয়ারগুলো ?'

সম্পাদক সবিনয়ে বলেছিলেন, 'সবাই এসে যাবে স্যার।'

কিন্তু ওই আশ্বাসবাণীর মধ্যে আশ্বাস খুঁজে পাননি চক্রপাণি। কাজেই আবারও বলেছিলেন, 'আর কিছুটা অপেক্ষা করলে হতো না ?'

শুনে সম্পাদক এবং স্থায়ী সহ-সভাপতি 'হাঁ হাঁ' করে উঠেছিলেন, 'আর দেরি

করলে চলবে না স্যার! আপনাদের এই চারজনের ভাষণ সাঙ্গ হতে-হতেই তো সভার বারোটা বেজে যাবে। মানে সকলেই তো স্যার—ধরলে কথা থামায় কে? আপনার বক্তৃতাই যা একটু শোনবার মতো। বাকি সবাই—'

এ মন্তব্য অবশ্য খুবই নিম্নস্বরে বলা হয়েছিল, উদ্যোক্তারা তো অভদ্র নয় যে চেঁচিয়ে কোনো মন্তব্য করে বসবেন।

চক্রপাণির সন্নিকটে বসেছিলেন সাহিত্যিক মানস হালদার। তিনি আবার বিশিষ্ট একটি সাপ্তাহিকের সম্পাদকও। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নেই বলে খানকয়েক ফুলস্ক্যাপ কাগজের দু'পিঠে খুদে খুদে অক্ষরে তাঁর বক্তব্য লিখে এনেছেন। তিনি উসখুস করে বলেন, 'তা আপনাদের কার্ডে লেখা রয়েছে ছ'টা। এখন পৌনে সাতটা পর্যন্তও—'

'ব্যাপার কি জানেন স্যার—', সম্পাদক হাত কচলে বলেন, 'আর্টিস্টরা সব বড্ড দেরী করে আসেন কিনা। আর ওনাদের জন্যেই তো এতো "সেল"। পয়সা খরচ করে সাহিত্য শুনতে কে আসে বলুন?'

না, না, ছেলেটা সাহিত্য বা সাহিত্যিকবৃন্দকে অবমাননা করবে মনস্থ করে বলেনি কথাটা। নেহাতই সারল্যের বশে সহজ কথাটা বলে বসেছে।

মানস হালদার চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'তা হলে এই সাহিত্য সম্মেলনের ফার্স কেন?'

ছেলেটা এ প্রশ্নের উত্তরে সারল্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়। অমায়িক গলায় বলে, 'তা যা বলেছেন। তবে কি জানেন, ফাংশানের খরচ তুলতে "স্যুভেনির" তো, একটা বার করতেই হয়, আর তাতে নামকরা লেখকদের লেখা না থাকলে অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট পাওয়া যায় না। কাজে-কাজেই—মানে বুঝছেনই তো, আপনাদের লেখা নেবো অথচ—ইয়ে একবার ডাকবো না এটা কেমন দেখায় না? তাই যাঁদের যাঁদের লেখা নেওয়া হয়েছে, বেছে বেছে শুধু তাঁদেরই ডাকা হয়েছে, দেখবেন লক্ষ করে। নচেৎ সাহিত্য নিয়ে বকবকানি শুনতে কার আর ভালো লাগে? কথা তো ঢের হয়েছে আমাদের দেশে, কাজের কাজ কিছু নেই, কেবল কথার ফুলঝুরি।

ছেলেটা নিজেও যে অনেক ভালো ভালো কথা শিখেছে তার পরিচয় দিতে নিজেই ফুলঝুরির ঝুরি ছড়ায়, 'দেশ কোথায় যাচ্ছে বলুন! রুচি নেই, সভ্যতা নেই, সৌন্দর্যবোধ নেই, গভীরতা নেই, চিন্তাশীলতা নেই, কেবলমাত্র কথার স্রোতে ভাসছে। তাই স্যার আমাদের শশাঙ্কদা বলে দিতে বলেছেন, আপনাদের ভাষণগুলো একটু সংক্ষিপ্ত করবেন। ভারী মজার কথা বলেন উনি—', ছেলেটা একসার দাঁত বার করে নিঃশব্দে হেসে বলে, 'বললেন, "ভাষণ" সংক্ষিপ্ত না হলে শ্রোতারা সম্যকরূপে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আরো একটা কথা, আর্টিস্টদের গুমোর জানেন তো—একটু বসে থাকতে হলেই, "অন্যত্র কাজ আছে" বলে উঠে চলে যাবেন। একজন বিখ্যাত গায়িকা তো আবার গানের সময় সভায় কেউ একটি কথা বললেই উঠে চলে যান। শিল্পী তো! ভীষণ মুডি!'...বিগলিত হাস্যে ছেলেটি বলে, 'শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো স্যার? শেষের দিকে ভালো আর্টিস্টদের রাখা হচ্ছে।'

'কিন্তু তোমাদের সভানেত্রী?'

'এসে গেছেন স্যার! মেয়েছেলে হলে কি হবে, খুব পাংচুয়াল। তা ওনাকে নিয়ে পড়েছে একদল কলেজের মেয়ে, অটোগ্রাফ খাতা এনেছে সঙ্গে করে। এই যে উইংস-এর ওদিকে। এসে বসে যাবেন, আপনি শুরু করে দিন না।'

চক্রপাণি বিরক্তভাবে বলেছিলেন, 'তাই কি হয়? সভার একটা কানুন আছে তো?'

'আপনি তো বলছেন স্যার, এদিকে আমাদের যে মিনিটে মিনিটে মিটার উঠছে।'

'মিটার উঠছে!'

অধ্যাপক-সাহিত্যিক সভয়ে এদিক-ওদিক তাকান।

'মিটার উঠছে? কিসের মিটার?'

'আজ্ঞে এই "হল"-এর!' ছেলেটি তার গজগজে কথার মধ্যেই একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, 'অনেক ধরে-করে কনসেশনেই পাঁচশো টাকা! ধরুন বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা। দশটা বেজে গেলেই—ঘণ্টা পিছু এক্সট্রা একশো টাকা। তা হলই বলুন মিটার ওঠাটা ভুল বলেছি কিনা! আপনাদের এই সাহিত্যের কচকচি না থামতেই যদি আর্টিস্টরা কেউ কেউ এসে পড়েন, কী অবস্থা হবে?'

ছেলেটা একদা চক্রপাণির ছাত্র ছিল, তাই এত অন্তরঙ্গতার সুর। কিন্তু ওই শিশুজনসদৃশ সরল অথচ গোঁফদাড়ি সম্বলিত দীর্ঘকায় প্রাক্তন-ছাত্রটিকে দেখে চক্রপাণির স্নেহধারা উথলে উঠছে বলে মনে হল না। নীরস গলায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন, কী অবস্থা হবে?'

'কী হবে সে কি আর আমি আপনাকে বোঝাবো স্যার? সময় নষ্ট হতে দেখলে অডিয়েন্স ক্ষেপে যাবে। কী রকম দিনকাল পড়েছে দেখছেন তো?...ওই তো সভানেত্রী এসে গেছেন। তবে আর কি!'

তবে আর কি করা।

মাইকের প্রথম বলি চক্রপাণি চট্টোপাধ্যায় 'যুগসাহিত্যে সত্য' নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন।

বলছিলেন, কিন্তু বার বার সামনের ওই শূন্য আসনের সারির দিকে তাকাচ্ছিলেন।...আর ভাবছিলেন, এ যুগের স্পষ্ট চেহারা কি তবে এই শূন্যবক্ষ প্রেক্ষাগৃহের মতো?

তবে ভাবছিলেন বলে যে থেমে থেমে যাচ্ছিলেন তা নয়। একবারই শুধু থেমেছিলেন। তারপর আবার একটানা বলে চলেন—'শিল্পী সাহিত্যিক কবি বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ, এঁদের তাই আজ বিশেষ সঙ্কটের দিন। তাঁরাও আজ দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁরা কি চিরাচরিত সংস্কারের মধ্যেই নিমজ্জিত থেকে গতানুগতিক ভাবে সৃষ্টি করে যাবেন, না নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে নতুন সত্য উদ্ঘাটিত করবেন। এই প্রশ্ন আজ সকলের মধ্যে।'

গুটিগুটি দুটি তরুণ এসে ঢুকে পিছনের সারিতে বসেছিল, চাপা গলায় হেসে উঠে একজন অপরজনকে বলে উঠলো, 'লে হালুয়া! ওই "সত্য"টা কি আজব চীজ্ বল দেখি? "সত্য সত্য" করে এতো মাথা খুঁড়ে মরে কেন দাদুরা?'

'বাছাদের নিজেদের সব কিছুই ক্রমশঃ মিথ্যে হয়ে আসছে বলে বোধ হয়!'

'দূর বাবা, এতোক্ষণ পরে এসে ঢুকলাম, তাও বসে বসে বক্তিমে শুনতে হবে? কর্তারা মধু পরিবেশনের আগে খানিকটা করে নিমের পাঁচন গেলায় কেন বল্ দিকি?'

'ওই ফ্যাশান!'

চক্রপাণি তখনও বলে চলেছেন, 'এই যুগকে তবে কোন্ নামে অভিহিত করবো? "অনুসন্ধানী যুগ?" যে যুগ তন্নতন্ন করে খুঁজছে, যাচাই করছে কোথায় সেই অভ্রান্ত সত্য, যা মানুষকে সমস্ত মিথ্যা বন্ধন থেকে মুক্ত করে—'

'আবার সেই সত্য!' কালো রোগা ছেলেটা সাদা সাদা দাঁত বার করে হেসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'সত্য মারা গেছে দাদু! তাকে খুঁজে বেড়ানো পণ্ডশ্রম।'

চক্রপাণি ভালো বলছেন, তথাপি অপর বক্তারা ঘন ঘন হাত উল্টে উল্টে ঘড়ি দেখছিলেন। মানস হালদার বেজার মুখে পকেটে হাত দিয়ে টিপে টিপে নিজের লিখিত ভাষণটি অনুভব করছিলেন আর বিড়বিড় করছিলেন, 'নাঃ, লোকটা দেখছি একাই আর সকলের বারোটা বাজিয়ে দিলো। উদ্যোক্তাদের উচিত প্রত্যেককে একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। ওদেশে এরকম হয় না। সে একেবারে সামনে ঘড়ি রেখে কাজ। আমাদের দেশে ? হুঁ!'

তা উদ্যোক্তাদের আছে সে শুভবুদ্ধি, তাঁদের একজন আস্তে পিছন থেকে এসে সবিনয়ে জানালেন, 'একটু সংক্ষেপ করবেন স্যার!'

সংক্ষেপ ?

চক্রপাণি ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে সামনের দিকে তাকালেন, সবে দু'চারটি করে লোক এসে বসতে শুরু করেছে এবং সবে বক্তব্যের গোড়া বাঁধা হয়েছে, এখন কিনা সংক্ষেপের অনুরোধ ?

তবে তিনি নাকি আদৌ রগচটা নন, বরং কৌতুকপ্রিয়, তাই কৌতুকের গলায় একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে বক্তব্যের উপসংহার করে দিলেন। কিন্তু তাঁর সেই বুদ্ধি-দীপ্ত তীক্ষ্ণ মন্তব্যটি মাঠেই মারা গেল।

বাইরে থেকে ঘরে তুমুল একটা হর্ষোচ্ছ্বাসের ঢেউ খেলে গেল, 'এসে গেছেন! এসে গেছেন!'

কে এসে গেছেন ?

যার জন্যে এই তুমুল হর্ষ ?

আঃ, জিজ্ঞেস করবার কী আছে ? ওঁকে না চেনে কে ?

উনি এসে গেছেন। পিছনে পিছনে ওঁর তবলচি।

তারপর আরও এক নায়ক। তাঁর সঙ্গে এক নায়িকা।

বলা বাহুল্য, এরপর আর সাহিত্য-বক্তৃতা চলে না। মানস হালদার, সিতেশ বাগচী এবং সভানেত্রী অনামিকা দেবী নিতান্তই অবাঞ্ছিত অতিথির মতো তাঁদের ভাষণ সংক্ষেপে শেষ করে নিলেন, মঞ্চাধিপতি সেই ভাইস প্রেসিডেণ্ট তারস্বরে ঘোষণা করলেন, 'সাহিত্য-সভা শেষ হলো। এইবার আমাদের "সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান" আরম্ভ হবে। আপনারা অনুগ্রহ করে স্থির হয়ে বসুন।'

কিন্তু দোদুল্যমান পর্দার সামনে কে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে ? দোদুল্যমান চিত্তের মৃদু গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'গদি একখানা পেলে আর কোনো মিঞাই ছাড়তে চান না। শেষক্ষণ পর্যন্ত গদি আঁকড়ে বসে থাকবো এই পণ! এই ভাষণ শুনতে এলেই আমার ওই গদি আঁকড়ানোদের কথা মনে পড়ে যায়।'

'আহা বুঝছিস না, কে কতো পণ্ডিত, কার কতো চিন্তাশক্তি, বোঝাতে চেষ্টা করবে না?'

'সবাইকে ওনাদের ছাত্র ভাবে, তাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আর আশ মেটে না। কোন্ নতুন কথাটা বলবি বাবা তোরা ? সেই তো কেবল লম্বা লম্বা কোটেশন্। অমুক এই বলেছেন, তমুক এই বলেছেন! আরে বাবা, সে-সব বলাবলি তো ছাপার অক্ষরে লেখাই আছে, সবাই পড়েছে, তুই কী বলছিস তাই বল্ ?'

পর্দার ওপারে তখন জুতো খুঁজতে খুঁজতে অধ্যাপক-সাহিত্যিক ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'এতোক্ষণ অসংস্কৃতির আসর চলছিল, সেটা শেষ হলো, এবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ! সংস্কৃতির বেশ একখানা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বেরিয়েছে দেশে। সংস্কৃতি মানে নাচ গান! কী বলুন অনামিকা দেবী ?'

অনামিকা দেবীর চটি যথাস্থানেই পড়ে আছে, তিনি অতএব আত্মস্থ গলায়

বলেন, 'তাই তো দেখি! আর আশ্চর্য হই, কে যে এই নতুন ব্যাখ্যার ব্যাখ্যাকার!'

'কে আর! এই ফাংশানবাজেরা!'

মানস হালদারের জুতোটা মঞ্চে ওঠার বাঁশের সিঁড়ির নীচে ঢুকে পড়েছিল, তিনি সেটা টেনে বার করতে করতে কঠিন পেশী-পেশী মুখে বলেন, 'এই ফাংশানবাজরাই দেশের মাথা খেলো। কী পাচ্ছি আমরা ছেলেদের কাছে? আমাদের পরবর্তীদের কাছে? হয় পলিটিক্স, নয় ফাংশান! কোনো উচ্চ চিন্তা নেই, উচ্চ আদর্শ নেই, সুস্থ একটা কর্মপ্রচেষ্টা নেই, শুধু রাস্তায় রাস্তায় রকবাজি! নাঃ, এ ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছি না আমরা ছেলেদের কাছে।'

অনামিকা দেবী এই সব প্রবলদের সঙ্গে তর্ক করতে ভয় পান। জানেন এদের প্রধান অস্ত্রই হবে প্রাবল্য। অনামিকা দেবীর সেখানে তাই হার। ওঁর প্রশ্নে শুধু মৃদু হাসেন।

উত্তরটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

আমরা ওদের কাছে কিছুই পাচ্ছি না। ঠিক। কিন্তু ওরাই বা আমাদের কাছে কী পাচ্ছে?

আদর্শ? আশ্রয়? সভ্যতা? সত্য?

ওঁরা নেমে এসে সামনের সারিতে নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। অন্ততঃ দু'একটি গান শুনে না গেলে ভালো দেখায় না।

যদিও ভালো গানের আশা দুরাশা।

প্রথমে শুধু দায়েপড়ে নেওয়া গায়কদের গান। হয় এরা বেশী চাঁদা দিয়েছে, অথবা এরা উদ্যোক্তাদেরই কেউ। সারমেয়র সামনে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে রেখে তাকে ছুটিয়ে নেওয়ার মতো, ভালো আর্টিস্টদের শেষের জন্যে ঝুলিয়ে রেখে এইগুলি পরিবেশিত হবে একটির পর একটি।

দশটা বেজে যাবে?

যাক্ না।

বারোটা বাজলেই বা কী! ঘণ্টা পিছু একশো টাকা বৈ তো নয়। পুষিয়ে যাবে।

প্রধান অতিথি সভানেত্রীকে উদ্দেশ করে চাপা গলায় ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেন, 'এতে মিটার ওঠে না, দেখছেন?'

হাসলেন অনামিকা দেবী 'দেখছি তো **অনেক কিছুই**।'

সত্যি দেখছেন তো অনেক কিছুই!

তাঁর ভূমিকাটাই তো দর্শকের।

অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তারা তাঁদের 'সাহিত্যসভা'র সভানেত্রী ও উদ্বোধককে সসম্মানে ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। তুলে দিলেন তাঁদের মালা আর ফুলের তোড়া। তারপরে প্রায় করজোড়ে বললেন, 'অনেক কষ্ট হলো আপনাদের।'

কথাটা বলতে হয় বলেই বললেন অবশ্য, নইলে মনে জানেন কষ্ট আবার কি? গাড়ি করে নিয়ে এসেছি, গাড়ি চড়িয়ে ফেরত পাঠাচ্ছি, বাড়তির মধ্যে মঞ্চ দিয়েছি মাইক দিয়েছি, একরাশ শ্রোতার সামনে বসে ধানাই-পানাই করবার সুযোগ দিয়েছি, আরামসেই কাটিয়ে দিলে তোমরা এই ঘণ্টা দুই-তিন সময়। কষ্ট যা তা আমাদেরই। কন্যাদায়ের অধিক দায় মাথায় নিয়ে আমরা তোমাদের বাড়িতে বার বার ছুটেছি, মাথায় করে নিয়ে এসেছি, ঘাড়ে করে নিয়ে যাচ্ছি।

তবু সৌজন্যের একটা প্রথা আছে, তাই ওঁরা হাত কচলে বললেন, 'আপনাদের

খুব কষ্ট হলো।'

তা এঁরাও সৌজন্যের রীতি পদ্ধতিতে অজ্ঞ নয়। তাই বললেন, 'সে কি সে কি, কষ্ট বলছেন কেন? বড় আনন্দ পেলাম।'

'আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন।'

'আ ছি ছি, এ কী কথা! না না, এসব বলে লজ্জা দেবেন না।'

'আচ্ছা নমস্কার—যাবো আপনার কাছে।' এটা মানস হালদারের উদ্দেশে, কারণ, তিনি একটা কাগজের সম্পাদক!

'আচ্ছা নমস্কার—'

গাড়িটা কারো ঘরের গাড়ি হলে হয়তো এই সৌজন্য-বিনিময়ের পালা আরও কিছুক্ষণ চলতো, ট্যাক্সি-ড্রাইভারের অসহিষ্ণুতায় তাড়াতাড়ি মিটলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো।

পিঠে ঠেস দিয়ে গুছিয়ে বসলেন সভানেত্রী অনামিকা দেবী, আর উদ্বোধক মানস হালদার।

প্রধান অতিথি চক্রপাণি চট্টোপাধ্যায়?

না, তিনি এসব সৌজন্য বিনিময়ের ধার ধারেননি, নিজের গাড়িতে বাড়ি চলে গেছেন একটামাত্র গান শুনেই। এঁরা দুজন গাড়িহীন, এবং একই অঞ্চলের অধিবাসী, কাজেই একই গতি।

মানস হালদারের যত্ন সহকারে লেখা ফুলস্ক্যাপ কাগজের গোছা অপঠিত অবস্থায় পকেটে পড়ে আছে, 'সময় সংক্ষেপে'র আবেদনে 'যা হোক কিছু' বলে সারতে হয়েছে, মনের মধ্যে সেই অপঠনের উষ্মা। যদিও নিজে তিনি একটা সাপ্তাহিকের সম্পাদক, কাজেই 'শ্রম'টা মাঠে মারা যাবার ভয় নেই, স্বনামে বেনামে বা ছদ্মনামে পত্রস্থ করে ফেলবেন সেটাকে, তবু মাইকে মুখ দিয়ে 'দশজন' সুধী-বৃন্দের সামনে ভাষণ দেওয়ার একটা আলাদা সুখ আছে। সে সুখটা থেকে তো বঞ্চিত হলেন।

গাড়িটা একটু চলতেই মানস হালদার ক্ষোভতপ্ত স্বরে বলে ওঠেন, 'এরা সব যে কেনই পায়ে ধরে ধরে ডেকে আনে! আসল ভরসা তো আর্টিস্টরা!'

অনামিকা দেবী মৃদু হেসে বলেন, 'ওদের দোষ কি? "জনগণ" যা চায়—'

'তা সে শুধু ওদের ডাকলেই হয়। সাহিত্য কেন?'

'প্রোগ্রামও তেমনি লম্বা। একাসনে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বায়ু সবাইকে বসানো চাই। এক ক্ষুরে সবাইয়ের মাথা মুড়োবে, এক তলওয়ারে সবাইয়ের গর্দান নেবে। গোড়ায় যে গায়কদের বসিয়ে দিয়েছে, তারা কী বলুন তো?'

অনামিকা দেবী ওঁর উত্তেজনায় কৌতুক অনুভব করেন, মৃদু হাসির সঙ্গে বলেন, 'আহা ওই ভাবেই তো নতুনরা তৈরি হবে।'

'তৈরি?' মানস হালদার মনের ঝাঁজকে মুক্তি দিয়ে বলে ওঠেন, 'ওই দাঁত-উঁচু ছেলেটা জীবনেও তৈরি হবে বলে আপনার বিশ্বাস?'

এসব কথার উত্তর দেওয়া বড় মুশকিল। নেহাৎ সৌজন্যের জন্যে একটু সায় দিয়ে বসলেই হয়তো পরে তাঁর কানে ফিরে আসবে, তিনিই নাকি 'নতুন'দের বেজায় অবজ্ঞা করেন এবং ওই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কড়া সমালোচনা করেছেন। এ অভিজ্ঞতা আছে অনামিকা দেবীর। যে প্রসঙ্গের মধ্যে তিনি হয়তো এতটুকু সায় দেওয়ার কথা উচ্চারণ করেছেন, সেই প্রসঙ্গের পুরো বক্তব্যের দায়িত্বই তাঁর উপরে বর্তেছে।

অমুক এসে অন্য এক অমুকের কথা তাঁর কাছেই পেশ করে গেছেন। দেখতে দেখতে ক্রমশঃ সাবধান হয়ে গেছেন অনামিকা দেবী।

তাই মৃদু হেসে বলেন, 'অবিশ্বাসেরও কিছু নেই, অভ্যাসে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়!'

মানস হালদার ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'এটা আপনার এড়িয়ে যাওয়া কথা। আমরা অনেক জ্বালায় জ্বলি, কাজেই আপনাদের মতো অতো ভদ্রতা করে কথা বলে উঠতে পারি না। জানেন বোধ হয় একটা কাগজ চালাই? উইক্‌লি! নতুন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহের প্রাবল্যে জীবন মহানিশা! কী বলবো আপনাকে, "সাহিত্য" জিনিসটা যে ছেলেখেলা নয়, তার জন্যে যে অভ্যাস দরকার, চেষ্টা ও নিষ্ঠা দরকার, তা মানতেই চায় না। একটা লিখলো, তক্ষুনি ছাপবার জন্যে নিয়ে এলো।...আমাদের কী? সব ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে চালান করে দিই—'

'কিন্তু', অনামিকা দেবী বলেন, 'ওর মধ্যে সম্ভাবনার বীজও থাকতে পারে তো? একেবারে না দেখে—'

'কী করা যাবে বলুন? বস্তা বস্তা লেখা জমে উঠেছে দপ্তরে। দেশসুদ্ধ সবাই যদি সাহিত্যিক হয়ে উঠতে চায়—'

'তবু লেখক তৈরি করা, নতুন কলমকে স্বাগত জানানো সম্পাদকেরই ডিউটি!'

'ওসব সেকালের কথা অনামিকা দেবী, যেকালে নতুনদের মধ্যে নম্রতা ছিল, ভব্যতা ছিল, প্রতীক্ষার ধৈর্য ছিল। আর একালে? একটুতেই অধৈর্য, নিজের প্রতি অগাধ উচ্চ ধারণা, এবং শুধু লেখা ছাপা হবার আনন্দেই বিগলিত নয়, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণার প্রত্যাশা। নাঃ, দেশের বারোটা বেজে গেছে!'

বলে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছেন মানস হালদার।

ভদ্রলোক অল্পেই উত্তেজিত হন, তা বোঝা গেল।

অনেকেই হয়। দেখে কৌতুক লাগে।

অনামিকা দেবী কখনোই খুব বেশী উদ্বেলিত হন না, হন না খুব বেশী উত্তেজিত।

কিছুক্ষণ আগেই যে বলছিলেন, 'আমাদের ভূমিকাটাই তো দর্শকের', সেটা হয়তো কেবলমাত্র কথার কথাই নয়। প্রায় দর্শকের নির্লিপ্ত মন নিয়েই জীবনটাকে দেখে আসছেন তিনি।

হয়তো তাঁর এ প্রকৃতি গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর মায়ের প্রকৃতি কিছুটা কাজ করেছে। অর্থাৎ মায়ের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত।

বড় বেশী আবেগপ্রবণ ছিলেন অনামিকা দেবীর মা সুবর্ণলতা, বড় বেশী স্পর্শকাতর। সামান্য কারণেই উদ্বেলিত হতেন তিনি, সামান্যতেই উত্তেজিত।

তার মানে সেই 'সামান্য'গুলি তাঁর কাছে 'সামান্য' ছিল না। সংসারের অন্য আর সকলকে যা অনায়াসেই সয়ে নিতে পারে, তিনি তার মধ্যে থেকে কুশ্রীতা দেখে বিচলিত হতেন, রুচিহীনতা দেখে পীড়িত হতেন। মানুষের নীচতা ক্ষুদ্রতা হীনতা দৈন্য তাঁকে যেন হাতুড়ির আঘাত হানতো। সেই আঘাতে চূর্ণ হতেন তিনি।

অনামিকা দেবীর বয়েস যখন নিতান্তই তরুণী, তখন মা মারা গেছেন, তবু তখনই তিনি মায়ের এই মূঢ়তায় দুঃখবোধ করতেন। মায়ের ওই সদা উদ্বেলিত বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া চিত্তের দিকে তাকিয়ে করুণাবোধ করতেন, বুঝতে পারতেন না সাধারণ ঘটনাগুলোকে এতো বেশী মূল্য কেন দেন তিনি।

পরে বুঝেছেন, মানুষ সম্পর্কে মার বড় বেশী মূল্যবোধ ছিল বলেই এত দুঃখ পেয়েছেন। পৃথিবীর কাছে বড় বেশী প্রত্যাশা ছিল অনামিকা দেবীর মার, মানুষ নামের প্রাণীদের তিনি 'মানুষ' শব্দটার সংজ্ঞার সঙ্গে মিলোতে বসতেন।

এই ভুল অঙ্কটা কষতে বসে জীবনের পরীক্ষায় শুধু ব্যর্থই হয়েছিলেন মহিলা, আর পৃথিবীর আঘাতে চূর্ণ হয়ে যাওয়া সেই প্রত্যাশার পাত্রখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নিজেও চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। মাকে বুঝতে পেরেছিলেন অনামিকা।

আর সেই চূর্ণ হয়ে যাওয়ার দৃশ্য থেকেই এই পরম শিক্ষাটি অর্জন করেছেন অনামিকা, 'মানুষ' সম্পর্কে ভুল অঙ্ক কষতে বসেন না তিনি।

'কী হলো অনামিকা দেবী? আপনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন যে?' বললেন মানস হালদার। 'নতুন লেখকদের সম্পর্কে আপনার যেন বেশ মমতা রয়েছে মনে হচ্ছে! তা থাকতে পারে, তাদের মুখোমুখি তো হতে হয়নি কখনো?'

অনামিকা দেবী বলেন, 'তাই হবে হয়তো। মুখোমুখি হতে হলে, বোধ হয় আপনাদের জন্যেই মমতা হতো।'

'হ্যাঁ, তাই হতো—', দৃঢ়স্বরে বললেন মানস হালদার। তারপর বললেন, 'তা ছাড়া আজকালকার কবিতার মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারি না, ওর আর বিচার করবো কি? নির্বিচারেই বাতিল করে দিই।'

'আপনার কাগজে কবিতা দেন না?'

'দেব না কেন? নিয়মমাফিক দুটো পৃষ্ঠা কবিতার জন্যে ছাড়া থাকে, যাঁদের নামটাম আছে তাঁরা সাপ ব্যাঙ যা দেন চোখ বুজে ছেপে দিই।'

অনামিকা ঈষৎ কৌতুকের গলায় বলেন, 'শুনে ভরসা পেলাম। ভবিষ্যতে যদি সাপ ব্যাঙ লিখতে শুরু করি, তার জন্যে একটা জায়গা থাকলো।'

মানস হালদার নড়েচড়ে বসলেন, 'আপনার সম্পর্কে এটা বলা যায় না, আপনার লেখা কখনো হতাশ করে না।'

'কি জানি আপনাদের করে কি না'—অনামিকা বলেন, 'তবে আমাকে করে—'

'আপনাকে করে? অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ কোনো লেখাটাই লিখে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারি না। মনে হয়, যা বলতে চেয়েছিলাম, তেমন করে বলতে পারিনি।'

'ওটাই তো আসল শিল্পীর ধর্ম'—মানস হালদার বোধ করি মহিলাকে সান্ত্বনা দান করতেই সোৎসাহে বলেন, 'সত্যিকার শিল্পীরা কখনোই আত্মসন্তুষ্টির মোহে আপন কবর খোঁড়েন না। আপনি যথার্থ শিল্পী বলেই—'

আরো সব অনেক ভালো ভালো কথা বললেন মানস হালদার, যা নাকি অনামিকাকে প্রায় আকাশে তুলে দেওয়ার মত। অনামিকা অস্বস্তি অনুভব করেন, অথচ 'না না, কী যে বলেন' গোছের কথাও মুখে যোগায় না, অতএব মানস হালদারের গন্তব্যস্থল এসে গেলে যেন হাঁফ ফেলে বাঁচেন। বাকি পথটুকু একা হবেন, নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকতে পাওয়া কী আরামের!

নমস্কার বিনিময়ের পর নেমে যান মানস হালদার।

অনামিকা পিঠ ঠেসিয়ে ভাল করে বসেন, আর আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে হারিয়ে যান যেন।

কিন্তু শুধুই কি মায়ের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত থেকেই অনামিকার প্রকৃতির গঠন? বকুলের কাছ থেকেও কি নয়?

বকুলের মধ্যেও কি আবেগ ছিল না? ছিল না মোহ, বিশ্বাস, প্রত্যাশা? মার মত তীব্রভাবে না হোক, সুষমার মূর্তিতে?

বকুলের সে মোহ, সে বিশ্বাস, সে প্রত্যাশা টেঁকেনি।

বকুল অতএব অনামিকা হয়ে গিয়ে আবেগ জিনিসটাকে হাস্যকর ভাবতে

শিখেছে।

তবু সেই সুষমাটুকু?

সেটুকু কি একেবারে হারিয়ে গেছে?

বকুলের সেদিনের সেই মূর্তিটা দেখলে তো তা মনে হয় না। বকুল যেন সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সেই সুষমাটুকুকে মনের মধ্যে আগলে রেখেছিল।

সেই সেদিন, যেদিন পারুল ও-বাড়ি গিয়ে বলেছিল, 'মা নেই, বাবারও খেয়াল নেই, তাই আমিই বলতে এলাম জেঠাইমা, বিয়েটার আর দেরি করবার দরকার কি?'

নির্মলের জেঠাইমা আকাশ থেকে পড়ে বলেছিলেন, 'কার বিয়ের কথা বলছিস রে পারু?'

পারুল জানতো এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে তাকে, তাই পারুল স্থির গলায় বলেছিল, 'আমি আর কার বিয়ের কথা বলতে আসবো জেঠাইমা, বকুলের কথাই বলছি।'

জেঠাইমার পাশে নির্মলের মা বসেছিলেন, তাঁর চোখমুখে একটা ব্যাকুল অসহায়তা ফুটে উঠেছিল, তিনি সেই অসহায়-অসহায় মুখটা নিয়ে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন বড় জায়ের দিকে। কিন্তু বড় জা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেননি। তিনি পারুলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উদাস গলায় বলেছিলেন, 'তা সে আর আমরা পাড়াপড়শীরা কী করবো বল্ মা? তোর বাবা তো আমাদের পোঁছেও না!'

'বাবা তো বরাবরই ওই রকম জেঠাইমা, দেখছেন তো এতকাল! কিন্তু তাই বলে তো চুপ করে বসে থাকলে চলবে না? মা নেই, বৌদিদের কথাও না বলাই ভালো, বকুলটাকে আপনাদের কাছে পোঁছে দিতে পারলে আমি শান্ত হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে পারি।'

হ্যাঁ, এই ভাবেই বলেছিল পারুল।

বোধ হয় নিজের বুদ্ধির আর বুদ্ধি-কৌশলের উপর বেশ আস্থা ছিল তার, ভেবেছিল একেবারে এইভাবেই বলবো, আবেদন-নিবেদনের বিলম্বিত পথে যাবো না। কিন্তু কতো ভুল আস্থাই ছিল তার!

জেঠাইমা এবার বোধ করি আকাশেরও ঊর্ধ্বতর কোনো লোক থেকে পড়লেন। সেই আছড়ে পড়ার গলায় বললেন, 'তোর কথা তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না পারু! আমাদের কাছে রেখে যাবি বকুলকে? তোর মানী বাবা সে প্রস্তাবে রাজী হবে? নচেৎ আমাদের আর কি, মা-মরা সোমত্ত মেয়েটা যেমন মাসী পিসির কাছে থাকে, থাকতো আমাদের কাছে।'

পারুল তথাপি উত্তেজিত হয়নি, পারুল বরং আরো বেশী ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'এ ধরনের কথা কেন বলছেন জেঠাইমা? আপনি কি সত্যিই বুঝতে পারেননি, বকুলের বিয়ের কথা আপনার কাছে বলতে এসেছি কেন?'

জেঠাইমা বিরস গলায় বলেছিলেন, 'এর আবার সত্যি-মিথ্যে কি তা তো বুঝছি না পারু! হেঁয়ালি বোঝবার চেষ্টার বয়েসও নেই। তোমাদের মা আমাকে বড় বোনের তুল্য মান্যভক্তি করতো, আমাদের কাছে একটা পরামর্শ চাইতে এসেছো এটাই বুঝছি। এ ছাড়া আর কি তা তো জানি না!'

নির্মলের মা এই সময় একটুখানি চাপা ব্যাকুলতায় অস্ফুটে বলে উঠেছিলেন, 'দিদি!'

দিদি সেই অস্ফুটের প্রতি কান দেননি।

হয়তো সমাজের চাকা আজ এমন উল্টো গতিতে ঘোরার কারণই ওই কান না দেওয়া। যাঁরা ক্ষমতার আসনে বসেছেন, গদির অধিকার পেয়েছেন, তাঁরা ওই অস্ফুট ধ্বনির দিকে কান দেওয়ার প্রয়োজন বিবেচনা করেননি। তাঁরা আপন অধিকারের সীমা সম্পর্কে সচেতন থাকেননি, অস্ফুটকে দাবিয়ে রেখে শাসনকার্য চালিয়ে যাওয়ার নীতি বলবৎ রেখেছেন, আজ আর তাই সেই অস্ফুটের ভূমিকা কোথাও নেই। আজ সর্বত্র প্রচণ্ড কল্লোল। সেই কল্লোলে, সেই তরঙ্গে ভেসে গেছে উপরওলাদের গদি, ভেসে গেছে তাঁদের শাসনদণ্ড। নির্বাক অসহায় দৃষ্টি মেলে সেই কল্লোলের দিকে তাকিয়ে আছেন এখন উপরওলারা। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা আর নেই। শুধু যে কেবল মাত্র 'গুরুজন', এই পদমর্যাদায় যা খুশি করা আর চলবে না তাই নয়, যারা এসে বসলো গদিতে, সেই 'লঘুজন'দের কাছে মৌন হয়ে থাকতে হয়ে। ইতিহাসের শিক্ষা হয়তো এই নিয়মেই চলে। কিন্তু নির্মলের মায়ের দল নিহত হলো মধ্যবর্তী যুদ্ধে।

অতএব তখন তাঁর ক্ষমতায় ওই 'দিদি' ডাকটুকু ছাড়া আর কিছু কুলোতো না। আর এখন—নাঃ, এখনের কথা থাক।

তখন দিদি সেদিকে তাকালেন না।

দিদি বললেন, 'দুধ চড়িয়ে আসোনি তো ছোটবৌ ?'

ছোটবৌ মাথা নাড়লেন।

ছোটবৌ পারুলের দিকে তাকাতে পারছিলেন না বলে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পারুল বললো, 'আমারই ভুল হয়েছিল জেঠাইমা, এভাবে বললে আপনি খেয়াল করতে পারবেন না সেটা খেয়াল করতে পারিনি। স্পষ্ট করেই বলি—নির্মলদার সঙ্গে বকুলের বিয়ের কথা বলতেই আমার আসা। অনেক বড় হয়ে গেছে বকুল। নির্মলদাও তো কাজকর্ম করছে—'

জেঠাইমা পারুলকে সব কথাগুলো বলে নেবার সময় দিয়েছিলেন। তারপর, সবটা শোনার পর মুখে একটি কুটিল হাসি ফুটিয়ে বলেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, তা দেখছি সে বিশ্বাস ভুল। সাহেব বরের ঘর করে মেমসাহেব বনে গিয়েছো। নির্মলের সঙ্গে বকুলের বিয়ে ? পাগল ছাড়া এ প্রস্তাব আর কেউ করবে না পারু !'

'কিন্তু কেন বলুন তো?' পারুল শেষ চেষ্টাটা করেছিল, হেসে বলেছিল, 'আপনাদের ওই রাঢ়ী-বারেন্দ্র গাঁইগোত্র ? ওসব আর আজকাল ততো মানে না।'

জেঠাইমা সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'আমরা আজকালের নই পারু।'

নির্মলের মা এই সময় একটা কথা বলে ফেলেছিলেন। অস্ফুটেই বলেছিলেন অবশ্য, 'পারুর বাবাদের ঘর তো আমাদের উঁচু দিদি !'

জেঠাইমা ছোট জায়ের দিকে একটি কঠোর ভর্ৎসনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'তুমি থাম ছোটবৌ ! উঁচু-নীচুর কথা নয়, কথাটা রীতিনীতির। যাকগে, অলীক কথা নিয়ে বৃথা গালগল্প করবার সময় আমার নেই পারু। তাছাড়া তোমার ওই ধিঙ্গী অবতার বোনটি স্বঘরের হলেও আমি ঘরের বৌ করতাম না বাছা, তা বলে রাখছি। একটা পরপুরুষ বেটাছেলের সঙ্গে যখন তখন ফুসফুস গুজগুজ, তাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা, এসব মেয়েকে আমরা ভাল বলি না।'

পারুলের মুখটা যে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সেটা পারুল নিজে নিজেই অনুভব করেছিল, এবং আর একটি কথাও যে বলবার ক্ষমতা ছিল না তার তখন তাও বুঝেছিল। পারুল নিঃশব্দে উঠে এসেছিল।

তবু বেচারা পারুল তার একান্ত স্নেহপাত্রটির জন্যে আরও কষ্ট করেছিল। গলির মোড়ে নির্মলকে ধরেছিল। বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে নির্মলদা!'

নির্মল থতমত খেয়ে বললো, 'কী কথা?'

'পথে দাঁড়িয়ে হবে না সে-কথা, এসো একবার।'

'আচ্ছা আগে দেখ, আমাদের জানলায় কেউ আছে কিনা?'

পারুল নিষ্পলকে ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'থাকলে কী হয়?'

ওই দৃষ্টিতে বোধ করি অপ্রতিভ হয়েছিল নির্মল। বলেছিল, 'না, হবে আর কি? তবে জেঠিমাকে তো জানো! দেখতে পেলেই এখুনি জিজ্ঞেস করতে বসবেন, কেন, কী বৃত্তান্ত, ওখানে কী কাজ তোর?'

পারুলের মুখে একটু হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল। পারুল আস্তে আস্তে বলেছিল, 'থাক, আর কোন কথা নেই তোমার সঙ্গে। কথা আমার হয়ে গেছে।'

নির্মল কোঁচার খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে অবাক গলায় বলেছিল, 'কথা হয়ে গেছে? কোন্ কথা?'

পারুল একটু বিচিত্র হাসি হেসে বলেছিল, 'তুমিও দেখছি তোমার জেঠাইমার মত। বিশদ করে না বললে একটুও বুঝতে পারো না। যাক—তাই বলি—বলছিলাম, বাড়ির অমতে বিয়ে করবার সাহস আছে তোমার? অথবা বাড়ির অমতকে স্বমতে আনবার শক্তি?'

নির্মল মাথা নীচু করেছিল।

নির্মল অকারণেই আবার কপালের ঘাম মুছেছিল। তারপর অস্ফুটে বলেছিল, 'তা কী করে হয়?'

'হয় না, না?'

নির্মল আবেগরুদ্ধ গলায় বলে উঠেছিল, 'শুধু মা-বাবা হলে হয়তো আটকাতো না পারুল, কিন্তু জেঠাইমা—? ওঃ, ওঁকে রাজী করানো অসম্ভব!'

'তা অসম্ভবই যখন, তখন আর বলবার কি আছে?' পারুল হেসে উঠে বলেছিল, 'যাও, আর তোমায় আটকাবো না। জেঠাইমা হয়তো তোমার দুধ গরম করে নিয়ে বসে আছেন!'

নির্মলের মুখটাও লাল হয়ে উঠেছিল।

আর বড় বেশী ফর্সা রং বলে খুব বেশী প্রকট হয়ে উঠেছিল।

নির্মল বলেছিল, 'তুমি আমায় ঠাট্টা করছো পারুল, কিন্তু ওঁদের অবাধ্য হবো, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

'ওঁদের বলছো কেন? তোমার মা-বাবার তো অমত নেই।'

'তাতে কোন ফল নেই পারুল। জেঠাইমার ওপর কথা কইবার ক্ষমতা কারুর নেই।'

'ওরে বাবা, তা'হলে তো আমারও কোনো কথাই নেই—', পারুল হঠাৎ খুব কৌতুকের গলায় হেসে উঠেছিল।

বলেছিল, 'কিন্তু একটা বড় ভুল করে ফেলেছিলে ভাই, জেঠাইমার কাছে অনুমতি না নিয়ে পাড়ার মেয়ের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করা ঠিক হয়নি! তা'হলে সে মেয়েটা মরতো না!'

'আমিও বেঁচে নেই পারুল—', হঠাৎ নির্মলের চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কোঁচার কাপড় দিয়ে সেই জলটুকু মুছতে মুছতে চলে গিয়েছিল নির্মল, 'আমার মনের অবস্থা বোঝবার ক্ষমতা তোমাদের কারুরই নেই পারুল!'

পারুলের কি সেই দিকে তাকিয়ে মমতা হয়েছিল ?

না।

পারুল বড় নির্মম।

পারুলের ঘৃণা হয়েছিল। পারুল বলেছিল, 'মাটির পুতুল।'

কিন্তু বকুলের মনে ওই মাটির পুতুলটার জন্যে অনেকখানি মমতা ছিল। সুষমায় মোড়া সেই মমতাটুকু বকুলের কোনো একখানে রয়ে গেছে।

॥ ১১ ॥

পারুল বরের কাছে যাবার সময় বলে গিয়েছিল, 'বুঝতে পারিনি, স্রেফ একটা মাটির পুতুলকে হৃদয় দান করে বসে আছিস তুই। না বুঝে তোর ভাল করতে গিয়ে শুধু "ছোট"ই করলাম তোকে।'

বকুল বলেছিল, ' "ছোট হলাম না" ভাবলে আর কে ছোট করতে পারে সেজদি ?'

পারুল বললো, 'ওটা তত্ত্বকথা। ও দিয়ে শুধু মনকে চোখ ঠারা যায়। ভেবে দুঃখ হচ্ছে, এমন ছাই প্রেম করলি যে একটা মাটির গণেশকে তার জেঠির আঁচল-তলা থেকে টেনে বার করে আনতে পারলি না !'

বকুল বলেছিল, 'থাম সেজদি ! বাবার মতই বলি, "জীবনটা নাটক নভেল নয়" ।'

কিন্তু কথাটা কি বকুল সত্যি প্রাণ থেকে বলেছিল? বকুলের সেই অপাত্রে দান করে বসা হৃদয়টা কি নাটক-নভেলের নায়িকাদের মতই বেদনায় নীল হয়ে যায়নি ? যায়নি যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে?

গভীর রাত্রিতে সারা বাড়ি যখন ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে যেতো, তখন বকুল জেগে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করতো না কি ও-বাড়ির তিনতলার ঘরটায় এখনো আলো জ্বলছে, না অন্ধকার ?

না, ওই আলো-অন্ধকারের মধ্যে কোনো লাভ-লোকসান ছিল না বকুলের, তবু বকুলের ওই আলোটা ভালো লাগতো। বকুলের ভাবতে ভালো লাগতো, ওই তিনতলার মানুষটাও ঘুমোতে পারছে না, ও জেগে জেগে বকুলের কথা ভাবছে। এ ভাবনাটা নভেলের নায়িকাদের মতই নয় কি ?

এ ছাড়াও অনেক সব অবাস্তব কল্পনা করতো বকুল।

যেমন হঠাৎ একদিন বিনা অসুখে মারা গেল বকুল. বাড়িতে কান্নাকাটি শোরগোল! 'ও-বাড়ি' এই আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে নিষেধবাণী ভুলে ছুটে চলে এলো এ-বাড়িতে, এসে শুনলো ডাক্তার বলেছে, 'মানসিক আঘাতে হার্ট দুর্বল হয়ে গিয়ে হার্টফেল করেছে—'

সেই কথা শুনে মাটির পুতুলের মধ্যে উঠতো দুরন্ত প্রাণের চেতনা, শূন্যে মাথা ঠুকে ঠুকে ভাবতো সে, 'কী মূর্খ আমি, কী মূঢ়!'

হ্যাঁ, বিনিদ্র রাত্রির দুর্বলতায় এই রকম এক-একটা নেহাৎ কাঁচা লেখকের লেখা গল্পের মত গল্প রচনা করতো বকুল, কিন্তু বেশী দিন নয়, খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই ও-বাড়িতে অনেক আলো জ্বললো একদিন—ওই তিনতলার ঘরটায় সারা-রাত্রি ধরে অনেক আলো ঝলসালো, সেই আলোয় আত্মস্থ হয়ে গেল বকুল।

আর—আর ওই কাঁচা গল্পগুলো দেখে নিজেরই দারুণ হাসি পেলো তার।

ভাবলো ভাগ্যিস মনে মনে লেখা গল্পের খবর কেউ জানতে পারে না!

কিন্তু বকুল কি ওই আলোটা শুধু নিজের ঘরে বসেই দেখলো? বকুল ওই আলোর নদীতে একবার ঘট ডোবাতে গেল না? তা তাও গেল বৈকি! বকুল তো নাটক-নভেলের নায়িকা নয়!

নির্মলের বাবা নিজে এসেছিলেন লাল চিঠি হাতে করে। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন বকুলের বাবার কাছে, 'আমার এই প্রথম কাজ দাদা, সবাইকে যেতে হবে, দাঁড়িয়ে থেকে তদ্বির করে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। না না, "শরীর খারাপ" বলে এড়াতে চাইলে চলবে না। কোনো ওজর-আপত্তি শুনবো না: বৌমাদের ডেকে আমার হয়ে বলুন, ও-বাড়ির কাকা বলে যাচ্ছেন, গায়েহলুদের দিন আর বৌভাতের দিন, এই দুটি দিন এ বাড়িতে উনুন জ্বলবে না। ছেলেপুলে সবাই ও-বাড়িতেই চা-জলখাবার, খাওয়াদাওয়া—'

বকুলের বাবা বলেছিলেন, 'যাবে যাবে, ছেলেরা বৌমারা যাবে।'

'শুধু ছেলেরা বৌমারা নয় দাদা', নির্মলের বাবা নির্বেদ সহকারে বলেছিলেন, 'নাতি-নাতনী সবাইকে নিয়ে আপনাকেও যেতে হবে। আর নির্মলের মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন বকুল যেন নিশ্চয় যায়। তার ওপর তিনি অনেক কাজের ভরসা রাখেন।'

হয়তো বকুলের যাওয়া সম্পর্কে ওঁদের একটা সন্দেহ ছিল, তাই এভাবে 'বিশেষ' করে বলেছিলেন বকুলকে।

বকুলের বাবা প্রবোধবাবু এই সময় তাঁর বাতের ব্যথা ভুলে সোজা হয়ে বসে বলেছিলেন, 'বৌমাকে বোলো ভাই, বকুলের কথা আমি বলতে পারছি না, বয়স্থা কুমারী মেয়ে, বুঝতেই পারছো পাঁচজনের সামনে একটা লজ্জা—'

তা বকুলদের আমলে বাস্তবিকই ওতে লজ্জা ছিল। বয়স্থা কুমারী মেয়েকে চোরের অধিক লুকিয়ে থাকতে হত। প্রবোধবাবু বাহুল্য কিছু বলেননি। কিন্তু নির্মলের বাবা সেটা উড়িয়ে দিলেন। হয়তো মেয়েটাকে তাঁরা বিশেষ একটু স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখতেন বলেই মমতার বশে ওর সঙ্গেকার সম্পর্কটা সহজ করে নিতে চাইলেন। বললেন, 'এ তো একই বাড়ি দাদা, বাড়িতে বিয়ে হলে কী করতো বলুন?'

বকুলের বাবা অনিচ্ছের গলায় বললেন, 'আচ্ছা বলবো।'

নির্মলের বাবা বললেন, 'তাছাড়া ওর খুড়ির আর একটি আবদার আছে, সেটিও বলে যাবো। ওর খুড়ি কাজকর্মে বেরোতে পারছে না, পরে আসবে, তবে সময় থাকতে বলে রাখতে বলেছে। ডাকুন না একবার বকুলকে। অনেকদিন দেখা-টেখা হয়নি, নইলে আরো আগেই বলতেন। তা ছাড়া—বিয়েটা তো হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল।'

বকুলের বাবা এতো আত্মীয়তাতেও খুব বেশী বিগলিত হলেন না, প্রায় অনমনীয় গলায় বললেন, 'বাড়ির মধ্যে কাজকর্মে আছে বোধ হয়, ব্যাপারটা কী?'

ব্যাপারটা তখন খুলে বললেন নির্মলের বাবা।

নির্মলের মা বকুলের কাছে আবেদন জানিয়েছে, বকুল যেন তাঁর ছেলের বিয়েতে তাঁর নামে একটি 'প্রীতি উপহার' লিখে দেয়।

বকুলের বাবার কপাল কুঁচকে গিয়ে আর সোজা হতে চায় না, 'কী লিখে দেবে?'

'প্রীতি উপহার, মানে আর কি পদ্য। বিয়েতে পদ্যটদ্য ছাপায় না? সেই

আর কি।'

বকুলের বাবা ভুরু কুঁচকে বিস্ময়-বিরস কণ্ঠে বলেন, 'বকুল আবার পদ্য লিখতে শিখলো কবে?'

নির্মলের বাবা বিগলিত হাস্যে বলেন, 'কবে! ছেলেবেলা থেকেই তো লেখে। কেন, ওর পদ্য তো ম্যাগাজিনে ছাপাও হয়েছে, দেখেননি আপনি? লজ্জা করে দেখায়নি বোধ হয়। ওর ও-বাড়ির খুড়ি দেখেছে। বলে তো খুব ভালো। তা সেই জন্যেই একটি 'প্রীতি উপহারে'র অর্ডার দিতে আসা। ডাকুন একবার নিজে মুখে বলে যাই।'

ওষুধ-গেলা মুখে মেয়েকে ডেকে পাঠান প্রবোধচন্দ্র। বলেন, 'তুমি নাকি পদ্য লেখো?'

বকুল শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

ও-বাড়ির কাকাই বা এ-বাড়িতে কেন, আর তাঁর সামনে এ কথাই বা কেন?

তা 'কেন' যে সেটা টের পেতে দেরি হল না। নির্মলের বাবা তড়বড় করে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন।

বকুল নভেলের নায়িকা নয়, তবু বকুলের পায়ের তলার মাটি সরে যায়নি কি? বকুলের কি মনে হয়নি, কাকীমা কি সত্যিই অবোধ, না নিতান্তই নিষ্ঠুর? বকুলের সমস্ত সত্তা কি একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়নি এই নির্মম চক্রান্তের বিরুদ্ধে?

কেন? কেন? কেন তাকে যেতে হবে নির্মলের বিয়ে দেখতে? কেন তাকে নির্মলের বিয়ের পদ্য লিখতে হবে? উপন্যাসের নায়িকা না হলেও, একথা কি ভাবেনি বকুল? মানুষের এই নিষ্ঠুরতায় বকুল কি ফেটে পড়তে চায়নি?

হয়তো সবই হয়েছিল, তবু বকুল অস্ফুটে বললো, 'আচ্ছা।'

'আপনার বকুলের মত মেয়ে এ যুগে হয় না দাদা,' নির্মলের বাবা হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'ওর খুড়ি তো সুখ্যাতি করতে করতে—'

বকুলের ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'আপনি থামবেন?'

কিন্তু বকুলের শরীরের ভিতরটা থরথর করা ছাড়া আর কিছু হল না।

নির্মলের বাবা হৃষ্টচিত্তে চলে গেলেন আরো একবার 'সবাই মিলে নেমতন্ন খাবার' জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে। হয়তো ওই মানুষটা সত্যিই অজ্ঞ অবোধ। কারণ নির্মলের মা পারুলের প্রস্তাবের কথাটুকু ছাড়া আর কিছুই বলেননি তাঁকে। কী-ই বা বলবেন? বকুল আর নির্মলের ভালবাসার কথা? তাই কি বলা যায়?

চলে যাবার পর ফেটে পড়েছিলেন প্রবোধচন্দ্র। বলেছিলেন, 'অমনি বলে দিলি "আচ্ছা"! লজ্জা করলো না তোর হারামজাদি?'

বকুল বলেছিল, 'ওঁদের যদি চাইতে লজ্জা না করে থাকে, আমার কেন দিতে লজ্জা করবে বাবা?'

'এই সেদিন অত বড় অপমানটা করলো ওরা—'

'অপমান মনে করলেই অপমান—,' বকুল সে-যুগের মেয়ে হলেও বাপের সঙ্গে খোলাখুলি কথা কয়েছিল, 'বিয়ের মত মেয়ে-ছেলে থাকলেই লোকে "সম্বন্ধ" করতে চেষ্টা করে, করলেই কি সব জায়গায় হয়? তা বলে সেটা না হলে তারা শত্রু হয়ে যাবে?'

প্রবোধচন্দ্র এই রকম উন্মুক্ত কথায় থতমত খেয়ে বলেছিলেন, 'তুমি পারলেই হল। পারুলবালা তো অনেক রকম কথা বলে গেলেন কিনা—।'

'সেজদির কথা বাদ দিন।' বলে সব কথায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিল বকুল।

হ্যাঁ, তারপর 'স্নেহের সুনির্মলের শুভ বিবাহে স্নেহ উপহার' লিখে দিয়েছিল বকুল নির্মলের মার নাম দিয়ে। সে পদ্য পড়ে ধন্যি ধন্যি করেছিল সবাই। নির্মলের মা বলেছিলেন, 'আমি তো তোকে কিচ্ছু বলে দিইনি বাছা, তবু আমার মনের কথাগুলি সব কি করে বুঝে নিলি মা? কি করেই বা অমন মনের মত লিখলি?'

বকুল শুধু হেসেছিল।

নির্মলের মার চোখ দিয়ে হঠাৎ জল পড়েছিল, তিনি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, 'ভগবানের কাছে তোর জন্যে প্রার্থনা করি মা, তোর যেন রাজা বর হয়!'

শুনে বকুল আর একটু হেসেছিল।

সেই হাসিটাকে স্মরণ করে অনামিকা দেবীও এতোদিন পরে একটু হাসলেন। নির্মলের মার সেই আশীর্বাদটা স্রেফ অকেজো হয়ে পড়ে থেকেছে।

নির্মলের মা ছলছল চোখে আবারও বলেছিলেন, 'তোর জন্য ভগবান অনেক ভাল রেখেছেন, অনেক ভাল।'

'তা এ ভবিষ্যদ্বাণীটা হয়ত ভুল হয়নি তাঁর। বকুল হয়তো অনেক ভালোই পেয়েছে, অনেক ভালো—,' ভাবলেন অনামিকা দেবী।

... ...

বকুল বৌ দেখতে তিনতলায় উঠে গিয়েছিল। বকুল আর সেদিন জেঠাইমার তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করেনি। বকুল বৌ দেখেছিল, নেমন্তন্ন খেয়েছিল, মেয়েদের দিকে পরিবেশনও করেছিল। আবার পরদিন নির্মলের মার কাছে বসে বউয়ের 'মুখ-দেখানি গহনা' টাকা জিনিসপত্রের হিসাব লিখে দিয়েছিল।

সেই সূত্রে অদ্ভুত একটা হৃদ্যতা হয়ে গেল নির্মলের বৌয়ের সঙ্গে। ব্যাপারটা অদ্ভুত বৈকি। এমন ঘটে না। তবু কিছু কিছু অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে জগতে মাঝে মাঝে।

হিসেব মেলানোর কাজ হচ্ছিল, বৌ অদূরে ঘোমটা ঢাকা হয়ে বসে বসে ঘামছিল, শাশুড়ীর উপস্থিতিতে কোন কথা বলেনি। কি একটা কাজে তিনি উঠে যেতে, ঘোমটা নামিয়ে মৃদু অথচ পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, 'নেমন্তন্ন খেতে এসে এতো খাটছো কেন?'

বকুল এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই একটু চমকালো। ভাবলো—বৌ আমায় চিনলে কি করে? তারপর আবার ভাবলো, এ প্রশ্নের অর্থ কি? বড় জেঠির কাছে তালিম নিয়ে যুদ্ধে নামলো নাকি বকুলের সঙ্গে?

হ্যাঁ, এই ধরনের একটা সন্দেহ মুহূর্তে কঠিন করে তুলেছিল বকুলকে। বকুল তাই নিজেও যুদ্ধে নামতে চাইল। স্থির আর শক্ত গলায় বললো, 'আমার সঙ্গে যে শুধু নেমন্তন্ন খাওয়ারই সম্পর্ক এ কথা আপনাকে কে বললো?'

বৌ চোখ তুলে তাকিয়েছিল।

দীর্ঘ পল্লবাচ্ছাদিত গভীর কালো দুটি চোখ।

নির্মলের বৌ খুব সুন্দরী হচ্ছে এ কথা আগে থেকেই শুনেছিল বকুল। বৌ আসার পর দেখে বুঝেও ছিল। 'ধন্যি-ধন্যি'টাও কানে এসেছিল, তবু ঠিক ওই মুহূর্তটার আগে বুঝি অনুধাবন করতে পারেনি সেই সৌন্দর্যটি কী মোহময়! ওই গভীর চোখের ব্যঞ্জনাময় চাহনির মধ্যে যেন অনেক কিছু লুকানো ছিল, ছিল অনেকখানি হৃদয়। যে দিকটার কথা এ পর্যন্ত আদৌ চিন্তা করেনি বকুল।

'নির্মলের বৌ' শব্দটাকে বকুল যেন অবজ্ঞা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই বসেছিল।

চেতনে না হোক, অবচেতনে।

কিন্তু বৌ বকুলের দিকে ভালবাসার ভর্ৎসনায় ভরা দুটি চোখ তুলে ধরলো। বকুল প্রতিজ্ঞার জোরটা যেন হারাতে বসলো।

বৌ 'মাধুরী' সেই চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বললো, 'আমি তো তোমায় "তুমি" করে বললাম ভাই, তুমি কেন "আপনি" করছো?'

খুড়িমা ঘরে নেই, মুখোমুখি শুধু তারা দুজনে—বকুল লজ্জা ত্যাগ করলো। বললো, 'তা করবো না? বাবা! আমি হলাম তুচ্ছ একটা পাড়ার মেয়ে, আর আপনি হচ্ছেন একজন মান্যগণ্য মহিলা। এ বাড়ির বড় বৌ।'

বকুলের কণ্ঠস্বরে কি ক্ষোভ ছিল?

অথবা তিক্ততা?

হয়তো ছিল।

কিন্তু বৌ তার পাল্টা জবাব দিল না। সে এ কথার উত্তরে হাত বাড়িয়ে বকুলের একটা হাত চেপে ধরে ভালবাসার গলায় বলে উঠলো, 'যতই চেষ্টা কর না কেন, তুমি আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না ভাই। আমি জানি তুমি খুব কাছের মানুষ, খুব নিকটজন।'

বকুল একটু অবাক হয়েছিল বৈকি।

এটা তো ঠিক জেঠিমার তালিম বলে মনে হচ্ছে না? তবে কী এটা?

বকুলের গলার স্বর থেকে বোধ করি তার অজ্ঞাতসারেই ক্ষোভ আর তিক্ততাটা ঝরে পড়ে গিয়েছিল। বকুল যেন ঈষৎ কৌতুকের গলায় বলেছিল, 'বেশ, না হয় "তুমিই" বললাম, কিন্তু আমি খুব নিকটজন, এমন অদ্ভুত খবরটি তোমায় দিল কে?'

মাধুরী-বৌ খুব মিষ্টি একটা হেসে বলেছিল, 'যে দেবার সে-ই দিয়েছে। সব কথাই বলেছে কাল আমায়।'

মুহূর্তে আবার কঠিন হয়ে উঠেছিল বকুল, রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গিয়েছিল তার।

ওঃ, ফুলশয্যার রাত্রেই বৌয়ের কাছে হৃদয় উজাড় করা হয়েছে! না জানি নিজের গা বাঁচিয়ে আর বকুলকে অপমানের সমুদ্রে ডুবিয়ে কতো কৌশলেই করা হয়েছে সেটি!

নির্মল এমন!

নির্মল এতো নীচ, অসার, ক্ষুদ্র! অথবা তা নয়, একেবারে নির্বোধ মুখ্যু!

ভেবেছে কানাঘুষোয় কিছু যদি শুনে ফেলে বৌ, আগে থেকে সাফাই হয়ে থাকি। সেটা যে হয় না, সে জ্ঞান পর্যন্ত নেই।

বকুল অতএব কঠিন হয়েছিল।

রূক্ষ গলায় বলেছিল, 'সব কথাই বলেছে? এক রাত্তিরেই এতো ভাব? তা কি কি বলেছে? আমি তোমার বরের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে মরে পড়ে আছি? তার জন্যে আমার জীবন ব্যর্থ, পৃথিবী অর্থহীন? এই সব? তাই করুণা করছো?'

বলেছিল।

আশ্চর্য! বকুলের মুখ থেকেও এমন কুশ্রী কথাগুলো বেরিয়েছিল সেদিন। বকুলের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল যেন।

কিন্তু মাধুরী-বৌ এই রূক্ষতার, এই কটূক্তির উচিত জবাব দিল না। সে শুধু তার সেই বড় বড় চোখ দুটিতে গভীরতা ভরে উত্তর দিল, 'না, তা বলবো কেন? সে নিজেই ভালবাসায় মরে আছে, সেই কথাই বলেছে।'

'বাঃ, চমৎকার!' বকুল কড়া গলায় হেসে উঠেছিল, 'সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির! তা যাক, তুমি সেই মরা মানুষটাকে বাঁচাবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছো অবিশ্যি? অতএব নিশ্চিন্দি!'

কথাগুলো কে বলেছিল?

বকুল, না বকুলের ঘাড়ে হঠাৎ ভর-করা কোনো ভূত? হয়তো তাই। নইলে জীবনে আর কবে বকুল অমন অসভ্য কথা বলেছে? তার আগে? তার পরে?

মাধুরী-বৌ তবুও শান্ত গলায় বলেছিল, 'আমি তো পাগল নই যে তেমন প্রতিজ্ঞা নেবো। তোমাকে ও কখনো ভুলতে পারবে না।'

বৌয়ের মুখে এমন একটি নিশ্চিত প্রত্যয়ের আভা ছিল যে, তাকে ব্যঙ্গ করা যায় না।

বকুল অবাক হয়েছিল।

মেয়েটা কী?

অবোধ? না শিশু?

ন্যাকা ভাবপ্রবণ বরের ওই গদগদ স্বীকারোক্তি হজম করে এমন অমলিন মুখে আলোচনা করছে সেই প্রসঙ্গ! তবে কি সাংঘাতিক ধড়িবাজ? কথা ফেলে কথা আদায় করতে চায়? এই সরলতা সেই কথার রুই টেনে তোলবার 'চার'?

ঠিক এই ভাষাভঙ্গীতে না হলেও, এই ভাবের কিছু একটা ভেবেছিল বকুল সেদিন প্রথমটায়!

কিন্তু তারপর বকুল সেই দেবীর মত মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছিল, তাকিয়ে দেখেছিল সেই দীর্ঘ পল্লবাচ্ছাদিত কালো কালো বড় বড় চোখের দিকে, আর দেখে যেন লজ্জায় মরে গিয়েছিল। বকুল বুঝেছিল, এ এক অন্য জাতের মেয়ে, সংসারের সাধারণ মাপকাঠিতে মাপা যাবে না একে।

বকুলের ভিতর একটা বোবা দাহ বকুলকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিচ্ছিল, বাইরে ভদ্রতা আর অহঙ্কার বজায় রাখতে রাখতে বকুল কষ্টে মরে যাচ্ছিল, কিন্তু মাধুরী বৌয়ের ওই জ্বালাহীন ঈর্ষাহীন পবিত্র সরলতার ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে বকুল নিজের চিত্তদৈন্যে মরমে মরলো।

বকুলের সেই দাহটাও বুঝি কিছুটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। বকুল সহজ কৌতুকের গলায় বললো, 'তুমি তো আচ্ছা বোকা মেয়ে! তোমার বর এমন একখানা পরমা সুন্দরী বৌকে ঘরে এনে পাড়ার একটা কালো-কোলো মেয়েকে হৃদয়ে চিরস্মরণীয় করে দেবে, আর তুমি সে ঘটনা সহ্য করবে?'

'কালো-কোলো?' বৌ একটু হাসে, 'তোমার খুব বিনয়।' তারপর হাসিমুখেই বলে, 'বাইরের রূপটাই তো সব নয়!'

বকুলই এবার হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে। যাকে বলে করপল্লব। যেমন কোমল তেমনি মসৃণ! নির্মলটা জিতেছে সন্দেহ নেই। এ মেয়েকে দেখে বকুলই মুগ্ধ হচ্ছে।

বকুল সেই ধরা হাতটায় একটা গভীর চাপ দিয়ে বলে, 'তোমার বাইরের রূপও অতুলনীয়, ভেতরের রূপও অতুলনীয়।'

মাধুরী-বৌ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বলে, 'প্রথম ভালবাসার কাছে কোনো কিছুই লাগে না।'

বকুলের বুকটা কেঁপে ওঠে, বকুলের মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে আসে, নিজের সম্বন্ধে 'ভালবাসা' শব্দটা অপরের মুখে এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে এর আগে কি কোনোদিন শোনেনি বকুল? পারুল তো বলেছে কতো।

কিন্তু এ যেন অন্য কিছু, আর কিছু।

নির্মলের বিয়ের ব্যাপারের গোড়া থেকে নিজেকে কেবলই অপমানিত মনে হয়েছে বকুলের, এখন হঠাৎ নিজেকে যেন অপরাধী মনে হলো। যেন বকুল নির্লজ্জের মত কারো ন্যায্য প্রাপ্যে ভাগ বসিয়ে রেখেছে। এখন বকুল নিজেকে সেই দাবিদারের থেকে অনেক তুচ্ছ ভাবছে।

ওই মেয়েটার কাছে বকুল শুধু রূপেই তুচ্ছ নয়, মহিমাতেও অনেক খাটো।

বকুল নিজেকে সেই 'তুচ্ছ'র দরেই দেখতে চেষ্টা করলো।

মাধুরী-বৌয়ের কথায় হেসে উঠে বললো, 'ওরে বাস্! খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে নির্মলদা তো দেখছি তোমার কাছে নিজের দর বাড়িয়ে ফেলেছে। ওসব হচ্ছে স্রেফ কল্পিত কল্পনার ব্যাপার, বুঝলে?'

'এটা তুমি লজ্জা করে বলছো—', মাধুরী-বৌ মৃদু হেসে বলে, 'মেয়েরা তো সহজে হার মানে না। পুরুষমানুষ মনের ব্যাপারে অতো শক্ত হতে পারে না। তা ছাড়া ও তো একেবারে—'

মাধুরী-বৌ নিজেই বোধ করি লজ্জায় চুপ করে গিয়েছিল।

বকুল সেই পরম সুন্দর মুখটার দিকে যেন মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইল। এই ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছে নির্মল নামের ছেলেটা?

বকুল কি নির্মলকে হিংসে করবে?

* * *

এ-যুগের কাছে কী হাস্যকরই ছিল সেকালের সেই জোলো-জোলো প্রেম ভালবাসা!

অনামিকা দেবী সেই 'বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসা আষাঢ়ে'র দিকে তাকিয়ে প্রায় হেসে উঠলেন।

এখনকার মেয়েরা যদি বকুলের কাহিনী শোনে, স্রেফ বলবে, শ্রীমতী বকুল-মালা, তোমাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা উচিত।

তুমি কিনা তোমার প্রেমপাত্তরের প্রিয়ার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে বসলে?

তার সেই রূপসী প্রিয়া যখন বললো, 'তোমার ওপর ঈর্ষা কেন হবে ভাই? ও তোমায় এতো ভালবাসে বলেই তো আমারও তোমাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে আমি "বন্ধু" পাতালাম আজ থেকে।'

তুমি তখন একেবারে বিগলিত হয়ে "বন্ধুত্বে"র শপথ নিয়ে বসলে। নির্মল নামের সেই ভাবপ্রবণ ছেলেটা না হয় প্রথম ঝোঁকে নতুন বৌয়ের কাছে 'অনেস্ট' হয়েছে, 'প্রথম ভালবাসা'র বড়াই করে কাব্যি করেছে, কিন্তু তুমি সেই ফাঁদে ধরা দিলে কী বলে?

বেশ তো বলছিলে, 'বেশী গল্প উপন্যাস পড়েই এই ঢং হয়েছে নির্মলদার, "দেবদাস" হতে ইচ্ছে হচ্ছে, "শেখর" হতে ইচ্ছে হচ্ছে, তাই তিলকে তাল করে তোমার কাছে "হীরো" হয়েছে!'

বেশ তো বলছিলে, 'এই সব আজেবাজে কতকগুলো কথা তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মলদার কী ইষ্টসিদ্ধি হল জানিনে বাবা! বাজে কথায় কান দিও না।'

বলেছিলে, 'সংসার জায়গাটা স্রেফ বাস্তব বুঝলে বৌঠাকরুণ, ওসব কাব্যি-টাব্যি চলে না। বিশেষ করে যেটা প্রবলপ্রতাপ শ্রীমতী জেঠিমার সংসার—'

তারপর—হঠাৎ তবে ওই মেয়েটার কোমল করপল্লবখানা হাতে ধরে স্তব্ধ

হয়ে বসে রইলে কেন অনেকখানি সময় ? কেন তারপর আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বন্ধুত্বই পাতালাম।'

তার মানে তোমার সব গর্ব ধূলিসাৎ হল, তুমি ধরা দিলে।

একটি সরল পবিত্রতা, একটি ভালবাসার হৃদয়, একটি হিংসাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, নির্মল মন অনেক কিছুই বদলে দিতে পারে বৈকি। সকল গর্ব চূর্ণ করে দিয়ে একেবারে জয় করে নিতে পারে সে।

বকুলও বিজিত হল।

মাধুরী নামের মেয়েটার ওই অদ্ভুত জীবনদর্শন বকুলকে আকৃষ্ট করলো, আবিষ্ট করলো।

'তোমার আর আমার দুজনেরই ভালবাসার পাত্র যখন একই লোক, তখন আমাদের মতো আপনজন আর কে আছে বল ভাই! তুমিও ওর মঙ্গল চাইবে, আমিও ওর মঙ্গল চাইবো, বিরোধ তবে আসবে কোন্‌খান দিয়ে?'

এই হচ্ছে মাধুরী-বৌয়ের জীবনদর্শন!

ষোল আনা অধিকারের দাবি নিয়ে রাজরাজেশ্বরী হয়ে এসে ঢুকেছিল সে, তবু বলেছিল, 'তোমার কাছে যে ভাই আমার অপরাধের শেষ নেই। সর্বদাই মনে হবে—বিনা দাবিতে জোর করে দখল করে বসে আছি আমি।'

বকুল হেসেছিল।

বলেছিল, 'তোমার মতন এরকম ধর্মনিষ্ঠ মহামানবী সংসারে দুচারটে থাকলে—সংসার স্বর্গ হয়ে যেতো ভাই বৌঠাকরুণ! নেই, তাই মর্তভূমি হয়ে পড়ে আছে!'

অবশ্য ঠিক সেই দিনই এতো কথা হয়নি। সেদিন শুধু স্তব্ধতার পালা ছিল।

দিনে দিনে কথা উঠেছে জমে।

তুচ্ছতার গ্লানি, বঞ্চনার দাহ, সব দূরে হয়ে গিয়ে মন উঠেছে অন্য এক অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরে। আর সেই ভরা মনে 'নির্মল' নামের মেরুদণ্ডহীন ছেলেটার উপর আর রাগ-বিরক্তি পুষে রাখতে পারেনি। খাড়া রাখতে পারেনি নিজের মধ্যেকার সেই ঔদাসীন্যের বোবা দেওয়ালটাকে, যেটাকে বকুল নির্মলের সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করতে চেষ্টা করে গেঁথেছিল। পারেনি, বরং মমতাই জমা হয়েছে তার জন্যে।

তবে সেদিন নয়।

যেদিন সেই মাধুরী-বৌয়ের হাতে হাত রেখে বন্ধুত্বের সংকল্প নিচ্ছিল, সেদিন দেওয়ালটাকে বরং বেশী মজবুত করার চেষ্টা করেছিল।

কাকীমা কোথায় যেন কোন কাজে ভেসে গিয়েছিলেন, একটু পরে নির্মল এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। নিজে থেকে আসবার সাহস হত না নির্মলের, কারণ এ ঘরে তার দু-দুটো 'অপরাধে'র বোঝা। অথবা দু-দুটো আতঙ্কের বস্তু। তাই ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল।

বকুল যদি দেখে নির্মল নতুন বৌয়ের ধারে-কাছে ঘুরঘুর করছে, নিশ্চয় বকুল ঘৃণায় ধিক্কারে ব্যঙ্গ-হাসি হেসে উঠবে। আর জেঠাইমা যদি দেখেন—হতভাগা গাধাটা বিয়ের পরও ওই পাজি মেয়েটার আনাচে-কানাচে ঘুরছে, রসাতল করে ছাড়বেন।

বৌয়ের কাছে ?

না, বৌয়ের জন্যে ভয় নেই নির্মলের! বৌয়ের কাছে তো নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করেছে সে।

বলেছে তার কাছে আবাল্যের ব্যাকুলতার ইতিহাস।

বলেছে, 'ওকে ভুলতে আমার সময় লাগবে, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো।'

বৌ তখন অদ্ভুত আশ্চর্য একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তুমি যদি ওকে ভুলে যাও, তাহলেই বরং তোমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। মনে করবো তুমি একটা অসার মানুষ।'

'তুমি আমার দুঃখ বুঝতে পারছো মাধুরী?'

চোখ দিয়ে জল পড়েছিল ওর।

মাধুরী বলেছিল, 'মানুষের প্রাণ থাকলেই মানুষের দুঃখু বোঝা যায়। তা আমাকে কি তোমার সেই রকম মনপ্রাণহীন পাষাণী মনে হচ্ছে?'

তারপর নির্মল কি বলেছিল, সে কথা অবশ্য বকুল জানে না।

কিন্তু এতো কথাই বা জানলো কি করে বকুল? বকুল কি আড়ি পাততে গিয়েছিল নির্মলের ঘরে? না, তেমন অসম্ভব ঘটনা ঘটেনি।

বলেছিল নির্মলই ম্লান বিষণ্ণ মুখে। নির্মলের মুখে তখন চাঁদের আলোর মত একটা স্নিগ্ধ আলোর আভাস ফুটে উঠেছিল। নির্মল তার ওই 'দেবীর মত মেয়ে' বৌয়ের মহিমান্বিত হৃদয়ের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হতে শুরু করেছে, নির্মল আস্তে আস্তে তার প্রেমে পড়তে শুরু করেছে তখন। আর নির্মল যেন তাই ব্যাকুল হয়ে বকুলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে নির্মল কতো নিরুপায়!

'এর থেকে যদি খুব দুষ্টু পাজি ঝগড়াটে একটা মেয়ে আমার বৌ হত!'

নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল নির্মল।

বকুল হেসে ফেলেছিল।

বকুল যেন তখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল নির্মলের চেয়ে।

নির্মলের বিয়েটাকে ঘিরে যতো সব ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনাগুলো যেন বকুলকে ঠেলে হঠাৎ একদিনে একটা দশক পার করে দিয়েছিল।

বকুলের বৌদিরা বলেছিল, 'ঢের বেহায়া মেয়ে দেখেছি বাবা, ছোট ঠাকুরঝির মত এমনটি আর দেখলাম না। নইলে ওই বিয়েতে নেমন্তন্ন যায়, পদ্য লিখে দেয়!'

বকুলের বাবা বলেছিলেন, 'যেতেই হবে! এতো কিসের চক্ষুলজ্জা? বলি এতো কিসের চক্ষুলজ্জা? বেশ তাই যদি হয়, "অসুখ করেছে" বলে বাড়িতে থাকলেই হত? অসুখের ওপর তো কথা নেই!'

বকুলের দাদারা বলেছিল, 'কি করবো, ও-বাড়ির কাকা নিজে এলেন তাই, তা নয়তো এক প্রাণীও যেতাম না। তবে ধারণা করিনি বকুল যাবে।'

বকুলের ভালবাসার ইতিহাস আন্দাজে অনুমানে সকলেই জানতো এবং রাগে ফুলতো, আর কেবলমাত্র 'বড় হওয়া'র অজুহাতটাকেই বড় করে তুলে ধরে তাকে শাসন করতো, কিন্তু উদ্‌ঘাটন করেনি কেউ। খোলাখুলি বলেনি কেউ। পারুলের ব্যর্থ চেষ্টাই সব উদ্‌ঘাটিত করে বসলো। পারুলের ব্যর্থতার পর সে চলে গেলে জেঠাইমা একদিন এ বাড়িতে এসে মিষ্ট মধুর বচনে অনেক যাচ্ছেতাই করে গেলেন, এবং বৌদের ওপর ভার দিয়ে গেলেন পরিবারের সুনাম রক্ষার।

বলে গেলেন, 'শাশুড়ী নেই, তোমাদেরই দায়। যতোদিন না বিয়ে দিতে পারছো, ননদকে চোখে চোখে রাখবার দায়িত্ব তোমাদেরই, আর স্বামী-শ্বশুরকে বলে বলে বিয়েটা দিয়ে ফেল চটপট। বয়সের তো গাছপাথর নেই আর।'

সে-কথা বকুলের কানে যায়নি তা নয়।

সেই কথার পর যে আবার কোনো মেয়ে সে বাড়িতে যায়, এ বৌদিরা ভাবতেই পারেনি।

অথচ বকুল গিয়েছিল।

হয়তো বকুল ওই জেঠাইমাকে ওদের বাড়ির প্রকৃত মালিক মনে করতো না। অথবা বকুল না গিয়ে থাকতে পারেনি।

বিয়ে করে ফিরে নির্মলের মুখটা কেমন দেখায় দেখতে বড় বেশী বাসনা হয়েছিল। কিন্তু বকুল উদাসীন থেকেছিল, বকুল নিষ্ঠুর হয়েছিল।

নির্মল যখন সেই ভোজবাড়ির গোলমালে একবার বকুলের নিতান্ত নিকটে এসে বদ্ধগভীর গলায় ডেকেছিল, 'বকুল!'

বকুল তখন ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, 'ওমা তুমি এখানে? দেখ গে তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এসে গেছে বোধ হয়! যাও যাও।'

নির্মল আরো সন্নিকটে এসে বলেছিল, 'বকুল, তুমি আমায় কী ভাবছো জানি না—'

বকুল কথা শেষ করতে দেয়নি।

বলে উঠেছিল, 'হঠাৎ আমি তোমায় কী ভাবছি, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে বসছো কেন? আর তোমার কথা নিয়ে আমিই বা ভাবতে বসবো কেন?'

'বকুল—'

'সব কিছুরই একটা সীমা আছে নির্মলদা,' বলে চলে গিয়েছিল বকুল।

আর তারপর থেকে যতোবারই নির্মল নিকটে আসবার চেষ্টা করেছে, বকুল সরে গেছে।

কিন্তু সেদিন ঘরে নতুন বৌ ছিল।

নির্মল ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যেন দেয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, 'মা বললেন, মা এখন আর আসতে পারবেন না, সব কিছু দেরাজে তুলে রাখতে।'

বকুল হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে বলেছিলো, 'শুনলে তো বৌ হুকুম? তা হলে রাখো তুলে, বরের একটু সাহায্য নিও বরং।' বলে নির্মলের পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল।

বকুলের সেই নিষ্ঠুরতা ভেবে আশ্চর্য লাগে অনামিকা দেবীর। অতো নির্মম হয়েছিল কি করে সেদিন বকুল? কোন্ পদগৌরবেই বা? নির্মলের বৌ তো বকুলের থেকে দশগুণ সুন্দরী, তার ওপর আবার অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে।

আর বকুল?

কিচ্ছু না। বকুল তো শুধু নির্মলের দেওয়া মর্যাদাতেই এতোখানি মূল্যবান। অথচ বকুল—

কিন্তু তারপর বদলে গেল বকুল।

নির্মলের বিয়ের পর জেঠাইমা বোধ করি নিশ্চিন্ত হয়েই কেদারবদরী গেলেন কিছু বান্ধবী জুটিয়ে। সেই পরম সুযোগে নির্মলের মা আর বৌ এ-বাড়ি ও-বাড়ি 'এক' করে তুললো। মাধুরী-বৌয়ের তো এই বাড়িটাই একটা বেড়াতে আসার জায়গা হল। নির্মলের মাও যেন একটা ভারী জাঁতার তলা থেকে বেরিয়ে এসে বেঁচেছিলেন দু'দিনের জন্যে।

এই মুক্তির মধ্যে মাধুরী-বৌ যেন বকুলকে এক নিবিড় বন্ধনে বেঁধে ফেললো। আর সেই সূত্রে নির্মলের সঙ্গে সম্পর্কটা হঠাৎ আশ্চর্য রকমের সহজ হয়ে গেল।

বকুল যেন মাধুরীরই বেশী আপন হয়ে উঠলো। বকুল যেন নির্মলের সঙ্গে ব্যবহারে শ্যালিকার ভূমিকা নিলো। প্রখর কৌতুকময়ী মুখরা শ্যালিকা।

হ্যাঁ, ওই সময়টা থেকেই একেবারে বদলে গিয়েছিল বকুল। এই কিছুদিন

আগেও কী ভীরু আর লাজুক ছিল সে। সেই ভীরু কুণ্ঠিত লাজুক কিশোরীর খোলস ভেঙে যেন আর একজন বেরিয়ে এসেছে। প্রখরা পূর্ণযৌবনা, অসমসাহসিকা।

নির্মল তার অসমসাহসিক কথাবার্তায় ভয় পেতো, অবাক হত আর বোধ করি আরও বেশী আকৃষ্ট হত। বকুল তখন ওকে ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছুরিতে বিঁধতো। মাধুরী-বৌ সেই কৌতুকে হাসতো, কৌতুক বোধ করতো।

... ...

কেদার-বদরী ঘুরে এসে জেঠাইমা দেখলেন সংসারের যে জায়গাটি থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন, সে জায়গাটি যেন আর নেই। যেন কে কখন তাঁর শূন্য সিংহাসনটা কোন দিকে ঠেলে সরিয়ে রেখে নিজেদের আসর বসিয়েছে। হয়তো এমনই হয় সংসারে।

কোনো শূন্য স্থানই শূন্য থাকে না।

সেখানে অন্য কিছু এসে দখল করে।

নির্মলের বৌ যেন জেঠশাশুড়ীর থেকে নিজের শাশুড়ীকেই প্রাধান্য দেয় বেশী, পুরনো ঝি চাকরগুলো পর্যন্ত যেন আর বড়মার ভয়ে তটস্থ হয় না। কেবলমাত্র নির্মলই ছিল আগের মূর্তিতে।

বড়মা এ দৃশ্য দর্শনে কোমর বেঁধে আবার নতুন করে লাগছিলেন, দুবা ওর 'শ্রীক্ষেত্র' ভাবটা দূর করতে চেষ্টিত হচ্ছিলেন, এই সময় মোতিহারিতে বদলি হয়ে গেল নির্মল।

মাধুরী-বৌ চলে গেল বরের সঙ্গে।

হয়তো সেটাই বকুলের প্রতি তার বিধাতার আশীর্বাদ। জেঠাইমা আবার নতুন করে কি কলঙ্ক তুলতেন বকুলের নামে কে জানে। কারণ একদিন বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করে গেলেন তিনি। বললেন, 'এ যুগে আর জাত যায় না বলে কি মেয়ের বিয়ে দেবে না ঠাকুরপো? মেয়েকে বসিয়ে রাখবে?"

প্রবোধচন্দ্র মাথা নীচু করে ছিলেন।

প্রবোধচন্দ্র কিছু বলতে পারেননি। তারপর উনি চলে যাওয়ার পর সব ঝাল ঝেড়েছিলেন বকুলের উপর।

যাক ওসব কথা।

এখন আর ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই। নির্মল তারপর অনেক দূরে চলে গেল।

মোতিহারীর মতো নয়, অনেক অনেক দূরে।

কিন্তু সে কবে?

বকুল তখন কোথায়?

তখন কি তার ওই 'বকুল' নামের খোলসটার মধ্যেই আবৃত ছিল সে?

না, তখন আর 'বকুল' নামের পরিচয়টুকুর মধ্যেই নিমগ্ন ছিল না সে। ছড়িয়ে পড়েছিল আর এক নতুন নামের স্বাক্ষরে। সেই নতুন নামটার ভেলায় চড়ে বেরিয়ে এসেছিল নালা থেকে নদীতে, ডোবা থেকে সমুদ্রে।

ক্রমশঃ সেই নতুন নামটাই পুরনো হয়ে গেছে, পরিচয়ের উপর শক্ত খোলসের মত এঁটে বসেছে। কিন্তু তখনও ততোটা বসেনি। তখন ওই নতুন নামটার ভেলাখানা যেন নিঃশব্দে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছে। ও যে 'বকুল' নামের নেহাত তুচ্ছ প্রাণীটাকে 'নাম' 'খ্যাতি' 'পরিচিতি'র ঘাটে ঘাটে পৌঁছে নিয়ে যাবে, এমন কোনো প্রতিশ্রুতিও বহন করে আনেনি। বরং বেশ কিছু অপ্রীতিকর অথচ কৌতুকবহ ঘটনাই

ঘটিয়েছিল।

তার মধ্যে সর্বপ্রথম ঘটনা হচ্ছে সেই নামে একটা খামের চিঠি আসা।

চিঠিখানা পড়েছিল প্রবোধচন্দ্রের হাতে। কারণ প্রবোধচন্দ্র সর্বদাই বাইরের দিকের ঘরে সমাসীন থাকেন, রাত্রে ছাড়া দোতলায় ওঠেন না। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয়। পথে বেরোনোও তো প্রায় বন্ধ!

রোগী সেজে-সেজেও আরো নিজের পথে নিজে কাঁটা দিয়ে রেখেছেন প্রবোধচন্দ্র। ছেলেমেয়েরা যদি কোনো সময় বলেছে, 'বাবা, সর্বদা আপনি এই একতলার চাপা ঘরখানায় বসে থাকেন, একটুখানি বাইরে বেড়িয়ে আসতেও তো পারেন—'

প্রবোধচন্দ্র ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনায় তাদের ধিক্কৃত করেছেন, 'বেড়িয়ে? বেড়িয়ে আসবার ক্ষমতা থাকলে আমি সর্বদা এই কুয়োর ব্যাঙের মত এখানে পড়ে থাকতাম? ...তোমরা বলবে তবে বেরবো এই অপেক্ষায়? আমার প্রাণ হাঁপায় না?...কী করবো, ভগবান যে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। তোমরা বিশ্বাস না করো, ভগবান জানছে আমার দেহের মধ্যে কী হচ্ছে! হাত-পা তুলতে কাঁপে, চোখে অন্ধকার দেখি', ইত্যাদি ইত্যাদি...

অতএব প্রবোধচন্দ্র ওই কুয়োর ব্যাঙের মতই মলিন শতরঞ্চপাতা একখানা চৌকিতেই দেহভার অর্পণ করে বসে বসে হিসেব রাখেন, কে কখন বেরোয়, কে কখন ফেরে, গোয়ালা কতটা দুধ নিয়ে যায়, ধোবা ক'কুড়ি কাপড়ের মোটের লেনদেন করে, পিয়ন কার কার নামে কখানা চিঠি আনে।

চিঠিগুলি অবশ্য সব থেকে আকর্ষণীয়।

পিয়নের হাত থেকে সাগ্রহে প্রায় টেনে নিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেগুলি বেশ কিছু-ক্ষণের জন্য নিজের কাছেই রাখেন, চট্ করে যার জিনিস তাকে ডেকে দিয়ে দেন না। এমন কি সে ব্যক্তি কোনো কারণে ঘরে এসে পড়লেও, তখনকার মত চট্ করে বালিশের তলায় গুঁজে রেখে দেন।

কেন?

তা প্রবোধচন্দ্র নিজেও বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। হয়তো তাঁর সৃষ্টিকর্তা বললেও বলতে পারেন। তবে প্রবোধচন্দ্র জানেন, যে, চিঠি যার নামেই আসুক, পোস্টকার্ডগুলি পড়ে ফেলা তাঁর কর্তব্য, এবং খামের চিঠির নাম ঠিকানার অংশটুকু বার বার পড়ে পড়ে আন্দাজ করে নেওয়া কার কাছ থেকে এসেছে। এটা তিনি রীতিমত দরকার মনে করে থাকেন।

বেশীর ভাগ চিঠিই অবশ্য বৌমাদের বাপের বাড়ি থেকে আসে, হাতের লেখাটা অনুমান করতে ভুরু কুঁচকে কুঁচকে বার বার দেখতে থাকেন প্রবোধচন্দ্র, এবং স্মরণ করতে থাকেন এই হস্তাক্ষরের চিঠি শেষ কবে এসেছিল।

তাড়াতাড়ির মধ্যে হলে মুখটা একটু বাঁকান, মনে মনে বলেন, 'উঃ, মেয়ের জন্যে মন-কেমন উথলে উঠছে একেবারে। নিত্য চিঠি!—আর আমার আপনার লোকেরা? মেয়েরা? জামাইরা? পুত্তুরটি? দিল্লী দরবারে (ওই ব্যাখ্যাই করেন প্রবোধচন্দ্র) অধিষ্ঠিত যিনি? কই বুড়ো বাপ বলে মাসে একখানা পোস্টকার্ড দিয়েও তো উদ্দিশ করেন না তাঁরা? দুটো পয়সার তো মকদ্দমা!'

এই চিঠিগুলো যেন ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয় প্রবোধের।

তবু পোস্টকার্ডগুলোর একটু মাদকতা আছে, পড়ে ফেলে তাঁর অজানিত অনেক কিছু খবর জানা হয়ে যায়। প্রবাহিত সংসারের কোনো ঘটনা-তরঙ্গই তো কেউ প্রবোধচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছে দিয়ে যায় না। প্রবোধচন্দ্র নিজেই 'হেঁই

হে'ই' করে জিজ্ঞেস করে করে যেটুকু সংগ্রহ করতে পারেন। এ তবু—

না, পরের চিঠি পড়াকে কিছুমাত্র গর্হিত বলে মনে করেন না প্রবোধচন্দ্র। বাড়ির কর্তা হিসাবে ওটুকু তাঁর ন্যায্য দাবি বলেই মনে করেন। তবু খামের চিঠি খুলতে সাহসে কুলোয় না। বার বার নেড়েচেড়ে, অনেকক্ষণ নিজের কাছে রেখে দিয়ে, অবশেষে যেন 'নাপাযিয়মানে'ই দিয়ে দেন, কেউ ঘরে এলে তার হাত দিয়ে।

এই চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল। এ আবার কার নামের চিঠি!

খামের চিঠি, এ বাড়িরই ঠিকানা, অথচ মালিকের নামটা সম্পূর্ণ অজানা! তা'ছাড়া চিঠিটা প্রবোধচন্দ্রের 'কেয়ারে' আসেনি। চিঠি যার জন্যেই আসুক—ঠিকানার জায়গায় জ্বলজ্বল অক্ষরে 'কেয়ার অব্ প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' তো লেখা থাকবেই।

যা রীতি!

যা সভ্যনীতি!

অথচ এ চিঠিতে সেই সুরীতি সুনীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। কর্তা প্রবোধচন্দ্রের কর্তৃত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে।

অন্য বাড়ির চিঠি?

ভুলক্রমে এসেছে?

তাই বা বলা যায় কি করে?

এই তো স্পষ্ট পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'তেরোর দুই রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট!'

'তেরোর এক'টা হচ্ছে নির্মলদের, 'তেরোর দুই'টা হচ্ছে প্রবোধচন্দ্রদের।

তা'হলে? কে এই চিঠির অধিকারিণী? তবে কি বৌমাদের কারো পোশাকী নাম এটা? নাকি বড়বৌমার ওই যে বোনঝিটা কদিন এসে রয়েছে তারই?

কিন্তু সেই একটা বছর দশ-বারোর নোলোক-পরা মেয়ের নামে এমন খামে-মোড়া চিঠি কে পাঠাবে?

দুর্দমনীয় কৌতূহলে খামের মুখটায় এক ফোঁটা জল দিয়ে টেবিলে রাখলেন প্রবোধচন্দ্র, যাতে আঠাটা ভিজে খুলে যায়।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে ঠিক সেই মুহূর্তেই বকুল এসে ঘরে ঢুকলো বাপের দুধের গ্লাস হাতে।

থতমত খেয়ে চিঠিটা সরাতে ভুলে গেলেন প্রবোধচন্দ্র। আর এমনি কপালের ফের তাঁর, তদ্দণ্ডেই কিনা তার ওপর চোখ পড়লো ওই ধিঙ্গী মেয়ের! যাকে নাকি প্রবোধচন্দ্র মনে মনে রীতিমত ভয় করে থাকেন। ভয় করার কারণ-টারণ স্পষ্ট নয়, তবু করেন ভয়। আর সেই ভয়ের বশেই—বকুল যখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'চিঠিটায় জল পড়লো কি করে বাবা?' বলে বসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র, 'জল নয়, ইয়ে ঘাম। টপ্ করে চিঠিটার ওপরই পড়লো, তাই হাওয়ায়—'

ঘাম!

বকুল হতবাক দৃষ্টিতে বাপের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর শীতের অগ্রদূত হেমন্তকালের ঝাপসা-ঝাপসা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, আর তারপর বকুলের মুখে ফুটে উঠেছিল একটুখানি অতি সূক্ষ্ম হাসি। যে হাসিটার বদলে এক ঘা বেত খেলেও যেন ভাল ছিল প্রবোধচন্দ্রের।

ওই, ওই জন্যেই ভয় ঢুকেছে।

আগে এই হাসিটি ছিল না হারামজাদির। কিছুদিন থেকে হয়েছে। দেখলে গা সিরসির করে ওঠে। মনে হয় যেন সামনের লোকের একেবারে মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে।

বকুল কিন্তু আর কিছু কথা বলেনি, শুধু বলেছিল, 'খাম !'

তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা তুলে নিতে গিয়েছিল।

প্রবোধচন্দ্র যেন একটা সুযোগ পেলেন, হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, 'থাক্ থাক্, পরের বাড়ির চিঠি, পিয়নব্যাটা ভুল করে দিয়ে গেছে।'

কিন্তু ততক্ষণে তো তুলে নেওয়া হয়ে গেছে এবং উল্টে দেখাও হয়ে গেছে।

খামের উপর লেখা নামটার উপর চোখ দুটো স্থির হয়ে গিয়েছিল বকুলের, তারপর বলেছিল, 'ভুল করে নয়, এ বাড়িরই।'

'এ বাড়িরই !'

প্রবোধ সেই সূক্ষ্ম হাসির ঝাল ঝাড়েন, 'বাড়িতে তা'হলে আজকাল আমার অজানিতে বাড়তি লোকও বাস করছে ?'

'বাড়তি কেউ নেই বাবা!'

'নেই! নেই তো এই "শ্রীমতী অনামিকা দেবী"টি কে শুনি ?'

বকুল মৃদু হেসে বলেছিল, 'আসলে কেউই নয়।'

আসলে কেউই নয়! অথচ তাঁর নামে চিঠি আসে! চমৎকার! তোমরা কি এবারে বাড়িতে রহস্যলহরী সিরিজ খুলছো ? রাখো চিঠি! আমি জানতে চাই কে এই অনামিকা দেবী!'

চিঠি অবশ্য রাখেনি বকুল।

আরও একবার মৃদু হাসির সঙ্গে বলেছিল, 'বললাম তো, আসলে কেউই নয়, ওটা একটা বানানো নাম!'

'বানানো নাম! বানানো নাম মানে?" প্রবোধচন্দ্র যথারীতি হাঁপানির টান ভুলে টানটান হয়ে উঠে বলেছিলেন, 'বানানো নামে চিঠি আসে কী করে ? তাহলে —প্রেমপত্র পাঠাবার ষড়যন্ত্র!'

তা তাই মনে হয়েছিল তখন প্রবোধচন্দ্রের। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন ওই বানানো নামটার সঙ্গে বকুল নামের মেয়েটার কোনো যোগসূত্র আছে। সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে মোতিহারীর যোগসূত্র আবিষ্কার করে বসেছিলেন তিনি।

লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে তা'হলে এই কল ফেঁদেছে। বানানো নামে চিঠি আসবে, কেউ ধরতে পারবে না ?...নির্ঘাত ওই চিঠির সন্ধানেই এসেছিল, দুধ আনাটা ছল।

রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গিয়েছিল প্রবোধচন্দ্রের। উঃ, সেই মিটমিটে পাজী চরিত্রহীন শয়তানটা, এখনো আমার মেয়েটার মাথা খাচ্ছে! বিয়ে করেছিস, বিদেশ চলে গেছিস, তবু দুষ্প্রবৃত্তি যাচ্ছে না ?...এনভেলাপে চিঠি লিখছিস! এতো আসপদ্দা যে, 'কেয়ার অব'টা পর্যন্ত দেবার সৌজন্য নেই!

প্রবোধচন্দ্রের অভিভাবক-সত্তা গৃহকর্তা-সত্তা, দুটো একসঙ্গে চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

প্রবোধচন্দ্র ধমকে উঠেছিলেন, 'খোলো চিঠি! দেখতে চাই আমি।'

'দেখতে চান সে তো দেখতেই পাচ্ছি—', বকুল খামখানা আবার বাপের টেবিলেই ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'জলে ভিজিয়ে আড়ালে খোলবার চেষ্টা না করে, এই অনামিকা দেবীর চিঠি এলে আপনি খুলেই দেখবেন বাবা !'

তারপর চলে গিয়েছিল ঘর থেকে।

বাপের অবস্থার দিকে আর তাকিয়ে দেখে যায়নি।

অথচ এই কিছুদিন আগেও বকুল বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারতো না। হঠাৎ এই সাহসটা তাকে দিল কে ? এই অনামিকা দেবী? যার নামে কোনো এক কাগজের সম্পাদক চিঠি পাঠিয়েছে, 'আপনার গল্পটি আমাদের মনোনীত হয়েছে। আগামী সংখ্যার জন্য আর একটি গল্প পাঠালে বাধিত হবো।'

না কি নির্মলের বিয়ে উপলক্ষ করে যে-বকুল উদঘাটিত হয়ে গিয়েছিল, সেই বকুল স্থির করেছিল পায়ের তলার মাটিটা কোথায় সেটা খুঁজে দেখতে হবে। হয়তো সেটা খুঁজেও পেয়েছিল বকুল। তাই বকুল তার খাতার একটা কোণায় কবে যেন লিখে রেখেছিল, 'ভয় করতে করতে এমন অদ্ভুত অভ্যাস হয়ে যায় যে, মনেই পড়ে না ভয় করার কোনো কারণ নেই। অভ্যাসটা ছাড়া দরকার।'

আর মনের মধ্যে কোন্‌খানে যে লিখেছিল, 'নির্মলকে সেজদি ধিক্কার দেয়, কিন্তু আমি ওকে ধন্যবাদই দিই। ওর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ও আমার নৌকোখানাকে দাঁড় বেয়ে খেয়া পার করে দিতে পারেনি বলেই না সেটা স্রোতের টানে সাগরে এসে পড়েছে!'

তা এই 'সাগর'টা উপমা মাত্র হলেও, প্রবোধচন্দ্রের সংসারে 'অনামিকা দেবী' একটা বিস্ময়ের ঘটনা বৈকি।

অনামিকা দেবীর নামের সেই চিঠিখানা প্রেমপত্র না হলেও, সেটা নিয়ে বাড়িতে কথা উঠেছিল কিছু। বকুলের বড়দা সেই না-দেখা সম্পাদকের উদ্দেশে মুচকি হেসে বলেছিল, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর!'

বকুলের ছোড়দা যার ডাকনাম মানু। বকুল পারুল ওকেই ছোড়দা বলে। সুবল ছিল শুধু 'সুবল'! সে তো এখন শুধু একটা নাম, দেয়ালের একটা ছবি। সে থাকলে হয়তো ইতিহাস একটু অন্যরকম হতো। তা সেই ছোড়দা হেসে বলেছিল, 'মেয়ে বলেই তাই লেখা ছেপে দিয়েছে।...শুনতে পাস না ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত গোবরমাথা মেয়েগুলোকে কি রকম পাস করিয়ে দিচ্ছে ? ওই লেখা একটা বেটাছেলের নাম দিয়ে পাঠালে, দেখতে স্রেফ ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে চলে গেছে।'

আর বকুলের বড়বৌদি অবাক-অবাক গলায় বলেছিল, 'নামডাক হবার জন্যেই তো লোকে বই লেখে বাবা, ইচ্ছে করে নাম বদলে লেখে, এ তো কখনো শুনিনি। লেখাটা যে তোমারই তা প্রমাণ হবে কী রে ভাই? এই আমিই যদি এখন বলি, "আমিই অনামিকা দেবী" ?'

'বলো না, আপত্তি কি?' বলে হেসে চলে গিয়েছিল বকুল।

বৌদি যে রীতিমত অবিশ্বাস করছে তা বকুল বুঝতে পেরেছিল।

ইতিপূর্বেও তার লেখা ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সে খবরটা নিতান্তই বকুলের নিজের আর নির্মলদার বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এ বাড়িতে ধাক্কা দেয়নি।

এবার ধাক্কা দিল বলেই ধাক্কা উঠলো।

আরও একটা ধাক্কার খবর পাঠিয়েছিল সেজদি পারুল।

লিখেছিল...'এদিকে তো দিব্যি এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিস। তোর গল্প নিয়ে তো এখানে পুরুষমহলে বেজায় সাড়া উঠেছে। "নবীন ভারত" পত্রিকাখানা এখানে খুব চালু কিনা।...তা ওনারা বলেছেন, 'নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী এসব তো জানি, এই নতুন দেবীটি আবার কে? এ নির্ঘাত কোনো মহিলার ছদ্মনামে পুরুষ।...লেখার ধরন যে রকম বলিষ্ঠ—'...অর্থাৎ 'বলিষ্ঠ' হওয়াটা পুরুষেরই একচেটে।

'তোর বুদ্ধিমান ভগ্নীপতিটি অবশ্য লেখিকার আসল পরিচয়টা কারো কাছে

ফাঁস করে বসেননি, কিন্তু নিজে তো জানেন। তিনি বিষম অপমানের জ্বালায় জ্বলছেন। কেন জানিস? তিনি নাকি ওই গল্পের ভিলেন নায়কের মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে পাচ্ছেন।

'যত বোঝাচ্ছি, গল্পটার নাম যখন "আয়না", তখন ওর মুখোমুখি হলে তো নিজের ছায়া দেখা যাবেই, কিন্তু নিজেকে কেন তুমি—' তা কে শোনে এসব সুযুক্তির কথা। বলছেন, ওনার শালী নাকী ওনাকে অপমান করতেই এমন একখানা মর্মান্তিক চরিত্র সৃষ্টি করেছে। তখন হেসে বলতেই হলো শালী, তাহলে শালীর মতই ব্যবহার করেছে। দেখ, তোদের অমলবাবুর সামনে গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছি বলে "ছি ছি" করিস নে। বাংলা ভাষা মেয়েদের সম্পর্কে যে কত উদাসীন তা প্রতি পদেই টের পাবি। মানে লিখতে যখন বসেছিস, লক্ষ্য পড়বেই...শালার সম্পর্কে "সম্বন্ধী" "বড় কুটুম্ব" দু'একটা কথা তবু আছে, কিন্তু শালী? বড় জোর শ্যালিকা! ছিঃ! কোনো গুণবাচক শব্দ খোঁজ, নেই, মেয়েদের জন্যে কিছু নেই। অতএব বলতে হবে "মহিলা কবি", "মহিলা সাহিত্যিক", "মহিলা ডাক্তার" ইত্যাদি ইত্যাদি, দেখিস মিলিয়ে মিলিয়ে।...কাজে কাজেই শালী ছাড়া উপায় কি? তা লোকটা বলে কিনা ঠিক বলেছ, "যা সম্পর্ক তেমনি ব্যবহার করেছে তোমার বোন!"

'এ কথাও বললাম, "তোমার ছায়াই বা দেখছো কেন? তুমি কি অত নিষ্ঠুর?"

'সে সান্ত্বনায় কিছু হচ্ছে না।'

এই

॥ ১২ ॥

হয় না। তেমন সান্ত্বনায় কিছু হয় না।

সেটা অনেক সময় টের পেয়েছেন অনামিকা দেবী। তাঁর এই দীর্ঘকালের লেখিকা জীবনে অনেকবার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। তিনি নাকি তাঁর সব পরিচিত জনেদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে কাউকে ক্যাউকে অপদস্থ করতে তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা সৃষ্টি করেছেন।

অবশ্য কাহিনীর মধ্যেকার মহৎ চরিত্রগুলি সম্পর্কে এ ধরনের দাবি কেউ করে না। 'হাস্যকর' অথবা ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার মধ্যে নিমজ্জিত চরিত্রগুলিতেই নাকি অনামিকা দেবীর কুটিল প্রচেষ্টা দেখতে পায় পরিচিত জনেরা। তাই মুখ কালো করে বলে, 'এ তো আমাকে নিয়েই লেখা।'...বলে, 'তোমার মনের মধ্যে এই সব ছিল তা জানতাম না। তা এতোটা অপদস্থ না করলেও পারতে।'

তারা নিজেরা ধরতে না পারলেও বন্ধু-বান্ধবেরা নাকি চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দেয়, 'এই দেখো তোমার অমুক দেবী এবার তোমাকে একহাত নিয়েছেন।'

তা অমলবাবুর ক্ষেত্রেও নাকি ওই বন্ধুরাই 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকা'র কাজ করেছিলেন।

বন্ধুর শলাকার পর তো আর কোন শলাকাই কাজ করে না। কাজেই সেজদির যুক্তি মাঠে মারা গেছে। 'আমায় নিয়ে লিখেছে' ভেবে খাপ্পা হয়েছিলেন অমলবাবু।

আবার এমন অনুরোধও বার বার আসে—'আমায় নিয়ে লেখো—'
না লিখলে ভাবে অবহেলা করলো।

কিন্তু আসলে যে সত্যিকারের কোনো একজনকে নিয়ে কোনো একটা গোটাকার 'চরিত্র' সৃষ্টি করা যায় না, এ সত্যটা কেউ ভেবেও দেখে না।

হয়তো জানেই না।

জানে না অথবা মানে না যে ওটার নিয়ম অনেকটা বৃষ্টির মত।

পৃথিবীর মাটি থেকে ওঠা জলটাই আবার জল হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়ে বটে, তবু দুটোই এক নয়। সে জলকে আগে বাষ্প হতে হয়, তারপর মেঘ হতে হয়, তবেই তার আবার বৃষ্টি হয়ে পড়ার লীলা।

তেমনি নিয়মেই প্রায় বহু চরিত্রের, আর বহু বৈচিত্র্যের সংস্পর্শে আসা অনুভূতির বাষ্পও মনের আকাশে উঠে জমা হয়ে থাকে চিন্তা হয়ে। তারপর কোনো এক সময় 'চরিত্রে' রূপায়িত হয়ে কলমে এসে নামে।

কিন্তু এত কথা বোঝানো যায় কাকে? বুঝতে চায় কে? তার থেকে তো রাগ করা অনেক সোজা। অনেক সোজা ভুল বুঝে অভিমান করা।

যাকে নিয়ে লেখা হল না, সে-ও আহত। আর আয়নায় যে নিজেকে দেখতে পেলো সে-ও আহত। অতএব তারা দূরে সরতে থাকে।

অবশ্য এ সমস্যা কেবলমাত্র পরিচিত জনেদের নিয়ে।

যারা দূরের, তারা তো আবার ওই আয়নায় মুখ দেখতে পাওয়ার সূত্রেই কাছে এসে দাঁড়ায়। আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে বলে, 'ইস, কী করে লিখেছেন! মনে হচ্ছে ঠিক আমাদের কথা!'

অনামিকা দেবীও হাসেন।

বলেন, 'আপনাদের কথা ছাড়া আর কোথায় কথা পাবো বলুন? আমি তো আপনাদেরই একজন। আকাশ-পাতাল এক করে কথা খুঁজতে যাই এমন ক্ষমতা নেই আমার। আপনারাই যদি আমার ফসল তো, আপনারাই আমার সার। পাঠক পাঠিকাই আমার নায়ক নায়িকা।'

কিন্তু অমলবাবুকে এসব কথা বোঝানো যায়নি। অমলবাবু তদবধি সেজদিকে আসতেই দেয়নি এ বাড়িতে।

আশ্চর্য, অভিমান মানুষকে কী নির্বোধ করে তোলে! অথবা মানুষজাতটাই নির্বোধ!

'বকুলের কথা' লেখবার দায়িত্ব নিয়ে বকুলকে ভাবতে ভাবতে, বকুলের সঙ্গে কখন যেন একাত্ম হয়ে যান অনামিকা দেবী। ওই বানানো নামের খোলস খুলে পড়ে, আর সেদিন অনেকদিন আগে বকুল যে-কথা ভেবেছিল, সেই কথাই ভাবতে বসেন তিনি, সত্যি মানুষ কি নির্বোধ!

শুধু দুটো মাত্র হাত দিয়ে শতদিক সামলাবার কী দুঃসহ প্রয়াস তার? শুধু দুটো মুঠোর মধ্যে সমস্ত পৃথিবীটাকে পুরে ফেলবার চেষ্টায় কী তার জীবন-পণ! কতো তার দুশ্চিন্তা, কতো তার ষড়যন্ত্র!

অথচ মুহূর্তে সে মুঠি আলগা করে ফেলে চলে যেতে হয় পৃথিবী ছেড়ে! হাত দুখানা সব কিছু সামলানোর দায়িত্ব থেকে কী সহজেই না মুক্তি পায়।

অমলবাবু তাঁর চাকরিতে অধিক উন্নতি করবার জন্যে কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করছিলেন, অমলবাবু তাঁর স্ত্রীকে মুঠোর মধ্যে ভরে রাখতে কী দুঃসহ ক্লেশই না স্বীকার করেছেন, স্ত্রীর শুধু দৈহিক মঙ্গলই নয়, ঐহিক, পারত্রিক, নৈতিক, চারিত্রিক, সর্ববিধ মঙ্গলের দায় নিয়ে ভদ্রলোক দিশেহারা হয়ে যেতেন, কিন্তু কতো কম নোটিশে চলে যেতে হল তাঁকে! কত অস্বস্তি বুকে নিয়ে!

সেজদি বলেছিল, 'দেখ্ বকুল, "স্বর্গ" জায়গাটা সত্যিই যদি কোথাও থাকে,

আর সেখান থেকে এই মর্ত্যলোককে দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তো অবিশ্যিই আমায় দেখতে পাচ্ছে। বেচারা মরেও কী যমযন্ত্রণা পাচ্ছে তাই ভেবে দুঃখিত হচ্ছি!'

বকুল বলতো, 'তোর মতো দজ্জাল বেপরোয়া স্ত্রীকে মনে রাখতে তাঁর দায় পড়েছে।'

সেজদি বলতো, 'দজ্জাল বেপরোয়াদেরই তো মনে রাখে মানুষ। দেখিস না—স্বয়ং ভগবানও সাধুসজ্জনদের মনে না রেখে, অহরহ জগাই-মাধাইকে মনে রাখেন, মনে রাখেন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপুদের।...এই যে লোকটি আমায় চোখের আড়াল করতো না, সেও তো ওই আমি দজ্জাল আর বেপরোয়া বলেই। শিষ্ট শান্ত সাধ্বী নারী হলে কবে আমায় ভুলে মেরে দিয়ে ভাঁড়ারঘরের এককোণে ফেলে রেখে দিতো।...তাই ভাবছি কী ছট্‌ফট করছে ও, যদি সত্যি দেখতে পায়।'

কিন্তু নাঃ, দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ বড় অসহায়।

সর্বস্ব নামিয়ে রেখে সর্বহারা হয়ে চলে যেতে হয় তাকে।

তারপর আর কিছু করার নেই।

করার থাকলে আজ প্রবোধচন্দ্রের পৌত্রী প্রবোধচন্দ্রের ভিটেয় বসেই 'প্রেম' করাটাকে মস্ত একটা বাহাদুরি মনে করে মহোল্লাসে তার পিসির কাছে এসে বলতে পারে, 'পিসি, বললে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আবার একটা নতুন শিকার জালে ফেলেছি।'

এই হতভাগা মেয়েটার সামনে কিছুতেই যে কেন গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারেন না অনামিকা দেবী! মেয়েটার প্রতি বিশেষ একটা স্নেহ আছে বলে? তা হলে তো 'স্নেহান্ধ'র দশা ঘটেছে বলতে হয়।

কিন্তু তাই কি?

না, ওর ওই লজ্জাহীনতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অমলিন সততা আছে বলে? যে বস্তু ইহসংসারে প্রায় দুর্লভ। তবুও তিনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টায় চোখ পাকিয়ে বলেন, 'নতুন শিকার জালে ফেলেছি মানে? ও আবার কী অসভ্য কথা?'

শম্পা কিন্তু কিছুমাত্র না দমে জোর গলায় বলে ওঠে, 'হতে পারে অসভ্য, কিন্তু জগতের কোন্ সত্যি কথাটাই বা সভ্য পিসি? সভ্য মাত্রেই অ-সভ্য, মানে সংসারী লোকেরা যাকে অসভ্য বলে।'

'তা সংসারে বাস করতে হলে সংসারী লোকের রীতিনীতির মাপকাঠিতেই চলতে হবে।'

শম্পা চেয়ারে বসেছিল, এখন বেশ জোরে জোরে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'ও কথা আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবী বলতে পারেন, তোমার মুখে মানায় না।'

অনামিকা দেবী চেষ্টাটা আরো জোরালো করতে বলেন, 'না মানাবার কী আছে? মা পিসি কি আলাদা? মা যা বলবে, পিসিও তাই বলবে।'

শম্পা হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, দুই কোমরে হাত দিয়ে বলে ওঠে, 'এ কথা তোমার সত্যি মনের কথা?'

এই সরাসরি আক্রমণে অনামিকা দেবী হেসে ফেলেন, মেয়েটার মাথায় একটা থাবড়া মেরে বলেন, 'এইখানটিতে আছে কেবল দুষ্টবুদ্ধির পাহাড়। কিন্তু ওই সব শিকার-টিকার কী ভালো কথা?'

'ভালোমন্দ জানি না বাবা, ওই কথাটাই বেশ লাগসই মনে হলো, তাই

বললাম, একটা করে ধরি আর মেরে ছেড়ে দিই যখন, তখন শিকার ছাড়া আর কি?'

'আমি তোর গুরুজন কি না?'

'হাজার বার।'

'তবে? আমার সামনে এই সব বেহায়া কথা বলতে তোর লজ্জা করে না?'

বলে অনামিকা দেবীও হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে ওর মতই পা দোলাতে থাকেন।

শম্পা সেই দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বলে, 'দেখো পিসি, লজ্জা-ফজ্জা বলে আমার কিছু নেই, একথা আমি বাবাকেও বলতে পারি, কিন্তু বলতে প্রবৃত্তি হয় না। কথাটার মানেই বুঝবে না। তুমি সাহিত্যিক, মনস্তত্ত্ব-টত্ত্ব বোঝো, তাই তোমাকে বলি। কই বড় মেজ সেজ পিসিকে তো বলতে যাই না?'

'তাঁদের পাচ্ছিস কোথায়?'

'আহা ইচ্ছে করলে তো পেতে পারি। একজন তো এই কলকাতা শহরেই বাস করছেন, আর দুজনও আশেপাশে। কথা তো তা নয়, আশা করি যে তুমি অন্ততঃ বুঝবে আমায়।'

অনামিকা দেবী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। ভাবেন, ও আমার ওপর এ বিশ্বাস রাখে, আমি ওকে বুঝবো। যদিও এ সংসারে ওইটাই হচ্ছে সব চেয়ে শক্ত কাজ। কে কাকে বোঝে? কে কাকে বুঝতে চায়?

আমি ওকে বুঝতে চেষ্টা করি, ও সেটা বুঝতে পারে। তাই ও আমার কাছেই মনের কথা বলতে আসে। কিন্তু নিত্য নতুন এই প্রেমিকই বা ও জোটায় কোথা থেকে?

সেই প্রশ্নই করেন অনামিকা দেবী।

শম্পা একগাল হেসে বলে, 'ও ঠিক জুটে যায়। একসঙ্গে দুটো তিনটে এসেই ভিড় করে কত সময়, আর এ তো এখন আমার ভেকেন্সি চলছিল। তোমরা সেই যে বল না, রতনে রতন চেনে, সেই রকম আর কি!'

অনামিকা দেবী হেসে ফেলে বলেন, 'তা নতুন রতনটি বোধ হয় কারখানার কুলিটুলি হবে?'

শম্পা ভুরু কুঁচকে বলে, 'হঠাৎ এ সন্দেহ করলে যে? শুনেছো বুঝি কিছু?'

'শুনতে যাবো কোথায়, অনুমান করছি। পছন্দর ক্রমোন্নতি দেখছি কিনা!'

শম্পা আরও একগাল হেসে বলে, 'তোমার অনুমান সত্য। হবেই তো! লেখিকা যে! সত্যি, কারখানাতেই কাজ করে। এণ্টালিতে একটা লোহার যন্ত্রপাতির কারখানা আছে, তারই অ্যাসিসটেণ্ট ফোরম্যান। বেশ একখানা কংক্রীট চেহারা, দিব্যি একটি বন্য-বর্বর বন্য-বর্বর ভাব আছে—'

'বন্য-বর্বর বন্য-বর্বর ভাব আছে!'

'বাঃ, অবাক হচ্ছো কেন? থাকে না কারো কারো?'

অনামিকা দেবী হতাশ গলায় বলেন, 'থাকতে পারে, কিন্তু—'

'কিন্তুর কিছু নেই পিসি! পুরুষমানুষের পক্ষে ওটাই তো সৌন্দর্য! দেখলে মনে হয় রেগে গেলে দু ঘা মেরেও দিতে পারবে। নিদেনপক্ষে বাসন ভাঙবে, বিছানা ছিঁড়বে, বইপত্তরকে ফুটবল করে স্যুট করবে, হয়তো আমাকেও—।'

'চমৎকার! শুনে মোহিত হয়ে যাচ্ছি! এ নিধিটিকে পেলে কোথায়?'

'সে এক নাটক, বুঝলে পিসি!' শম্পা চেয়ারের মধ্যে নড়েচড়ে বসে, 'তাহলে শোনো বলি—বেগবাগানের ওই মোড়টায় বাস চেঞ্জ করতে নেমেছি, দেখি ওটাও এসে কাছাকাছি দাঁড়ালো। কালিঝুলি মাখা নীল প্যাণ্ট আর খাকি শার্ট পরা, মাথার চুল স্রেফ কদমছাঁট, মুখটা নিগ্রো প্যাটার্নের, বেঁটেখাটো মুগুর-মুগুর

গড়ন, রংটা ছাতার কাপড়ের কাছাকাছি। ভারী ইণ্টারেস্টিং লাগলো। অনিমেষ নয়নে তাকিয়েই থাকলাম যতক্ষণ না বাস এলো। আর দেখি না আমার ওই তাকানো দেখে সে পাজীটাও ড্যাবড্যাব করে তাকাতে শুরু করেছে। ওমা তারপর কিনা একই বাসে উঠলো! বোঝ ফন্দী। উঠে একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে বলে কিনা, "অমন ভাবে তাকাচ্ছিলেন যে? চিড়িয়াখানার জন্তু দেখছিলেন নাকি?"...শুনে মনটা যেন আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলো। গলার আওয়াজ কী! যেন সত্যি চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘের হুঙ্কার? ওই একটি কথা শুনেই মনে হলো এমন এক-খানা প্রাণীকে লটকে সুখ আছে।...ব্যস্, চেষ্টায় লেগে গেলাম।'

'চেষ্টায় লেগে গেলাম!'

অনামিকা দেবী ওর মুখের দিকে তাকান। ছলা-কলার মুখ নয়, নির্ভেজাল মুখ অথচ অবলীলায় কী না বলে চলেছে!...এযাবৎকাল ওর চুলগুলো খাটো করে ছাঁটা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি সেই চুল দিয়েই, কোন্ অলৌকিক উপায়ে কে জানে, মাথার মাঝখানে চুড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে, আর সেই খোঁপাটার জন্যে ওর চেহারাটা একদম বদলে গেছে।

ওকে যেন একটা অহঙ্কারী মেয়ের মতো দেখতে লাগছে।

অনামিকা দেবীর হঠাৎ তাঁর মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল।

অনেক চুল ছিল মার। আর গরমের দুপুরে যখন চুড়ো করে মাথায় ওপর বেঁধে রাখতেন, অনেকটা এই রকম দেখাতো। অহঙ্কারী-অহঙ্কারী!

শম্পার মুখে অনামিকা দেবীর মায়ের মুখের আদল আছে। অথচ শম্পার বাবার মুখে তার ছায়ামাত্র নেই। আর শম্পার মা তো সম্পূর্ণ আলাদা এক পরিবারের মেয়ে। প্রকৃতির এ এক আশ্চর্য রহস্য! সে যে কতো রহস্যের সিন্দুক আগলে বসে নিঃশব্দে আপন কাজ চালিয়ে যায়! হঠাৎ আবার মায়ের মুখের আদল দেখে কি নতুন করে ওকে ভালো লাগলো অনামিকা দেবীর? আর ওকে এই অহেতুক প্রশ্রয় দেবার ওটাও একটা কারণ?

মায়ের মতো মুখ।

মাকে ভাবলেই মার জন্যে ভয়ানক একটা কষ্ট হয় অনামিকা দেবীর।

এখনো হলো।

মনে পড়লো বহির্জগতের জন্যে কী আকুতি ছিল মার! কী আকুলতা ছিল একটু আলোর জগতের টিকিটের জন্যে!

অথচ এরা—

সিগারেটের সেই প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়লো অনামিকা দেবীর.... 'আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন'।

এরা জানে না এরা কী পাইতেছে।

এদের হাতে যথেচ্ছ বিহারের ছাড়পত্র, এদের হাতে সব দরজার চাবি, সব জগতের টিকিট। এরা ভাবতেও পারে না সুবর্ণলতা কতো শক্ত দেওয়ালের মধ্যে আটকা থেকেছে, আর বকুলকে কতো দেওয়াল ভাঙতে হয়েছে, কতো ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে।

এদের কোনোদিন সে পরীক্ষা দিতে হয়নি।...মহাকাল এগিয়ে চলেছে আপন নিয়মে, সমস্ত প্রতিকূল চিত্র স্রে প্রবাহে ভাসতে ভাসতে আপনিই অনুকূল হয়ে যাচ্ছে।

বকুলের যে-বড়দা তাঁর ছোট বোনকে একবার পাড়ার ছেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে দেখলে সৃষ্টি রসাতলে যাচ্ছে ভেবে রাগে দিশেহারা হতেন, সেই দাদার

ছেলে আঠারো বছরের মেয়েকে তার বয়-ফ্রেন্ডদের সঙ্গে পিক্‌নিক করতে ছেড়ে দেয় দীঘায়, পুরীতে, রাঁচিতে, কোলাঘাটে, নেতারহাটে।

সেই মেয়েটা অনামিকা দেবীর নাতনী সম্পর্ক হল না? তা তারই তো উচিত ছিল অনামিকা দেবীর কাছে এসে হেসে হেসে তার বয়-ফ্রেন্ডদের গল্প করা।

কিন্তু তা সে করে না।

সে মেয়েটা এদিকও মাড়ায় না।

তার মাতৃদেবী আপন পরিমণ্ডলে আত্মস্থ, তুচ্ছ লেখিকা-টেখিকাকে সে ধর্তব্যের মধ্যে আনে না। তার পিতৃকুলের দিকে-দিগন্তে সকলেই পদস্থ ব্যক্তি, সরকারের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই সমাজটাকেই সে বোঝে ভালো, সেই সমাজের উপযুক্ত করে 'মানুষ' করে তুলছে সে মেয়েকে। মেয়েকে 'নাচিয়ে মেয়ে' করে তুলতে অনেক কাঠখড় পুড়োচ্ছে।

সাহিত্য-টাহিত্য ওদের কাছে একটা অবান্তর বস্তু।

সেই মেয়েটা, যার ভালো নাম নাকি সত্যভামা, আর ডাকনাম কৃষ্ণা (মহাভারতের নামগুলিই তো এযুগে লেটেস্ট ফ্যাশান। আর চট করে বোঝাও যায় না বাঙালী কি অবাঙালী), সে যখন গায়ে টানটান শালোয়ার কামিজ চাপিয়ে আর পুরু করে পেণ্ট করা লালচে-লালচে মুখে মোমপালিশ লাগিয়ে হি হি করতে করতে তার একপাল বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যায়, তখন সে দৃশ্য চোখে পড়লে অনামিকা দেবীর অজ্ঞাতসারেই তাঁর বড়দার মুখটা মনে পড়ে যায়।

সেই বাড়ি, সদর দরজাটাও একই আছে। যে দরজার সামনে ভীম মনোভাব নিয়ে পাহারা দিতো বড়দা, আর বকুল পাশের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরলেই চাপা গর্জনে প্রশ্ন করতো, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

পাশের ওই বাড়িটা ছাড়া যে বকুলের যাবার আর কোনো জায়গা ছিল না, সে কথা জানা সত্ত্বেও বকুলের বড়দা ওই বৃথা প্রশ্নটাই করতেন।

সত্যভামার মা, অলকাদের সেই বড়দার অনেক যত্নে খুঁজে আনা বৌমাটি কি ওই সেকেলে শ্বশুরটিকে 'উচিত জবাব' দেবার জন্যেই ছোট্ট থেকে মেয়েকে হাতিয়ার বানিয়েছেন!

এখন অবশ্য বড়দা মরে বেঁচেছেন।

কিন্তু ওই সযত্নে শান দেওয়া হাতিয়ারটি আবার তার নিজের মা-বাপের জন্যেই আরো শাণিত হচ্ছে কিনা কে জানে। সংসারের নিয়মই তো তাই।

সত্যভামা আর শম্পার বয়সের পার্থক্য সামান্যই, এক বাড়িতেই বাস, তবু ওদের মধ্যে ভাব নেই। শম্পা সত্যভামাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখে, সত্যভামা শম্পাকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখে।

শম্পার একমাত্র প্রিয় বান্ধবী পিসি।

তাই শম্পা অবলীলায় বলে বসতে পারে, 'চৈষ্টায় লেগে গেলাম।'

অনামিকার কড়া গলাকে অবশ্য শম্পা গ্রাহ্য করে না, তবু অনামিকা কড়া গলায় বলে ওঠেন, 'চেষ্টায় লেগে গেলাম মানে?'

'এই সেরেছে, তোমায় আবার মানে বোঝাবো কি? কী না জানো তুমি! আর কী না লেখো! চেষ্টায় লেগে গেলাম মানে—কটমট করে তাকিয়ে বললাম, "সাহস থাকে তো একসঙ্গে নেমে পড়ুন, জবাব দিচ্ছি!"...ব্যস, যেই আমি নেমে পড়লাম, অমনি সেও দুম করে নেমে পড়লো।'

'নেমে পড়লো?'

'পড়বে না?' শম্পা একটু বিজয়-গৌরবের হাসি হেসে বলে, 'অলরেডি তো

জালে পা আটকে গেছে ততক্ষণে। রাস্তায় নেমে আমি প্রথম বললাম, "আপনার কথার জবাব হচ্ছে, চিড়িয়াখানায় জীবকে খোলা রাস্তায় ছাড়া দেখলে তাকাবেই মানুষ। কিন্তু আপনি ড্যাবড়োবিয়ে তাকাচ্ছিলেন কী করতে শুনি?" পাজীটা বললো কিনা, "আপনাদের মতো উদ্ভট সাজ করা হাস্যকর জীবদের দেখলেও তাকাবেই মানুষ"...তারপর এইরকম কথাবার্তা হলো—আমি বললাম, "জানেন এতে আমি অপমানিত বোধ করছি।"

'ও বললো, "তার মানে আপনাদের গায়ের চামড়া আঙুরের খোসার মতো। সত্যি কথা শুনলেই ফোসকা পড়ে।"

'আমি—"জানেন আপনার এই স্পর্ধাজনক উক্তি যদি রাস্তার লোককে ডেকে বলে দিই, তো যে যেখানে আছে একযোগে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে!"

' "তা জানি। আর সেইখানেই তো আপনাদের বন্দুকের বল। জানেন দোষ যে পক্ষই করুক, কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এই পুরুষ জাতটাকেই।"

' "করা হয় তো কুলিগিরি, এতো লম্বা লম্বা কথা শেখা হলো কোথা থেকে?"

'কড়া গলায় ও বললো, "আপনাদের মতো মেয়েদের দেখে দেখে।"

'বললাম, "এতো দেখলেন কোথা থেকে?"

'বললো, "চোখ থাকলেই দেখা যায়। কেউ তো আর হারেমে বাস করে না।" ...তারপর সে অনেক কথা। মোট কথা, শেষ অবধি ভাব হয়ে গেল।...একসঙ্গে চা খেলাম। আর সেই অবধি—'

শম্পা একটু হেসে চুপ করে।

'তার সঙ্গেই তা হলে ঘুরে বেড়াচ্ছিস এখন?'

'ঘুরে ঠিক নয়। সময় কোথায় তার? কারখানার কাজ, ওভারটাইম খাটে, ওই মাঝে মাঝে ঘুরি! কালিঝুলিমাখা জামা পরেই হয়তো কোনো পার্কে-টার্কে এসে বসে পড়ে।'

'খুব ভাল লাগে কেমন? বিশেষ করে চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম!'

শম্পা এবার গম্ভীর হয়।

বলে, 'চেহারায় কী এসে যায় পিসি? মানুষটা কেমন সেটাই দেখবার বিষয়। এদেশে একসময় পুরুষের চেহারার আদর্শ ছিল কার্তিক ঠাকুর, আর তার সাজ-সজ্জার আদর্শ ছিল লম্বা-কোঁচা ফুলবাবুটি। এখন বরদাস্ত করতে পারো সে চেহারা? মনের সঙ্গে সঙ্গে চোখের পছন্দও বদলাবে বৈকি।'

অনামিকা দেবী হেসে ফেলে বলেন, 'তা এখন তো ওই বন্য-বন্য বর্বরে-বর্বরে এসে ঠেকেছে, এর পর? পুরো অরণ্যের প্রাণী?'

শম্পা উদাস উদাস গলায় বলে, 'সেটাও অসম্ভব নয়। "মানুষ" জাতটা দিন দিন যে রকম ভেজাল হয়ে যাচ্ছে!'

টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো শম্পা, 'নির্ঘাত সে।'

'রিসিভারের মুখটা হাত দিয়ে ঢেকে অনামিকা চাপা গলায় বলেন, 'তোকে না বলেছিলাম, তোর ওই বন্ধুদের আমার ফোন নম্বর দিবি না।'

'বলেছিলে, মানছি সে-কথা। কিন্তু না দিলে ওদের কী গতি হবে সেটা বলো!'

কিন্তু ফোন ধরেই হতাশ হয়ে পড়ে শম্পা, 'সে' নয়।

অনামিকা দেবী ততক্ষণে কথা শুরু করে দিয়েছেন, 'দেখা করতে চান? কারণটা বলুন? লেখা, না সভা? দুটোতেই কিন্তু আপাততঃ অপারগ।...কী

বললেন? আমাকে সম্বর্ধনা দিতে চান? কী সর্বনাশ! কেন? হঠাৎ কী অপরাধ করে বসলাম?...পাগল হয়েছেন? না না, ওসব ছেলেমানুষী ছাড়ুন।...দেশ চায়? কেন আমার তো এখনো আশী বছর বয়েস হয়নি! আশীর আগে ওসব করতে নেই।...তবু দেখা করতে আসবেন?...দেখুন, আমার বাড়ি আসবেন না এটা বলা শক্ত, কিন্তু এসে কি করবেন? ওসব সং সাজা-টাজা আমার দ্বারা হবে না।...তা হোক, তবু আসবেন?...ঠিক আছে, আসুন, তবে কার্ড-ফার্ড ছেপে বসলে কিন্তু তার দায়িত্ব আপনাদের।...কী বললেন? নাকতলা শিল্পী সংস্থা?...আচ্ছা ধন্যবাদ।'

নামিয়ে রাখলেন।

ক্লান্ত-ক্লান্ত দেখালো তাঁকে।

এই আবার চলবে খানিক ধস্তাধস্তি, নিতান্ত অভদ্র না হওয়া পর্যন্ত ওদের হাত এড়ানো যাবে না।...কারণ ওই সম্বর্ধনার অন্তরালে 'অভিসন্ধি' নামক যে জন্তুটি অবস্থান করছে, সে তার 'মুখের গ্রাস'টি কি সহজে ছাড়তে রাজী হবে?

দেশ অনামিকা দেবীকে সম্বর্ধনায় ভূষিত করতে চায় বলেই 'নাকতলা শিল্পী সংস্থা' দেশবাসীর মুখপাত্র হয়ে সেই গুরু দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে চাইছে, এমন কথা বিশ্বাস করার মতো ছেলেমানুষ অবশ্যই আর নেই অনামিকা দেবী। তবু যেটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেইটুকু বিশ্বাস করবার ভানই ভালো। সব সত্য উদ্‌ঘাটিত না করাই বুদ্ধির কাজ। শম্পার নিয়মে সংসারে বাস করা চলে না।

শম্পা বললে, 'কী গো পিসি, তোমায় সম্বর্ধনা দিতে চায়?'

'সেই রকম বাসনাই তো জানাচ্ছে। হ্যাঁ, মনে হয়, মরবার আগেই শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করে শেষকৃত্য করে দিচ্ছে।'

'অথচ বেড়েই চলেছে ব্যাপারটা। রোজই তো শুনি এর সম্বর্ধনা তার সম্বর্ধনা।'

'বাড়বেই তো। দেশকে যে ফাংশানের নেশায় পেয়ে বসেছে। এ নেশা কাটাতে পারে এমন আর কোনো নতুন নেশা না আসা পর্যন্ত চলবে। উত্তরোত্তর বাড়বে।'

মুখে বলবেন ওইটুকু, মনে মনে বলবেন, শুধু তো নেশাই নয়, ওই ফাংশানের পিছনে যে অনেক মধুও থাকে। নেশাটা সেই মধুরই। দেশের লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা, সরকারের ঘর থেকে 'এড্' বার করা, নিদেনপক্ষে নিজেকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরা, সব কিছুর মাধ্যমেই তো ওই ফাংশান! যখন যে উপলক্ষটা পাওয়া যায়।

আশ্চর্য! আগে কী মূল্যবানই মনে হতো এই সব জিনিসগুলো! প্রথম প্রথম যখন তেরোর-দুই রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের চৌকাট পার হয়ে বাইরের পৃথিবীর আসরে গিয়ে বসেছেন অনামিকা দেবী, যখন ওই 'অভিসন্ধি' নামের লুকোনো জন্তুটার গোঁফের ডগাটি দেখে চিনে ফেলবার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লাভ হয়নি, তখন সব কিছুই কী ভালোই লাগতো! ভাল ভাল কথাগুলো যে কেবলমাত্র 'কথা' একথা বুঝতে বেশ কিছুদিন লেগেছে তাঁর।

তাই বলে কি খাঁটি মানুষ দেখেনি অনামিকা দেবী? ছি ছি, একথা বললে পাপ হবে!

উদার দেবোপম চরিত্র সেই মানুষটিকে কি আজও প্রতিদিন প্রণতি জানান না অনামিকা দেবী? যে মানুষটি বকুল নামের মেয়েটাকে হাত ধরে খোলা আকাশের নীচে ডেকে এনেছিলেন, যে মানুষটির স্নেহ অনামিকার একটি পরম সঞ্চয়?

সেই খোলা গলার উদাত্ত স্বর এখনো কানে বাজে, 'বাবা আপত্তি করবেন?

রাগ করবেন? করেন তো চারটি ভাত বেশী করে খাবেন। তুমি আমার সঙ্গে চলো তো। দেখি তোমায় কে কী বলে!...কী আশ্চর্য! অন্যায় কাজ নয়, অন্যের অনিষ্টকর কাজ নয়, কবিকে দেখতে যাবে। এতে এতো ভয়? কতো লোক যাচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আসছে। অথচ দেশের মধ্যে থেকে দেখবে না? দেব-দর্শনে যায় না লোকে? তীর্থস্থানে যায় না? মনে করো তাই যাচ্ছো। আর তাই-ই তো, বোলপুর শান্তিনিকেতন আজ ভারতবর্ষের একটি তীর্থ। তাছাড়া তুমি এখন লেখিকা-টেখিকা হচ্ছো, তোমাদের কাছে তো বটেই!'

ভরাট উদার সেই গলার স্বর যেন ভয়ের খোলসগুলো খুলে খুলে দিয়েছে।

তবুও কম বাধা কি ঠেলতে হয়েছিল?

প্রবোধচন্দ্রের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে প্রবোধচন্দ্রের বয়স্থা কুমারী মেয়ে এক নিতান্ত দূর-আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে একা বেড়াতে গিয়ে দু'রাত বাড়ির বাইরে কাটিয়ে আসবে, এর থেকে অনিয়ম পৃথিবীতে আর আছে কিনা, সেটা তো প্রবোধচন্দ্রের জানা ছিল না, জানতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে, অনেক বাধার সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

তবু বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল প্রবোধচন্দ্রের বয়স্থা কুমারী মেয়ে। একবার স্ত্রীর তীর্থযাত্রা রোধ করতে যে কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, সে কৌশল করতে সাহস হয়নি প্রবোধচন্দ্রের।

হ্যাঁ, বকুলের মা সুবর্ণলতা একদা সঙ্গিনী যোগাড় করে কেদারবদরীর পথে পা বাড়িয়েছিলেন, প্রবোধচন্দ্র সেই বাড়ানো পা-কে ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলেন কেবল-মাত্র সামান্য একটু কৌশলের জোরে। কিন্তু সে কৌশল এখন আর প্রয়োগ করা চলে না। এখন আর সাহস হয় না একসঙ্গে অনেক বেশী মাত্রায় জোলাপ খেয়ে নাড়ি ছাড়িয়ে ফেলতো। এখন ভয় হয় সেই চলে যাওয়া নাড়ি আর যদি ফিরে না আসে!

অতএব শেষ পর্যন্ত এ সংসারে সেই ভয়ঙ্কর অনিয়মটা ঘটেছিল।

তখনো বকুলের বড়দাদার ছেলে স্কুলের গণ্ডি পার হয় নি, আর বাকি সবই তো কুচোকাচার দল।

তখন এ বাড়িতে আসামী শুধু বকুল নামের মেয়েটা!

বড়দা তাই বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, 'বাড়িতে তা হলে এই সব স্বেচ্ছাচার চলবে?'

প্রবোধচন্দ্র কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বলেছিলেন, 'আমি কে? আমি তো এখন মনিষ্যির বার হয়ে গেছি। তোমরা বড় হয়েছো—'

'আমরা আমাদের নিজেদের ঘর শাসন করতে পারি, আপনার ধিঙ্গী মেয়েকে শাসন করতে যাবো কিসের জোরে? তায় আবার তিনি লেখিকা হয়েছেন, পৃষ্ঠ-বল বেড়েছে।'

তবু এসেছিলো শাসন করতে। বড়দা নয়, যে মেজদা সাতেপাঁচে থাকে না, সে।

বলেছিল, 'বাবার উঁচু মাথাটা এইভাবে হেঁট না করলে হতো না?'

বকুল ওর মেজদার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'বাবার এতে মাথা হেঁট হবে, একথা আমি মনে করি না মেজদা! অনেকে তো এমন যায়!'

'ও মনে কর না? অনেকে এমন যায়! চমৎকার! তা হলে আর বলার কি আছে? কিন্তু সুবিধের খাতিরে এটাও বোধ হয় ভুলে যাচ্ছো সকলের বাড়ি সমান নয়। এ বাড়ির রীতিনীতিতে—'

বকুলের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠেছিল।

বকুল সেই হাসিটা সমেতই বলেছিল, 'সুবিধের খাতিরে অনেকে তো অনেক কিছুই ভুলে যায় মেজদা! একদা এ বাড়িতে গৌরীদানের রীতিও ছিল, এখন কুমারী মেয়ের বয়স পঁচিশে গিয়ে ঠেকলেও অনিয়ম মনে হচ্ছে না। এটাই কি মনে থাকছে সব সময়?'

তার মানে বকুল তার এই পঁচিশ বছরের কুমারীত্বের কথা তুলে দাদাকে খোঁটা দিয়েছিল। তার মানে এটা যে বকুলের জেদে ঘটেনি সেটাই বোঝাল বকুল!

'ওঃ তাই!' মেজদা একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেছিল, 'যথাসময়ে বিয়ে দেওয়া হয়নি বলে যথেচ্ছাচারের ছাড়পত্র পেয়ে গেছো, সেটা খেয়াল হয়নি। তবে বিয়ের চেষ্টাটা বাবা থাকতে আমাদের করার কথা নয়! বাবা না থাকলে অবশ্যই—'

এবার বকুল জোরে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'দোহাই মেজদা, তোমরা আমার বিয়ে দাওনি বলে ক্ষেপে উঠে যথেচ্ছাচার করতে চাইছি, এতোটা ভেবো না লক্ষ্মীটি! ওই বিয়েটা না হওয়া আমার পক্ষে পরম আশীর্বাদ! সনৎকাকা আগ্রহ করে বললেন, তাই সাহস! জীবনের এ স্বপ্ন যে কখনো সফল হবে তা কোনো দিন ভাবিনি। যদি তোমাদের বাড়ির একটা মেয়ের জীবনে এমন অঘটন ঘটে—'

॥ ১৩ ॥

তা শেষ পর্যন্ত ঘটেছিল সেই অঘটন।

সনৎকাকার সঙ্গে বোলপুরের পথে পা বাড়িয়েছিল বকুল।

জীবনের প্রথম বিস্ময়!

সে কী আশ্চর্য স্বাদ!

সে কী অভাবিত রোমাঞ্চ!

আকাশে কতো আলো আছে, বাতাসে কতো গান আছে, জগতে কতো আনন্দ আছে, সে কথা আগে কবে জেনেছিল বকুল?

... ...

কিন্তু বকুল কি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছাকাছি পৌঁছেছিল? তাঁর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করেছিল? তাঁকে বলতে পেরেছিল 'আমার জীবন ধন্য হলো!'

পাগল!

বকুল অনেকের ভিড়ে অনেক পিছনে বসেছিল, শুধু অন্যকে বলা কথা শুনেছিল। অথবা কথাও শোনেনি! বকুল শুধু এক রূপময় শব্দময় আলোকময় জগতের দরজায় দাঁড়িয়েছিল—সমস্ত চেতনা লুপ্ত করে।

পৌষ মেলা দেখতে মেলার মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন সনৎকাকা।

বাধ্য হয়েই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হয়েছিল বকুলকে। কিন্তু বকুলের মনে হয়েছিল কী অর্থহীন এই ঘোরা! কী লাভ ওই মাটির কুঁজো, কাঠের বারকোশ, রঙিন কুলো, মেটে পাথরের বাসন, লোহার কড়া, চাটু আর নাগরদোলা দেখায়! ...অবশ্য শুধু ওই নয়, মেলায় আরো অনেক আকর্ষণ ছিল, লোকেরা তো ওই মেলার মাঠেই পড়ে থাকছিল, এবং তাদের মুখ দেখে আদৌ মনে হচ্ছিল না কোনো অর্থহীন কাজ করছে। শুধু বকুলেরই মনে হচ্ছিল, অনন্তকাল সেই দেবমন্দিরের দরজায় বসে থাকলেই বা কী ক্ষতি? জীবনে কি আর কখনো এ সৌভাগ্য হবে?

হয়ওনি। কতো-কতোগুলো দিন গিয়েছিল তারপর।

তারপর তো দেবতা বিদায় নিয়েছিলেন।

সনৎকাকা এসে বলেছিলেন, 'যাই ভাগ্যিস সেদিন বাপের রাগের ভয়ে আটকে বসে থাকোনি, তাই না—'

কিন্তু বকুলদের সংসারে বকুলের সনৎকাকার পরিচয় কি?

মাসিক পত্রিকার সম্পাদক?

প্রেসের মালিক?

পুস্তক প্রকাশক?

আসলে তো এইগুলোই পরিচয়ের সূত্র।

তবু আরও একটা টিকিট ছিল, যার জোরে সনৎকাকার এ বাড়িতে প্রবেশাধিকার। প্রবোধচন্দ্রের খুব দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই উনি। নইলে শুধু কাগজের সম্পাদক অথবা পুস্তক প্রকাশক হলে কে ডিঙোতে দিতো এ চৌকাঠ? আর কে গলাধঃকরণ করতো সেকথা—'মেয়েটি যে আপনার রত্ন প্রবোধদা! একে আপনি বাড়ি বসিয়ে রেখেছেন? কলেজে-টলেজে পাঠালে—'

কিন্তু শুধুই কি সম্পর্ক?

চরিত্র নয়?

যার জোরে জোর গলায় বলতে পারে মানুষ, 'আমার সঙ্গে যাবে, তবে আবার এতো চিন্তা কী?'

অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়, হঠাৎ শম্পার প্রশ্নে যেন অন্য জগৎ থেকে ছিটকে সরে এলেন অনামিকা দেবী।

শম্পা প্রশ্ন করছে, 'তোমার সেই সনাতনী বাবার মেয়ে হয়েও চিরকুমারী থেকে গেলে কী করে বল তো পিসি? যা সব গল্প শুনি তোমার বাবা বুড়োর! ...হতাশ প্রেম-ট্রেম নয় তো?

'তোর বড্ডো বাড় বেড়েছে শম্পা—'

'আহা বাড়বৃদ্ধিই তো ভালো পিসি! বল না তোমার ঘটনা-টটনা—'

'তোর মত রাতদিন ঘটনা ঘটাতাম, এই বুঝি মনে হয় তোর আমায় দেখে?'

'মনে অবশ্যি হয় না, তবে চিরকুমারী থাকাটার কারণটাও তো জানা দরকার।'

'তুই থামবি? ন্যাকি ধাড়ি বয়সে মার খাবি?'

বাচাল শম্পাকে ধমক দিয়ে থামালেন অনামিকা দেবী। কিন্তু ওর প্রশ্নের ধাক্কাটাকে তখুনি থামিয়ে ফেলতে পারলেন না। সেই আর একদিনের মতই ভাবতে বসলেন, তাঁর জীবনের এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, এই নিজের মনে নিজের মত থেকে যাওয়া, এটা আর কিছুই নয়, তাঁর ভাগ্যদেবতার অপার করুণার ফল। সে করুণার স্পর্শ সারাজীবনে বারেবারেই অনুভব করেছেন, তবু এটাই বুঝি সব চেয়ে বড়ো। যার জন্যে কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই তাঁর ভাগ্যের কাছে।

হতাশ প্রেম?

পাগল নাকি?

এখনকার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই 'প্রথম প্রেম'কে সকৌতুকে দেখে তার মূল্যায়ন করে অবজ্ঞা করছেন না অনামিকা দেবী, শুধু সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাকিয়ে দেখে বলেছেন, পাগল নাকি!

হতাশ প্রেমে কাতর হবার যার কথা, সে কী অনামিকা দেবী? সে তো বকুল।

সেই বকুলের পক্ষে কি অমন একটা অদ্ভুত কথা ভাবা সম্ভব ছিল?

বকুলের বাবা-দাদারা যদি যোগ্য পাত্র যোগাড় করে এনে, সেই তরুণী মেয়েটাকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিত, মেয়েটা কি এ যুগের সিনেমার নায়িকার মত বিয়ের পিঁড়ি থেকে ছিটকে উঠে, কনেচন্দন রুমালে মুছে ফুলের মালা গলা থেকে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে জমজমাটি বিয়েবাড়ি থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পথে বেরিয়ে পড়তে পারতো, 'এ অসম্ভব' 'এ অসম্ভব' বলতে বলতে?

নাকি অভিভাবকদের চেষ্টার মুখে তাদের মুখের ওপর বলতে পারতো, 'বৃথা চেষ্টা করবেন না। যদি করেন তো নিজের দায়িত্বে করবেন।'

নাঃ, এসব কিছুই করতে পারতো না সে। কেউই পারতো না তখন। বকুলরা 'দেবদাস' পড়ে মানুষ হওয়া মেয়ে। অভিভাবকরা বিয়ে দিলে সে বর 'হাতিপোতা'র জমিদারই হোক্ আর 'মশাপোতা'র ইস্কুলমাস্টারই হোক্, তার চাদরে গাঁটছড়া বেঁধে ঠিকই তার পিছু পিছু গিয়ে দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়াতো।

তারপর?

তারপর সারাজীবন সেই জীবনের জাবর কাটতো, আর কখনো কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হয়তো একটা উন্মনা নিঃশ্বাস ফেলতো।

পারুলের জীবনে 'প্রথম প্রেম'-ট্রেম কিছু নেই, তবু পারুলের জীবনটাও ওই জাবরকাটা ছাড়া আর কি? পারুলও অনেক উন্মনা নিঃশ্বাস ফেলেছে বৈকি। যে প্রেম জীবনে কখনো আসেনি তার বিরহেই নিঃশ্বাস ফেলেছে পারুল। হয়তো এখনো তার সেই গঙ্গার ধারের বারান্দায় পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যে নিঃশ্বাসটা ফেলে পারুল, সেটা তার ছেলেদের প্রতি অভিমানে নয়, সেই না-পাওয়ার গভীর শূন্যতার।

হঠাৎ একটা কথা ভাবলেন অনামিকা দেবী, 'নির্মল যদি সেজদিকে ভালবাসতো!'

যদিও পারুল নামের প্রখরা মহিলাটি 'নির্মল' নামের মেরুদণ্ডহীন ভীরু ছেলেটাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল, তবু এ কথাটা এতোদিন পরে মনে হলো অনামিকা দেবীর।

নির্মলের ওপর বকুল সম্পর্কে একটা প্রত্যাশা ছিল বলেই পারুল হয়তো অতো ধিক্কার দিয়েছিল ছেলেটাকে। যদি সে রকম কোনো প্রত্যাশা না থাকত, যদি ছেলেটা তার পরিপূর্ণ জীবনের মাঝখানে বসেও পারুলের দিকে দীন-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, পারুল হয়তো সম্পূর্ণতা পেতো। পারুল সেই সঞ্চয়টিকে পরম মূল্য দিতো।

সেজদি এখনো প্রেম-ট্রেম ভালো বোঝে—মনে মনে বললেন অনামিকা দেবী, আমার মত এমন নীরস হয়ে যায়নি। অবিরত যতো রাজ্যের কাল্পনিক লোকের প্রেম-ভালবাসার কথা লিখতে লিখতে, নিজের অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে আমার।

নইলে সেদিন মহাজাতি সদনে, সেই ফাংশনের দিন, কেমন করেই আমি—

হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন অনামিকা দেবী।

ভোঁতা হয়ে যাওয়া অনুভূতিও কি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে ঝনঝনিয়ে উঠলো? সেই ধাক্কায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন?...

নির্মল, সুনির্মল নামের সেই বড় চাকুরে ছেলেটার মধ্যেও বুঝি সব পেয়েও বরাবর সেজদির মতোই একটা না-পাওয়ার শূন্যতা ছিল।

তাই নির্মল বলেছিল, 'কতো গল্প লিখছো, আমাদের গল্পটা লেখো না।'

তখন আর মোতিহারীতে নেই নির্মল, বদলির চাকরির সূত্রে আরো কোথায়

যেন ছিল। সেখানে বাংলা পত্রিকা দুর্লভ, তবু খুঁজে খুঁজে পড়তো। আর ছুটিতে বাড়ি এলেই সেই নিতান্ত কম বয়সের মতো চেষ্টা করে করে উপলক্ষ খুঁজে অনামিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করে যেতো।

তা তখনো উপলক্ষ খোঁজার চেষ্টা করতে হতো বৈকি।

জগৎসংসারে এতো লোক থাকতে, একজন আর একটি জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছে, এটা ধরা পড়ে যাওয়া যে দারুণ লজ্জার। হোক না তাদের যতোই কেননা বয়েস, ধরা পড়লেই মারা গেলে!

আর পড়বেই ধরা।

ওই 'ব্যাকুলতা'টা এমনি জিনিস যে সংসারের ঝুনো মানুষগুলো তো দূরের কথা, শিশুর চোখেও ধরা পড়তে দেরি হয় না। শিশুও বিশেষ দৃষ্টিটা যে 'বিশেষ' তা বুঝে ফেলে কৌতূহল-দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে দেখে।

অতএব নিজের ক'বছরের যেন বাচ্চা ছেলেটাকেও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে, চেষ্টা করে করে উপলক্ষ সৃষ্টি করতো নির্মল।

তেমনি এক মিথ্যা উপলক্ষের মুহূর্তে গভীর একটু দৃষ্টি মেলে বলেছিল নির্মল, 'এতো গল্প লিখছো, আমাদের গল্পটা লেখো না!"

বকুল তো তখন অনামিকার খোলসে বন্দী, সে খোলস ভেঙে ফেলে বকুল হয়ে ফুটে উঠবার উপায় কই তার? বকুলকে তো চিরকাল ওই খোলসের বোঝাটা বয়ে বেড়াতেই হবে।

এই খোলস জিনিসটা বড় ভয়ানক, প্রথমে মনে হয় আমি বুঝি নিজেই গায়ে চড়ালাম ওটাকে, খুলে রাখতে ইচ্ছে হলেই খুলে রাখবো, কিন্তু তা হয় না। আস্তে আস্তে নাগপাশের বন্ধনে বেঁধে ফেলে সে, তার থেকে আর মুক্তি নেই।

অতএব অনামিকা দেবীকে অনামিকা দেবী হয়েই থাকতে হবে। আর কোনদিনই বকুল হওয়া চলবে না, অন্য আর কিছু হবার ইচ্ছে থাকলেও চলবে না।

কাজে কাজেই বকুলকে নির্মলের ওই ছেলেমানুষি কথায় হেসে উঠে বলতে হয়েছিল, 'আমাদের গল্প? সেটা আবার কী বস্তু?'

নির্মলের সেই ছেলেমানুষি অথচ গভীর চাহনির মধ্যে আঘাতের বেদনা ফুটে উঠেছিল। নির্মল আহত গলায় বলে উঠেছিল, 'এখন হয়তো সে বস্তু তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছো তুমি, তবু আমার কাছে সে সমান মূল্যবানই আছে। তুচ্ছ হয়ে যায়নি।'

মনকে চঞ্চল হতে দিতে নেই।

কারণ সেটা ছেলেমানুষি, সেটা ওই খোলসখানার উপযুক্ত নয়। তাই অচঞ্চল কৌতুকে বলতে হয়, 'ওরে বাবা! সেই তামাদি হয়ে যাওয়া দলিলটা এখনো আয়রন চেস্টে তুলে রেখেছো? তোমার তো খুব অধ্যবসায়!'

নির্মল তার প্রকৃতিগত আবেগের সঙ্গে বলেছিল, 'তোমার কাছে হয়তো তামাদি হয়ে গেছে বকুল, আমার কাছে নয়।'

'তাই তো, তা'হলে তো ভাবালে!'

বলে হেসে ফেলেছিলেন অনামিকা দেবী।

আর ভেবেছিলেন, মনে করি বুঝি অনুভূতির ধারগুলো সব ঘষে ঘষে ক্ষয়ে গেছে আমার, কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাই যদি হয়, কেন তবে ওকে দেখলে ভিতর থেকে এমন একটা উথলে-ওঠা আহ্লাদের ভাব আসে? কেন ওর যে কদিন ছুটি থাকে, মনে হয় আকাশ-বাতাস সব যেন আনন্দে ভাসছে? কেন ওর ছুটি ফুরোলে মনে হয়, কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে এক মাস হয়ে গেল? আর কেন মনে হয়, দিনগুলো

কেমন যেন একরঙা হয়ে গেল।

'ভাবাতে পারলাম ?' নির্মল আগ্রহের গলায় কৌতুক-স্বরে বলেছিল, 'সেটাও আশার কথা। তা ভাবনাটাকে রূপ দিয়ে ফেলো না, লেখো না আমাদের গল্প! এতো লিখছো বানানো গল্প!'

অনামিকা দেবীর ওই আবেগের দিকে তাকিয়ে মমতা হয়েছিল, হঠাৎ যেন কোথায় কোন্ ধূলোর স্তরের নিচে থেকে মাথা তুলে একটা বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট চুপি-চুপি বলে উঠেছিল, 'বাজে কথা বলছো কেন? বুকে হাত দিয়ে বল দিকি জিনিসটা একেবারে তামাদি হয়ে গেছে, একথা তুমি নিজেই বিশ্বাস করো!'

তাই অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, না হয় লিখলামই একটা সত্যি গল্প, কিন্তু তারপর ?'

'কী তারপর ?'

'লোকে ভুলে-টুলে গেছে, আবার তাদের মনে পড়িয়ে দিয়ে এই বুড়ো বয়সে ধরা পড়া তো ?' খুব তরল শুনিয়েছিল গলাটা।

নির্মলের ঝকঝকে চোখ দুটো হঠাৎ খুশির আলোয় ঝলসে উঠেছিল। নির্মল কি অনামিকার ওই তরলতার বুদ্বুদে 'বকুলে'র ছায়া দেখতে পেয়েছিল ?

আশ্চর্য, নির্মলের চোখের সেই ঝলকানিটা কোনোদিনই ম্লান হয়ে যায়নি। হয়তো এই দীপ্তিটা অন্য এক আলোর। হয়তো নির্মল তার জীবনের বহিরঙ্গের সমস্ত সমারোহের অন্তরালে একটি অন্তরঙ্গ কোণে একটি অকম্প দীপশিখা জেবলে, সেটিকে বিশ্বস্ততার স্ফটিকের কৌটোয় ভরে রেখেছিল, এই দীপ্তি সেই শিখার।

নির্মল সেই দীপ্তি দিয়ে বলেছিল, 'ধরা পড়ে যাওয়া মানে ? তবে আর কিসের বড় লেখিকা? এমন কৌশলে লিখবে যে, কেউ জানতেই পারবে না এটা "সত্যি" গল্প।

'চেনা লোকেরা পারবে।'

'উঁহু! যাতে না পারে, সেইভাবে লিখবে।'

হেসে উঠেছিলেন অনামিকা দেবী, 'তবে আর লিখে লাভ? কেউ যদি টেরই না পেলো ?'

'বাঃ, নাই বা টের পেলো। না পাওয়াই তো চাইছি। লোকের জন্যে তো নয়, নিজেদের জন্যেই। কেউ ধরতে পারবে না, শুধু আমরা দুজনে বুঝবো। বল তো কী মজা হবে সেটা ?'

'তাহলেও—', অনামিকা দেবী একটু দুষ্টু হাসি হেসেছিলেন, 'গল্পের মূল নায়িকা তো বড় জেঠিমাকেই করতে হবে ?'

'ধ্যেৎ! ওই গল্পটা লিখতে কে তোমায় সাধছে? একেবারে আমাদের নিজেদের গল্পটা লেখো। যে গল্পটা এখনো রোজ তৈরি হচ্ছে।'

'লিখলে কিন্তু পাল্লা দুটো ভয়ানক উঁচু-নিচু দেখাবে।' অনামিকা দেবী বলেছিলেন হেসে হেসে, 'একদিকে সুন্দরী স্ত্রী, সোনারচাঁদ ছেলে, মোটা মাইনের চাকরি, কর্মস্থলে প্রতিপত্তি, অন্যদিকে একটা অখাদ্য গল্পলেখিকা। বর জোটেনি, ঘর জোটেনি, তাই সময় কাটাতে কলম ঘষে।'

নির্মলের চোখের সেই ঝকঝকানির ওপর মেঘের ছায়া নেমে এসেছিল। নির্মল বলেছিল, 'সুন্দরী স্ত্রী, মোটা মাইনের চাকরি, সেটা বাইরের লোক দেখবে। তুমি লেখিকা, তুমিও সেটাই দেখবে ?'

'বাঃ, লেখিকা আবার নতুন কী দেখবে ?'

'লেখিকা দেখবে সমারোহের অন্তরালে অবস্থিত দৈন্য। দেখবে অনেক জমজমাটের ওপিঠের গভীর শূন্যতা। কিন্তু—', নির্মল মিষ্টি একটু হেসে বলেছিল, 'কিন্তু এ গল্পও এখন চাই না আমি। এ গল্প পরে লিখো, যখন মরে-টরে যাবো। আমি চাই সেই বোকা ছেলেমেয়ে দুটোর গল্প। "যাহারা আঁকেনি ছবি, সুজেছিল শুধু পটভূমি"।'

অনামিকা দেবী হেসে কুটিকুটি হয়ে বলেছিলেন, 'কেন? নতুন করে অনুভব করতে, কী বোকা ছিল তারা?'

তারপর বলেছিলেন, 'আচ্ছা লিখবো।'

নির্মল বললো, 'ঠিক আছে। কিসে দেবে বল, সেই পত্রিকাটার গ্রাহক হবো কাল থেকে।'

'আরে তুমি গ্রাহক হতে যাবে কোন্ দুঃখে? লেখিকা নিজেই না হয় পাঠিয়ে দেবে।'

'নাঃ।' ও মৃদু হেসে বলেছিলো, 'বিনা প্রতীক্ষায় পেলে সে জিনিস আর মূল্যবান থাকে না। এ বেশ প্রতি মাসে ডাকের প্যাকেটটা খোলবার সময় হাত কাঁপবে—'

অনামিকা দেবীর ভাবনা ধরে গিয়েছিল।

অনামিকা দেবীর মনে হয়েছিল, এমনি ছোট্ট ছোট্ট কথার চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নির্মল নামের ছেলেটা বুঝি অনামিকা দেবীর সেই অনেক আগে বন্ধ করে দেওয়া, অনেক নিচের পাতাল-ঘরটা খুলে ফেলতে চায়।

তাই অনামিকা দেবী খুব জোরে হেসে উঠেছিলেন, 'ও বাবা! বল কি? এতো?'

'তুমি ঠাট্টা করছো?'

'বাঃ, ঠাট্টা করবো কেন? এমনিই বলছি। এতো?'

নির্মল উদাস হাসি হেসে বলেছিল, 'ঠাট্টা অবশ্য করতে পারো তুমি, সে রাইট আছে তোমার। আমার আর মুখ কোথায়?'

'ও কথা বোলো না নির্মলদা,' বকুল তখন ব্যাকুল হয়ে বলেছিল, 'ও কথা কোনোদিনও বলবে না। আমার মতে এটাই ভালো হয়েছে।'

'তাই ভাববো!'

দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত একটা শব্দ পেয়েছিলেন অনামিকা দেবী।

তারপর আবার সেই আবেগের গলায় উচ্চারিত কথা, 'আমি কিন্তু প্রতীক্ষা করবো।'

বলেছিল নির্মল।

প্রতীক্ষা করবো!

কিন্তু সে গল্প লেখা হয়েছিল কোনোদিন?

কই আর?

লেখা হলে আর সেই ঘর-সংসারী বড় বয়সের মানুষটা কতোদিন পরে আবার একখানা চিঠি লিখে বসবে কেন? 'কই? কোথায় সেই গল্প? যে গল্প কেবল তুমি বুঝবে আর আমি বুঝবো, আর কেউ বুঝতে পারবে না!'

হ্যাঁ, অকস্মাৎ একদিন সেই চিঠিটা এসে হাজির হয়েছিল। অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অনামিকা দেবী। আশ্চর্য রকমের ছেলেমানুষ আছে তো মানুষটা ? এখনো সেই 'গল্প'টার কথা মনে রেখে বসে আছে ? এখনো ভাবছে সেই গল্পটা ভালো লাগবে তার ? শুধু একা বুঝে ফেলে পরম আনন্দে উপভোগ করবে ?

অথবা পরম বেদনায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে দীর্ঘশ্বাসকে মিশিয়ে দেবে অনন্তকালের বিরহী হিয়ার তপ্তশ্বাসের সঙ্গে!

ভগবান জানেন কী ভাবছে।

কিন্তু আশ্চর্য লাগে বৈকি।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে, অথচ মাধুরী-বৌকে ও প্রাণতুল্য ভালবাসে। নিবিড় গভীর স্নেহ-সহানুভূতি ভরা সেই ভালবাসার খবর বকুলের অজানা নয়। অজানা নয়, এই অনামিকা দেবীরও। তবু সেই অতীত কৈশোরকালের 'প্রথম-প্রেম' নামক হাস্যকর মূঢ়তাটুকুকে আজো আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা !

আজও ওর প্রাণের মধ্যে গোপন গভীরে সেই মূঢ়তাটুকুর জন্যে হাহাকার !

হয়তো ওর এই ছেলেমানুষি মনটা বজায় থাকার মূলে রয়েছে মাধুরী-বৌয়ের আশ্চর্য হৃদয়ের অনাবিল ভালবাসার অবদান। মাধুরী-বৌ যদি সংসারের আরো অসংখ্য মেয়ের মত ঈর্ষাবিদ্বেষ, সন্দেহ আর অভিমানে ভরা একটা মেয়ে হতো, যদি মাধুরী-বৌ তার তীব্র তীক্ষ্ণ অধিকারের ছুরিটা নিয়ে ওই অবোধ মানুষটার সেই মূঢ়তাটিকে দীর্ণবিদীর্ণ ছিন্নভিন্ন করে উৎপাটিত করে ফেলবার কাজে উৎসাহী হয়ে উঠতো, যদি ওকে বুঝিয়ে ছাড়তো 'এখনো তোমার ওই প্রথম প্রেমকে পরম প্রেমে লালন করাটা মহাপাতক' তাহলে কী হতো বলা যায় না। হয়তো মূঢ় ছেলেমানুষটা সেই তীব্র শাসনবাণীতে কুণ্ঠিত হয়ে গুটিয়ে যেতো, সঙ্কুচিত করে ফেলতো নিজেকে।

কিন্তু মাধুরী-বৌ কোনো দিন তা করেনি।

মাধুরী-বৌ ওকে যেন মাতৃহৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে। ভালবেসেছে বন্ধুর হৃদয় দিয়ে।

মাধুরী-বৌ ওর ওই 'প্রথম প্রেমে'র প্রতি নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা করে।

চিঠি মাধুরী-বৌও লিখতো বকুলকে।

অথবা বলতে পারা যায় মাধুরী-বৌই লিখতো। নির্মল তো মাত্র দুবার। সেই অনেক দিন আগে ছোট্ট দু'লাইনের একটা, কী যে তাতে বক্তব্য ছিল ভুলেই গেছেন অনামিকা দেবী। আর তারপর অনেক দিন পরে এই চিঠি।

যোগাযোগ রাখতো মাধুরী-বৌ।

কোথায় কোথায় বদলি হয়ে যাচ্ছে তারা, কেমন কোয়ার্টার্স পাচ্ছে, দেশটা কেমন, এমনি ছোটখাটো খবর দেওয়া চিঠি।

কিন্তু বকুল ?

উত্তর দিতো নিয়মিত ?

নাঃ। মোটেই না।

প্রথম দিকে ভদ্রতা করে দিয়েছিল উত্তর দু'চারটে, তারপর আর নয়!
কিন্তু কেন?
তারপর কি অভদ্র হয়ে গেল? নাকি অহঙ্কারী হয়ে গেল? অথবা অলস?
তা ঠিক নয়।
বকুল নিষেধাজ্ঞা পালন করতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।
তা এই নিষেধাজ্ঞা কি বকুলের বড়দার? না নির্মলের সেই বড় জেঠির?
সেই নিষেধাজ্ঞা পালন করেছিল বকুল?
নাঃ, তখন আর অতোটা হাস্যকর কোনো ঘটনা ঘটেনি।
নিষেধাজ্ঞা ছিল স্বয়ং পত্রদাত্রীর।

মাধুরী-বৌ নিজেই লিখেছিল, 'আমাদের খবরটা দিয়ে মাঝে মাঝে আমি তোমায় চিঠি দেব ভাই, তাতে তুমি খুশি হও না-হও, আমি খুশি হবো। তুমি কিন্তু ভাই উত্তরপত্রটি দিও না।...কী? ভাবছো নিশ্চয় এ আবার কোন্ ধরনের ভদ্রতা? তা তুমি ভাবলেও, এ অভদ্রতাটি করছি ভাই আমি। হয়তো এমন অদ্ভুত অভদ্রতা সংসারের আর কারো সঙ্গেই করতে পারতাম না, শুধু তুমি বলেই পারলাম। জানি না এটা পারছি তুমি লেখিকা বলে, না আমার বরের প্রেমিকা বলে। যাই হোক, মোট কথা পারলাম। না পেরে উপায় কি বল? যে দিন তোমার চিঠি আসে, লোকটার আহারনিদ্রা যে প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়!

খেতে বসে খিদে কম, শুতে গিয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। আবার এমনও সন্দেহ হয় আমায় বুঝি ঈর্ষাই করছে। যে বস্তু ওর কাছে দুর্লভ, সে বস্তু আমি এমন অনায়াসে লাভ করছি, এটা হিংসের বিষয় হলেও হতে পারে তো?

অথচ বাবুর নিজে সাহস করে লেখার মুরোদ নেই। বলেছিলাম, আমার চিঠি পড়ছো কি জন্যে শুনি? ইচ্ছে হয় নিজে চিঠি লিখে উত্তর আনাও। আমার চিঠিতে তো আছে ঘোড়ার ডিম, তোমার চিঠিতে বরং রোমান্স-টোমান্স থাকবে।... তা উচিত মত একটা জবাবই দিতে পারলো না। রেখে দিয়ে বললো, "ঠিক আছে, পড়তে চাই না।"

বোঝ ভাই!

এর পরে আবার মান খুইয়ে পড়তেও পারবে না, দীর্ঘশ্বাস আরো বাড়বে।'

এই রকমই চিঠি লিখতো মাধুরী-বৌ।

একবার লিখেছিল, 'মাঝে মাঝে ভাবি, আশ্চর্য, তোমরা চিঠি লেখালিখিই বা করো না কেন?' চিঠির দ্বারা আর সমাজকে কতোটা রসাতলে দেওয়া যায়? আবার ভাবি, থাক্‌গে, হয়তো এই-ই ভালো। লক্ষ্মীর কৌটোয় তুলে রাখা মোহর ভাঙাতে না বেরোনোই ভালো।'

আর একবার লিখেছিল, 'উঃ বাবা, ক্রমে ক্রমে কী লেখিকাই হয়ে উঠছো! এখানে তো তোমার নামে ধন্য ধন্য। আমি বাবা মরে গেলেও ফাঁস করি না, এই বিখ্যাত লেখিকাটি আমার চেনা-জানা।...কী দরকার বলো? এনে তো দেখাতে পারবো না? তাছাড়া এও ভাবি সত্যিই কি চেনা-জানা? যে 'তুমি'-কে দেখি, গল্প কর, হয়তো বা হতাশ প্রেমের নায়িকা বলে মাঝে মাঝে করুণাও করে বসি, এই সব জটিল কুটিল ভয়ঙ্কর গল্পটল্প কি তারই লেখা? না আর কেউ লিখে দেয়? সত্যি ভাই, তোমার মুখের ভাষার সঙ্গে তোমার লেখার ভাষার আদৌ মিল নেই। ...তবু মাঝে মাঝে ওই অভাগা লোকটার জন্যে মায়া হয়। এমন একখানি নিধি ঘরে তুলতে পারতো বেচারা, কিন্তু বিধি বাম হলো। তার বদলে কপালে এই রাঙামুলো।'

শেলষ করে লিখতো না, অসূয়ার বশেও লিখতো না, মনটাই তো এমনি সহজ সরল মাধুরী-বৌয়ের। মেয়েমানুষের মন এমন অসূয়াশূন্য, এটা বড় দুর্লভ।

... ...

মাধুরী-বৌ-বলেছিল, 'লক্ষ্মীর কৌটোয় তুলে রাখা মোহর না ভাঙানোই ভালো।'

তবু সেবার সে মোহর বার করে বসেছিল নির্মল। কে জানে মাধুরী-বৌকে জানিয়ে কি না-জানিয়ে।

হয়তো জানায়নি।

হয়তো অফিসে বসে লিখে পাঠিয়েছে, 'কই ? কোথায় সেই গল্প ? যে গল্প কেবল তুমি বুঝবে, আর আমি বুঝবো। আর কেউ বুঝবে না।...চিঠির উত্তর চাই না, গল্পটাই হবে উত্তর।'

চিঠির উত্তর দিতে নির্মলও বারণ করেছিলেন।

পড়ে হেসে ফেলেছিলেন অনামিকা দেবী। তাঁর ভাগ্যটা মন্দ নয়, লোকে চিঠি দিয়ে উত্তর দিতে বারণ করে।

কিন্তু উত্তর স্বরূপ যেটা চেয়েছিল ?

যার জন্যে হয়তো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করেছিল। সে গল্প কোথায় ?...সেই এক বিদারণ-রেখা টানা আছে অনামিকা দেবীর জীবনে। সে গল্প লেখা হয়নি।

অথচ তারপর কতো গল্পই লিখলেন। এখনো লিখে চলেছেন।

কিন্তু একেবারেই কি লেখা হয়নি সে গল্প ?

সে দিন মহাজাতি সদন থেকে ফিরে চুপিচুপি সেই প্রশ্নটাই করেছিলেন অনামিকা দেবী আকাশের কোন এক নক্ষত্রকে, 'একেবারেই কি লিখিনি তোমার আর আমার সেই গল্পটা ? লিখেছি লিখেছি! লিখেছি নানা ছলে, নানা রঙে, নানা পরিবেশের মাধ্যমে। আমাদের গল্পটা রেণু রেণু করে মিশিয়ে দিয়েছি "অনেক-দের" গল্পের মধ্যে!

তবু—

তুমি জেনে রইলে, অনেক গল্প লিখলাম আমি, শুধু তোমার আর আমার সেই গল্পটা লিখলাম না কোনো দিন। তুমি অনেকবার বলেছো, তবু লিখিনি। তুমি প্রতীক্ষা করেছো ছেলেমানুষের মত, হতাশ হয়েছো ছেলেমানুষের মত, বুঝতেও পেরেছি সেকথা, তবু হয়ে ওঠেনি।

কেন হয়ে ওঠেনি, আমি নিজেই ভাল জানি না। হয়তো পেরে উঠিনি বলেই। তবু আজ আমার সে কথা ভেবে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। খুব যন্ত্রণা।

কিন্তু নক্ষত্রটা কি বিশ্বাস করেছিল সেকথা ? বিশ্বাস করবার তো কথা নয়। সে তো সব কিছুই দেখেছিল আকাশের আসনে বসে।

দেখেছিল 'মহাজাতি সদনে' মস্ত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, ভিড়ে ভেঙে পড়েছে হল্, আলোয় ঝলমল করছে প্রবেশদ্বার।

মস্তবড় একখানা গাড়ি থেকে নামলেন অনুষ্ঠানের সভানেত্রী। এরাই পাঠিয়ে-ছিল গাড়ি।

শান্ত প্রসন্ন চেহারা, ভদ্রমার্জিত সাজসজ্জা। উদ্যোক্তাদের আভূমি নমস্কারের বিনিময়ে নমস্কার করছেন। পাড়ার সেই একটা ছেলে, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের কোনো একখানে যার বাড়ি, অনামিকা দেবীকে ধরে কবে এই অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র এক-

খানা যোগাড় করেছিল, সেই ছেলেটা কেমন করে যেন মহাজনবেষ্টিত সভানেত্রীর একেবারে কাছ ঘেঁষে খুব চাপা গলায় বললো, 'আপনিও বেরিয়ে এলেন, আর সংগে সংগেই আপনাদের পাশের বাড়িতে একটা স্যাড্ ব্যাপার ! বিরাট কান্নাকাটি!'

ছেলেটা কাছ ঘেঁষে আসার চেষ্টা করায় অনামিকা দেবী ভাবছিলেন, তাঁর সংগ ধরে একেবারে প্রথম সারির চেয়ারে গিয়ে বসবার তাল করছে বোধ হয়।... পাড়ার ছেলেরা সুযোগ-সুবিধের তালটা খোঁজে, বাড়ির ছেলেরা কদাচ নয়। অনামিকা দেবীর ভাইপোরা কোনোদিন সামান্য একটা কৌতূহল প্রশ্নও করে না অনামিকা দেবীর গতিবিধি সম্পর্কে। কদাচ কখনো কোনো ভালো অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র উপহার দিয়ে দেখেছেন, দেখতে যাবার সময় হয়নি ওদের। অথচ তার থেকে বাজে জিনিসও দেখতে গিয়েছে পয়সা খরচ করে। গিয়েছে হয়তো পরদিনই।

পাড়ার ছেলেরাই সুযোগ-টুযোগের আশায় কাছে ঘেঁষে আসে।

অনামিকা দেবী ভাবলেন তাই আসছে। কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ কাছ ঘেঁষে এসে পাশের বাড়ির খবর দিতে বসলো।

বললো, 'আপনিও যেই বেরিয়ে এলেন—'

অনামিকা দেবী ঝাপসা ভাবে একবার তাঁর বাড়ির এপাশ-ওপাশ স্মরণ করলেন।

তারাচরণবাবুর মা মারা গেলেন তা হলে, ভুগছিলেন অনেক দিন ধরে। বললেন, 'তাই নাকি ? আমি তো—'

এগিয়ে চলেছেন উদ্যোক্তারা, ছেলেটাকে পাশ-ঠ্যালা করছেন তবু ছেলেটা যেন নাছোড়বান্দা।

হয়তো ও সেই স্বভাবের লোক, যারা কারো কাছে একটা দুঃসংবাদ পরিবেশন করবার সুযোগটাকে বেশ একটা প্রাপ্তিযোগ মনে করে। তাই সুযোগটাকে ফস্কাতে চায় না। সংগে সংগে এগোতে থাকে, হলের মধ্যে ঢুকে যায়, আর হঠাৎ একবার 'চান্স' পেয়ে বলে নেয়, 'আপনি কি করে জানবেন? তক্ষুনি টেলিগ্রাম এলো। ওই যে আপনাদের পাশের বাড়ির সুনির্মলবাবু ছিলেন! বক্সারে থাকতেন—'

কথাটা শেষ করতে পেলো না।

ততক্ষণে তো অনামিকা দেবীকে মঞ্চে তোলার জন্য গ্রীনরুমের দিকে নিয়ে চলে গেছে এরা। সর্বসমক্ষে দোদুল্যমান ভেলভেটের পর্দার ওদিকে সাজিয়ে বসিয়ে মাহেন্দ্রক্ষণে যবনিকা উত্তোলন করবে।

এখনো ভাবতে গেলে বিস্ময়ের কূল খুঁজে পান না অনামিকা দেবী।

বুঝতে পারেন না সত্যিসত্যিই সেই ঘটনাটা ঘটেছিল কিনা। অথচ ঘটেছিল। যবনিকা উত্তোলিত হয়েছিল নাটকীয় ভঙ্গীতে, উৎসুক দর্শকের দল দেখতে পেয়েছিল সারি সারি চেয়ারে সভানেত্রী, প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক সমাসীন।

তারপর নাটকের দৃশ্যের মতই পর পর দেখতে পেয়েছিল, উদ্বোধন সংগীত অন্তে তিন প্রধানকে মোটা গোড়ে মালা পরিয়ে দেওয়া হলো, সমিতি-সম্পাদক উদাত্ত ভাষায় তাঁদের লক্ষ্য, আদর্শ ইত্যাদি পেশ করলেন। তারপর একে একে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সভানেত্রী ভাষণ দিলেন, তারপর যথারীতি সমাপ্তি সংগীত হলো।

আর তারপর আসল ব্যাপার সংস্কৃতি অনুষ্ঠান শুরু হবার জন্যে পুনর্বার যবনিকা নামলো।

সভানেত্রীর ভাষণ হয়েছিল কি ?

হয়েছিল বৈকি।

এমন জমজমাটি অনুষ্ঠানের ত্রুটি হতে পারে কখনো ?

তারপর যদি সভানেত্রী হঠাৎ অসুস্থতা বোধ করে বাড়ি চলে যান, তাতে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হবার কথা নয়।

না, কোনো ত্রুটি হয়নি অনুষ্ঠানের।

সভানেত্রীর ভাষণেও নাকি ত্রুটির লেশ ছিল না। উদ্যোক্তাদের একজন এ অভিমতও প্রকাশ করলেন, এই রকম মৃদু সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষণই তাঁরা চান। দীর্ঘ বক্তৃতা দু'চক্ষের বিষ।

অতএব ধরা যেতে পারে সভা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাছাড়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছাজ্ঞাপন ইত্যাদি সব কিছুই ঠিক মত সাজানো হয়েছিল।

আকাশের সেই নক্ষত্রখানি আকাশের জানলা দিয়ে সবই তো দেখেছিল তাকিয়ে।

কী করে তবে বিশ্বাস করবে সে, এই ভয়ানক যন্ত্রণাটা সত্যি। বিশ্বাস করেনি, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেনি। হয়তো মৃদু হেসে নিঃশব্দ উচ্চারণে বলেছিল, 'এতোই যদি যন্ত্রণা তো, ওই সব সাজানো-গোছানো কথাগুলি চালিয়ে এলে কী করে শুনি ? শোনামাত্রই তো সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তে পারতে তুমি। এরকম ক্ষেত্রে যেটা খুব স্বাভাবিক ছিল।'

আকস্মিক সেই অসুস্থতাকে লোকে এমন কিছু অস্বাভাবিক বলেও মনে করতো না।

বলতো 'গরমে', বলতো 'অতিরিক্ত মাথার খাটুনিতে'। অথবা বলতো, 'শরীর খারাপ নিয়ে এসেছিলেন বোধ হয়'।

আর কী ?

সভা পণ্ড হতো ?

পাগল !

রাজা বিনে রাজ্য চলে, আর সভানেত্রী বিহনে সভা চলতো না ?

কতো কতো জায়গায় তো এমনিতেই 'সভাপতির অন্তর্ধান' ঘটে। 'এই আসছেন এখুনি আসছেন', 'আনতে গেছে' বলতে বলতে কর্তৃপক্ষ হাল ছেড়ে দিয়ে আর কোনো কেষ্টবিষ্টুকে বসিয়ে দেন সভাপতির আসনে।

অনামিকা দেবী সেদিন হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাই হতো। তাছাড়া আর কী লোকসান ?

অথচ ওই মূর্খ সভানেত্রী আপ্রাণ চেষ্টায় সেই সংজ্ঞাটাকেই ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। সত্যিই তাই করেছিলেন অনামিকা। ওই পালিয়ে যেতে চেষ্টা করা বস্তুটাকে ধরে রাখবার জন্যে তখন যেন একটা লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন।

হার মানবো না।

কিছুতেই হার মানবো না।

বুঝতে দেবো না কাউকে। জানতে দেবো না আমার মধ্যে কী ঘটছে।

কিন্তু সম্ভব হয়েছিল তো।

বহুবার নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছে বকুল, কী করে হলো সম্ভব ?

তার মানে আসলে 'মন' নামক লোকটার নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই ? সে শুধু পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত !

ভগবান সম্পর্কে কখনোই খুব একটা চিন্তা ছিল না বকুলের। চলিত কথার নিয়মে 'ভগবান' শব্দটা ব্যবহার করতো হয়তো। 'ভগবান খুব রক্ষে করেছেন।' 'ভগবান জানেন কী ব্যাপার!' 'খুব ভাগ্যি যে ভগবান "অমুক"টা করেননি'!

এই রকম।

এ ছাড়া আর কই ?

শুধু এই একটি জায়গায় ভগবানকে মুখোমুখি রেখে প্রশ্ন করেছে বকুল, এখনো করে, 'ভগবান! কী দরকার পড়েছিল তোমার ওই শান্ত সভ্য অবোধ মানুষটাকে তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার? কী ক্ষতি হতো তোমার, যদি সেই মানুষটা পৃথিবীর একটুখানি কোণে সামান্য একটু জায়গা দখল করে থাকতো আরো কিছুদিন! তোমার ওই আকাশে তো নক্ষত্রের শেষ নেই, তবে কেন তাড়াতাড়ি আরও একটি বাড়াবার জন্যে এমন নির্লজ্জ চৌর্যবৃত্তি তোমার!'

ভগবানকে উদ্দেশ্য করে কথা বলার অভ্যাস সেই প্রথম।

ভগবানের নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হয়ে, ভগবানের নিষ্ঠুরতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়ে।

বকুলের খাতায় ছন্দের চরণধ্বনি উঠলেই সে ধ্বনি পৌঁছে যেতো সেজদির কাছে। এটাই ছিল বরাবরের নিয়ম।

শুধু সেই একসময়, 'মহাজাতি সদনে' অনুষ্ঠিত ফাংশানের ক'দিন পরে বকুলের খাতায় ছন্দের পদপাত পড়েছিল, কিন্তু সেজদির কাছে পৌঁছয়নি। খাতার মধ্যেই সমাধিস্থ হয়ে আছে সে।

সেই খাতাটা, যার পাতার খাঁজে সেই চিঠিখানা ঘুমিয়ে আছে এখনো।

'কই ? কোথায়? আমাদের সেই গল্পটা ?'

না, সেজদির কাছে যায়নি খাতার সেই পৃষ্ঠাটা। গেলে হয়তো যত্নের ছাপ পড়তো তাতে। দেখা হতো ছন্দে কতটা ত্রুটি, শব্দচয়নে কতটা দক্ষতা।

আর হয়তো শেষ পর্যন্ত শেষও হতো। কোনো একখানে সমাপ্তির রেখা টানা হতো। কিন্তু ওটা যায়নি সেজদির কাছে। বকুলের অক্ষমতার সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে খাতার মধ্যে।

অথচ সেই রাত্রেই লেখেনি বকুল যে, অক্ষমতাটাকে ক্ষমা করা যাবে। লিখে-ছিল তো ক'দিন যেন পরে—

লিখেছিল—

রাত্রির আকাশে ওই বসে আছে যারা
    স্থির অচঞ্চল,
    আলোক স্ফুলিঙ্গ সম
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারা,
    আমরা ওদের জানি।
পৃথিবী হতেও বড়ো বহু বড়ো
    গ্রহ উপগ্রহ।
নাম-পরিচয়হীন দূরান্তের পড়শী মোদের।
দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে অহর্নিশি আবর্তিছে
    আপন আপন কক্ষে।
    কিরণ বিকীর্ণ করি।
বিজ্ঞানের জ্ঞানলোকে
    ধরা পড়ে গেছে ওদের স্বরূপ।

অনেক অঙ্কের আর অনেক যুক্তির
সারালো প্রমাণে
রাখেনি কোথাও সন্দেহের অবকাশ।
ওরা সত্য, ওরা গ্রহদল।
তবু মনে হয়—
জীবনের ঊষাকালে মাতৃমুখ হতে—
শুনেছি যা ভ্রান্তবাণী, শিখেছি যা ভুল,
সব চেয়ে সত্য সেই।
সত্য সব চেয়ে যুক্তিহীন বুদ্ধিহীন
সেই মিথ্যা মোহ।
তাই স্তব্ধ রাত্রিকালে,
নিঃসীম নিকষপটে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলি
দেখি চেয়ে চেয়ে—
অনেক তারার মাঝে কোথা আছে
দুটি আঁখিতারা।
যে দুটি তারকা কোটি কোটি যোজনের
দূরলোকে বসি
চেয়ে আছে তন্দ্রাহীন।
চেয়ে আছে সকরুণ মৌন মহিমায়
মাটির পৃথিবী'পরে।
যেথা সে একদা—
একটি নক্ষত্র হয়ে জ্বলিত একাকী
আলোকিয়া একখানি ঘর।
নিয়তির ক্রূর আকর্ষণে যেথা হতে নিয়েছে বিদায়
প্রাণবৃন্তখানি হতে ছিঁড়ে আপনারে।
লক্ষ ক্রোশ দূর হতে—
লক্ষ্য স্থির করি
হয়তো সে আছে চেয়ে
সেই গৃহখানিপানে নতনেত্র মেলি।
হয়তো দেখিছে খুঁজে—
দীপহীন দীপ্তিহীন সেই ঘর হতে
দুটি নেত্র আছে কিনা জেগে
ঊর্ধ্ব আকাশেতে চেয়ে।
কোটি তারকার মাঝে
খুঁজিবারে দুটি আঁখিতারা
সহসা একদা যদি—

না, আর লেখা হয়নি।

কতকাল হয়ে গেল, খাতার পাতার রংটা হলদেটে হয়ে গেছে, ওটা অসমাপ্তই রয়ে গেল। কি করে তবে বলা যায় 'মন' নামক কোনো সত্যবস্তু আছে?

না নেই, 'মন' নামক কোনো সত্য বস্তু নেই। অন্ততঃ অনামিকা দেবীর মধ্যে তো নেইই। থাকলে তারপর আরো অনেক অনেক গল্প লিখতে পারতেন না তিনি। থাকলে সেই চিঠিখানাই তাঁর কলমের মুখটা চেপে ধরতো। বলে উঠতো, 'থামো

থামো, লজ্জা করছে না তোমার ? ভুলে যাচ্ছো নক্ষত্রেরা অহর্নিশি তাকিয়ে থাকে।'

কিন্তু সে সব কিছু হয়নি। সে কলম অব্যাহত গতিতে চলেছে। বরং দিনে দিনে নাকি আরো ধারালো আর জোরালো হচ্ছে। অন্ততঃ শম্পা তো তাই বলে। আর শম্পা নিজেকে এ যুগের পাঠক-পাঠিকা সমাজের মুখপাত্র বলেই বিশ্বাস রাখে।

শম্পা মাঝে মাঝেই এসে বলে, 'আচ্ছা পিসি, তুমি এমন ভিজেবেড়াল প্যাটার্নের কেন ?'

অনামিকা দেবী ওর কোনো কথাতেই বিস্ময়াহত হন না, তাই মৃদু হাসেন। অথবা বলেন, 'সে উত্তর সৃষ্টিকর্তার কাছে। তুই বা এমন বাঘিনী প্যাটার্নের কেন, সেটাও তো তা'হলে একটা প্রশ্ন।'

'বাজে কথা রাখো।' শম্পা উদ্দীপ্ত গলায় বলে, 'তোমায় দেখলে তো স্রেফ একটি ভোঁতা পিসিমা মনে হয়, অথচ কলম থেকে লেখাগুলো এমন জব্বর বার করো কী করে বাছা ?'

আজও শম্পা উদ্দীপ্ত মূর্তিতেই এসে উদয় হলো, 'নাঃ, তোমার ওই "ভিজে বেড়াল" নামটাই হচ্ছে আসল নাম।'

অনামিকা দেবী বোঝেন তাঁর সাম্প্রতিককালের কোনো একটা লেখা ওর বেদম পছন্দ হয়ে গেছে, উচ্ছ্বাস তৎ-দরুন। মৃদু হেসে বলেন, 'সে কথা তো আগেই হয়ে গেছে।'

'গেছে, তবু কিছুটা সংশয় ছিল, আজ সেটা ঘুচলো।'

'বাঁচলাম।'

'তুমি তো বাঁচলে, মুশকিল আমারই। তোমার কাছে এসে বসলেই ভাবনা ধরবে ভিজে বেড়ালটির মতো চক্ষু মুদে বসে আছো, কিন্তু কোন্ ফাঁকে অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে বসছো।'

'তাতে ভাবনাটা কী?' অনামিকা হাসেন, 'তোর অন্তস্তলে তো আর কোন কালিঝুলি নেই !'

'সে না হয় আমার নেই।' শম্পা অনায়াস মহিমার গলায় বলে, 'আমার ভেতরটা না হয় দেখেই ফেললে, বয়েই গেল আমার। কিন্তু অন্যদের ? তাদের কথাও তো ভাবতে হবে।'

'তুই-ই ভাব। তারপর আমার কী কী শাস্তিবিধান করিস কর।'

'শাস্তি !'

শম্পা উত্তাল গলায় বলে, 'শাস্তি কী গো ? বল পুরস্কার! কী একখানা মারকাটারী গল্প লিখেছো এবারের "উদয়নে", পড়ে তো আমার কলেজের বন্ধুরা একেবারে "হাঁ"। বলে, আচ্ছা তোর পিসিকে তো আমরা দেখেছি, দেখলে তো একেবারেই মনে হয় না উনি আমাদের, মানে আর কি আধুনিক মেয়েদের এমন বোঝেন। আশ্চর্য, কী করে উনি আধুনিক মেয়েদের একেবারে যাকে বলে গভীর গোপন ব্যথা-বেদনার কথা এমন করে প্রকাশ করেন ? সত্যি পিসি, তোমায় দেখলে তো মনে হয় তুমি আধুনিকতা-টাধুনিকতা তেমন পছন্দ কর না।'

অনামিকা দেবী ঈষৎ গম্ভীর গলায় বলেন, 'এমন কথা মনে করার হেতু?'

'কী মুশকিল! মনে করার আবার হেতু থাকে?'

'থাকে বৈকি ! কার্য থাকলেই কারণ থাকবে, এটা তো অবধারিত সত্য। দেখা সে কারণ।'

'ওরে বাবা, অতো চেপে ধরো না। ওরাই তো বলে।'

'দ্যাখ বিচ্ছু, তোর ওই ওদের যদি কখনো এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাস তো বলিস "আধুনিকতা" আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়। আর—' অনামিকা দেবী একটু হাসলেন, 'আর "আধুনিক" শব্দটার বিশেষ একটা অর্থ আছে, ওটা বয়েস দিয়ে মাপা যায় না। একজন অশীতিপর বৃদ্ধও আধুনিক হতে পারেন, একজন কুড়ি বছরের তরুণ যুবকও প্রাচীন হতে পারে। ওটা মনোভঙ্গী। কেবলমাত্র বয়সের টিকিটখানা হাতে নিয়ে যারা নিজেদের "আধুনিক" ভেবে গরবে গৌরবে স্ফীত হয়, তারা জানে না ও টিকিটটা প্রতিমুহূর্তে বাসি হয়ে যাচ্ছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কুড়ি বছরটা পঁচিশ বছরের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হাসবে। আমি একজনকে জানি, আজ যাঁর বয়েস আশীর কম নয়, তবু তাঁকেই আমি আমার জানা জগতের সকলের থেকে বেশী আধুনিক মনে করি।'

'জানি নে বাবা!' শম্পা দুই হাত উল্টে বলে, 'তোমার সেই আশী বছরের আধুনিকটিকে দেখিয়ে দিও একদিন, দেখে চক্ষু সার্থক করা যাবে। তবে তোমার ওই উদয়নের "নবকন্যা" পড়ে কলেজের মেয়েরা তোমায় ফুলচন্দন দিচ্ছে এই খবরটা জানিয়ে দিলাম। লিলি তো বলছিল, ইচ্ছে হচ্ছে গিয়ে পিসির পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।...লেখক মশাইরা তো দেখতে পান শুধু যুগযন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরা ছেলে-গুলিকেই, সে যন্ত্রণা যে মেয়েদের মধ্যেও আছে, তা কে কবে খেয়াল করেছে। ওনারা জানেন কেবলমাত্র দেহযন্ত্রণা ছাড়া মেয়েদের আর কোনো যন্ত্রণা নেই। ঘেন্না করে, লজ্জা করে, রাগে মাথা জ্বলে যায়। পিসিকে গিয়ে বলবো—'

অনামিকা দেবী কথায় বাধা দিয়ে বলেন, 'তা যেন বুঝলাম, কিন্তু পায়ের ধুলো নেওয়া! সেটা যে বাপু বড্ড সেকেলে! এই তোর বন্ধু! সেকেলে গহিয়া! ছি!'

'তা বলো! ক্ষতি নেই!'

শম্পা গেঁটিয়ে বিছানায় বসে গম্ভীর গলায় বলে, 'দ্যাখো পিসি, তোমায় আর আমি কী বলবো, তুমি কী না বোঝ! তবে আমি তো দেখছি আসলে প্রাণের মধ্যে যখন সত্যিকার আবেগ আসে তখন তোমার গিয়ে ওসব সেকেলে একেলে জ্ঞান থাকে না।'

'থাকে না বুঝি!'

'কই আর? নিজেকে দিয়েই তো দেখলাম, সাতজন্মেও ঠাকুর-দেবতার ধার ধারি না, ধারেকাছেও যাই না, যারা ওই সব ঠাকুর-টাকুর করে তাদের দিকে বরং কৃপার দৃষ্টিতে তাকাই। কিন্তু তোমার কাছে আর বলতে লজ্জা কি, জাম্বোর যেদিন হঠাৎ একেবারে একশো ছয় জ্বর উঠে বসলো চড়চড় করে, ডাক্তার মাথায় হাত দিয়ে পড়লো বলেই মনে হলো, সেদিন না দুম করে ঠাকুরের কাছে মানত না কি যেন তাই করে বসলাম। বললাম, হে ঠাকুর, ওর জ্বর ভালো করে দাও, তোমায় অনেক পুজো দেব। বোঝো ব্যাপার!'

অনামিকা দেবী হেসে ফেলে বলেন, 'ব্যাপার তো বেশ বুঝলাম, জলের মতোই বুঝলাম, কিন্তু "জাম্বো"টি কী বস্তু তা তো বুঝলাম না।'

'জাম্বো কে জানো না?'

শম্পা আকাশ থেকে পড়ে।

'ওর নামটা তোমায় কোনোদিন বলিনি নাকি?'

'কার নাম?'

'আঃ, ইয়ে সেই ছেলেটার। মানে সেই মিস্ত্রীটার আর কি! যেটার বেশ বন্য বন্য ভাবের জন্যে এখনো রিজেক্ট করিনি।'

'তার নাম জাম্বো ? আফ্রিকান বুঝি ?'

'আহা আফ্রিকান হতে যাবে কেন? ওর চেহারাটার জন্যে ওর কাকা নাকি ওই নামেই ডাকতো। শুনে আমারও বেশ পছন্দ হয়ে গেল।'

'তা তো হবেই! তুমি নিজে যেমন! তোর নামও শম্পা না হয়ে হিড়িম্বা হওয়া উচিত ছিল। কেন, একটু সভ্য-ভব্য হতে পারিস না? বাড়িতে তো তোর বয়সী আরও একটা মেয়ে রয়েছে, তাকে দেখেও তো শিখতে পারিস!'

'কী শিখতে পারি? সভ্যতা? কাকে দেখে? তোমার ওই নাতনীটিকে দেখে? আমার দরকার নেই।' শম্পা অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টোয়।

তারপর বলে, 'আমি নেহাৎ অশিক্ষিত অ-সভ্য বলেই ওর কীর্তিকলাপ মুখে আনতে চাই না। শুনলে না তুমি মোহিত হয়ে যেতে নাতনীর গুণপনায়।'

'আহা লেখাপড়ায় হয়তো তেমন ইয়ে নয়, কিন্তু আর সব কিছুতে তো—'

'লেখাপড়ার জন্যে কে মরছে?' শম্পা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, 'বর্ণপরিচয় না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু "আর" সবটা কী শুনি?'

'কেন, নাচ গান, ছবি আঁকা, সূঁচের কাজ, টেবিল ম্যানার্স, পার্টিতে যোগ দেবার ক্যাপাসিটি—'

'থামো পিসি, মাথায় আগুন জেবলে দিও না। তোমার ওই বৌমাটি মেয়েটার ইহকাল পরকাল সব খেয়ে মেরে দিয়েছেন, বুঝেছো? ছবি আঁকে! হুঃ! যা দেখবে সবই জেনো ওর মাস্টারের আঁকা। সেলাই তো স্রেফ সমস্তই ওর মাতৃদেবীর —তবে হ্যাঁ, সাজতে-টাজতে ভালই শিখেছে। যাকগে মরুকগে, মহাপুরুষরা বলে থাকেন পরচর্চা মহাপাপ। তুমি যে দয়া করে তোমার ওই নাতনীটিকেই এ যুগের আধুনিকাদের প্রতিনিধি ভাবোনি এই ভালো। যাক লিলি যদি আসে, আর পায়ের ধুলোফুলো নিয়ে বসে, ওই নিয়ে কিছু বোলো না যেন?... আবেগের মাথায় আসবে তো? আর আবেগের মাথায়—হঠাৎ ঠাট্টা-টাট্টা শুনলে—'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোর বন্ধুর ভারটা আমার ওপরই ছেড়ে দে। কিন্তু সেই যে জাম্বুবান না কার জন্যে যেন ঠাকুরের কাছে মানত করে বসেছিলি, পুজো দিয়েছিস? না কি তার জবর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তোরও ঘাড় থেকে ভগবানের ভূত ছেড়ে গেল?'

শম্পা হেসে ফেলে। অপ্রতিভ-অপ্রতিভ হাসি।

বলে, 'ব্যাপারটা আমি নিজেই ঠিক বুঝতে পারছি না পিসি! ঠাকুর-টাকুর তো মানি না, হঠাৎ সেদিন কেনই যে মরতে—এখন ভেবে পাচ্ছি না কী করি! পুজোফুজো দেওয়া মনে করলেই তো নিজের ওপর কৃপা আসছে, অথচ—'

'তবে আর "অথচ" কি?' অনামিকা নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'ভেবে নে হঠাৎ একটা বোকামি করে ফেলেছিলি, তার জন্য আবার কিসের দায়।'

'তাই বলছো?'

শম্পা প্রায় অসহায়-অসহায় মুখে বলে, 'আমিও তো ভাবছি সে কথা, মানে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কী যে একটা অস্বস্তি পেয়ে বসেছে! কাপড়ে চোরকাঁটা বিঁধে থাকলে যেমন হয় প্রায় সেই রকম যেন। দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু—'

'তাহলে জিনিসটা চোরকাঁটাই।' অনামিকা মুখ টিপে হেসে বলেন, 'চোরের কাঁটা। অলক্ষিত চোর চুপি চুপি সিঁদ কেটে—'

'পাগল! ক্ষেপেছো!' শম্পা হৈ-চৈ করে ওঠে, 'তুমি ভাবছো এই অবকাশে আমার মধ্যে ঠাকুর ঢুকে বসে আছে? মাথা খারাপ! তবে আর কি, ওই অস্বস্তিটার

জন্যেই ভাবছিলাম—তুমি দিয়ে দিতে পারবে না?'

'দিয়ে দিতে? কী দিয়ে দিতে?'

'আহা বুঝছো না যেন! ন্যাকা সেজে কী হবে শুনি? ওই কিছু পুজোফুজো দিয়ে দিলেই—মানে সত্যরক্ষা আর কী! প্রতিজ্ঞাটা পালন করা দরকার।'

অনামিকা ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'কার কাছে প্রতিজ্ঞা? যাকে বিশ্বাস করিস না তার কাছে তো? সেখানে আবার সত্যরক্ষা কি? অনায়াসেই তো ভাবতে পারিস, "দেব না, বয়ে গেল! ঠাকুর না হাতি"!'

'চেষ্টা করেছি—', শম্পা আরও একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে বলে, 'সুবিধে হচ্ছে না। ও তুমি যা হয় একটা করে দিও বাবা!'

'আমি? আমি কী করে দেব?'

'আঃ বললাম তো, ওই পুজোটুজো যা হোক কিছু। তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েই তো দিতে হতো!'

অনামিকা কৌতুকের হাসি গোপন করে বলেন, 'সে আলাদা কথা। কিন্তু তুই কোন্ ঠাকুরের কাছে পুজো কবলালি, আমি তার কী জানি?'

'কোন্ ঠাকুর', শম্পা আবার আকাশ থেকে পড়ে, 'ঠাকুর আবার কোন্ ঠাকুর? এমনি ঠাকুর!'

'আহা, কোনো একটা মূর্তি তো ভেবেছিলি? কালী কি কেষ্ট, দুর্গা কি শিব—'

'না পিসি, ওসব কিছু ভাবি-টাবিনি।' শম্পা এবার ধাতস্থ গলায় বলে, 'এমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে মরেছি। মানে ওর টেম্পারেচারটাও যতো ওপর দিকে উঠে চলেছে, আমার চোখও তো ততো ওপর দিকে এগোচ্ছে। জ্বর যখন একশো ছয় ছাড়িয়ে আরও চার পয়েন্ট আমার চোখও তখন স্রেফ চড়কগাছ ছাড়িয়ে আকাশে। মূর্তি-টুর্তি কিছু ভাবিনি, শুধু ওই আকাশটাকেই বলেছি, ছোঁড়াটা তোমার এমন কী কাজে লাগবে বাপু যে টানাটানি শুরু করেছো? তোমার ওখানে তো অনেক তারা আছে, আরও একটা বাড়িয়ে তোমার লাভ কী?'

হঠাৎ জোরে হেসে ওঠে শম্পা, 'দেখেছো পিসি, কুসংস্কারের কী শক্তি! যেই না বিপদে পড়া, অমনি স্রেফ ছেলেমানুষের মতো ভাবতে শুরু করা—মৃত্যুর দূত আকাশ থেকে নেমে আসে, মরে গেলে মানুষরা সব আকাশের নক্ষত্র হয়ে যায়! এসব হচ্ছে ভুল শিক্ষার কুফল।...যাচ্চলে, ঘুমিয়েই পড়লে যে! বাবা তোমার আবার কবে থেকে আমার মাতৃদেবীর মতো ঘুমের বহর বাড়লো? মা তো— থাক বাবা ঘুমোও। রাত জেগে জেগে লিখেই বুড়ী মলো!'

নেমে যায় শম্পা।

বোজা চোখেই অনুভব করেন অনামিকা।

আর সেই মুদ্রিত পল্লবের নিচটা ভয়ানক যেন জ্বালা করতে থাকে।

ঠিক সেই সময় চোখ জ্বালা করছিল আরো একজনের। সে চোখ শম্পার মা রমলার। তাঁর মেয়ে যে কেবলই তাঁকে ছাড়িয়ে, অথবা সত্যি বলতে তাঁকে এড়িয়ে কেবলই গুণবতী পিসির কাছে ছুটবে, এটা তাঁর চক্ষুসুখকর হতেই পারে না। অথচ করারও কিছু নেই। শ্বশুরঠাকুর বাড়িটি রেখে গেছেন, কিন্তু উঠোনের মাঝখানে একটি বিষবৃক্ষ পুঁতে রেখে গেছেন।

হতে পারে ননদিনীটি তাঁর পরম গুণবতী, তাঁর নিজেরই বোনেরা, ভাজেরা, ভাজের বোনেরা এবং বোনেদের জা ননদ ভাগ্নী ভাসুরঝি ইত্যাদি করে পরিচিত-

কূল সকলেই যে ওই গুণবতীর ভক্ত, তাও জানতে বাকি নেই শম্পার মার, এমন কি তিনি অনামিকা দেবীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করার মতো পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী বলে অনেকে ঈর্ষার ভানও করে থাকে, কিন্তু নিজে তো তিনি জানেন সর্বদাই হাড় জ্বলে যায় তাঁর ননদিনীর বোল-বোলাও দেখে।

এদিকে তো ইউনিভার্সিটির ছাপও নেই একটা, অথচ বড় বড় পণ্ডিতজনেরা পর্যন্ত মান্য করে কথা বলতে আসে, খোসামোদ করে ডেকে ডেকে নিয়ে যায় সভার শোভাবর্ধন করতে, এটা কি অসহ্যের পর্যায়ে পড়বার মতো নয়?

যাক গে, মরুকগে, থাকুন না হয় আপন মান যশ অর্থ প্রতিষ্ঠার উচ্চমঞ্চে বসে, শম্পার মার মেয়েটা কেন ওঁর পায়ে পায়ে ঘুরতে যায়? মেয়েকে যে তিনি হাতের মুঠোয় পুরে রাখতে পারলেন না, তার কারণ তো ওই গুণবতীটি!

না সত্যি, সংসারের মধ্যে যদি কোনো একজন বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে বসে, সে সংসারের অপর ব্যক্তিদের জ্বালার শেষ নেই। শুধু চোখই নয়, অহরহ সর্বাঙ্গ জ্বালা করে তাদের। প্রতিভা-ট্রতিভা ওসব দূর থেকেই দেখতে ভালো, কাছের লোকের থাকায় কোনো সুখ নেই। তা সংসারের কোনো একজন যদি সাধু-সন্ন্যাসীও হয় তাহলেও। আত্মজনের ভক্তজন, এসে জুটলেই বাড়ির লোকের বিষ লাগতে বাধ্য।

অতএব শম্পার মাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু পুরুষমানুষ হলেও বা সহ্য হয়, এ আবার মেয়েমানুষ!

তাছাড়া শম্পার মার কপালে ওই মেয়ের জ্বালা। বাড়িতে তো আরও মেয়ে আছে, আরও মেয়ে ছিল, যাদের বিয়ে হয়ে গেছে একে একে, কেউ তো তাঁর ওই বেয়াড়া মেয়েটার মতো পিসিভক্ত নয়। আর বেয়াড়া যে হয়েছে সে তো শুধু ওই জন্যেই।

এই তো অলকা বৌমার মেয়ে, খুবই নাক-উঁচু ফ্যাশানি, মানুষকে যেন মানুষ বলে গণ্যই করে না, তবু দ্যাখো তাকিয়ে, এই বয়সে মা-দিদিমাদের সঙ্গে গুরুদীক্ষা নিয়েছে। এদিকে যতোই ফ্যাশান করুক আর নেচে বেড়াক, সপ্তাহে একদিন করে সেই 'আত্মাবাবা'র মঠে হাজরে দিতে যাবেই যাবে। তবু তো একটা দিকেও উন্নতি হচ্ছে! তাছাড়া সেখানে নাকি সমাজের যতো কেষ্ট-বিষ্টুরা এসে মাথা মুড়োন, কাজেই 'গুরুমন্ত্র' বলে একটা লোকলজ্জাও নেই। কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার যে গ্রাম্যতা আছে, এঁদের কাছে দীক্ষা নেওয়ায় তো সেটা নেই। বরং ওতেই মান-মর্যাদা, ওতেই আধুনিকতা।

ওসব জায়গায় আরো একটা মস্ত সুবিধে, বাবার যত কেষ্ট-বিষ্টু শিষ্যরা তো সপরিবারেই এসে ধর্না দেন, ভাল ভাল পাত্র-পাত্রীরও সন্ধান পাওয়া যায় সেই সুযোগে। বাবা নিজেও নাকি কতো শিষ্য-শিষ্যার ছেলেমেয়ের বিয়ে ঘটিয়ে দিয়েছেন।

শম্পার মার অবিশ্যি এসব শোনা কথা। ব্যাপারটা একবার দেখে আসবার জন্যে যতোই কেন না কৌতূহল থাকুক, মান খুইয়ে ভাশুরপো-বৌকে তো গিয়ে বলতে পারেন না, 'তোমার গুরুর কাছে আমায় একবার নিয়ে চল।'

আর বললেই যে নিয়ে যাবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? এই তো ওর নিজের শাশুড়ীই তো বলেছিল একদিন। 'সেখানে ভীষণ ভিড়, সেখানে আপনার কষ্ট হবে, আপনি ব্লাড-প্রেসারের রোগী—সংকীর্তনের আওয়াজে আপনার প্রেসার বেড়ে যাবে—' বলে কেমন এড়িয়ে গেল। সোজা তো নয় বৌটি, ঘুঘু! তবু নিজের মেয়েটিকে কেমন নিজের মনের মতোটি করে গড়তে পেরেছে। ভাগ্য, ভাগ্য, সবই

ভাগ্য ! শম্পার মার ভাগ্যেই সব উল্টো।

মেয়েকে নামতে দেখেই শম্পার মা আটকালেন, 'কোথায় না কোথায় সারাদিন ঘুরে বাড়ি এসেই তো পিসির মন্দিরে গিয়ে ওঠা হয়েছিল, বলি সেখানে কি ডান-হাতের ব্যাপারটা আছে ? নাকি পিসির মুখ দেখেই পেট ভরে গেছে?'

শম্পা দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন গলায় বলে, 'আর কোনো কথা আছে তোমার ?'

'আমার আবার কী কথা থাকবে ?' শম্পার মা-ও ধাতব গলায় বলে ওঠেন, 'যতোক্ষণ আমার হেফাজতে আছো, ঠিক সময় খেতে দেওয়ার ডিউটিটা তো পালন করতে হবে আমায়। দয়া করে কিছু খাবে চল।'

'আমার খিদে নেই।'

'খিদে নেই ? ওঃ! পিসি বুঝি ঘরে কড়াপাকের সন্দেশের বাক্স বসিয়ে রেখেছিল ভাইঝির জন্যে ?'

শম্পা একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, 'নাঃ, কড়াপাকটা পিসির ভাজেরই এক-চেটে।'

'ওঃ বটে ! বড্ড তোর কথা হয়েছে ! কবে যে তোকে ভিন্ন গোত্র করে দিয়ে হাড় জুড়বো—'

শম্পা আর একটু হেসে বলে, 'ওটার জন্যে তুমি আর মাথা ঘামিও না মা! ওই গোত্র বদলের কাজটা আমি নিজেই করে নিতে পারবো।'

'কী বললি ? কী বললি শুনি ?'

'যা বলেছি তা একেবারেই বুঝেছো মা ! আবার শুনে কেন রাগ বাড়াবে ?'

বলে শম্পা একটা পাক খেয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে শম্পার বাবা প্রায় তাঁর নিজের বাবার গলায় মেয়েকে বলে ওঠেন, 'দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লো শম্পা।

শম্পার বাবার বোনের মতো ভীরু ভঙ্গীতে নয়, দাঁড়ালো নিজের ভঙ্গীতেই। যে ভঙ্গীতে ভীরুতা তো নয়ই, বরং আছে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা। যেন, ট্রেনের টিকিট কাটা আছে, যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব যা বলবে চটপট বলে নাও বাপু।

বাবা এই অসহনীয় ভঙ্গীটাকেও প্রায় সহ্য করে নিয়ে পাথুরে গলায় বলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই তোমায় বার বার বলতে হয়েছে, তবু কোনোমতেই তোমায় বাধ্য বিনীত সভ্যতা-জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা সম্ভব হয়নি, তুমি যে একটা ভদ্র বাড়ির মেয়ে, সেটা যেন খেয়ালেই রাখো না। কিন্তু মনে হচ্ছে সেটা এবার আমাকেই খেয়াল রাখতে হবে। তোমার নামে অনেক কিছু রিপোর্ট পাচ্ছি কিছু দিন থেকে, এবং—'

কথার মাঝখানে বাবাকে তাজ্জব করে দিয়ে শম্পা টুক্ করে একটু হেসে ফেলে বলে, 'রিপোর্টারটি অবশ্যই আমাদের মা-জননী ?'

'থামো ! বাচালতা রাখো !'

বাবা সেই তাঁর নিজের ভুলে যাওয়া বাবার মতই গর্জে ওঠেন, 'আমি জানতে চাই সত্যবান দাস কে ?'

সত্যবান দাস !

শম্পা আকাশ থেকে পড়ে, 'সত্যবান দাস কে তা আমি কি করে জানবো ?'

'তুমি কি করে জানবে ? ওঃ ! একটা গুণ ছিল না জানতাম, সেটাও হয়েছে তাহলে ? মিথ্যে কথা বলতে শিখেছো ! হবেই তো, যেমন সব বন্ধু-বান্ধব জুটেছে !

কলের মজুর, কারখানার কুলি—

'কারখানার কুলি।' শম্পার মুখে হঠাৎ একঝিলতে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

জাম্বোর নাম যে আবার সত্যবান, তা তো ছাই মনেই থাকে না।

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে হাসি লুকিয়ে বলে শম্পা, 'মিথ্যে কথা বলবার কিছু দরকার নেই, শুধু চট করে মনে পড়ছিল না! ডাকনামটাই মনে থাকে—'

'ওঃ!' শম্পার বাবা ফেটে পড়বার অবস্থাকেও আয়ত্তে এনে বলেন, 'ডাকনামে ডাকা-টাকা চলছে তাহলে! কিন্তু আমি জানতে চাই কোন্ সাহসে তুমি একটা ছোটলোকের সঙ্গে মেশো?'

শম্পা ফেরানো ঘাড় এদিকে ফিরিয়ে স্থির গলায় বলে, 'ছোট কাজ করলেই কেউ ছোট হয়ে যায় না বাবা!'

'থাক থাক, ওসব পচা পুরনো বুলি ঢের শুনেছি। আমি চাই না যে আমার মেয়ে একটা ইতরের সঙ্গে মেশে।'

শম্পার সমস্ত চাপল্যের ভঙ্গী হঠাৎ একটা কঠিন রেখায় সীমায়িত হয়ে যায়। শম্পা তার বাবার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, 'তোমার চাওয়ার আর আমার চাওয়ার মধ্যে যদি মিল না থাকে বাবা?'

যদি মিল না থাকে!

শম্পার বাবা এই দুঃসাহসের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত ফেটেই পড়েন। বলে ওঠেন, 'তাহলে তোমার আর এ বাড়িতে জায়গা হবে না।'

'আচ্ছা, জানা রইল।'

শম্পা এবার আবার সেই আগের অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে ফিরে আসে, 'আর কিছু বলবে? আমার একটু কাজ ছিল। বেরোতে হবে।'

'বেরোতে হবে!'

শম্পার বাবা ভুলে যান তিনি তাঁর বাবার কালে আবদ্ধ নেই। শম্পার বাবার মনে পড়ে না, এখন আর চার টাকা মণের চাল খান না তিনি, খান না আট আনা সেরের রুই মাছ। শম্পার বাবা তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'এক পা বেরোনো হবে না তোমার। কলেজ ভিন্ন আর কোথাও যাবে না।'

হঠাৎ বাবাকে 'থ' করে দিয়ে ঝরঝরিয়ে হেসে ওঠে শম্পা।

হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি ঠিক যেন সেই সেকালের রাজরাজড়াদের মত কথা বললে বাবা! যাঁরা আজ যাকে কেটে রক্তদর্শন করতেন, কাল আবার তাকে ডেকে আনতে বলতেন! এইমাত্র তো হুকুম হয়ে গেল, "এ বাড়িতে জায়গা হবে না।" আবার এখুনি হুকুম হচ্ছে বাড়ি থেকে বেরোনো হবে না! অদ্ভুত!'

হঠাৎ কী হয়ে যায়!

শম্পার বাবা কাণ্ডজ্ঞানশূন্যভাবে মেয়ের সেই চুড়ো করে বাঁধা খোঁপাটা ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে বলে ওঠেন, 'ওঃ আবার বড় বড় কথা! আস্পর্দার শেষ নেই তোমার? তোমাকে আমি চাবি-বন্ধ করে রেখে দেব তা জানো, পাজী মেয়ে!'

শম্পা নিতান্ত শান্তভাবে খোঁপা থেকে ঝরে পড়া পিন্‌গুলো গোছাতে গোছাতে বলে, 'পারবে না। খামোকা আমার কষ্ট করে বাঁধা খোঁপাটাই নষ্ট করে দিলে। যাক গে, মরুক গে! আচ্ছা, যাচ্ছি তাহলে।'

বলে দিব্যি চটিটা পায়ে গলিয়ে টানতে টানতে বাবার সামনে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাবার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরোয় না। হঠাৎ ওই চুলটা ধরার সঙ্গে সঙ্গেই কি নিজের ভুলটা চোখে পড়লো তাঁর? মনে পড়ে গেল নিরুপায়তার পাত্র বদল হয়েছে?

তাই ওই চলে যাওয়ার দিকে স্তব্ধ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন? নাকি অধস্তনের ঔদ্ধত্য শক্তিহীন করে দিয়ে গেল তাঁকে?

হতে পারে।

চার টাকা মণের চালের ভাতে যাদের হাড়ের বনেদ, তাদের চিত্তজগৎ থেকে যে কিছুতেই ওই 'ঊর্ধ্বতন-অধস্তন' 'প্রভু-ভৃত্য' 'গুরুজন-লঘুজন' ইত্যাদি বিপরীতার্থক শব্দগুলো পুরনো অর্থ হারিয়ে বিপরীত অর্থবাহী হয়ে উঠতে চাইছে না! তাই না তাদের প্রতি পদে এত ভুল! যে ভুলের ফলে ক্রমাগত শক্তিহীনই হয়ে পড়ছে তারা!

অনিবার্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলেই তো শক্তির বৃথা অপচয়।

অনামিকা দেবী এসবের কিছুই জানতে পারেননি, অনামিকা তিনতলার ঘরে আপন পরিমণ্ডলে নিমগ্ন ছিলেন। ছোড়দার উচ্চ কণ্ঠস্বর যদিও বা একটু কানে এসে থাকে, সেটাকে গুরুত্ব দেননি। নানা কারণেই তো ওনার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে উচ্চগ্রামে উঠে যায়, খবর নিতে গেলে দেখা যায় কারণটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

অতএব স্বরটা কান থেকে মনে প্রবেশ করেনি।

কিন্তু ঘটনাটাকে কি সত্যিই একটা ভয়াবহ ঘটনা বলে মনে হয়েছিল শম্পার মা-বাপের? ওঁরা শুধু মেয়ের দুঃসহ স্পর্ধা দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

তার মানে নিজের সন্তানকে আজ পর্যন্ত চেনেননি ওঁরা।

কেই বা চেনে?

কে পারে চিনতে?

সব থেকে অপরিচিত যদি কেউ থাকে, সে হচ্ছে আপন সন্তান। যাকে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের মোড়ক দিয়ে মুড়ে রাখে মানুষ।

কাজেই সামান্য ওই কথা-কাটাকাটির সূত্রে কী ঘটে গেল, অনুধাবন করতে পারলেন না শম্পার মা-বাপ। ওঁরা ঠিক করলেন মেয়ে এলে কথা বলবেন না। বাক্যালাপ বন্ধই করে ফেলবেন।

*　　　　*　　　　*

অনামিকা দেবী লেখায় ইতি টেনে একটু টান-টান হয়ে বসলেন, আর তখনি চোখ পড়লো টেবিলের পাশের টুলটার ওপর, আজকের ডাকের চিঠিপত্রগুলো পড়ে রয়েছে।

বাচ্চা চাকরটা কখন যেন একবার ঢুকেছিল, রেখে গেছে। অনেকগুলো বইপত্তরের উপর একখানা পরিচিত হাতের লেখা পোস্টকার্ড।

॥ ১৫ ॥

পোস্টকার্ডখানার মাথার উপর তারিখের নিচে লেখা ঠিকানাটা দেখে চোখটা যেন জুড়িয়ে গেল। আগ্রহে তুলে নিলেন সেটা, তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে ফেললেন, তারপর আবার ধীরেসুস্থে পড়তে বসলেন।

অথচ অনামিকা দেবীর নামাঙ্কিত ওই পোস্টকার্ডটায় তো মাত্র দুতিন ছত্র।

'...অনেক দিন পরে কলকাতায় ফিরে তোমার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে পড়লো, তাই একটা চিঠি পোস্ট করে দিচ্ছি। নিশ্চয় ভালো আছো।

সনৎকাকা।'

এই ধরন সনৎকাকার চিঠির।

গতানুগতিক পদ্ধতিতে স্নেহ-সম্বোধনান্তে শুরু করে 'আশীর্বাদান্তে ইতি'র পাট নেই সনৎকাকার। বাহুল্য কথাও নয়। ঝরঝরে তরতরে প্রয়োজনীয় কয়েকটি লাইন। কখনো বা পোস্টকার্ডের পুরো দিকটা সাদাই পড়ে থাকে, ও-পিঠের অর্ধাংশে থাকে ওই লাইন কটা।

একদা, অনামিকা দেবীর বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, ওই চিঠির ব্যাখ্যা করে তাঁর আপত্তি তুলেছিলেন তিনি, 'এ আবার কি রকম চিঠি তোমার সনৎ? একে কি চিঠি বলে ?'

সনৎকাকা হেসে বলেছিলেন, 'চিঠি তো বলে না। বলে কার্ড। পোস্টকার্ড।'

'তাতে কি হয়েছে ? লিখছো যখন সে চিঠিতে একটা যথাযোগ্য সম্পর্কের সম্বোধন থাকবে না, কুশল প্রশ্ন থাকবে না, নিজে কেমন আছো এ খবর থাকবে না, প্রণাম আশীর্বাদ থাকবে না, মাথার ওপর একটা দেবদেবীর নাম থাকবে না, এ কেমন কথা ? না না, এটা ঠিক নয়। এতে কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। তোমার দেখাদেখি অন্যেও এইরকম ল্যাজামুড়োহীন চিঠি লিখতে শিখবে।'

শুনে কিন্তু সনৎকাকা কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বরং হেসেই উঠেছিলেন। বলেছিলেন, 'তা চিঠিটা তো আর টাটকা রুইমাছ নয় যে, ল্যাজামুড়ো বাদ গেলে লোকসান আছে! যথাযোগ্য সম্বোধন তো নামের মধ্যেই রয়েছে। তোমায় লিখলে লিখবো "প্রবোধদা", বোঝাই যাবে তুমি গুরুজন, বকুলকে লিখলে শুধু "বকুল"ই লিখবো, অতএব বুঝতে আটকাবে না লঘুজন।'

'তা বলে একটা শ্রীচরণকমলেষু কি কল্যাণীয়াসু লিখবে না ?'

'সেটা না লিখলেই কি বোঝা যায় না ?' সনৎকাকা বোধ করি তাঁর প্রবোধদার এই তুচ্ছ কারণে উত্তেজিত হওয়াটা দেখে আমোদ পেয়েছিলেন, তাই হেসে হেসে বলে চলেছিলেন, 'ঘটা করে না বললেও বোঝা যায় ছোটদের আমরা সর্বদাই কল্যাণ কামনা করি, আশীর্বাদ করি। এবং বড়দেরও ভক্তিটক্তি প্রণাম-টণাম করে থাকি। কুশল প্রশ্ন তো থাকেই। নিশ্চয় ভালো আছো এটাই তো কুশল প্রশ্ন। অথবা কুশল প্রার্থনা।'

'নিশ্চয় ভালো আছো এটা একটা কথা নাকি ? মানে আছে এর? সনৎকাকার প্রবোধদা চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন, 'সব সময় মানুষ "নিশ্চয়" ভালো থাকে ? এই যে আমি ? কদিন ভাল থাকি ?'

'আমাদের সকলের ইচ্ছের জোরে ভালো থাকবে, সেটাই প্রার্থনা।'

'বাজে কথা রাখো। এ সব হচ্ছে তোমাদের এ যুগের ফাঁকিবাজি। নিজে কেমন আছি এটুকু লিখতেও আলিস্যি।'

সনৎকাকাকে তাঁর প্রবোধদা 'এ যুগের' বলে চিহ্নিত করতেন। সেটা যেন কতদিন হয়ে গেল ? সনৎকাকার বয়েসটাই বা কোথায় গিয়ে পৌঁছলো ? অথচ তাঁর প্রবোধদার অর্ধশতাব্দী পার হয়ে যাওয়া মেয়েটাও বলে, 'সনৎকাকাকে আমি বলি আধুনিক।'

তার মানে সনৎকাকা হচ্ছেন সেই দলের, যারা চির-আধুনিক। সেই আধুনিক সনৎকাকা আজও তেমনি চিঠি লিখেছেন। যাতে ল্যাজামুড়ো নেই। আপন কুশলবার্তাও নেই। যেটাকে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, 'ওটাকে কিছুতেই আলস্য বলতে দিতে রাজী হবো না আমি। আমার ভালো থাকা মন্দ থাকার খবর আমি যেচে যেচে দিতে যাবো কেন? কার কাছে সেটা দরকারী জানি আমি। যার দরকার সে নিজে জানতে চেয়ে চিঠি লিখবে। পোস্টকার্ডের দাম ওই দুলাইনেই

উসুল হয় বাবা!'

পারুলও এইরকম চিঠি লেখে। হয়তো ওই কু-দৃষ্টান্তের ফল।

খামের চিঠিতে অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটে সনৎকাকার। সেটার দাম শুধু উসুল করেই ছাড়েন না তিনি। উসুলের উপর বাড়তি মাশুল চাপিয়ে তবে ছাড়েন অনেক সময়ই। আর সেটারও ওই ল্যাজামুড়ো থাকে না বলেই অনেক সময় পত্র না বলে প্রবন্ধও বলা চলে। হয়তো কোনো একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়েই তার শুরু এবং শেষ।

তেমনি একখানা চিঠি দিল্লীতে ভাইপোর কাছে গিয়ে মাত্র একবারই লিখেছিলেন সনৎকাকা। দিল্লীর সমাজ নিয়ে যার শুরু এবং সারা। তবে এও লিখেছিলেন, এটা হচ্ছে প্রথম ছাপ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাংলায় ফার্স্ট ইম্প্রেশান, দেখি এখানে থাকতে থাকতে এদের মর্মের গভীরে প্রবেশ করতে পারি কিনা এবং ছাপ বদলায় কিনা।'

কিন্তু সে চিঠি আর আসেনি তাঁর। 'দিল্লীর সমাজের মর্মমূলে' প্রবেশ করাটাই কি হয়নি তাঁর এখনো? না কি সেই প্রবেশের ছাপটা প্রকাশ করতে বসার উৎসাহ পাননি আর?

কিন্তু অনামিকাই কি খোঁজ করেছিলেন, 'কি ধরনের ছাপ পড়লো আপনার সনৎকাকা?' আর জানিয়েছিলেন কি, 'আপনি কেমন আছেন সেটা জানা আমার কাছে খুব দরকারী'? নাঃ! হয়ে ওঠেনি।

ভাইপোর কাছেই শেষ জীবনটা থাকতে হবে, এই অনিবার্যকে মেনে নিয়েই থাকতে গিয়েছিলেন সনৎকাকা। কারণ লোকজন চরিয়ে 'একা সংসার করার' মতো বয়েস যে আর নেই অথবা থাকবে না, এটা উপলব্ধি করে ফেলেছিলেন। আর তা না পারলে শেষ গতি তো ওই ভাইপো আর ভাইপো-বৌ। নিজের স্ত্রীটি এমন অতীতকালে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন যে এখন আর বোধ করি মনেও পড়ে না—একদা তিনি ছিলেন। একালের পরিচিত সমাজ অনেকেই সনৎ ব্যানার্জিকে চিরকুমার বলেই জানে!

অনামিকা ওঁর স্ত্রীকে একবার মাত্র দেখেছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় যেন বেড়াতে যাবার পথে একবার প্রবোধদার বাড়িতে নেমেছিলেন তিনি। প্রেমঘটিত বিবাহ বলে বৌভাতের ভোজ-টোজ তো হয়নি! তাই বিয়ের সময় কেউ বৌ দেখেনি।

অনামিকার মনে আছে, ওঁরা চলে গেলে প্রবোধচন্দ্র বলেছিলেন, 'এই বৌ? ওই রোগাপট্‌কা কেলে! কী দেখে মজলেন আমাদের সনৎবাবু! তাই বাঁড়ুয্যে হয়ে ঘোষালের ঘরে মাথা মুড়োতে গেলেন! ছ্যাঃ!'

যাক সেই অতীত ইতিহাস নিয়ে আর কেউ চিন্তা করে না। ধরেই নিয়েছে সবাই, লোকটা এতোদিন স্বাধীনভাবে একা থাকলেও, এবার ওকে পরাধীন হতে হবে। আর সেই সূত্রে বাংলা বিহার উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ, এক কথায় ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশেই হোক, শেষ জীবনটা কাটাতে হবে। অতএব বহুদিনই সনৎকাকা বাংলা দেশ ছাড়া।

এতোদিন পরে যে হঠাৎ এলেন, সে কি কোনো বিশেষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যে। না সনৎকাকার সেই ভাইপোটি বদলি হয়ে আবার বাংলা দেশের কোনো চেয়ারে অধিষ্ঠিত হতে এলেন? তার সঙ্গে লটবহরের মত সনৎকাকাও?

অনামিকাকে উনি এ ইঙ্গিতের কণামাত্রও দেননি যে 'তুমি এসো' অথবা

'তোমায় দেখতে ইচ্ছে করছে'।

তবু অভিমানের কোনো প্রশ্ন নেই।

'এসো' শব্দটি ব্যবহার না করলেও অনামিকা দেবী যে সেখানে সর্বদাই 'স্বাগত' এ কথা অনামিকা যতটা জানেন, ততটা বোধ করি সনৎ ব্যানার্জি নিজেও জানেন না।...ওই চিঠিটাই তো 'এসো'!

সেই একটি অনুক্ত 'এসো' শব্দটি অনামিকাকে টেনে বার করলো ঘর থেকে।

বেরোবার সময় আশা অথবা আশঙ্কা করছিলেন, দুষ্টু মেয়েটা কোন্ ফাঁক থেকে এসে জেরা করতে শুরু করবে, 'এ কি শ্রীমতী লেখিকা দেবী, নিজে নিজে ট্যাক্সি ডেকে বেরোনো হচ্ছে যে? রথ আসেনি তোমার? পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে সভার শোভাবর্ধন করতে বসিয়ে রাখবার জন্যে?'

না, মেয়েটাকে ধারেকাছে কোথাও দেখতে পেলেন না। নির্ঘাত সেই কারখানার কুলিটার সঙ্গে কোথাও ঘুরছে, নচেৎ আর কোথা? আজ তো কলেজের ছুটি।

বাড়ি জানা ছিল, তবু খুঁজে বার করতে কিছু দেরি হয়ে গেল। রাস্তার চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে। অনেক দিন যে আসা হয়নি সেটা ধরা পড়লো ওই চেহারাটা দেখে।

মাঝারি একটা গলির মধ্যে পৈতৃক বাড়ি সনৎকাকাদের, সেই গলির মোড়ে অনেকখানিটা জমি পড়ে ছিল বহুকাল যাবৎ। সেটা ছিল পাড়ার বালকবৃন্দের খেলার মাঠ এবং পাড়ার ঝিয়েদের ডাস্টবীন। কষ্ট করে আর কেউ ছাইপাঁশ-জঞ্জালগুলোকে নিয়ে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে কর্পোরেশনের ডাস্টবীনে ফেলতে যেতো না, ওই মাঠেই ফেলতো। তাতে যে ছেলেদের খেলার আমোদ কিছুমাত্র ব্যাহত হতো এমন নয়, শুধু খেলার শেষে বাড়ি ফেরার পর মা-ঠাকুমার 'জামাকাপড় ছাড়, পা ধুয়ে ফেল' ইত্যাদি চিৎকারে তাদের শান্তিটা কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত করতো।

অনেকদিন পরে এসে দেখলেন অনামিকা দেবী সেই মাঠটায় বিরাটকলেবর একটি ম্যানসন উঠেছে। যাতে অজস্র খোপ। সেই খোপে খোপে কে জানে কতো পরিবার এসে বাসা বেঁধেছে। কে জানে এর মধ্যে থেকেই তারা জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছে কিনা।

তবে আপাততঃ চেনা বাড়িটাও খুঁজে পেতে দেরি হলো ওই বহুখোপ-বিশিষ্ট আকাশছোঁয়া বাড়িটার জন্যে। তারপর ঢুকে পড়লেন।

হৈ-চৈ করে উঠলেন না সনৎকাকা, খুব শান্ত সহৃদয় হাস্যে বললেন, 'আয়। তোর অপেক্ষাই করছিলাম।'

প্রণাম করে বসে পড়ে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলেন অনামিকা দেবী, 'অপেক্ষা করছিলেন মানে? আসতে বলেছিলেন নাকি আমায়?'

'বলিনি? সে কী রে? না বললে এলি কেন?' হাসলেন সনৎকাকা।

লজ্জিত হলেন অনামিকা দেবী। বললেন, 'তারপর, কেমন আছেন বলুন।

'খুব ভালো। খাচ্ছি দাচ্ছি বাড়ি বসে আছি, খাটতে-টাটতে হচ্ছে না, এর থেকে আরামদায়ক অবস্থা আর কি হতে পারে?'

অনামিকা অবশ্য এই 'আরামদায়ক অবস্থা'র খবরে বিশেষ উৎসাহিত হলেন না, বরং ঈষৎ শঙ্কিত গলায় বললেন, 'কেন বসে আছেন কেন? বেরোন না?'

'বেরোবো? কেন?' সনৎকাকা দরাজ গলায় হেসে উঠলেন, 'চলৎশক্তি জন্মাবার জন্যে যদি একটা বছর লেগে থাকে, সেটা বাদ দিয়েই ধরছি, ঊনআশী বছর কাল ধরে তো হাঁটলাম বেরোলাম বেড়ালাম, বাকি দিনগুলো ঘরে বসে

থাকাই বা মন্দ কি?'

'ওটা তো বাজে কথা,' অনামিকা আরো শঙ্কিত গলায় বলেন, 'আসল কথাটা বলুন তো! শরীর ভাল নেই?'

'এই দ্যাখো! শরীর ভাল নেই মানে? ভাল না থাকলেই হলো?'

'তবে? তবে বাড়ি বসে থাকবেন কেন?'

'বাঃ, বললাম তো। জীবনের প্রত্যেকটি স্টেজই চেখে চেখে উপভোগ করা দরকার নয়? নীরুকে বললাম, "দ্যাখ নীরু, এই হৃদ্‌যন্ত্রটা তো বহুকাল যাবৎ খেটে মরছে, এবার যদি ছুটি চায় তো চাক না, ছুটি নিতে দে।" তা শুনতে রাজী নয়। ধরে নিয়ে এলো এক ব্যাটা ডাক্তারকে, মোটা ফী, সে তার পাণ্ডিত্য না দেখিয়ে ছাড়বে কেন? ব্যস্‌ হুকুম হয়ে গেল "নট্‌ নড়নচড়ন নট কিচ্ছু"। অতএব স্রেফ "গাব্দুপিল্‌" হয়ে পড়ে আছি।'

অনামিকা বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। আস্তে বললেন, 'কতোদিন হয়েছে এ রকম?'

'আরে বাবা, হয়নি তো কিছুই। তবে কী করে দিনের হিসেব দেবো? তবে তো কবে থেকে চুল পাকলো, কবে থেকে দাঁত নড়লো, এসব হিসেবও চেয়ে বসতে পারিস। একটা যন্ত্র বহুদিন খাটছে, একদিন তো সেটা বিকল হবেই, তাকে ঘষে মেজে আবার চাকায় জুড়ে দেবার চেষ্টা কি ঠিক? কিন্তু কী আর করা? কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আপাততঃ যখন নীরুবাবুই কর্তা, তাঁর ইচ্ছাই বলবৎ থাকুক!'

'নীরুদা বুঝি আবার কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন?'

'বদলি? আরে না না। ও তো রিটায়ার করে দেশে এসে বসলো।'

'রিটায়ার করে!' অনামিকা অবাক হয়ে বলেন, 'এখুনি?'

'এখুনি কি রে? সরকারী হিসেব কি ভুল হয়? যথাযথ সময়েই হয়েছে। আমরাই শুধু মনে রাখতে ভুলে যাই দিন এগিয়ে চলেছে।'

'তাহলে এখন এখানেই, মানে কলকাতাতেই থাকবেন?'

'তাছাড়া?' সনৎকাকা আবার হাসেন, 'নীরুর সংসারের আবোল-তাবোল আসবাবপত্তরগুলোর সঙ্গে এই একটা অবান্তর বস্তুও থাকবে। যতদিন না—'

হেসে থেমে গেলেন।

'কলকাতায় এসে আর কোনো ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

'দ্যাখ্‌ বকুল, যে রেটে কেবলই মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করছিস—কাকা তুমি বুড়ো হয়েছো, কাকা তুমি রুগী হয়ে বসে আছো, তাতে তোকে আর নীরুকে তফাৎ করা শক্ত হচ্ছে। ও প্রসঙ্গয় যবনিকাপাত কর্‌। তোর কথা বল্‌। খুব তো লিখছিস-টিখছিস। দিল্লীতেও নামডাক। নতুন কি লিখছিস বল!'

'নতুন কি লিখছি?'

অনামিকা হাসলেন, 'কিছু না।'

'কিছু না? সে কী রে? এই যে শুনি এবেলা-ওবেলা বই বেরোচ্ছে তোর!'

'খবর তো যতো হাঁটে ততো বাড়ে!' অনামিকা আর একটু হাসেন, 'নশো মাইল ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছেছে তো খবরটা।'

'তার মানে, তুই বলছিস খবরটা আসলে খবরই নয়, স্রেফ বাজে-গুজব। লিখছিস-টিখছিস না!'

'লিখছি না তা বলতে পারি না, বললে বাজে কথা বলা হবে, তবে "নতুন" কিছু আর লিখছি কই?'

'কেন রে?' সনৎকাকা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে বসে বলেন, 'সমাজে সংসারে এতো

নতুন ঘটনা ঘটছে রোজ রোজ, মুহূর্তে মুহূর্তে সমাজের চেহারা পাল্টাচ্ছে, তবু "নতুন" কথা লিখতে পারছিস না?'

অনামিকা হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলেন, 'হয়তো ওই জন্যেই পারছি না। রোজ রোজ যে নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে তার হিসেব রাখতে পারছি না, মুহূর্তগুলোকে ধরে ফেলতে পারছি না, হারিয়ে যাচ্ছে, অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে তারা।'

'ধরতে চেষ্টা করতে হবে,' জোর দিয়ে যেন নির্দেশ দিলেন সনৎকাকা।

'চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। ওই মুহূর্তগুলো তো স্থায়ী কিছু দিয়ে যাচ্ছে না, ওরা শুধু সাবানের ফেনার মতো রঙিন বুদ্বুদ কেটে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর একদিকে—', একটু যেন ভাবলেন অনামিকা দেবী, 'আর একদিকে কোথায় যেন চলছে ভয়ানক একটা ভাঙনের কাজ, তার থেকে ছিটকে আসা খোয়া পাথরের টুকরো, উড়ে আসা ধুলো গায়ে চোখে এসে লাগছে, কিন্তু সেই 'ভয়ানক'কেই বা ধরে নেব কী করে? তার সঙ্গে তো আমার প্রত্যক্ষের যোগ নেই, যোগ নেই নিকট অভিজ্ঞতায়। আধুনিক, না "আধুনিক" বলবো না, বলবো বর্তমান সমাজকে তবে আমি কলমের মধ্যে ভরে নেব কী করে? শুনতে পাই অবিশ্বাস্য রকমের সব নাম-না-জানা ভয়ানক প্রাণী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ছে, ঘরের লোকের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, এবং সেই প্রাণীরা তাদের নখ দাঁত শিঙ লুকোবারও চেষ্টা করছে না। বরং ওইগুলোই গৌরবের বস্তু ভেবে সমাজে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আর ঘরের লোকেরাও তাই দেখে উঠে পড়ে লাগছে নখ দাঁত শিঙ গজাবার কাজে। কিন্তু এ সমস্তই তো আমার শোনা কথা! শোনা কথা নিয়ে লিখতে চেষ্টা করাটা তো হাস্যকর কাকা। অথচ এও শুনতে পাই, ওদের কাছেই নাকি সাহিত্যের নতুন খোরাক, ওদের কাছেই সাহিত্যের নতুন কথা।'

সনৎকাকা আস্তে বলেন, 'বঙ্গভূমি সম্পর্কে একটা মোহ ছিল, সেটা তাহলে আর রাখবো না বলছিস?'

'অমন জোরালো একটা রায় দিয়ে বসবো, এমন সাহস নেই কাকা। আমি তো নিজেই জানি না মোহটা একেবারে মুছে ফেলে দেবার মতো দুঃসময় সত্যিই এসেছে কিনা। তবে মাঝে মাঝে ভাবি, এইটাই কি চেয়েছিলাম আমরা? এইটাই কি আমাদের দীর্ঘদিনের তপস্যার পুরস্কার? বহু দুঃখ, বহু ক্লেশ সয়ে এই দেবতাকেই জাগালাম আমরা আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে? তা যদি হয় তো সেটা সেই মন্ত্রেরই ত্রুটি।'

'তবে সেই কথাই বল্ জোর গলায়। তোরা সাহিত্যিকরা, কবিরা, শিল্পীরা, তোরাই তো বলবি। মানে তোরা বললেই লোকের কানে পৌঁছবে। আমাদের মত ফালতু লোকেরা একযোগে তারস্বরে চেঁচালেও কিছু হবে না। কিস্যু না!'

অনামিকা হেসে ফেলেন, ওই আশী বছরের বৃদ্ধের এই একটা নেহাৎ ছেলেমানুষি ভঙ্গী দেখে ভারী কৌতুক অনুভব করেন অনামিকা। হেসে বলেন, 'কারুর বলাতেই কিস্যু হবে না। সমাজের একটা নিজস্ব গতি আছে, যে গতিটা যাকে বলে দুরন্ত দুর্বার দুর্জয়। এবং তার নিজেরও জানা নেই গতির ছকটা কি। যতো দিন যাচ্ছে, ততই অনুভব করছি কাকা, গোটাতিনেক জিনিসকে অন্ততঃ পরিকল্পনা করে গড়ে তোলা যায় না। সে তিনটে হচ্ছে—সমাজ, সাহিত্য এবং জীবন।'

'এই সেরেছে, মেয়েটা বলে কি!' সনৎকাকা একটি বিস্ময়-আতঙ্কের ভঙ্গী করেন, 'বলিস কি রে! দুটো না হয় না পারা গেল, কিন্তু বাকিটা? সাহিত্যকে

পরিকল্পনা মত গড়ে তোলা যায় না? সে তো নিজের হাতে।'

'আগে তাই ভাবতাম,' অনামিকা আবার যেন অন্যমনা হয়ে যান, 'আগে তাই ধারণাই ছিল। ভাবতাম কলমটা তো লেখকের নিজের আয়ত্তে। কিন্তু ক্রমশই মনে হচ্ছে হয়তো ঠিক তা নয়। কোথাও কোনোখানে কারো একটি গভীর অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায় অনুসারেই যা হবার হচ্ছে।'

'সর্বনাশ! তুই যে তত্ত্বকথায় চলে যাচ্ছিস। অর্থাৎ সকলই তোমারই ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!'

'মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।' অনামিকা মৃদুস্বরে বলে চলেন, 'ইচ্ছাময়ী কি "অনিবার্য" যে নামই দেওয়া হোক, অদৃশ্য একটা শক্তিকে কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন কাকা? কবিত্ব করে বললে, "জীবনদেবতা"। কবির কথাতেও এ কথা বলা হয়েছে, "এ কী কৌতুক নিত্য নতুন ওগো কৌতুকময়ী, আমি যাহা চাই বলিবারে তাহা বলিতে দিতেছ কই"?'

সনৎকাকা মৃদু হেসে যোগ দেন, "অন্তর মাঝে বসি অহরহ মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ, মোর কথা নিয়ে কি যে কথা কহ", এই তাহলে তোর বক্তব্য?'

'সব সময় না হলেও অনেক সময়ই। অন্তরদেবতাই বলুন, আর অনিবার্যই বলুন, একটা কিছু ঘটনা আছে। সে কোন্ ফাঁকে লেখকের কলমটাকে নিজের পকেটে পুরে ফেলে! সেই জন্যেই বলছিলাম, সাহিত্যের নিজের একটা গতি আছে। সভা ডেকে, আইন করে, অথবা নির্দিষ্ট কোনো ছক কেটে দিয়ে তাকে বিশেষ একটি গতিতে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আমার তো অন্ততঃ তাই মনে হয়।'

'তার মানে তোর মতে যে যা লিখছে সবই ওই অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক হয়ে?'

'কে কি করে জানি না কাকা, তবে আমি অনেক সময়ই অনুভব করি এটা।'

সনৎকাকা মৃদু হাসেন, 'শুনতে পাই আরও একটা জোরালো শক্তিই নাকি তোদের আজকালের সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক। তার শক্তির প্রভাবেই লেখকের কলম—'

অনামিকা হেসে ফেলেন, 'শুনতে তো কিছু বাকি নেই দেখছি আপনার। কিন্তু "যত দোষ নন্দঘোষ" বললে চলবে কেন? এ ধাঁধা তো চিরকালের— পৃথিবীটা কার বশ"?'

'আহা সে ধাঁধার উত্তর তো সকলেরই জানা। কিন্তু আমরা চাই কবি সাহিত্যিক শিল্পী, এঁরা সে পৃথিবীর বাইরের হবেন। অন্ততঃ সেটাই আমাদের ধারণার মধ্যে আছে।'

'তেমন হলে উত্তম। কিন্তু তেমন ধারণার কি সত্যিই কোনো কারণ আছে কাকা? সেকালেও মহা মহা কবিরা রাজসভার সভাকবি হতে পেলে কৃতার্থ হতেন। সেটাই তাঁদের পরম পাওয়ার মাপকাঠি ছিল। আর সেটা আশ্চর্যেরও নয়। পৃথিবীটা যেহেতু টাকার বশ, সেই হেতুই সব কিছুর মূল্যে নির্ধারণ তো হয় ওই টাকার অঙ্ক দিয়েই? নিজের প্রতি আস্থা আসারও তো ওইটাই মানদণ্ড! তার ওপর আবার সাহিত্য জিনিসটা আজকাল ধান চাল তুলো তিসির মত ব্যবসার একটি বিশেষ উপকরণ হয়ে উঠেছে। অতএব লেখকরাও টাকার অঙ্ক দিয়ে নিজের মূল্য নিরূপণ করতে অভ্যস্ত হবেন এ আর বিচিত্র কী? আর যে লেখা বেশী টাকা আনবে, সেই রকম লেখাকেই কলমে আনবার চেষ্টা করাটাও অতি স্বাভাবিক।'

সনৎকাকা ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলেন, 'তার মানে তুইও ওই টাকার জন্যে লেখাটাকে সমর্থন করিস?'

অনামিকা হেসে ফেলে বলেন, 'সমর্থনের কথা নয় কাকা, সমর্থনের কোনো প্রশ্নই নেই। আমি সেই অনিবার্যের কথাই বলছি। আমার ধারণায় এইটা হলে

ওইটা হবেই। আপনি অবশ্যই জানেন, আজ এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সমাজের প্রতিটি স্তরের লোক অর্থাৎ প্রতিটি সুযোগ-সন্ধানীই লেখকের কলম ভাঙিয়ে খাচ্ছে। লেখকের কলমই তো বিজ্ঞাপনের বাহন। কাগজের সম্পাদকরা এখন আর 'লেখক' তৈরি করে তোলার দায়িত্বর ধার ধারেন না, ধার ধারেন শুধু সেই লেখকের যার লেখা থাকলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আসবে। অতএব প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ক্রমশই তাঁদের ওই বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কল হয়ে উঠছেন। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসেবে নতুনরা ওই দরবারে ঢোকবার পথ না পেয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উৎকট রঙের উদ্ভট পোশাক গায়ে চাপিয়ে দরবারের দরজায় দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী করে টিন পেটাচ্ছে। জানে এতে লোক জুটবেই। দরবারে ঢুকে পড়তে পারলে তখন দেখানো যাব প্রতিভা।'

'অবস্থাটা তো বেশ মনোরম লাগছে রে!'

'কিন্তু কিছু বাড়িয়ে বলছি না কাকা! নতুন লেখকদের অনেক সংগ্রাম করে তবে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। অনেক নতুন ভঙ্গী, নতুন চমক লাগাতে না পারলে উপায় নেই। আর তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়াতে একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসতে পেলে আর কেউ খাটতে চায় না। আর নতুন কথা দেবার চিন্তা থাকে না, চিন্তা থাকে না কি বলবার জন্যে এসেছিলাম। ওই টিন পেটানোটাই যখন সহজ কার্যকরী, আর হাঙ্গামায় কাজ কি! তাছাড়া ওই জিনিসটার ওপর বিশেষ একটা আস্থাও থাকে। দেখেছে যখন ওইটাই দরবারের দরজা খোলার চাবি। আসল কথা কি জানেন কাকা, মননশীলতায় স্থির হতে পারার অবকাশও কেউ দিচ্ছে না শিল্পী সাহিত্যিককে, নির্জন থাকতে দিচ্ছে না। তার সেই স্থিরতার স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভিড় বাড়াচ্ছে।'

সনৎকাকা হেসে বলেন, 'তাতে আর আক্ষেপের কি? তোর মতে তো এ সবই "অনিবার্যে"র হাতের পুতুল!'

'সেটাও ভুল নয়। তাছাড়া মুশকিল কি, ওই টিন পেটানোদের কাছে লোকে টিন পেটানোই চাইবে। যেমন কৌতুক অভিনেতার কাছে কৌতুক অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনে একবার যে ভাঁড়ামি করে মরেছে, জীবনে কখনো আর তার সীরিয়াস নায়ক হবার উপায় নেই।'

'তাহলে তো দেখছি তোদের ওই সাহিত্যক্ষেত্রটাও দস্তুরমতো গোলমেলে!'

'দারুণ গোলমেলে কাকা! নিভৃত চিন্তায় নিমগ্ন হবার গভীর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়াচ্ছে সবাই।'

'তোরও তাই অবস্থা নাকি?' সনৎকাকা একটু কৌতুকের হাসি হাসেন।

'আমার কথা বাদ দিন।' অনামিকা বলে ওঠেন, 'লিখলেই "সাহিত্যিক" হয় না। নিজেকে অন্ততঃ আমি "সাহিত্যিক" শব্দটার অধিকারী ভাবিও না। লেখার অধিকার আছে কি না একথা না ভেবেচিন্তেই একদা লিখতে শুরু করেছিলাম, এখন দেখি পাঠকরাই অথবা সম্পাদকরাই লেখাচ্ছেন। এর বেশী কিছু নয়। তবে ইচ্ছে করে নতুন কিছু লিখি, বিশেষ কিছু লিখি," হেসে ওঠেন অনামিকা 'তা সেই বিশেষের ক্ষমতা থাকলে তো? সত্যিই বলবো কাকা, এ যুগকে আমি চিনি না। চেনবার চেষ্টা করবো এমন পরিবেশও নেই। এ যুগ সম্পর্কে যে সব ভয়াবহ চিত্র শুনি অথবা পড়ি সেটা বিশ্বাস করতে পেরে উঠি না।'

'কিন্তু—', সনৎকাকা আস্তে বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রেই তো "বাস্তব" বস্তুটা কল্পনার থেকেও অবিশ্বাস্য।'

'হয়তো তাই!' আবার যেন কেমন অন্যমনা হয়ে যান অনামিকা, 'তার সত্য

সাক্ষী পুলিসের রিপোর্ট, ডাক্তারের রিপোর্ট। কিন্তু সাহিত্যিকও কি সেই সত্যেরই সাক্ষী হবে ? সাহিত্যিকও কি এই সত্য উদ্ঘাটনের কাজে কলম ধরবে ? জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ শুধু বাইরের চেহারাটায় ! অন্য কোনো তফাৎ আছে কি না সে সন্ধান না করেই হেসে বলে উঠবে, আরে বাবা থাক, তফাৎ থাকবে কেন? এখানেও রক্তমাংস, ওখানেও রক্তমাংস ! রক্তমাংস ব্যতীত আর কোথায় কি ?'

'এই প্রশ্নটাই আজকাল খুব প্রবল হয়েছে, তাই না-রে ?'

'খুব ! হয়তো অনবরত ওইটা শুনতে শুনতে ওটাই বিশ্বাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।'

সনৎকাকা দৃঢ়স্বরে বলেন, 'উঁহু, লোকে তো অনবরত নতুন কথা শুনতে চাইবে, এ কথা আর কতদিন নতুন থাকবে? মানুষ নামের জীবটা তো বাঘসিংহীর মতো অতো বড়োও নয়, মাত্র সাড়ে তিন হাত দেহখানা নিয়ে তো তার কারবার। তার রক্তমাংস ফুরোতে কতক্ষণ ?'

'সেই তো কথা ! সেইটাই তো ভাবি। ওপর দিকে অনন্ত আকাশ, নিচের দিকে পা চাপলেই কাদায় পা। কোনটা সত্য ?'

'নাঃ, যা বুঝছি তোর দ্বারা আর নতুন কথা লেখা হবে না।' সনৎকাকা হাসেন।

'হয়তো তাই!' হাসেন অনামিকাও, অন্যমনস্কের হাসি। তারপর বলেন, 'মানুষের সংজ্ঞা যে শুধু "জীব" মাত্র, "শিব" শব্দটা যে অর্থহীন, এর প্রমাণ যখন এখনও স্পষ্ট পাইনি, তখন হবে নাই মনে হয়। তবে এটাও ঠিক কাকা, যা আমার অজানা, তা নিয়ে লিখতে গেলে পদে পদে ভুলই হবে সেটা জানি। আমার তো ভাবলে অবাক লাগে—'

কথায় বাধা পড়ে।

সনৎকাকার ভাইপো-বৌ এসে দাঁড়ান। বলেন, 'ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে কাকামণি।'

কোমল মধুর কণ্ঠ। মায়ের আদর ভরা। মনে হলো যেন একটি শিশুর কাছে এসে কথা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন অনামিকা, কারণ উত্তরে পরক্ষণেই সত্যসত্যই যেন একটি শিশুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি।

'নাঃ, এই নির্ভুল হুঁশিয়ার মা-জননীটির কাছ থেকে বুড়ো ছেলেটার আর ছাড়ন-ছোড়ান নেই। দাও কোথায় কি ওষুধ আছে তোমার।'

কে বললো কথাটা ? সনৎকাকা ? হ্যাঁ, তিনিই বটে।

অথচ অনামিকার কানে যেন ভয়ঙ্কর রকমের অপরিচিত লাগলো স্বরটা। স্বর, সুর, ভঙ্গী !

সর্বদা যারা সাজিয়ে গুছিয়ে ছেঁদো-ছেঁদো কথা বলে, ঠিক যেন তাদের মতো। অনামিকার খারাপ লাগলো, খুব খারাপ লাগলো, অথচ এমন কি আর ঘটেছে এতে খারাপ লাগার মত ?

যে মহিলাটি তাঁর একজন বৃদ্ধ গুরুজনকে স্নেহ-সমাদর জানাতে মহিমাময়ী মাতৃমূর্তিতে কাছে এসে দাঁড়িয়ে স্রেফ মায়ের গলাতেই জানালেন ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, তাঁর কণ্ঠস্বর সুরেলা, মুখশ্রী সুন্দর, সাজসজ্জা গ্রাম্যতা-বর্জিত, এবং সর্ব অবয়বে একটি মার্জিত রুচির ছাপ।

এঁর সঙ্গে কথা বলতে হলে তো ওই রকম গলাতেই বলা উচিত। মহিলাটি

যদি তাঁর পূজনীয় গুরুজনটির দ্বিতীয় শৈশবের কালের কথা স্মরণ করে তাঁর সঙ্গে শিশুজনোচিত ব্যবহার করেন, গুরুজনটির কি শ্বশুরজনোচিত ব্যবহার সঙ্গত ?

তবু অনামিকার খারাপ লাগলো। সত্যিই খুব খারাপ।

মহিলাটি যেন এতক্ষণে অনামিকাকে দেখতে পেলেন, তাই ওষুধের শিশি গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে দুই হাত জোড় করে ঈষৎ নমস্কারের ভঙ্গীতে সৌজন্যের হাসি হেসে বললেন, 'শুনেছি আপনি আমার স্বামীর ছোট বোন, তবু কিন্তু 'আপনি' করে ছাড়া কথা বলতে পারবো না !'

হঠাৎ এরকম অদ্ভুত ধরনের কথায় বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুক অনুভব করলেন অনামিকা। মৃদু হেসে প্রতিনমস্কার করে বললেন, 'কেন বলুন তো ?'

মহিলাটি অবসরপ্রাপ্ত স্বামীর স্ত্রী, এবং দ্বিতীয় পক্ষও নয়, কাজেই নিতান্ত তরুণীর পর্যায়ে পড়েন না, তবু নিতান্ত তরুণীর গলাতেই সভয় সমীহে বলে উঠলেন. 'বাবা, আপনি যা একজন ভীষণ বড় লেখিকা ! উঃ, আপনার সঙ্গে তো কথা বলতেই ভয় করে।'

সনৎকাকার ভাইপো-বৌয়ের উচ্চারণ স্পষ্ট মাজা, প্রতিটি শব্দ যেন আলাদা আলাদা করে উচ্চারিত। 'কথা' বস্তুটা যে একটি আর্ট, এ বোধ যে আছে তাঁর তাতে সন্দেহ নেই। একজন ভীষণ বড় লেখিকার সঙ্গে কথা বলছেন বলেই কি ভাইপো-বৌ এমন কেটে ছেঁটে মেজে ঘষে কথা বললেন, না এই ভাবেই কথা বলেন ?

হয়তো তাই বলেন।

হয়তো এইটাই ওঁর নিজস্ব ভঙ্গী, তবু কেনই যে অনামিকার মনে হলো অনেকদিনের চেষ্টায় উনি ওই কথা বলার আর্টটি আয়ত্ত করেছেন !

ভাইপো-বৌয়ের শাড়ি পরার ধরনটি ছিমছাম, চুলগুলি সুছাঁদের কবরীতে সুবিন্যস্ত, গায়ে হালকা দু'একটি অলঙ্কার, চোখের কোণে হালকা একটু সুর্মার টান, পায়ে হালকা একজোড়া চটি, শাড়ির জমিটা ধরা যায়-কি-না-যায় গোছের হালকা একটু ধানীরঙের, এবং চশমার ফ্রেমও হালকা ছাই-রঙা।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটি হালকা ওজনের তরুণীই লাগলো তাঁকে।

অনামিকা হেসে বললেন, 'বড় লেখিকা এই শব্দটাকে অবশ্য আমি মেনে নিচ্ছি না, তবু প্রশ্নটা হচ্ছে যদি কেউ কোনো ব্যাপারে বড়ই হয়, বাড়ির লোকেরাও কি তাকে সমীহ করবে ?'

'ওরে বাবা তা আবার বলতে ?' ভাইপো-বৌ হেসে ওঠেন, 'এই তো আপনার দাদা যখন বড় অফিসার ছিলেন, ভীষণ "বিগ্" অফিসার, তখন আমি তো একেবারে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম!' খিলখিল করে হেসে ওঠেন ভাইপো-বৌ, আর সেই হাসির সঙ্গে এমন একটি লীলা বিচ্ছুরিত হয়, ওই 'বিগ্' অফিসারদের গৃহিণীদেরই মানায়।

এই ভঙ্গীতেই উনি হয়তো বলতে পারেন, 'বাড়ি সারাবো ? কোথা থেকে ? খেতেই কুলোয় না তো বাড়ি !'

সখী-সামন্ত নিয়ে যখন বসেন এ'রা, তখনও ওই বাজার দর দিয়েই আক্ষেপ করেন হয়তো এমনি লীলাভরে।

অনামিকা ওই লীলাহাস্যমণ্ডিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এখন আর ভয় করেন না তো ?'

'উঁহু ! আর করবো কেন ? এখন তো বেকার !'

সনৎকাকা বলে ওঠেন, 'দেখছিস তো বকুল, মেয়েটা কী সাংঘাতিক!'

অনামিকা বলেন, 'দেখছি বৈ কি।'

হ্যাঁ, দেখছেন। দেখতে পাচ্ছেন ওঁর ওই সাংঘাতিক মহিমায় সনৎকাকা সন্ধি সাজিয়ে কথা বলতে শিখেছেন। হয়তো শিখতে সময় লেগেছে, হয়তো শিখতে বিরক্তিই এসেছে, তবু শিখেছেন।

কিন্তু শেখার কি সত্যই দরকার ছিল? কে জানে, হয়তো বা ছিল। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না শিখলে তো প্রতিপদেই আবহাওয়া বিষময় হয়ে ওঠে।

'দিল্লিতেও তো আপনার খুব নামডাক!'

ওষুধটি ঢেলে দিয়ে ওষুধ মাপা গলায় ওই মন্তব্যটি করলেন ভাইপো-বৌ।

অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'তবে তো আর নিজেকে বড় লেখিকা না ভেবে উপায় নেই!'

সনৎকাকা অনামিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে বলেন, 'করতে হলো তো স্বীকার? তাহলেই বল মেয়েটাকে "সাংঘাতিক" বলতে হয় কি না? আমার কাছে তো এতোক্ষণ স্বীকার করছিলিই না। মা-জননীদের কী যেন একটি সমিতি আছে, তার লাইব্রেরীতে তোর কত্তো বই আছে, তাই না মা-জননী?'

ভাইপো-বৌ স্মিতহাস্যে বলেন, 'হ্যাঁ, আছে কিছু কিছু। আমিই কিনিয়েছি। লাইব্রেরীর সব কিছুর ভার আমার ঘাড়েই চাপিয়ে রেখেছে তো!'

অনামিকার মুখে আসছিল, 'যাই ভাগ্যিস আপনি আমার একটি বৌদি ছিলেন রাজধানীতে, তাই আমার লেখা "কিছু কিছু" বইয়ের প্রবেশাধিকার ঘটেছে রাজধানী হেন ঠাঁইতে।' তা মুখে আসা কথাটাকে আর মুখের বাইরে আনলেন না, বললেন, 'পড়েছেন তা হলে আমার লেখা?'

ভাইপো-বৌ আর একবার লীলাভরে হাসলেন, 'ওই প্রশ্নটি করলেই উত্তর দেওয়া মুশকিল। আমি আবার ধৈর্য ধরে বসে বসে গল্প-উপন্যাস পড়তেই পারি না। তাছাড়া—'

ভাইপো-বৌ ওষুধের গ্লাস শিশি যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলেন, 'তাছাড়া আজকালকার বইটই তো পড়ারই অযোগ্য।'

'পড়ারই অযোগ্য?'

ভাইপো-বৌয়ের বক্তব্যটি অনুধাবন করবার আগেই প্রশ্নটি যেন স্খলিত হয়ে পড়ে অনামিকা দেবীর কণ্ঠ থেকে।

ভাইপো-বৌ তাঁর হালকা চটি পরা একটি পা টেবিলের পায়ায় তালে তালে ঠুক ঠুক করতে করতে বললেন, 'তাই তো শুনি! ভীষণ নাকি অশ্লীল।'

'শোনেন! তবু ভালো!' অনামিকা মৃদু হাসেন, 'ভাগ্যিস পড়েন না!'

ভাইপো-বৌয়ের হাস্যরঞ্জিত মুখটা মুহূর্তে যেন কাঠ হয়ে যায়, গম্ভীর মুখে বলেন, 'রুচিও নেই। যে সব বই নিয়ে আদালতে কেস ওঠে, সে-সব বই যে মানুষ কী করে পড়ে!'

'আমিও তো তাই বলি,' সনৎকাকা মৃদু হাস্যে বলেন, 'তোমার ওই মহিলা সমিতির মহিলারা যে কী বলে কেবলই আধুনিক সাহিত্য পড়বার জন্যে অস্থির হন!'

ভাইপো-বৌ একবার তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরুজনটির দিকে কটাক্ষপাত করেন, মুখটা আর একটু কাঠ হয়ে যায়, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান তিনি, 'সকলের রুচি সমান নয়' বলে।

চেয়ারটা ঠিক করেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

আর সেই মুহূর্তেই অনুভব করেন অনামিকা, সনৎকাকার কণ্ঠে অমন একটা অপরিচিত সুর শুনতে পেয়েছিলেন কেন।

ভাইপো-বৌ চলে যাবার পর সনৎকাকা মৃদু হেসে বলেন, 'বুদ্ধিমানের ধর্ম এ্যাড্‌জাস্ট করে চলা, কী বলিস?'

অনামিকা কিছু বলেন না, শুধু তাকিয়ে থাকেন ওঁর হাস্যরঞ্জিত মুখের দিকে।

'কীরে অমন করে হাঁদার মত তাকিয়ে আছিস কেন?'

'দেখছি!'

'কী দেখছিস?'

'কিছু না।'

সনৎকাকা আর কিছু বলতেন হয়তো, হঠাৎ ঘরে ঢোকেন সনৎকাকার ভাইপো, যাঁর পুরো নামটা জানাই নেই অনামিকার। 'নীরুদা' বলেই জানেন।

নীরুদার পরনে গাঢ় রঙের সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে একটা টেপ্ গেঞ্জি, হাতে টোব্যাকোর টিন। স্ত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত ভঙ্গীতে একেবারে হৈ চৈ করতে করতে ঢোকেন তিনি, 'আরে আমাদের কী ভাগ্য! শ্রীমতী লেখিকা দেবীর আগমন! তারপর আছো কেমন? বাড়ির সব খবর কি? খুব তো লিখছো-টিখছো!'

অনামিকা বলেন, 'একে একে জবাব দিই, কেমন? আছি ভালো, বাড়ির খবর ভালো, লিখছি অবশ্যই, তবে "খুব" কিনা জানি না।'

'জানো না কি! শুনতে পাই তুমি নাকি দারুণ পপুলার! মেয়েরা নাকি তোমার লেখার নামে পাগল!'

অনামিকা হেসে ফেলে বলেন, 'মেয়েরা তো? মেয়েদের কথা বাদ দাও। ওরা কিসে না পাগল হয়?'

'তা যা বলেছো—', নীরুদা হো হো করে হেসে ওঠেন, 'খুব খাঁটি কথা। শাড়ি দেখলো তো পাগল, গহনা দেখলো তো পাগল, লোকের গাড়ি-বাড়ি দেখলো তো পাগল। সিনেমার নামে পাগল, খেলা দেখার নামে পাগল। বাজার করতে পাগল, বাপের বাড়ির নামে পাগল, এমন কি একটা উলের প্যাটার্নের জন্যেও পাগল। তাছাড়া রাগে পাগল, সন্দেহে পাগল, অভিমানে পাগল, অহংকারে পাগল, অপরের ওপর টেক্কা দেবার ব্যাপারে পাগল, মোট কথা নেচার ওদের আধাআধি পাগল করেই পাঠিয়েছে, বাকিটা ওরা নিজে নিজেই—'

'মেয়েদের তো তুমি অনেক স্টাডি করেছো নীরুদা?' অনামিকা হাসেন, 'লিখলে তুমিও সাহিত্যে নাম করতে পারতে।'

'লিখলে?'

নীরুদা উদাত্ত গলায় বলে ওঠেন, 'দরকার নেই আমার অমন নাম করার। দেশের ছেলেগুলোকে বখিয়ে সমাজকে উচ্ছন্ন দিয়ে জাতির সর্বনাশ করে নাম আর পয়সা করা হচ্ছে। এই সিনেমাগুলো হচ্ছে, কী থেকে এর উৎপত্তি? ওই তোমাদের সাহিত্য থেকেই তো? কী ঘটছে তা থেকে? ছেলেগুলো ওই থেকেই অসভ্যতা অভব্যতা খুনোখুনি রাহাজানি শিখছে না?'

সনৎকাকা হেসে ফেলে বলে ওঠেন, 'শুনলি তো? এবার কী জবাব দিবি দে!'

'জবাব দেবার কিছু থাকলে তো?' অনামিকা হাসলেন, 'জবাব দেবার নেই, স্রেফ কাঠগড়ায় আসামী যখন। আর সিনেমার গল্পকেও যদি সাহিত্য বলে ধরতে হয়, তাহলে তো ফাঁসির আসামী।'

বলে ফেলেই অনামিকা ঈষৎ ভীত হলেন, এ'র মুখেও সঙ্গে সঙ্গে 'কাঠে'র চাষ হবে না তো !

কিন্তু ভীতিটা অমূলক, নীরুদা বরং আরো বীরদর্পে বলে ওঠেন, 'তা সাহিত্য নয় কেন? সাহিত্যিকদের লেখা গল্প-টল্পই যখন নেওয়া হচ্ছে।'

'তা বটে!'

'হু বাবা! স্বীকার না করে উপায় আছে?' নীরুদা কাকার সামনেই টোব্যাকোর টিন ঠুকে কুচো তামাক বার করে একটা সিগারেট বানাতে বানাতে বলেন, 'তা তোমার গল্প-টল্পও তো শুনেছি সিনেমা হয়, তাই না?'

অনামিকা লক্ষ্য করলেন, নীরুদা আর তাকে 'তুই' করে কথা বলছেন না। অথচ আগে বলতেন। 'তুই' ছাড়াই বলতেন না বরং। তার মানে এখন সমীহ করছেন। নাকি দীর্ঘদিন দূরে থাকার দূরত্ব? কিন্তু তাই কী হয়? কই সনৎকাকা তো তাকে 'তুমি' বলতে বসলেন না!

বেদনা অনুভব করলেন অনামিকা।

আত্মীয়জন সমীহ করছে, এটা পীড়াদায়ক। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে দেখেন। পুরোনো সম্পর্কের সহজ ভঙ্গীটি যেন খুঁজে পান না। নেহাৎ যারা বাড়ির লোক তারাও কি মাঝে মাঝে এমন দূরত্ব দেখায় না? যেন 'বকুল' নামের মেয়েটা অন্য নামের ছদ্মবেশ পরে অন্যরকম হয়ে গেছে!

অতএব তারাই বা অন্যরকম হয়ে যাবে না কেন?

অথচ এই ছদ্মনামটার সম্পর্কে তাদের অনাগ্রহের শেষ নেই, জানবার ইচ্ছের লেশ নেই। শম্পা বাদে, বাড়ির আর সকলে অনামিকা দেবীর বহির্জীবন এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শুধু উদাসীনই নয়, যেন বিদ্বিষ্ট। তাদের কথার সুরে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে অনেক সময়ই মনে হয়, অনামিকা বুঝি স্রেফ সংসারকে ফাঁকি দেবার জন্যেই দিব্যি একটি ছুতো আবিষ্কার করে নিয়ে মনের সুখে স্বাধীনতা উপভোগ করছে। যেন বকুলের যেটি প্রাপ্য নয়, সেটি ওই কৌশলটি করে লুটে নিচ্ছে বকুল।

অনামিকা কি লিখছেন, কতো লিখছেন, কোথায় লিখছেন, এ ব্যাপারে কারো মাথাব্যথা নেই, অনামিকা যে বিনা পরিশ্রমে শুধু কাগজের উপর কতকগুলো আঁকিবুকি টেনে অনেকগুলো টাকা-ফাকা পেয়ে যান, সেইটা নিয়েই কোনো এক জায়গায় ব্যথা। সেই টাকার সুযোগ যারা পাচ্ছে—ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা, তাদেরও।

না, অনামিকার দাদা-বৌদিরা হাত পেতে কোনো খরচা নেন না অনামিকার কাছ থেকে, কিন্তু অনামিকারই বা ওরা ছাড়া আর কে আছে? কোথায় করবেন খরচ? দূর সম্পর্কের দুঃস্থ আত্মীয়জন? হয়তো কিছুটা করতে হয় সেখানে, কিন্তু তাতে পরিতৃপ্তি কোথায়।

কিন্তু ওই রূঢ় রুক্ষ কথাটা থাক, অভিমানের আরো ক্ষেত্র আছে বৈকি। অনামিকার 'সাহিত্যে'র ব্যাপারে একেবারে বরফশীতল হলেও, বাইরে অনামিকার অসাক্ষাতে যে ওরা অনামিকার নিতান্ত নিকটজন বলে পরিচিত হতে পরম উৎসাহী, সে তথ্য অনামিকার অবিদিত নেই।

হয়তো জীবন এই রকমই। এতে আহত হওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা! অনামিকা যখন তাঁর পরিচিত বন্ধুসমাজের দিকে তাকিয়ে দেখেন, তখন এই অনুভূতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'জীবন এই রকমই'।

মানুষের সম্পর্কে মর্যাদাবোধ নেই, শুধু ভাঙিয়ে খাবার মতো মানুষকে

ভাঙিয়ে খাওয়ার চেষ্টাটা আছে প্রবল। আজকের দিনের সব থেকে বড়ো শিল্প বোধ করি মানুষ ভাঙিয়ে খাওয়ার শিল্প।

যদি অনামিকা নামের মানুষটাকে ভাঙিয়ে কিছুটা সুবিধে অর্জন করে নিতে পারা যায়, তবেই সেই অর্জনকারীরা অনামিকার অনুরক্ত ভক্ত বন্ধু। কিন্তু অনামিকা ভালই জানেন যে মুহূর্তে তিনি ওই ভাঙিয়ে খাওয়াটা বুঝতে পারছেন সেটা জানতে দেবেন, সেই মুহূর্তে সকলের সব ভক্তি নিশ্চিহ্ন।

আর নিজে যদি তিনি প্রত্যাশার পাত্র হাতে নিয়ে একবার বলে বসেন, 'আমায় তো অনেক ভাঙালে, এবার আমার জন্যে কিছু ভাঙো না' তা হলেই লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে ধিক্কারে বন্ধুরা সহস্র যোজন দূরে সরে যাবেন!'

হ্যাঁ, এই পৃথিবী।

তুমি যদি বোকা হও, অবোধ হও, আত্মস্বার্থে উদাসীন হও, বন্ধুর গুণগুলি সম্পর্কে চক্ষুষ্মান আর দোষগুলি সম্পর্কে অন্ধ হও, তুমি যে পৃথিবীর সব কিছু ধরে ফেলতে পারছো, সেটা ধরতে না দাও, তবেই তোমার বন্ধুজন তোমার প্রতি সহৃদয়।

নচেৎ ? হৃদয়বর্জিত।

এই তো এখনই দেখো, এই নীরুদা নামের বিজ্ঞ বয়স্ক এবং আপন প্রাক্তন পদমর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত আত্মীয়টি, অনায়াসেই ইনি ছেলেমানুষের মতো ওজনহীন উক্তি করছেন, কিন্তু তাঁর উক্তি যে ছেলেমানুষী ও কথা একবার উচ্চারণ করুন দিকি অনামিকা দেবী?

সঙ্গে সঙ্গেই যে উনি ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবেন, তাতে সন্দেহ নাস্তি। যেমন করলেন ওঁর স্ত্রী। তিনি হয়তো 'শিরিষ কুসুম সম' অতি সুকুমার, ইনি হয়তো তার থেকে কিছুটা সহনশীল, কিন্তু কলসীর মধ্যে গোখরো আছেই।

অতএব হাস্যবদনে উপভোগ কর ওঁর ছেলেমানুষী! অতএব বলে ফেলো, 'ও বাবা, তোমার ওই বিরাট কর্মচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনির মাঝখানেও এতো খবর পেঁৗছেছে তোমার কাছে? অতো দূরে থেকে?'

'পেঁৗছবে না?'

নীরুদা খুব একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতায় হাসি হেসে বলে ওঠেন, 'তোমার সুখ্যাতিতে তো কান পাতা দায়। যাক, তুমি যে ওই সব আধুনিক লেখকদের মতো অশ্লীল-অশ্লীল লেখা লেখো না এতেই আমাদের পক্ষে বাঁচোয়া!'

অনামিকা মনে মনে হাসলেন। ভদ্রলোক হয়তো তাবৎ জীবনকাল উচ্চ রাজকর্মচারী হিসেবে যথেষ্ট কর্মদক্ষতা দেখিয়ে এসেছেন, হয়তো সূক্ষ্ম দর্শন ক্ষমতায় অধস্তনদের চোখে সর্ষেফুল এবং ঊর্ধ্বতনদের চোখে নিষ্কৃতির আলো ফুটিয়ে এসেছেন, কিন্তু সংসার ক্ষেত্রে যে, 'আর একজনের চোখ' দিয়ে জগৎ দেখে আসছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

এ একটা টাইপ। বশংবদ স্বামীর উদাহরণ।

যাক্, কথাবার্তাগুলো কৌতুককর।

তাই হাসি-মুখে উত্তর দেন অনামিকা, 'আমি যে ওই সব মারাত্মক লেখা লিখি না সে কথা কে বললে তোমায়?'

'আহা ওটা আবার একটা বলবার মতো কথা নাকি? তুমি ওসব লিখতেই পারবে না। হাজার হোক ভদ্রঘরের মেয়ে তো? আমাদের ঘরের মেয়ে! রুচি অমন কু হতে যাবে কেন?'

'তা বটে!'

অনামিকা অমায়িক গলায় সায় দেয়, 'সে কথা সত্যি! তাছাড়া আমি তো আর আধুনিক নই।'

'বয়সের কথা বলছো?' নীরুদা উদাত্ত গলায় বলেন, 'সেটা আর আজকাল মানছে কে? যতো রাজ্যের বুড়োরাও তো শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকছে শুনছি। কী এরা? সমাজের শত্রু নয়? হয়তো এঁরাই কলেজের প্রফেসর-ট্রফেসর, হয়তো সমাজের মাথার মণি, অথচ স্রেফ পয়সার লোভে কদর্য-কদর্য লিখে—'

কথাটার উপসংহারটা বেশ জুৎসই করবার জন্যেই বোধ হয় নীরুদা একবার দম নিলেন, সেই অবকাশে অনামিকা খুব নিরীহ গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আর কার লেখা তোমার এতো কদর্য লাগে নীরুদা?'

'কার আর? নীরুদা সুপুরি একগালে দেওয়ার সুরে বলেন, 'কার নয়? একধার থেকে সবাইয়ের। আজকাল কোন্ লেখকটা সভ্যতব্য লেখা লিখছে? লিখবে কেন? আজকাল তো অসভ্য লেখাতেই পয়সা। তাই না? যে বই অসভ্যতার দায়ে কোর্টে উঠবে, সেই বইয়ের ততো এডিশন হবে।'

অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'কোর্টে ওঠেনি, এমন বইয়েরও অনেক সংস্করণ হয়।'

'হতে পারে! আমি তার খবর-টবর রাখি না।'

'ও তাই বুঝি! শুধু এইসব আধুনিক সাহিত্যই পড়ো বুঝি খুব?'

'পড়ি? আমি?'

নীরুদা যেন আকাশ থেকে পড়েন, 'আমি ছোঁবো ওই নোংরা অপবিত্র দুর্গন্ধ বই? রাবিশ! মলাটও উল্টে দেখিনি কারুর। আমার হাতে আইন থাকলে এইসব লেখকদের একধার থেকে জেলে পুরতাম, বুঝলে? যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! ইহজীবনে যাতে আর কলম না ধরতে পারে বাছাধনেরা।'

উত্তর দেবার অনেক কথা ছিল অবশ্য, তবে সেটা তো অর্থহীন। সেই নিরর্থক চেষ্টায় গেলেন না অনামিকা, শুধু খুব একটা ভীতির ভান দেখিয়ে বললেন, ওরে বাবা! ভাগ্যিস নেই! তাই বেচারীরা খেয়ে পরে বেঁচে আছে।'

যাঁর চোখ দিয়ে জগৎ দেখেন নীরুদা, তাঁর মতো অনুভূতির সূক্ষ্মতা যে অর্জন করে উঠতে পারেননি নীরুদা এটা ঠিক। তাই শ্লেষের সুরে বলেন, শুধু খেয়ে পরে, গাড়ি-বাড়ি করে নয়? অথচ চিরদিনই শুনে এসেছি সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর বিরোধ। মাইকেল পয়সার অভাবে বই বেচে খেয়েছেন, গোবিন্দদাস না কে যেন না খেয়ে মরেছেন। গানেও আছে "হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কী গো মা তারাই তত"। অথচ এখন?'

এতক্ষণ কৌতুকের হাসি মুখে মাখিয়ে নিঃশব্দে এই আলাপ-আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন সনৎকাকা, এখন হঠাৎ একটু যোগ দিলেন। বললেন, 'আহা হবেই তো! এঁরা তো আর মা সরস্বতীর ভক্ত নয়, ভক্ত হচ্ছেন দুষ্টু সরস্বতীর, কাজেই লক্ষ্মীর সঙ্গে বিরোধ নেই। কী বলিস বকুল!'

'তাই মনে হচ্ছে—', অনামিকা হেসে ফেলে বলেন, 'কিন্তু যাই বলো নীরুদা, সরকারের অতোবড়ো একটা দায়িত্বের জোয়াল কাঁধে নিয়েও যে তুমি "সাহিত্য" নিয়ে এতো ভেবেছো, চর্চা রেখেছো, এটা আশ্চর্য! এমন কি এতো সব মুখস্থ-টুখস্থ রাখা—'

'চর্চা রাখতে দায় পড়েছে—', নীরুদা সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে অম্লান বদনে বলেন, 'তোর বৌদি বলে তাই শুনি। ও তো বলে—নাটক-নভেল গল্প-টল্প একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে যদি দেশের কিছু উন্নতি হয়। জিনিসপত্রগুলো কি?

কতকগুলো বানানো কথা মাত্র, তাছাড়া আর কিছু? ওদের মেয়ে এদের ছেলের সঙ্গে প্রেম করলো, নয়তো এর বৌ ওর সঙ্গে পালিয়ে গেল, এই তো ব্যাপার! এই নিয়েই ফেনিয়ে ফেনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে সাতশো পাতার বই, কুড়ি টাকা দাম, দশটা এডিশন, একটা ক্লাস ওয়ান অফিসারের থেকে বেশী আয় আজকাল নামকরা লেখকের! রাবিশ!'

অনামিকার হঠাৎ মনে হয় গাত্রদাহটা বোধ হয় ওই 'আয়'টাকে কেন্দ্র করেই এবং সহসা হাতের কাছে একটা ঘোরতর পাপীকে পেয়ে—

চিন্তায় ছেদ পড়লো।

সুদৃশ্য একটা ট্রে হাতে ঝাড়ন কাঁধে একটি ভৃত্যের আবির্ভাব ঘটলো।

বলা বাহুল্যে ট্রে-তে অনামিকার জন্য চা এবং 'টা'।

নীরুদা একটু নড়েচড়ে বসলেন। একটু যেন 'অসহায়-অসহায় এবং অপ্রতিভ-অপ্রতিভ' গলায় বললেন, 'মেমসাহেব কোথায়?'

ভৃত্যের গলায় কিন্তু গভীর আত্মস্থতা।

'ঘরে আছেন। মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরেছে! এই সেরেছে!'

নীরুদা চঞ্চল হয়ে ওঠেন, 'ওই একটি ব্যাধি সঙ্গের সাথী বেচারার!'

সনৎকাকা উদ্বিগ্ন গলায় বলেন, যা দিকিন—দেখ্‌গে তো একবার।'

'না, দেখবো আর কি—', নীরুদার কণ্ঠস্বর স্খলিত, 'ও তো আছেই।'

তারপর যেন জোর করেই নিজেকে চাঙ্গা করে নিয়ে বলেন, আচ্ছা বকুল, কাকাকে কেমন দেখছো বল?'

'ভালই তো।'

'তা এখন অবশ্য "ভালই তো" বলবে। যা অবস্থা হয়েছিল, আর যে ভাবে এই "ভাল"র পর্যায়ে রাখা হয়েছে! কথা তো শুনতেই চাইতেন না। আর্গুমেণ্টটা কী জানো? এতো সাবধানে সাবধানে নিজেকে জীইয়ে রেখে আরো কিছুদিন পৃথিবীতে থাকবার দরকারটা কী? বোঝো! শুনেছো এমন কথা? তোমার বইতে আছে এমন ক্যারেক্টার?'

'তাই নেই।' অনামিকা ঈষৎ গভীর সুরে বলেন, 'সাধ্য কি যে এ ক্যারেক্টারকে আঁকি?'

নীরুদা খোলা গলায় বলেন, 'অসাধ্য হবে না যদি আমার কাছে দু'দিন বসে ডিক্টেশান নাও। উঃ! তবে হ্যাঁ, একটি জায়গায় স্রেফ জব্দ!'

এক ঝলক হাসিতে নীরুদার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, 'বৌমাটির কাছে তাঁর ট্যাঁ-ফোঁটি চালাতে পারেন না। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না বকুল. এখন কাকার আমার রাতদিন "মা-জননী" ছাড়া—'

হঠাৎ কেমন যেন চাঞ্চল্য বোধ করেন নীরুদা। বোধ করি শিরঃপীড়াগ্রস্ত সেই বেচারীর পীড়ার কথা সহসা হৃদয়ে এসে ধাক্কা মারে।

উঠে পড়েন উনি। 'কই তুমি তো কিছুই খেলে না,। স্যাণ্ডুইচটা অন্ততঃ খাও—' বলেই শিথিল চরণে চটি টানতে টানতে এগিয়ে যান।

সনৎকাকা কয়েক সেকেণ্ড সেই দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বলেন, 'ছেলেটার জন্যে দুঃখ হয়।'

'সে কী কাকা!'

অনামিকা গালে হাত দেন, 'নিজে তো উনি সুখের সাগরে ভাসছেন।

'সেটাই তো আরো দুঃখের।'

সনৎকাকার কথাটা কি ধাঁধা? না খুব সোজা? জলের মতো একেবারে?

যারা সুখের সাগরে ভাসছে, তাদের জন্যেই চিন্তাশীলদের যতো দুঃখ। তাদের দুঃখবোধ জাগিয়ে তুলে, সেই দুঃখ নিরাকরণের জন্য মাথা খোঁড়াখুঁড়ি।

কিন্তু—

মনে মনে একটু হাসলেন অনামিকা, কিন্তু যারা জেগে ঘুমোয়? যারা জেনে বুঝে কৃত্রিমতার দেবতাকে পুজো দিয়ে চলে? আচ্ছা কেন দেয়? চামড়া উড়ে যাওয়া শুধু রক্ত-মাংসের চেহারাটা সহ্য করতে পারে না বলে? রূপ-রস-রং-তুলিসহীন পৃথিবীটায় বাস করতে পারবে না বলে?

সনৎকাকার বাড়ি থেকে অনামিকাদের বাড়ির দূরত্ব নেহাৎ কম নয়, ট্যাক্সিতে সে চিন্তাকে ছেড়ে দিয়ে যেন গভীরে তলিয়ে যান অনামিকা।

নীরুদা উঠে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ বসেছিলেন সনৎকাকার কাছে, আরো কতো কথা হয়েছে, সনৎকাকার হাসির সুরমাখা প্রশ্নটা যেন কানের পর্দায় লেগে রয়েছে এখনো—'চোখ থেকে মুছে যায় যদি, সব রং সব অনুরাগ, শুধিতে কাহার ঋণ, কাটাইতে হবে দিন, ধরণীর অন্নজলে বসাইয়া ভাগ।'

সনৎকাকা কি কবিতা লেখেন?

আস্তে আস্তে নিজের ভেতর থেকে আর এক প্রশ্ন ওঠে। লেখা নিয়ে তো অনেক হাস্যকর কথা হলো, হাসলামও। কিন্তু নিজের জমার খাতায় অঙ্কটা কী? সত্যিই কি কিছু লিখেছি?

যে লেখা কেবলমাত্র নগদ বিদায় নিয়ে চলে যায় না, কিছু পাওনা রেখে যায়?

আমি কি সত্যি সত্যি কারো কথা বলতে পেরেছি? আমি কি সত্যকার জীবনের ছবি আঁকতে পেরেছি? নাকি নীরুদার ভাষায়, শুধু কতকগুলো কাল্পনিক চরিত্র খাড়া করে গল্প বানিয়েছি?

হয়তো অপস্রিয়মাণ সমাজজীবনের কিছু ছবি রয়ে গেল আমার খাতায়, কিন্তু যে সমাজজীবন বর্তমানের স্রোতে উত্তাল? মুহূর্তে মুহূর্তে যার রং বদলাচ্ছে, গড়ন বদলাচ্ছে? আমার অভিজ্ঞতায় কি ধরতে পারছি তাদের? না, পারছি না। তার কারণ, আজ আর সমাজের একটা গোটা চেহারা নেই, সে খণ্ড ছিন্ন টুকরো টুকরো। সেই টুকরোগুলো অসমান তীক্ষ্ম, তাতে যতটা ধার আছে ততটা ভার নেই। আর যেন ওই তীক্ষ্মতাটা অদূর ভবিষ্যতে ভোঁতা হয়ে যাবার সূচনা বহন করছে। তবু এখন যারা সেটা ধরতে পারছে, তারা সমাজের সেই ধারালো টুকরোগুলো তুলে নিয়ে আরো শান দিচ্ছে।

তাহলে কি কলমকে এবার ছুটি দেবেন অনামিকা?

বলবেন, তোমার ছুটোছুটি এবার শেষ হোক!

হয়তো অনামিকা দেবীর ভক্ত পাঠকের দল সেই অনুপস্থিতিতে হতাশ হবে, কিন্তু নতুন কিছু যদি তাদের দিতে না পারি, কী হবে পুরনো কথাকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে?

গাড়ি একটা বাঁক নিল, সামান্য একটু নির্দেশ দিলেন চালককে, তারপর আবার ভাবলেন, কিন্তু সেই নতুন কথাটা কি? কেবলমাত্র নিষ্ঠুর হাতে সব কিছুর আবরণ উন্মোচন?

তা ছাড়া?

তাছাড়া আর সবটাই তো পুরনো।

জীবন নিয়েই সাহিত্য, চরিত্র নিয়েই কল্পনা। আদ্যিকালেও যা ছিল, আজও কি তাই নেই? যেটা অন্যরকম সেটা তো পরিবেশ। সমাজে যখন যে পরিবেশ, তার খাঁজে খাঁজে ওই জীবনটাকে যেমন দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই সাহিত্যের উপজীব্য। আজকের পরিবেশ যদি খাপছাড়া, পালছেঁড়া, হালভাঙা হয়, সাহিত্যই বা—

'না, না, বাঁ দিকে নয়, ডান দিকে—'

নির্দেশ দিলেন চালককে।

তারপর শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে উঠে বসলেন, এবার ঠিক জায়গায় নামতে হবে।

যে মনটাকে ছেড়ে দিচ্ছিলেন, তার দিকে তাকালেন, তারপর আস্তে বললেন, কিন্তু পরিবেশ সাহিত্যের উপর জয়ী হবে, না সাহিত্য পরিবেশের উপর? সাহিত্যের ভূমিকা কি পরাজিতের?

বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলেন, একটু চকিত হলেন, দরজার কাছে ছোড়দা দাঁড়িয়ে, দাঁড়িয়ে বড়দার ছেলেও।

ওরা এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন?

অনামিকার দেরি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে?

সেটা তো অলীক কল্পনা!

অনামিকার গতিবিধি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

ব্যস্ত তেমন হলেন না, ভাবলেন নিশ্চয় সম্পূর্ণ অন্য কারণ।

ধীরেসুস্থে মিটার দেখছিলেন, বড়দার ছেলে এগিয়ে এলো, দ্রুত প্রশ্ন করলো, 'শম্পার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'শম্পার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করেছে?'

ভাইপোর গলায় যেন একটা নিশ্চিত সন্দেহের সুর, যেন যে প্রশ্নটা করছে সেটার উত্তরটা তার অনুকূল হওয়ারই সম্ভাবনা।

অনামিকা বিস্ময় বোধ করলেন। বললেন, 'আমি তো তাকে সকালের পর আর দেখিইনি। কেন কী হয়েছে?'

'যা হবার তাই হয়েছে!' বড় ভাইপো যেন পিসিকেই নস্যাৎ করার সুরে বলে ওঠে, 'কেটে পড়েছেন। সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে।'

॥ ১৬ ॥

জলের অপর নাম যে কেন 'জীবন' এ কথা বোধ করি এমন করে উপলব্ধি করতে পারতো না পারুল যদি সে তার এই চন্দননগরের বাড়িটিতে একা এসে বাস না করতো, আর যদি না ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপচাপ গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কাটাতো।

এক গঙ্গার কতো রূপ, কতো রং, কতো রঙ্গ, কতো বৈচিত্র্য! শুধু ঋতুতে ঋতুতেই নয়, দিনে রাত্রে, সকাল সন্ধ্যায়, প্রখর রৌদ্রের দুপুরে, ছায়া-ছায়া বিকেলে, শুক্লপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে বদল হচ্ছে তার রঙের রূপের ভঙ্গিমার। এই অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যেন অফুরন্ত জীবনের স্বাদ।

সেকালের তৈরি বাড়ি, ছোট হলেও ছোট নয়, একালের ফ্ল্যাটবাড়ির ছোটত্বের

সঙ্গে তার ছোটত্বের তুলনাই হয় না। ফেলে ছড়িয়ে অনেকগুলো ঘর-বারান্দা, অকারণ অর্থহীন খানিকটা দালান, এই বাড়িতে শুধু একা পারুল তার নিতান্ত সংক্ষিপ্ত জীবনযাত্রার মধ্যে নিমজ্জিত, গলার সাড়া নেই কোথাও, নেই প্রাণের সাড়া।

তবু যেন পারুলকে ঘিরে এক অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ। নিঃসঙ্গ পারুল শুধু ওই জলের দিকে তাকিয়েই যেন অফুরন্ত সঙ্গের স্বাদ পায়, যেন অনন্ত প্রাণের স্পর্শ পায়।

পরিবর্তন মানেই তো জীবন, যা অনড় অচল অপরিবর্তিত, সেখানে জীবনের স্পন্দন কোথায়? অচলায়তনের মধ্যেই মৃত্যুর বাসা। জীবনই প্রতি মুহূর্তে রং বদলায়। তাই নদীপ্রবাহ জীবন-প্রবাহের প্রতীক। তবু নদীর ওই নিয়ত রূপ-বৈচিত্র্যের গভীরে যে একটি স্থির সত্তা আছে, পারুলের প্রকৃতির মধ্যে বুঝি আছে তার একাত্মতা। পাগল হয়ে সেই সত্তার গভীরে নিমগ্ন থেকে ওই রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্য হতে আহরণ করে বাঁচার খোরাক, বাঁচার প্রেরণা।

অথচ পারুলের মত অবস্থায় অপর কোনো মেয়ে অনায়াসেই ভাবতে পারতো, আর কী সুখে বাঁচবো? ভাবতো, আর বেঁচে লাভ কী?

পারুল তা ভাবে না।

নিঃসঙ্গ পারুল যেন তার জীবনের পাত্রখানি হাতে নিয়ে চেখে চেখে উপভোগ করে।

প্রতিটি দিনই যেন পারুলের কাছে একটি গভীর উপলব্ধির উপচার হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

পারুল যে কেবলমাত্র সেই দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত অমলবাবু নামের ভদ্রলোকটির স্ত্রী নয়, পারুল যে মোহনলাল এবং শোভনলাল নামক দু-দুজন ক্লাস ওয়ান অফিসারের মা নয়, পারুল যে বহু আত্মীয়জনের মধ্যেকার একজন নয়, পারুল একটি সত্তার নাম, সেই কথাটাই অনুভব করে পারুল। আর তেমনি এক অনুভবের মুহূর্তে মাকে মনে পড়ে পারুলের।

আগে পারুল মাকে বুঝতে পারতো না। পারুল তার মার সদা উত্তেজিত স্বভাবপ্রকৃতির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, পারুল তার মার ওই ডজনখানেক ছেলেমেয়ে বরদাস্ত করতে পারতো না। কিন্তু এখন পারুল যেন দর্শকের ভূমিকায় বসে মাকে দেখতে পায়।

পারুলের একটা নিঃশ্বাস পড়ে। পারুল ভাবে মা যদি খুব অল্পবয়সে বিধবা হয়ে যেতো, তাহলে হয়তো মা বেঁচে যেতো।

হয়তো বকুলই পারুলকে এই দৃষ্টিটা দিয়েছে। বকুলই তার মার অপরিসীম নিরুপায়তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। সেই অবরোধের অসহায় যুগে প্রায় সব বাঙালী মেয়ের জীবনেই তো বকুল-পারুলের মায়ের জীবনের ছায়ার প্রতিফলন।

শুধু কেউ ছিল অন্ধ অবোধ, কেউ দৃষ্টিশক্তি আর বোধের যন্ত্রণায় জর্জরিত। পারুল তার মার সেই বোধ-জর্জরিত জীবনের জ্বালা দেখেছে।

তখন পারুল মার ওই জ্বালাটা নিয়ে মাতামাতি দেখে বিরক্ত হতো, এখন দূরলোক থেকে মমতার দৃষ্টিতে তাকায়।

পারুল এক এক সময় যেন মাকে এই গঙ্গার উপরকার বারান্দায় এনে বসায়, তারপর গভীর একটা নিঃশ্বাস উৎসর্গ করে মুক্তির কাঙাল সেই মানুষটার উদ্দেশে। পারুলের বিধাতা পারুলের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন বৈকি, তাই পারুলকে

দীর্ঘদিন ধরে একটা স্থূল পুরুষচিত্তের ক্লেদাক্ত আসক্তির শিকার হয়ে পড়ে থাকতে হয়নি, যে আসক্তি একটা চটচটে লালার মতো আবিল করে রাখে, যে আসক্তি কোথাও কোনোদিকে মুক্তির জানালা খুলতে দেয় না।

কিন্তু এখন নাকি পালাবদল হয়েছে।

তা হয়েছে বটে। এখন শিকার শিকারী জায়গ্য বদল করেছে।

পারুলের হঠাৎ-হঠাৎ তার ছেলে দুটোর কথা মনে পড়ে যায়।

কিন্তু ওরা কি মুক্তির জানালা খুঁজে বেড়ায়? পারুলের ছেলেরা? না পরম পরিতোষে সেই একটা আঠা-চটচটে আসক্তির লালা গায়ে মেখে পড়ে থেকে নিজেদেরকে খুব 'সুখী-সুখী' মনে করে? হয়তো তাই।

হয়তো অধিকার-বোধে তীব্র তীক্ষ্ন সচেতন, অথচ অভিমানারক্ত সেই এক 'প্রভুচিত্তে'র কাছে সমর্পিত-প্রাণ হয়ে থাকাই ওদের আনন্দ। প্রভুর ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছা বিলীন করার মধ্যেই ওদের জীবনের চরম সার্থকতা।

আপন সন্তানকেই কি সম্পূর্ণ পড়া যায়? হয়তো অনেকটা যায়, তবু সবটা নয়। অনেকটা যায় বলেই শোভনের জন্যে একটি গভীর বেদনাবোধ আছে। যেন বুঝতে পারে পারুল, শোভনের শান্তিপ্রিয়তাই শোভনকে অনেকটা অসহায় করে রেখেছে।

এক এক সময় ভারী অদ্ভুত লাগে পারুলের। মনে হয় পারুল যেন অনেক দড়িদড়ার গেরো কেটে কি একটা ভয়ংকরের কবল থেকে হাত-কয়েক পালিয়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে।

সেই ভয়ঙ্করটা কী? সমাজ? লোকসমাজ?

বোধ হয় তাই।

লোকসমাজের মুখ চেয়ে পারুলকে আর এখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতে হয় না। হঠাৎ কখন এক সময় পারুল ওই 'লোকনিন্দে' জিনিসটার মধ্যেকার পরম হাস্যকর দিকটা উপলব্ধি করে ফেলে 'তেলি হাত ফসকে গেলি' হয়ে গেছে।

এখন আর পারুলের শ্বশুরকুলের কেউ পারুল সম্পর্কে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। বিধবা পারুল, ঝাড়া-হাত-পা পারুল, আত্মীয়স্বজনের সুখে-দুঃখে গিয়ে পড়ে বুক দিয়ে করবে এমন আশা কারুর নেই। পারুল যদি কারুর অসুখ শুনে দেখতে যায়, তাহলে সে বিগলিত হয়, পারুল যদি কারুর বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে গিয়ে দাঁড়ায়, সে ধন্যবোধ করে।

না গেলেও কেউ কিছু মনে করে না, কারণ এখন সবাই ধরে নিয়েছে, 'উনি এই রকমই'।

এখন আর পারুলের বেয়ানেরা পারুলের ছেলে-বৌয়ের প্রতি কর্তব্যহীনতা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হন না, তাঁরাও ধরে নিয়েছেন 'উনি তো ওই রকমই'।

কিন্তু সবাই কি পারে এই মুক্তি আহরণ করতে?

পারে না। কারণ বন্ধন তো বাইরে নয়, বন্ধন নিজের মধ্যে। সেই বন্ধনটি হচ্ছে 'আমি'। সেই 'আমি'টি যেন লোকচক্ষুতে সব সময়ে ঝকঝকে চকচকে নিখুঁত নির্ভুল থাকে, যেন তাকে কেউ ত্রুটির অপরাধে চিহ্নিত করতে না পারে, এই তো চেষ্টা মানুষের। 'আমি'টিকে সত্যকার পরিশুদ্ধ করে নির্ভুল নিখুঁত হবার চেষ্টা ক'জনেরই বা থাকে? 'আমি'টিকে পরিপাটি 'দেখানো'র সংখ্যাই অধিক। ওই দেখানোর মোহটুকু ত্যাগ করতে পারলেও বা হয়তো সেই ত্যাগের পথ ধরে পরিশুদ্ধি এলেও আসতে পারে। কিন্তু 'আমি'র বন্ধন বড় বন্ধন।

পারুলের হয়তো ও বন্ধনটা চিরদিনই কম ছিল, এখন আরো গেছে। কিন্তু

এই বন্ধনহীন পারুলের সামনে হঠাৎ একটি বন্ধন-রজ্জু এসে আছড়ে পড়লো।

তা এক রকম আছড়ে পড়াই। কারণ ব্যাপারটা ঘটলো বিনা নোটিশে।

পারুল আজ সামান্য রান্নার আয়োজন করে নিয়ে সবে স্টোভটা জ্বেলেছে, হঠাৎ বাইরের দরজায় একটা সাইকেল-রিকশার শব্দ হলো, সঙ্গে সঙ্গে রিকশাওয়ালারই ডাক শোনা গেল, 'মাইজী, মাইজী!'

তার মানে আরোহী ওকেই ডাক দেবার কাজটা চাপিয়েছে।

কে এলো এমন সময়? কে এলো পারুলের কাছে?

আর কেই বা, ছেলেরা ছাড়া? যারা কর্মস্থল থেকে কলকাতায় আসা-যাওয়ার পথে এক-আধবেলার জন্যে এসে দেখা দিয়ে যায়, অথবা মাকে দেখে যায়।

কিন্তু তারা তো নিজেই আগে উঠে আসে। পিছু পিছু হয়তো রিকশাওয়ালাটা মাল মোট নিয়ে—

তবে কি কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে—

তাড়াতাড়ি নিচের তলায় নেমে গেল পারুল।

আর নেমে গিয়েই থেমে দাঁড়িয়ে পড়লো।

সিঁড়ির জানলা থেকে রিকশায় বসা যে রোগা-রোগা মেয়েটাকে হঠাৎ শোভনের বৌ বলে ভুল হয়েছিলো, সে একটা অপরিচিত মেয়ে। তার পাশে একটি অপরিচিত পুরুষ-মূর্তি।

কিন্তু মেয়েটা কি একেবারেই অপরিচিত? কোথায় যেন দেখেছেন না?

আরে কী আশ্চর্য, মেয়েটা পারুলের পিতৃকুলের না? পারুলের ভাইঝি তো!

তবু পারুল প্রশ্ন না করে পারলো না, 'কে?'

'আমি।'

মেয়েটা নেমে এলো, যেন কষ্টে নিচু হয়ে একটা প্রণামের মতো করে বলে উঠলো, 'আমি হচ্ছি শম্পা। আপনার ভাইয়ের মেয়ে। পিসিকে, মানে ছোট পিসিকে অবশ্য আমি 'তুমি' করেই কথা বলি, কিন্তু আপনার সঙ্গে তো মোটেই চেনাজানা নেই, তাই আপনিই বলছি। যদি এখানে কিছুদিন থেকে যাওয়া সম্ভব হয় তো পরে দেখা যাবে। এখন কথা হচ্ছে থেকে যাওয়ার!...অদ্ভুত একটা পরিস্থিতিতে পড়ে চট্ করে আপনার এখানে চলে এলাম। কেন এলাম তা জানি না। আপনাকে তো চিনিও না সাতজন্মে, নেহাৎ পিসির লেখা খামে ঠিকানাটা ক্রমাগত দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল তাই।...এখন শুনুন ব্যাপার—'

'আমাকে তুই 'তুমিই' বল্।' পারুল হাসলো, 'আমি চটে যাবো না।'

'যাবে না তো? বাঁচলাম বাবা! এতক্ষণে কথা বলাটা সহজ হলো। শোনো, আমি না—যাকে বলে একটা অসুবিধেয় পড়ে, মানে বিরাট একটা অসুবিধেয় পড়ে, না ভেবে-চিন্তে তোমার এখানেই চলে এলাম, বুঝলে? না, একেবারেই যে ভাবিনি তা নয়, ভাবনা-চিন্তা করতে গিয়ে তোমার নামটাই মনে এসে গেল। এসেছি অবশ্য উপকারের আশাতেই, তবে উপকার করা না-করাটা তোমার ইচ্ছে। ওই যে ছেলেটাকে দেখছো না রিকশায়, ওর নাম সত্যবান দাস। মানে আর কি বুঝতেই পারছো —ব্রাহ্মণসন্তান-টন্তান নয়। আর মনে হচ্ছে, তোমরা যাকে ভদ্দরলোক বলো ঠিক তাও নয়। মানে স্রেফ্ কুলি মজুর। তা সে যাই হোক, ওকেই বিয়ে করবো ঠিক করেছি, আর তাই ওর সঙ্গেই ঘুরছি-টুরছি, হঠাৎ আমার শ্রীযুক্ত বাবা, মানে আর কি তোমার ছোড়দা, কি করে ওই ঘটনাটি টের পেয়ে একেবারে তেলেবেগুনে!... ও সে কী রাগ! "ওই হতভাগাটার সঙ্গে মিশলে এ বাড়িতে থাকা চলবে না—" ইত্যাদি প্রভৃতি।...তা আমিও তো সেই বাবারই মেয়ে, আমিই বা কম যাবো কেন?

বললাম—বেশ ঠিক আছে। ওকে যখন ছাড়তে পারবো না, তখন বাড়ি ছাড়লাম।... ব্যাস, চলে এলাম, এদিকে ওই মহাপ্রভুর মেসের বাসায় এসে দেখি, বাবু দিব্যি একখানি একশো চার জ্বর করে কম্বল গায়ে দিয়ে পড়ে আছেন। বোঝো আমার অবস্থা! মেসের ঘর, আরও দু'দুখানা রুম-মেট রয়েছে, সেখানে ওই রুগীটাকে নিয়ে করি কি! বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম ওর ভরসায়, আর ও কিনা এই দুর্ব্যবহারটি করে বসলো! তাহলে উপায় কি? তা এই উপায়টিই মাথায় এসে গেল!...মানে আর কি, বিপদে পড়লেই পিসির কাছে যাওয়াটাই অভ্যাস তো? অথচ পিসি এখন তাঁর মান্যগণ্য দাদার বাড়িতে। তখন মনে পড়ে গেল, আরও পিসি তো রয়েছে, তার কাছেই গিয়ে পড়া যাক!...অবিশ্যি সকলেই কিন্তু একই রকম হয় না। তুমিও যে ছোট পিসির মতোই হবে তার কোনো মানে নেই। না-জানা না-চেনা এক লক্ষ্মীছাড়া ভাইঝি রাস্তা থেকে এক-গা জ্বরসুদ্ধু আর একটা লক্ষ্মীছাড়াকে জুটিয়ে এনে "তোমার বাড়িতে থাকবো গো" বলে আবদার করলেই যে তুমি আহ্লাদে গলে "থাকো থাকো" করবে এমন কথা নেই, কিন্তু কী করবো? একদম উপায় ছিল না। যা হোক একটা বিছানার ব্যবস্থা করে দাও বাপু এই নিচতলারই একটা ঘরে। একে একটু শুতে দেওয়া দরকার। দেখছো তো কী রকম ঘাড় গুঁজে বসে আছে, গড়িয়ে পড়ে গেলেই দফা শেষ। কিছুতে আসতে চাইছিল না, আমি প্রায় জোর করে—'

ওর কথার স্রোতে ভেসে যাওয়া পারুল এতোক্ষণে সেই স্রোতের মাঝখানে নিজেকে একটু ঢুকিয়ে দেয়, 'আচ্ছা তোর ওসব কাহিনী পরে শুনবো, এখন নিয়ে চল্ ওকে। রিকশাওয়ালা তুমি বাপু দাদাবাবুকে একটু ধরো—'

এতোক্ষণে গাড়ির আরোহীও একটু চেষ্টা করে সোজা হয়ে বসে জড়িত গলায় বলে, 'না না, ধরতে হবে না—'

'না হবে না! ভারী সর্দারী!' প্রবলা গার্জেন ওর একটা হাত চেপে ধরে নামতে সাহায্য করে বলে, 'তারপর রাস্তার মাঝখানে আলুর দম হও আর কি! চলো আস্তে আস্তে, রিকশাওলা সাবধান—'

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচতলার 'বৈঠকখানা' নামধারী চির-অব্যবহৃত ঘরটায় পড়ে থাকা চৌকিটার ওপর একটা বিছানা পেতে দিয়ে পারুলও ধরতে একটু সাহায্য করে, বলে, 'এখন নিচতলাতেই দিলাম বিছানাটা, জ্বর না কমলে তো সিঁড়ি ওঠা সম্ভব হবে না। স্বস্তি হয়ে শুলে ডাক্তারের ব্যবস্থা দেখবো।'

ছেলেটা যেন শুয়ে বাঁচে।

পারুল একটা খবরের কাগজ নিয়ে বাতাস করতে করতে বলে, 'রিকশাওলা তুমি এক্ষুনি চলে যেও না, আমি একটু তোমার গাড়িটায় যাবো। বাজারের কাছে কোথায় যেন একটা ডাক্তারখানা আছে না? ডাক্তার বসেন তো?'

'যাক বাঁচা গেল বাবা!' ধপ্ করে চৌকিটার একধারে বসে শম্পা। তারপর কাগজখানা তুলে নিয়ে নিজেই বাতাস খেতে খেতে বলে, 'দেখা যাচ্ছে আমার ঠাকুমা ঠাকরুণের ছেলেগুলি যে মাটিতে তৈরী, মেয়েগুলি তা দিয়ে নয়। অবিশ্যি বড় পিসি, মেজ পিসির খবর জানি না, তবে তোমরা দুজন লোক ভালো। এই, তুমি যে তখন বলছিলে তেষ্টা পেয়েছে, খাবে জল?'

'শুধু জল থাক, ডাব আছে ঘরে, দাঁড়া, এনে দিই। তারপর ডাক্তার যা বলেন—', বলে উঠে যায় পারুল।

পারুলের পক্ষে কাজটা অভাবনীয় বৈকি। হঠাৎ এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে না হলে পারুল কি ভাবতে পারতো সে বাজারের মোড় পর্যন্ত গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনছে!

ভাবতে পারতো না, অথচ এখন সেই কাজটাই করে ফেললো সহজে অনায়াসে। মানুষ যে পরিস্থিতির দাস মাত্র, এতে আর সন্দেহ কি?

ওকে ওষুধপথ্য খাওয়ানোর পর শম্পা হাঁপিয়ে বসে পড়ে বলে, 'এতোক্ষণ বলতে লজ্জা করছিল, কে জানে তুমি হয়তো ভাববে মেয়েটা কী পিশাচী গো, এই দুঃসময়ে কিনা নিজের ক্ষিদে পাওয়ার কথা মনে পড়লো ওর! কিন্তু এখন তো আর থাকতে পারা যাচ্ছে না!'

'ইস্! আহা রে!' পারুল লজ্জার গলায় বলে, 'ছি ছি! আমি কী রে? এটা তো তোর বলবার কথা নয়, আমারই উচিত ছিল তোকে আগে একটু জল খেতে দেওয়া।'

'উচিত আবার কী? অকস্মাৎ যা একখানা গন্ধমাদন পর্বত এনে চাপিয়ে দিলাম তোমার মাথায়!'

॥ ১৭ ॥

'আমার বাড়িতে কিন্তু ভাল জিনিস কিছু মজুত থাকে না—' শম্পাকে বসিয়ে তার সামনে খানকয়েক বিস্কুট আর কিছুটা হালুয়া ধরে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে পারুল বলে, 'রসগোল্লা-টসগোল্লা খেতে ইচ্ছে হলে নিজে দোকানে যেতে হবে।'

'আপাততঃ নয়, তবে ইচ্ছে খুবই হবে।' শম্পা আগেই ঢকঢক করে এক গেলাস জল শেষ করে বলে, 'ওই ছোঁড়াটা সেরে উঠলেই যাওয়া যাবে। ভীষণ পেটুক ওটা, বুঝলে? মিষ্টি খাওয়ার যম একেবারে। আমি একলা খেলে দেখে হিংসেয় মরে যাবে। তা তোমার হালুয়াও কিছু মন্দ নয়। এখন তো মনে হচ্ছে স্বর্গের সুধা। চাও ঢালছো? গুড। তা তোমার রান্না-খাওয়া হয়ে গেছে?'

পারুল হেসে উঠে বলে, 'সে কী রে! তুই আসছিস, আমি খেয়ে-দেয়ে বসে থাকবো?'

'তার মানে?'

শম্পা চোখ কপালে তুলে বলে, 'তুমি জানতে নাকি আমি আসছি—'

'জানতাম বৈকি।' পারুল হাসে, 'জানা যায়।'

'সে কী রে বাবা, জ্যোতিষ-ট্যোতিষ জানো নাকি?'

পারুল আবারও মুখ টিপে হেসে বলে, 'ধরে নে জানি।'

'জানো? সত্যি?'

শম্পা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে, 'তা হলে খাওয়ার পর আমার হাতটা দেখো দিকি একবার। প্রেম, বিবাহ, পারিবারিক সুখ, শিক্ষাদীক্ষা, এসবের কী কী ফলাফল!'

পারুল ওর মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বলে, 'সব ফলই ভালো।'

'ওটা তো ফাঁকির কথা! দেখতে হবে...কই, তুমি চা খেলে না?'

পারুল হেসে ফেলে, 'আমি এরকম বেলা বারোটায় চা খাই না।'

'আরে বাবা, এ করি না, এ খাই না, এসবের কোন মানে আছে ? ইচ্ছে হলেই করবে।'

'তাহলে ধর ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'সে আলাদা কথা ! তবে না হয় আমাকেই আর এক কাপ দাও। আচ্ছা পিসি, ওকে একটু দিলে দোষ আছে ?'

'ওকে ? ও ! মানে, চা ? না না, এতো রোদের সময় জ্বরের ওপর—এই মাত্র ওষুধ খেয়েছে—'

'তবে থাক্। চা বলে মরে যায় কিনা ! তাই একটু মন-কেমন করছে।'

বলে অনামনাভাবে পেয়ালার ধারে চামচটা ঠ্‌কঠ্‌ক করে ঠ্‌কতে থাকে শম্পা।

'ওর নামটা কি যেন বললি ?'

খেয়ে-দেয়ে ধাতস্থ হয়ে শম্পা মুখটা মুছতে মুছতে বলে, 'মানে মা-বাপের দেওয়া নাম সত্যবান, তবে আমি জাম্বুবান-টান বলি আর কি !'

পারুল যেন মেয়েটার কথাবার্তায় ক্রমশই অধিকতর আকৃষ্ট হতে থাকে। আশ্চর্য তো, পারুলের সেই ছোড়দার মেয়ে এ ! ছোড়দার চালচলন ধরণ-ধারণ সবই তো সনাতনী। সেই সনাতনীর আবহাওয়া থেকে এমন একখানি বেহেড মেয়ে গজালো কী করে ?

বললো, 'ভালই করো। তা হঠাৎ জাম্বুবানের গলায় মালা দেবার ইচ্ছে হলো যে ?'

'ওই তোমরা বিধিলিপি না কি বল, তাই আর কি!'

'আমরা যে "বিধিলিপি"তে বিশ্বাসী, এটা তোকে কে বললো ?'

'আরে বাবা, ও কি আর বলতে হয় ? ও হতেই হয় সবাইকে, কোনো না কোনো সময়। এই আমাকেই দেখো না, মানিও না কিছু, আবার ওই হতভাগাটার জন্যে পুজোও মানত করে বসে আছি। এখন কী করে যে—

পারুল হেসে বলে, 'তা আর আশ্চর্য কি, পিতৃপিতামহের রক্তধারা যাবে কোথায় ? কিন্তু ওই নিধিটিকে জোটালি কোথা থেকে ?'

'ওমা ! তুমি যে ঠিক পিসির মতো কথা বললে গো ! হঠাৎ মনে হলো, পিসিই বুঝি কথা বলে উঠলো। গলার স্বরটাও তোমার পিসি-পিসি। যদিও দেখতে তুমি আরো অনেক সুন্দরী। তোমাদের বাবা বুড়ো খুব সুপুরুষ ছিল, তাই না ?'

'ছিলেন !'

পারুল ঈষৎ গভীর সুরে বলে, 'মা-ও সুন্দর ছিলেন।'

শম্পাও হঠাৎ গভীর সুরে বলে ওঠে, 'ভাবলে কিন্তু এক এক সময় ভারী আশ্চর্য লাগে। বাড়িটা সেই একই আছে, সেই ঘর দালান জানলা দরজা, অথচ মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে, সংসারের রীতিনীতি বদলে যাচ্ছে, এক দল যাচ্ছে অন্য দল আসছে—'

পারুল মৃদু হেসে বলে, 'হ্যাঁ, এক দল দেয়ালে মাথা ঠুকছে, আর পরের দল সেই দেয়াল ভাঙছে—'

শম্পা একটু তাকিয়ে দেখে আবার বলে, 'তোমাদের দুই বোনে খুব মিল—কথায় চিন্তায়। কিন্তু বল তো, তোমার কি মনে হয় যারা ভাঙছে তারা ভুল করছে ?'

পারুল তেমনি মৃদু হেসে বলে, 'আমি বলার কে ? কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা ঠিক তার রায় দেবার মালিক শুধু ইতিহাস। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, যা হচ্ছে তা অনিবার্য। ইতিহাসের নিয়ম। সেই নিয়ম রক্ষার্থে আমার বাবার নাতনী

শম্ভুবোনের গলায় মালা দেবে।...এখন আড্ডা ভঙ্গ হোক বাবা, যাই দেখি গে পিসি-ভাইঝিতে কি খেতে পারি। অবশ্য আমার রান্নাঘরে কোনো সমারোহের আশা কোরো না, নেহাৎ আলুসেদ্ধ ভাতেরই ব্যবস্থা। বড়জোর খিচুড়ি।'

'ব্যস ব্যস, ওতেই চলবে।' শম্পা বলে ওঠে, 'দূর দূর করে খেদিয়ে না দিয়ে বাড়িতে ঠাঁই দিয়েছো। এই ঢের, আবার রাজভোগের বায়না করতে যাবো নাকি? আমার বেশী কথা-টথা আসে না তাই, নইলে তোমার উদ্দেশ্যে "মহৎ-টহৎ" বলে একটা প্রশস্তি গেয়ে দিতে পারতাম।'

'খুব বাঁচান যে বেশী কথাটথা আসে না, এখন যা দেখ্ গে তোর রুগীর কি হচ্ছে। এখনো ঘুমোচ্ছে না ঘুম ভেঙেছে!'

'যাচ্ছি—', শম্পা সহসা গভীরভাবে বলে, 'ভেবে অবাক লাগছে, তোমায় না জেনে-চিনে এসে পড়লাম কী করে?'

'জানতিস চিনতিস না কে বললে?'

'জানতাম বলছো? তা হবে। হয়তো জানতাম, তাই সাহস হলো। হঠাৎ ওর এই জ্বরটরগুলো হয়েই—মানে কিছুদিন আগে একবার খুব শক্ত অসুখ করেছিল, বাঁচে কিনা। তা ভাল করে সারতে-না-সারতেই আবার খাটতে লেগে এইটি হলো। কুলিমজুরের কাজ তো! যাক, নিজের কথাই সাতকাহন করছি, তোমার কথা শুনি। তোমার ছেলে দু'জন তো অন্য জায়গায় থাকে, তোমার কাছে কে থাকে?'

'আমার কাছে? আমিই থাকি।'

'বাঃ চমৎকার! বেশ ভালই আছো মনে হচ্ছে! গঙ্গার ওপর বারান্দাবসানো এমন একখানি বাড়ি, শুধু নিজেকে নিয়ে আছো—'

পারুল মৃদু হেসে বলে, 'শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা তোর কাছে খুব আদর্শ জীবন বুঝি?'

'আমার কাছে?'

শম্পা হেসে ওঠে, 'আমি তো ওটা ভাবতেই পারি না। আমার মনে হয়—কেউ আমায় ভালবাসছে না, কেউ আমার জন্যে হেদিয়ে মরছে না, কেউ আমার বিহনে পৃথিবী অন্ধকার দেখছে না, এমন জীবন অসহ্য। তবে তোমার কথা আলাদা—বয়েসটয়েস হয়ে গেছে।...আচ্ছা যাই তাহলে নিচে!'

পারুল বোধ করি শেষের বিদায়-প্রার্থনায় শুনতে পায় না, তাই আস্তে বলে, 'এতো কথা তুই শিখলি কোথা থেকে?'

'কি জানি! হয়তো নিজের থেকেই। তবে মা বলে, নাকি পিসিই আমার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। পিসির দৃষ্টান্তই আমার পরকাল ঝরঝরে করে দিয়েছে। অথচ দেখো মিলটিল কিছুই নেই। পিসি জীবনভোর শুধু বানানো প্রেমের গল্পই লিখলো, সাঁত্য প্রেমের ধার ধারলো না কখনো, আর আমি তো সেই আট বছর বয়স থেকেই প্রেমে পড়ে আসছি।'

'চমৎকার! তা সবগুলোই বোধ হয় "সাঁত্য" প্রেম?'

'তৎকালীন অবস্থায় তাই মনে হয় বটে, তবে কী জানো, ধোপে টেকে না। দু-দশদিন একটু ভালোবাসা-ফালোবাসা হলেই ছোঁড়ারা অমনি ধরে নেয় বিয়ে হবে। দুচক্ষের বিষ! শুধু ভালোবাসাটা বুঝি বেশ একটা মজার জিনিস নয়!'

পারুল ঈষৎ গম্ভীর গলায় বলে, 'তা মজার বটে। তবে কথা হচ্ছে এটিকেই বা তাহলে দু'চক্ষের বিষ দেখলি না কেন? বিয়ের প্রশ্ন তুলেই তো বাপের সঙ্গে ঝগড়া?'

শম্পাও হঠাৎ গম্ভীর গলায় বলে, 'এক্ষেত্রে ব্যাপার একটু আলাদা। এখানে

ওই হতভাগাই বিয়ের বিপক্ষে। কেবলই বলে কিনা, সরে পড়ো বাবা, আমার দিক থেকে সরে পড়ো! তোমার বাবা কতো দামীটামী পাত্র ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দেবে, আমি হতভাগা, চালচুলো নেই, চাকরির স্থিরতা নেই, বৌকে কী খাওয়াবো তার ঠিক নেই, আমার সঙ্গে দোস্তি করতে আসা কেন?...আমারও তাই রোখ্ চেপে গেছে—'

পারুল ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'এ বিয়েতে সুখী হতে পারবি?'

শম্পা অম্লানবদনে বলে, 'হতে বাধা কী? সুখী হওয়া-টওয়া তো স্রেফ্ নিজের হাতে। তবে যদি হতভাগা মরে-ফরে যায় সে আলাদা কথা।'

'বালাই ষাট!' পারুল বলে, 'তোর মুখে কি কিছুই আটকায় না বাছা?'

'পিসিও তাই বলে।' শম্পা চলে যায় হাসতে হাসতে।

...   .

অভাবনীয় একটা বৃহৎ ভার ঘাড়ে পড়া সত্ত্বেও খুব একটা ভালো-লাগা ভালো-লাগা ভাব আসে পারুলের।

॥ ১৮ ॥

বহু-বহুদিন পরে চন্দন এলো বাপের বাড়িতে। অথবা ভাইদের বাড়িতে।

আবির্ভাবটা অপ্রত্যাশিত।

স্বর্গত কাকা প্রবোধকুমারের বড় মেয়ে চাঁপা বরং কদাচ কখনো এ বাড়িতে আসে, পাকা চুলের মাঝখানটায় সুগোল টাকের উপর বেশ খানিকটা সিঁদুর লেপে আর কপালের মাঝখানে বড় একটা সিঁদুর টিপ পরে, ঢোলা সেমিজের ওপর চওড়াপাড় একটা শাড়ি জড়িয়ে প্রসাধিত হয়ে এসে পা ছড়িয়ে বসে। যতক্ষণ থাকে, নিজের হাঁটুর বাত, অম্বলশূল ও কর্তার হাঁপকাশ রক্ত আমাশা এবং খেঁকি মেজাজের গল্প করে, ভাই ভাই-বৌ এবং ভাইপো-বৌদের ওপর বিশ-পঁচিশ দফা নালিশ ঠুকে, বাঁধানো-দাঁতের পাটি খুলে রেখে মাড়ি দিয়ে পাকলে পাকলে সিঙাড়া কচুরি সন্দেশ রসগোল্লা খেয়ে, বকুল সম্পর্কে কিছু তথ্য আর তার লেখা দু'চারটে বই সংগ্রহ করে চলে যায়। বকুলের সঙ্গে কোনোদিন দেখা হয়, কোনোদিন দেখা হয় না। দেখা হলে প্রত্যেকবারই নতুন করে একবার জিজ্ঞেস করে, 'তা নিজের অমন খাসা নামটা থাকতে এই একটা অনামা-বিনামা নামে বই লিখতে যাস কেন?'

তারপর ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলে, 'আমার দ্যাওরঝি ভাসুরপো-বউরা আর নাতনী ছুঁড়িটা তোর নাম করতে মরে যায়! এইসব বইটই ওদের জন্যেই নিয়ে যাওয়া। আমি বাবা সাতজন্মেও ন্যাটক-নভেল পড়ি না। তা ওদেরই একশো কৌতূহল। তুই কেমন করে লিখিস, কেমন করে হাঁটিস চলিস, উঠিস বসিস, এই সব। আমি বলি আরে বাবা, আমাদেরই বোন তো, যেমন আমরা, তেমনি। চারখানা পাও নেই, মাথায় দুটো সিংও নেই। তবে বে-থা করলো না, গায়ে হাওয়া দিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিলো, তাই ডাঁটো আছে।...তা ছুঁড়িদের খুব ইচ্ছে বুঝলি তোর সঙ্গে দেখা করবার, মানে তোকে একবার দেখবার, আমিই আনি না।'

বকুল মৃদু হেসে বলে, 'তা আনো না কেন?'

চাঁপা হয়তো ফট্ করে দালানের কোণে, কি সিঁড়ির কোণে খানিকটা পানের পিচ ফেলে মুখ হালকা করে নিয়ে বলে, 'আনা মানেই তো আমার জ্বালা। তাদের

জন্যে গাড়ি ভাড়া করো, হা-পিত্যেশী হয়ে বসে থাকো কতোক্ষণে সাজগোজ হবে, আবার ফেরার জন্যে তাগাদা থাকবে, অতো ভালো লাগে না। এ বাবা স্বাধীনভাবে এলাম, দু-দণ্ড বসলাম, মুখ খুলে সংসারের দুটো গল্পগাছা করলাম, চুকে গেল। ওদের তাই বলি, "সেই অনামী দেবীকে দেখে তোদের কী চারখানা হাত গজাবে রে?"...তা তখন বলে, বেশ তবে ওঁর বই নিয়ে এসো? দে বাবা দুচারখানা বই-ই দে।'

চাঁপাকে সুবর্ণলতার মেয়ে বলে মনেই হয় না।

ফেরার সময় বইয়ের প্যাকেট বাঁধতে বাঁধতে আর একটি কথাও বলে যায় চাঁপা, 'এখন তো নতুন আইনে মেয়েরাও বাপের সম্পত্তি পাচ্ছে, তা আমাদের কপালে আইনকানুন সব মিথ্যে, যে ঘাসজল সেই ঘাসজল! তুই তবু চালাকি করে বাবার বাড়িটা খুব ভোগ করে নিচ্ছিস।'

বকুল মৃদু হাসে।

হাসিটা কি নিজের চালাকির মহিমায়?

চাঁপার ওই আসাটা দৈবাতের ঘটনা হলেও, তবু ঘটে কদাচ কদাচ।

কিন্তু চন্দন?

তার চেহারাটাই তো প্রায় ভুলে গেছে এ বাড়ির লোকেরা। অথচ এমন কিছু দূরে সে থাকে না। থাকে রাণাঘাটে।

তবু চন্দনের পায়ের ধুলো এ বাড়িতে দুর্লভ!

চন্দনের শ্বশুর রাণাঘাটের এক নামকরা উকিল ছিলেন, সেখানে তিনি প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি করে রেখে গিয়েছিলেন, জমিজমা বাগানপুকুর ধানচাল। চন্দনের স্বামী জীবদ্দশাকাল সেই ভাঙিয়ে খেয়েছেন। এখন চন্দনই তার মালিক। ছটা মেয়ে চন্দনের, ছেলে নেই, মেয়েদের প্রায় সব কটারই বিয়ে হয়ে গেছে। একটাই বুঝি আছে এখনও আইবুড়ো। তবু চন্দনের মরবার সময় নেই।

সেই দুর্মূল্য সময় থেকে কিছুটা বাজে খরচ করে, এবং রেলগাড়ি ভাড়া খরচ করে চন্দন হঠাৎ ভাইয়ের বাড়ি এলো কেন, এটা দুর্বোধ্য। মেয়েদের বিয়েতে 'ডাকে' একটা নেমন্তন্ন পত্তর পাঠানো ছাড়া আর তো কোন যোগাযোগই রাখে না। এরাও অবশ্য নয়। পত্রোত্তরে কিছু মনিঅর্ডার, ব্যস।

এসে দাঁড়িয়েই বিস্ময় আনন্দ এবং কৌতূহলের প্রশ্ন শিকেয় তুলে রেখে চন্দন আগে ট্যাক্সি থেকে নামানো জিনিসপত্রগুলো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বাড়ির সবাই এখনো এক হাঁড়ির না ভিন্ন হাঁড়ির, এ প্রশ্ন তাকে উতলা করে তোলে। ভিন্ন হাঁড়ি হলে তো যা কিছু এনেছে যথা রাণাঘাটের বিখ্যাত কাঁচা-গোল্লা এবং মানকচু, কচি ঢ্যাঁড়শ, সজনেডাঁটা, কাঁচা পেঁপে ইত্যাদি, সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করতে হবে।

কিন্তু জিজ্ঞেস করাও তো কঠিন।

তবে কথার কৌশলেই জগৎ চলে এই ভরসা। চন্দন হাঁক দিয়ে বলে, 'কই গো গিন্নীরা, সবাই রান্নাঘরে নাকি?' দৃষ্টি তীক্ষ্ম করে—দেখবে কোন্ দিক থেকে কে আসে।

খবরটা ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছিল এবং সকলেই সচকিত হয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, উনি হঠাৎ কেন? অপ্রতিভ হবার কথা ওনারই, কিন্তু উনি অপ্রতিভ হবার মেয়ে নন, উনি ওঁর ঠাকুমা মুক্তকেশীর হাড়ে তৈরী। তাই উনি কোনোদিকে না তাকিয়ে সঙ্গের লোকটাকে নির্দেশ দিতে থাকেন, 'মাছটা উঠোনে রেখে ওই কলে

হাত ধুয়ে তবে অন্য জিনিসে হাত দে। রোস রোস, টোপাকুলগুলো যেন চটকে ফেলিস নে। আচার তৈরি করেই আনবো ভেবেছিলাম, তা হুট করে আসা হয়ে গেল। সঙ্গী তো জোটে না সব সময়। ভাই-ভাজ তো আর ডাকবে না কখনো, তবু বাপের ভিটে মা-বাপের স্মৃতি একবার তো চোখেও দেখতে ইচ্ছে করে।... বড় পুকুরে জাল ফেলাতে পারলাম না এইটাই খেদ রয়ে গেল। হঠাৎ আসা তো! --মেয়েটি কার? বিয়ে হয়নি দেখছি।...মাথায় ও কিসের খোঁপা রে? আমের টুকরি বসিয়ে তার ওপর চুড়ো বানিয়েছিস নাকি? এই এক বিটকেল ঢঙের খোঁপার ফ্যাশান হয়েছে বাবা। আমাদের রাণাঘাটেও কসুর নেই। যাদের পেটে ভাত জোটে না, তাদেরও মাথায় এতো বড়ো খোঁপা।...কানুর বৌকে দেখছি না যে? তারপর বকুল কোথায়? বই-লিখিয়ে বোন আমাদের? তার তো খুব নামডাক! রাণাঘাটেও কমতি নেই।...বকুল বাড়ি নেই? কোথায় গেছে?"

অপূর্বর বৌ অলকা মুচকে হেসে বলে, 'কোথায় গেছেন তা আর কে জানতে যাচ্ছে?'

'ওমা সে কি! কোথায় যায় বলে যায় না? যতই মিটিং করুক আর লেকচার মারুক, মেয়েমানুষ, বেরোবার সময় বাড়িতে বলে যাবে না?...স্বাধীন জেনানা হয়ে গেছেন বুঝি? আমার মেয়েরা তো নিত্যিই খবর-কাগজ এনে খুলে দেখায়, মা এই দেখো তোমার বোনের ছবি, মা এই দেখো তোমার বোনের নাম। তা আমি বলি, তোরা ওই অনামী দেবীকে দ্যাখ, তোরা গদগদ হ। আমার কাছে সেই চিরকেলে বোকা মুখচোরা বকুলই হচ্ছে বোন। মুখে একটা বাক্যি ছিল না, কেউ অন্যায় করে শাসন করলে বলতে জানতো না, 'শুধু শুধু বকছো কেন? আমি তো ও দোষটা করিনি।''...সেই বকুল লেকচার দিয়ে বেড়ায় শুনলে হাসি পায়। অবিশ্যি আমাদের তো বাবা অতি সকালে গলা টিপে বাড়ি থেকে বার করে দিয়ে খালাস হয়েছিলেন, পরে পারুল বকুলকে আধুনিক-টাধুনিক করে মানুষ করে থাকবেন। ছেলেদের তাই বলি, "ওরে এক মায়েরই পেটের আমরা, তোদের মাকেও অতি সকালে গোয়ালে ঢুকিয়ে না দিলে, তোদের মাসির মতোই হতে পারতো!"... তবে বাবা এও বলবো, বকুল একটা কীর্তি রাখা কাজ করেছে বিয়ে না করে। এ বংশের তিনকুলে কেউ আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না। প্রথম প্রথম তো শ্বশুরবাড়িতে মুখ দেখাতে পারতাম না, বাপের বাড়ি আসা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল ওই কারণে—'

অপূর্বর বৌ অলকা মৃদু হেসে বলে, 'সে সব তো ক্লাইভের আমলের কথা!'

চন্দন মহোৎসাহে বলে, 'তোমাদের কাছে তাই, আমাদের কাছে যেন এই সেদিন। সে যাক, মিষ্টিটা ঘরে তোলো গো কেউ, পিঁপড়ে ধরবে। কুলগুলো এইবেলা রোদে ফেললে হতো!'

মানকচু, কাঁচা পেঁপে, টোপাকুল, কাতলা মাছ, সব কিছুর সঙ্গে বাড়ির প্রসঙ্গ মিশিয়ে মিশিয়ে একাই সব কথা কয়ে যায় চন্দন।

অলকা আর তার মা ঘরে ঢুকে হাসাহাসি করে বলে, 'আজব চীজ!'

কানুর বৌ ঘরে বসেই কানুকে বলে, 'ভাগ্যিস ওঁর বাপের বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! না হলে হেসেই মারা যেতে হতো আমাদের। কিন্তু হঠাৎ এরকম আসার কারণটা কী বুঝতে পারছো?'

কানু বলে, 'তাই ভাবছি।'

এই মেজকর্তা মেজগিন্নী সাতে-পাঁচে থাকেন না, বাড়িতে যে ধরনের ঘটনাই ঘটুক তাঁরা নির্লিপ্তের ভূমিকা অভিনয় করে যান, তবু তাঁরাও চন্দনের আগমন

সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সকলেরই এক চিন্তা—ইনি কেন হঠাৎ?

... ...

বকুল ফিরলো সন্ধ্যার পর।

দরজায় ছোট চাকরটা বসে ছিল, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'পিসিমা, আপনার একজন বোন এসেছেন বিদেশ থেকে।'

বকুলের বুকটা আহ্লাদে ধ্বক করে উঠলো, পারুলের ঝকঝকে মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার। পারুল ছাড়া আর কে? দিদি মানে তো পারুল।

সত্যি বলতে, চাঁপা চন্দনকে কোনোদিনই তার নিজের দিদি বলে মনেই হয় না। একে তো তার জ্ঞানের আগেই ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, তাছাড়া ওদের সঙ্গে বকুল পারুলের মানসিক ব্যবধান আকাশ-পাতাল।

পারুলের আবির্ভাব আশায় বকুলের মনের ভারটা ভারী হাল্কা হয়ে গেল।

হ্যাঁ, মনের ভার একটা ছিল বৈকি।

শম্পা চলে যাওয়ার সব দোষটাই তো ছোড়দা ছোটবৌদি অব্যক্তভাবে তারই উপর চাপিয়ে বসে আছে।

অথবা একেবারে অব্যক্তও নয়। যখন জানা গেল বাপের নাকের সামনে দিয়ে সেই যে চটি পায়ে দিয়ে 'আচ্ছা তোমার আদেশ মনে রাখবো' বলে বেরিয়ে গেল শম্পা, সেটাই তার শেষ যাওয়া—তখন তো বকুলকে নিয়েই পড়েছিল তার ছোড়দা ছোটবৌদি। এমন কি ভাইপো অপূর্ব এবং তস্য স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত।

নিজেই যখন খুব চিন্তিত বকুল, মেয়েটা কোথায় যেতে পারে ভেবে (কারণ বকুলের তো ওই যাত্রাকালীন ইতিহাসটা জানা ছিল না), তখন যে-ছোড়দা জীবনে কখনো তিনতলার এই ঘরটার ছায়াও মাড়ায় না, সে একেবারে সস্ত্রীক উঠে এসে বলে উঠল, 'শ্রীমতী অনামিকা দেবীর মূল্যবান সময় একটু নষ্ট করতে এলাম।'

অনামিকা দেবী!

বকুল একবার ছোড়দার মুখের দিকে তাকালো, তার মুখে এলো হঠাৎ পাগলামি শুরু করলে কেন? কিন্তু তা সে করলো না, সঙ্গে সঙ্গে অনামিকা দেবীই হয়ে গেল সে। স্রেফ বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার মতো শান্ত ভঙ্গীতে বললো, 'বোসো, কী বলবে বল।'

'নতুন করে বলার কিছু নেই—', বললো পিছনে দাঁড়ানো অপূর্ব। ইতিপূর্বে অপূর্বকে কোনোদিন তার ছোট কাকার এমন কাছাকাছি দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না গাম্ভীর্যময়ী অনামিকা দেবী। সেই গাম্ভীর্যের অন্তরালে এক টুকরো ব্যঙ্গ হাসি খেলে গেল—ওঃ, পারিবারিক মানমর্যাদার প্রশ্ন যে! এ বাড়িতে যেটা বরাবর বাড়ির পুরুষদের মৈত্রীবন্ধনে বেঁধেছে। বাবার সঙ্গে বড়দার কোনোদিনই হৃদ্যতার বালাই ছিল না, কিন্তু বকুলের নির্মলদের বাড়িতে যাওয়া-আসার ব্যাপার নিয়ে পিতাপুত্রে রীতিমত একদল হয়েছিলেন।

অনামিকা অপূর্বর ওই উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন শুধু, কিছু বললেন না। অপূর্ব বললো বাকি কথাটা—'শম্পার ব্যাপার নিয়েই কথা হচ্ছে। তার ঠিকানাটা তো জানা দরকার।'

অনামিকা খুব স্থিরভাবে বললেন, 'সেই ঠিকানাটা আমার খাতায় লেখা আছে, এইটাই কি তোমাদের ধারণা?'

এবার ছোড়দা উত্তর দিলেন, 'সে ধারণাটা খুব অস্বাভাবিক নয় নিশ্চয়ই?'

'আমার তো খুবই অস্বাভাবিক ঠেকছে।'

'এটা হচ্ছে তোমার এড়িয়ে যাওয়া কথা বকুল, তোমার কাছেই ছিল তার সব

কথা, সব গল্প।'

এ কথাটা বললেন ছোট বৌদি।

অনামিকা দেবীর ভঙ্গীতেই মৃদু হাসলো বকুল, 'তোমাদের তো দেখছি ত্রিশক্তি সম্মেলন, একা কী পেরে উঠবো? তবে এটা তোমাদের বোধ হয় ভুলে যাবার কথা নয়, শম্পা কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বাক্সবিছানা বেঁধে নিয়ে চলে যায়নি। কথা বলতে বলতে জেদের মাথায় চলে গেছে, আমি অন্ততঃ যা শুনেছি তোমাদের কাছে। অতএব আমার পক্ষে ওর ঠিকানা জানার প্রশ্নই ওঠা অদ্ভুত বৈকি। ব্যবস্থা করে যদি যেতো, হয়তো আমায় জানিয়ে যেতো।'

'হয়তো কেন নিশ্চয়ই, সব পরামর্শই তো তোমার সঙ্গে—', ছোটবৌদি পুঞ্জীভূত ঝাল উদ্‌গীরণ করে বলেছিলেন, 'মা মুখ্যু, সেকেলে গাঁইয়া, পিসী বিদুষী, আধুনিকা, সভ্য, কাজেই মার চেয়ে পিসীর মানসম্মান বেশী হবে এটাই তো স্বাভাবিক। তবে এটাও বলবো—তুমি যদি সত্যিই ওর হিতৈষী হতে, তা হলে ওকে ওর ইষ্ট-অনিষ্ট বোঝাতে। তা তুমি করোনি, শুধু আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে নিজের দলে টেনেছো।'

'দলে!' অনামিকার মুখটা হঠাৎ খুব বেশী লাল দেখায়, তবু কথা তিনি খুব নিরুত্তেজ গলাতেই বলেন, 'আমার যে বিশেষ কোনো দল আছে, তা তো আমার নিজেরই জানা ছিল না ছোটবৌদি! তবে দল থাকলে দলে টানার চেষ্টা থাকাটাও স্বাভাবিক।'

'এটা ঝগড়া করবার সময় নয়,' ছোড়দা গম্ভীর গলায় বলে উঠেছিলেন, 'একটা পারিবারিক সুনাম-দুর্নামের প্রশ্ন নিয়ে কথা হচ্ছে। তোমার যদি জানা থাকে বকুল তবে সেটা বলে ফেলাই উচিত, সে বারণ করলেও।'

'কিন্তু আমার উত্তর তো আগেই শুনে নিয়েছো ছোড়দা! ঠিকানা ঠিকঠাক করে যদি কোথাও যেতো শম্পা, তাহলে হয়তো আমাকেই দিয়ে যেতো ঠিকানাটা কিন্তু ঘটনাটা তো তা নয়!'

'কিন্তু মা-বাপকে বাদ দিয়ে তোমাকেই বা দিতো কেন?'

অনামিকা হেসে ফেলেছিলেন, 'এ 'কেন'র উত্তর আমার জানা নেই ছোড়দা! মেয়েটা কাছে থাকলে তাকেই করা চলতো প্রশ্নটা।'

'প্রশ্রয় দিলেই সে সুয়ো হয়,' ছোটবৌদি তীব্র গলায় বলেন, 'কাদের সঙ্গে মিশতো সে, সে খবর তো জানা আছে তোমার, সেইগুলোই না হয় বলো।'

'যাদের সঙ্গে মিশতো, তাদের আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় সে মাঝে মাঝে আমায় দিতে আসতো, কিন্তু ঠিকানা? কই মনে তো পড়ছে না।'

'তা হলে তুমি বলতে চাও জলজ্যান্ত মেয়েটা কর্পূরের মতোন উপে যাবে, আর সেটাই মেনে নিতে হবে?'

হঠাৎ ছোটবৌদির চোখ থেকে একঝলক জল গড়িয়ে পড়েছিল।

অনামিকা সেই দিকে তাকিয়ে দেখে আস্তে বকুলের কাঠামোয় ফিরে এসেছিলেন, নম্রকোমল গলায় বলেছিলেন, 'আমি এই অদ্ভুতটা চাই, তা কেন ভাবছো ছোটবৌদি? সত্যিই বলছি আমি তোমাদের মতোই অন্ধকারে আছি।'

'সে কথা বলে তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে উপন্যাস লিখতে বসতে পারো বকুল, আমরা পারি না।'

ছোটবৌদির গলায় কাঠিন্য, কিন্তু চোখে এখনো জল। বকুলকে অতএব নম্র আর কোমলই থাকতে হয়। বলতেই হয়, 'সে তো সত্যি কথাই বৌদি! মা-বাপের মনপ্রাণের সঙ্গে আর কার তুলনা!'

ছোড়দাও এবার কোমল হয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'না, সে কথা হচ্ছে না। তুইও ওকে মা-বাপের থেকে কম ভালবাসিস না, বরং বেশীই। আর সেইজন্যেই তোকে ব্যস্ত করতে আসা। মনে হচ্ছে খবর-টবর যদি কিছু দেয় সেই উদ্ধত অহংকারী নিষ্ঠুর মেয়েটা, তোর কাছেই দেবে। যদি দেয় সঙ্গে সঙ্গে জানাস।'

বকুল চোখ তুলে একটু হেসেছিল।

যে হাসিটা কথা হলে এই দাঁড়াতো, 'সেটা আবার বলছো?'

আর সেই সময়ই হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল বকুলের, যেন যুগযুগান্তর পরে ছোড়দা তাকে 'তুই' করে কথা বললো।

বকুলের একান্ত বাসনা হতে থাকে কালই যেন খবর আসে শম্পার, আর সেটা যেন ওর মা-বাপের কাছেই আসে। বকুলের গর্ব খর্ব হোক, সেটাই প্রার্থনা। সে প্রার্থনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যেন মাথা তুলতে পারবে না বকুল।

কিন্তু তারপর কতগুলো দিন কেটে গেল, কারুর গর্বই বজায় রইল না, খবর এলো না শম্পার। না পিসির কাছে, না মা-বাপের কাছে।

তবু কি ওরা সবাই ভাবতে বসবে রাগের মাথায় বেরিয়ে যেতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনার মুখে পড়েছে শম্পা? কিন্তু তাই বা ভাবতে পারছে কই? তেমন খবর কি চাপা থাকে? তেমন খবর চাপা থাকে না নিশ্চয়ই।

কোনো খবরই চাপা থাকে না। বিশেষ করে দুঃসংবাদের।

দুঃসংবাদের একটা দুরন্ত গতিবেগ আছে, সে বাতাসের আগে ছোটে। নইলে শম্পার এই হারিয়ে যাবার খবরটা শম্পাদের সমস্ত আত্মীয়জনের কাছে পৌঁছয় কি করে?

পৌঁছয় বৈকি, নইলে হঠাৎই বা কেন এদের বাড়িতে এতো আত্মীয়-বন্ধুর পদধূলি পড়তে থাকে? আর কেনই বা তাঁরা অনেক গল্পগাছা করে উঠে যাবার প্রাক্কালে হঠাৎ সচকিত হয়ে প্রশ্ন করেন, 'শম্পাকে দেখলাম না যে?'

শম্পার আরো ভাই বিলেতে আছে, বাড়িতে আরো মেয়েটেয়ে আছে সেজ কর্তার দিকে, সকলের কথা তো মনে পড়ে না সকলের!

গোঁজামিল দেওয়া একটা উত্তরে তাঁরা সন্তুষ্ট হন না, শুধু সন্তোষভাব দেখান। কিন্তু মুখের চেহারা অন্য কথা বলে।

তথাপি ওই প্রশ্নটা যে নিরুদ্দেশ রাজার উদ্দেশ করিয়ে ছাড়বে, রাণাঘাট থেকে এ বাড়ির কর্তার বহুদিন 'নিরুদ্দিষ্ট' মেজো মেয়ে সেই প্রশ্নটা বহন করে আনবে, এতোটা কেউ আশা করেনি। আশা করবার মতো নয় বলেই করেনি।

তাই 'বিদেশ থেকে বোন এসেছে' শুনে আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বকুলের বুক।

বকুলের চোখের সামনে পারুলের ঝকঝকে চেহারাটা ভেসে উঠেছিল।

কিন্তু—

কিন্তু তার বদলে?

তার বদলে চির-অব্যবহৃত 'মেজদি' শব্দটার পোশাক-আঁটা অজ্ঞাত অপরিচিত মানুষটা বকুলের ঘরে এসে বকুলের মুখের কাছাকাছি মুখ এনে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে, মানুর মেয়েটা নাকি কোন্ একটা ছোটলোকের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে?'

বকুল চম্‌কে উঠলো।

তার ভিতরের রুচি নামক শব্দটাই যেন সিঁটিয়ে উঠলো এ প্রশ্নে। আর সঙ্গে

সংগে হঠাৎ মনে হলো বকুলের, ইনি আমার সেজদিরও সহোদরা বোন। হাঁ। আমাদের মায়ের গর্ভজাত।

আশ্চর্য বৈকি!

ভাবলে কী অদ্ভুত আশ্চর্য লাগে। একই মানুষের মধ্যেই সৃষ্ট হয় কতো বর্ণ-বৈচিত্র্য, কতো জাতি-বৈচিত্র্য! মেজদি আর সেজদি কি এক জাতের?

বড়দি আর আমি? অথবা সবই পরিবেশের কারসাজি?

ওই ভাবনাটার মাঝখানেই মেজদি আবার প্রশ্ন করে উঠলো, 'কথাটা তাহলে সত্যি? বাবার বংশে তাহলে সব রকমই হলো?'

বকুল মুখটা একটু সরিয়ে নিয়ে একটু কঠিন হেসে বললো, 'শুধু আমাদের বাবার বংশে কেন মেজদি, আজকের দিনে সকলের বংশেই সব রকম হচ্ছে!'

'হচ্ছে! সব্বাইয়েরই হচ্ছে?'

'হচ্ছে বৈকি। আর সেটা তো হতেই হবে। কালবদল হবে না? যুগবদল হবে না? সমাজের রীতিনীতি আচার-আচরণ সব অনড় হয়ে থাকবে? মানুষ চিরকাল এক ছাঁচেই থেকে যাবে?'

এ ধরনের কথা বড় একটা বলে না বকুল। বললো শুধু মানুষটা তার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে একান্তে তার ভাই-ভাইবৌ-ভাইঝির সমালোচনা করতে বসেছে দেখে।

বকুলের এই তিনতলার ঘরটাতেই বিছানা বিছানো হয়েছে চন্দনের জন্যে, আর অপ্রতিবাদেই সেটা মেনে নিতে হয়েছে বকুলকে। তাই প্রথম থেকেই বকুল আত্মরক্ষায় সচেতন হতে চাইছে।

যুগ যে বদল হয়, কাল যে বদল হয়, এটা স্পষ্ট করে বলে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইছে ওই সমালোচনার জাল থেকে।

মেজদি বলে ওঠে, 'তা তুই তো ও কথা বলবিই। তুই তো আবার নভেল লিখিস। ওই নাটক নভেল আর সিনেমা এই থেকেই তো দেশ ধ্বংস হতে চলেছে।'

'কে বললে তোমায় এ কথাটা?'

'বলবে আবার কে?' চন্দন গভীর আত্মস্থ গলায় বলে, 'চোখ নেই দুটো? দেখতে পাচ্ছি না? কী ছিল সমাজ, আর কী হয়ে উঠেছে?'

'খারাপ হয়ে উঠেছে কিছু?'

'খারাপ নয়?' চন্দন গালে হাত দেয়, 'আজকাল যা হচ্ছে তা খারাপ নয়, ভালো হচ্ছে? এই যে মেয়েগুলো হুট হুট করে পৃথিবী পয়লট্ট করছে, এটা ভালো? এই তো আমার সেজমেয়ের ননদটা, বিয়ে হলো আর বরের সংগে আমেরিকা চলে গেল, এটাকে তুই খুব ভালো বলিস?'

বকুল হেসে ফেলে, 'খারাপই বা কী? নিজের বরের সংগেই তো?'

'বাবা বাবা, তোর সঙ্গে কথা কওয়া ঝকমারি। তুইও অতি আধুনিক হয়ে গিয়েছিস। বর হলেই অমনি তাকে ট্যাঁকে পুরতে হবে। দুদিন সবুর কর? যেখানে বিয়ে হলো তাদের সংগে একটু চেনাজানা কর? তা নয়, জগতে শুধু বরটি আর বৌটি। যেন জীবজন্তু, পাখী-পক্ষী। ত্রিভুবনে আর কেউ নেই, শুধু উনিটি আর আমিটি। তাও তো সেই জুটিটিও ভাঙছে, যখন ইচ্ছে তখন আর একটার সংগে জোড় বেঁধে ভাঙা সংসার জুড়ে নিয়ে দিব্যি আবার সংসার করছে। তবে আর এতকাল ধরে পৃথিবীতে এতো বেদ পুরাণ শাস্তর পালা গড়া হলো কেন? এই রকম চললে মানুষ এরপর হয়তো গাছের ফল পাতা খাবে আর উলংগ হয়ে বেড়াবে যা দেখছি।'

বকুল এঁর মতবাদে চমৎকৃত হয়, আবার শঙ্কিতও হয়, এঁকে নিয়ে সারা রাত্তিরটা কাটাতে হবে বকুলকে। হয়তো মাত্র একটা রাত্তিরই নয়, একাধিক রাত্তির।

অথচ পারুলও আসতে পারতো।

আশ্চর্য, পারুলের একবারও মা-বাপের স্মৃতি-সম্বলিত বাড়িটার কথা মনে পড়ে না?

চন্দনের আবার মুহুর্মুহু দোক্তা খাওয়ার অভ্যাস, সেই বিজাতীয় গন্ধটা থেকে নিজেকে খানিক তফাতে সরিয়ে এনে বকুল বলে, 'তা এক সময়ে তো মানুষ তাই বেড়াতো মেজদি, আর লোকে সেটাকেই "সত্যযুগ" বলে।

'অনাছিষ্টি কথা বলিসনে বকুল, দেখছি তোর মতি-গতি একেবারে বেহেড্ হয়ে গেছে। ছোটবৌ দুঃখ করে যা বললো, তা দেখছি সত্যি!'

বকুল চমকালো না। চুপ করে থাকলো।

ছোটবৌ দুঃখ করে কী বলেছে সেটা সে অনুমান করতে পারছে।

চন্দন কৌটো খুলে পান বার করে মুখে দিয়ে বললো, 'তা তোরও বাপু উচিত য় সোমত্ত মেয়েটাকে এভাবে আস্কারা দেওয়া। লেখিকা হয়ে নাম করেছিস বলে ক মাথা কিনেছিস? কত বড় বংশ আমাদের সেটা ভেবে দেখবি না?'

বকুলের ইচ্ছে হয় না আর এর সঙ্গে তর্ক করে, তবু কথার উত্তর না দেওয়াটা অসৌজন্য এই ভেবে শান্ত গলায় বলে, 'বড় বংশ কাকে বলে বল তো মেজদি?'

মেজদি একটু থতমত খেয়ে বলে, 'কাকে বলে, সেটা আমি তোকে বোঝাবো? এ বংশে আগে কখনো এদিক-ওদিক হয়েছে?'

'সেইটাই বড় বংশের সার্টিফিকেট মেজদি?'

মেজদি তা বলে হারেন না, তাই বলে ওঠেন, 'তা আমরা সেটাকেই বড় বলি। সব বংশেই কি আর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জন্মায়?'

'তা বটে।' বলে একটু হাসে বকুল।

চন্দন উঠে গিয়ে ছাতের কোণে পানের পিক ফেলে এসে বলে, 'ছোট বৌটার প্রাণে জ্বালাও তো কম নয়। একেই তো ছেলেটা লেখাপড়া শেষ করেও বিলেতে বসে আছে, ভগবান জানেন কী মতলবে, তার ওপর মেয়ে এই কীর্তি করলো—'

'প্রসূন তো বিলেতে চাকরি করছে—'

'তুই থাম বকুল! বিলেতে চাকরি করছে! বিলেতে আর চাকরির উপযুক্ত লোক নেই, তাই একটা বাঙালীর ছেলেকে ধরে চাকরি দিয়েছে! ও সব ভুজুং শোনবার পাত্রী চন্দন নয়। মেম-ফেম বিয়ে করেছেন কিনা বাছাধন কে জানে!'

বকুল আর একবার নিঃশ্বাস ফেললো। এই ভদ্রমহিলা বকুলের সহোদরা!

চন্দন আবার বলে ওঠে, 'অবিশ্যি দোষ ছেলে-মেয়েকে দেব না, বাপ-মাকেই দেব। যেমন গড়েছ তেমনি হয়েছে। তুমি গড়তে পারলে শিব পাবে, না পারলে বাঁদর পাবে।'

বকুল মৃদু হেসে বলে, 'তাই কি ঠিক মেজদি? আমাদের মা-বাপ তো তোমাকেও গড়েছেন, আবার আমাকেও—'

মেজদি ভুরু কুঁচকে বলেন, 'কী বলছিস?'

'অন্য কিছু না। তোমার বড়দির কত শিক্ষাদীক্ষা, শাস্ত্রজ্ঞান, সে তুলনায় সেজদি আর আমি তো যা-তা! অথচ একই মায়ের—'

চন্দন এই অভিমতটি পরিপাক করে বলে, 'আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা সবই বাবা শ্বশুরবাড়ির। এ সংসার থেকে তো কবেই দূর হয়ে গেছি। নেহাৎ নাড়ির টান, তাই মানুর মেয়েটার বেরিয়ে যাওয়ার খবর শুনে—'

বকুল শান্ত গলায় বলে, 'মেজদি, তোমার মেয়েদের খবর বলো—'

চট করে নিজের জগতে চলে যায় চন্দন। একে একে তার পাঁচ মেয়ের নিখুঁ জীবনী আওড়াতে বসে।

ক্লান্ত বকুলের মাথার মধ্যে কিছুই ঢোকে না।

কিন্তু বকুলকে কে উদ্ধার করবে?

তা তেমন কাতর প্রার্থনা বুঝি ভগবান কানে শোনেন।

নইলে রাত সাড়ে নটায় 'একটি ভদ্রমহিলা' দেখা করতে আসেন অনামি দেবীর সঙ্গে?

ছোট চাকরটার মুখস্থ হয়ে গেছে ভাষাটা, সে সিঁড়ির আধখানা পর্যন্ত উঠেই গলা তুলে ডাক দেয়, 'পিসিমা, একটি ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছে আপনার সঙ্গে।'

ভদ্রমহিলা! এই রাত্তির সাড়ে নটায়?

বকুল অবাক একটু হয়, তবে এমন ব্যাপার একেবারেই অ-পূর্ব অঘটন নয়। রাত দশটার পরও এসে হানা দেয় এমন লোক আছে।

বকুল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বলে, 'জিজ্ঞেস করে আয় তো কোথা থেকে আসছেন?'

'জিজ্ঞেস করেছি। জানি তো নইলে আবার ছুটতে হতো। বলল, "বল গে জলপাইগুড়ির নমিতা, তাহলেই বুঝতে পারবেন"।'

ছেলেটা চৌকস।

সিনেমা থিয়েটারের ভৃত্যের ভূমিকাভিনেতাদের মতো উজবুক অদ্ভুত নয়।

এ ছোকরা পায়জামা প্যান্ট ভিন্ন পরে না, রোজ সাবানকাচা ভিন্ন জামা গেঞ্জি ছুঁতে পারে না এবং পাঁউরুটি ব্যতীত হাতেগড়া রুটি জলখাবার খেতে পারে না। সপ্তাহে একবার করে সিনেমা যাওয়া ওর বাঁধা এবং বাঙালীর ছেলে হলেও বাংলা নাটকের থেকে হিন্দীকে প্রাধান্য দেয় বেশী। বাবু-টাবুদের সামনেই সেই হিন্দী ছবির গানের দু'কলি গুনগুনাতেও কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করে না এবং পুজোর সময় ওকে ধুতি দিলে 'ধুতি পরতে পারি না, পায়ে জড়িয়ে যায়' বলে ফেরত দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

এহেন চাকরকে দিয়ে বাইরের কাজ করানোর অসুবিধে নেই।

তাছাড়া পিসিমার কাজের ব্যাপারে ছেলেটা পরম উৎসাহী, অনামিকার কাছে অনেক লোকজনই তো আসে, ছেলেটা তাদের জন্যে চায়ের জল চাপাতে একপায়ে খাড়া।

বকুল হাত নেড়ে বলে, 'আচ্ছা তুই যা, আমি যাচ্ছি।'

জলপাইগুড়ির নমিতা! নামটা খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে, তার কথাগুলোও!

কিন্তু চেহারাটা? সেটা স্পষ্ট নয়, যেন ঝাপসা-ঝাপসা।

ভাবতে ভাবতে নেমে এল।

মেজদি খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'বাবা, এই রাতদুপুরে আবার কে এলো? মরণ! তাই বলছিল ওরা, "বাড়ি তো নয় হাটবাজার, রাতদিন লোক!" দেখালি বটে বাবা খুব!'

শেষটা কানে যায় না বকুলের, নেমে গেছে ততক্ষণে।

জলপাইগুড়ির নমিতা!

সেই মাঝরাত্তিরে এসে আস্তে আস্তে কথা বলা, বিষণ্ণ-বিষণ্ণ মেয়েটা। একদিনের দেখাতেই জীবনের কাহিনী বলতে বসেছিল। অবশ্য অনামিকার ভাগ্যে তেমন অভিজ্ঞতা অনেক আছে, অদেখা মানুষ টেলিফোনে ডেকেও আপন জীবনের দুঃখের কাহিনী শোনাতে বসে, কিন্তু এই বৌটির দুঃখ যেন একটু অন্য ধরনের।

কী ধরনের? মনে পড়িয়ে নিয়ে নিচে যাওয়া দরকার, তা নইলে হয়তো লজ্জায় পড়তে হবে। আহত হয়ে বলবে, 'সে কি? আমার কথা আপনার মনে নেই?'

তা মনে পড়ে গেল।

স্বামী সাধু হয়ে চলে গেছে, হরিদ্বারে না হৃষিকেশে কে জানে কোথায়! কিন্তু ওর মুখটা মনে পড়ছে না কেন? কেমন দেখতে নমিতার মুখটা? ভাবতে ভাবতে নেমে এসে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে খুব একটা লজ্জাবোধ করলেন অনামিকা। এতো চেনা মুখটা মনে করতে পারছিলাম না! অথচ এখন একেবারে অতি-পরিচিত লাগছে।

হয়তো ওই লাগাটার কারণ মেয়েটার একান্ত বিশ্বস্ত চেহারাটার জন্যে। ও যেন ওর কোন পরম আত্মীয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখে সেই আশ্রয়-প্রাপ্তির ছাপ।

ওই ছাপটাই মনে করালো মুখটা বড় বেশী পরিচিত। কী আশ্চর্য, এইটা মনে আসছিল না!

এরকম আজকাল প্রায়-প্রায় হচ্ছে অনামিকার। নাম মনে পড়ছে তো মুখ মনে পড়ছে না। আবার হয়তো মুখ মনে পড়ছে, নামটা কিছুতেই মনে আসছে না। স্মৃতির দরজায় মাথা খুঁড়ে ফেলেও না।

'বয়েস হওয়ার' এইটাই বোধ করি প্রথম লক্ষণ। অবশ্য সবাইয়ের বয়েস একই নিয়মে বাড়ে না। সনৎকাকার কি কারো মুখ চিনতে দেরি হয়? অথবা তাদের নাম মনে আনতে? কি জানি!

অনামিকাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো নমিতা, এগিয়ে এসে অনামিকা 'থাক থাক' বলে পিছিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পায়ের ধুলো না নিয়ে ছাড়লো না। এবং অনামিকা কিছু বলবার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'এতো রাত্তিরে এসে খুব বিরক্ত করলাম তো?'

এক্ষেত্রে যা বলতে হয় তাই বললেন অনামিকা। বিরক্তির প্রশ্ন ওঠে না সেটাই জানালেন সুন্দরভাবে।

তারপর বললেন, 'কী খবর?'

নমিতা স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় বললে, 'খবর কিছু না, আপনাকে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব—'

শুধু আমাকে একবার দেখবার ইচ্ছেয়? অনামিকা হাসলেন, 'আশ্চর্য তো! তার জন্যে এত কষ্ট করে? কবে এলে কলকাতায়? এখানে এলে কার সঙ্গে?'

ও একে একে বললো, 'আমার একটি ভাইপো পৌঁছে দিয়ে গেছে। এই পাড়ায় তার মাসির বাড়ি, ওখানে ঘুরে আবার এসে নিয়ে যাবে। কলকাতায় এসেছি দিন দশেক। আপনাকে দেখার জন্যে কষ্ট করে আসার কথা বলছেন? কষ্ট কী? বলুন যে ভাগ্য? আপনাদের মতো মানুষদের চোখে দেখলেও প্রাণে সাহস আসে।'

তার মানে নমিতা নামের মেয়েটা প্রাণে সাহস সংগ্রহের জন্যেই এই রাত্তিরে চেষ্টা করে সঙ্গী জুটিয়ে এসে হাজির হয়েছে। তার মানে নমিতার এখন কোনো কারণে সাহসের দরকার হয়েছে।

তবে প্রশ্ন করে বিপন্ন হবার সাহস অনামিকার হলো না। তিনি আলতো ভাবে বললেন, 'জলপাইগর্ড়ির খবর কী?'

'খবর ভালই। মামা বেশ ভাল আছেন।' বলেই খাপছাড়া ভাবে বলে ওঠে নমিতা, 'আমি ওখান থেকে চিরকালের মতো চলে এসেছি। আর ফিরবো না।'

এমনি একটা কিছু অনুমান করেছিলেন অনামিকা। ওকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যতই মৃদুছন্দে কথা বলুক, আপাততঃ ও একটি ছন্দপতনের শিকার। সেই যে ওর 'লক্ষ্মী-বৌ'য়ের ভূমিকা, সে ভূমিকায় আর বন্দী নেই নমিতা।

তবু প্রশ্নের মধ্যে গেলেন না অনামিকা, সাবধানে বললেন, 'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি। কেন ফিরবো বলুন তো? সেখানে আমার প্রত্যাশার কী আছে?'

অনামিকার মনে হলো, ও বদলে গেছে। আবার ভাবলেন, ও বদলে গেছে এ কথা ভাবছি কেন? ও হয়তো এই রকমই ছিল। এক-দু'দিনে কি মানুষকে চেনা যায়? আমি ওর জীবনের সব ইতিহাস জানি? হয়তো ও এই ভাবেই একাধিক আশ্রয় থেকে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। হয়তো মূলকেন্দ্র থেকে চ্যুত হলে এমন একটা অবস্থাই ঘটে।

স্বামীর ঘরটা একটা আইনসঙ্গত অধিকারের মাটি, যেখানে দাঁড়িয়ে জীবন-যুদ্ধে লড়ে যাওয়া সহজ। ওখানে 'প্রেম' নামক দুর্লভ বস্তুটি নিয়ে মাথা না ঘামালেও কাজ ঠিকই চলে যায়। কিন্তু আর সবই তো অনধিকারের জমি। সেখানে কেবলমাত্র মনোরঞ্জন ক্ষমতার জোরে টিকে থাকতে হয়। অতএব প্রতিপদেই হতাশ হতে হয়। নমিতা হয়তো তেমনি হতাশ হয়েছে।

দেখেছে চেষ্টা করে, কারো মনোরঞ্জন করা যায় না। কোথাও কোনো মন যদি আপনি রঞ্জিত হলো তো হলো, নচেৎ শ্রমই সার।

কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না, তাই অনামিকা বলেন, 'কলকাতায় তোমার বাপের বাড়ি, তাই না?'

আন্দাজে ঢিল ফেলেন অবশ্য। হয়তো নমিতা ওর পরিচয়লিপি পেশ করেছিল সেই সেদিন রাত্রে, কিন্তু মনে থাকা সম্ভব নয়! অথচ সম্ভব যে নয়, সেকথা অপরকে বোঝানো কঠিন। সে ভাববে, আশ্চর্য, অতো কথা মনে রইল না! তবুও নমিতা এ প্রশ্নে আহত হয়।

সেই আহত সুরেই বলে, 'বাপের বাড়িতে আবার আমার কে আছে? আপনি তো সবই জানেন! বলেছি তো সবই!'

বিপদ!

অনামিকা মনে মনে বলেন, 'বলেছো তো সবই, কিন্তু আমার কি ছাই মনে আছে!' কিন্তু মুখে তো সেকথা বলা যায় না। তাই বলতে হয়, 'হ্যাঁ, সে তো জানিই। তবে মানে বলছিলাম কি, এখন তো কলকাতাতেই থাকতে হবে?'

স্বরটা নিদারুণ নির্লিপ্ত, কিন্তু নমিতা সেই নির্লিপ্ত ভঙ্গীটি ধরতে পারে না; নমিতার বোধ করি মনে হয়, এটা নির্দেশ, তাই নমিতা ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বলে, 'থাকতেই যে হবে তার কোনো মানে নেই। এখন আমি স্বাধীন, এখন আমি যা ইচ্ছে করতে পারি।'

তাজ্জব! হঠাৎ এমন অগাধ স্বাধীনতাটি কোন্ সূত্রে লাভ করে বসলো নমিতা?

তা সূত্রটা নমিতা নিজেই ধরিয়ে দিল। ধরিয়ে দিল তার উত্তেজিত চিত্তের পরস্পর-বিরোধী সংলাপ।

'হঠাৎ একদিন চোখটা খুলে গেল, বুঝলেন? হঠাৎ নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে এইভাবে দাসীর মত পড়ে আছিস কেন তুই?" উত্তর পেলাম, "শুধু দুটো ভাতের জন্যে।" ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর।'

অনামিকা শান্ত গলায় বলেন, 'শুধু ভাতের জন্যে কেন বলছো নমিতা? তার থেকে অনেক বড়ো কথা "আশ্রয়"। আশ্রয়, নিরাপত্তা, সামাজিক পরিচয়—এইগুলোর কাছেই মানুষ নিরুপায়।'

কিন্তু নমিতা এ যুক্তিতে বিচলিত হলো না। কারণ নমিতার হঠাৎ চোখ খুলে গেছে।

দৃষ্টিহীনের হঠাৎ দৃষ্টি খুলে যাওয়া বড় ভয়ানক, সেই সদ্য-খোলা দৃষ্টিতে সে যখন নিজের অতীতকে দেখতে বসে, এবং সেই দেখার মধ্যে আপন 'অন্ধত্বের' শোচনীয় দুর্বলতাটি আবিষ্কার করে, তখন লজ্জায় ধিক্কারে মরীয়া হয়ে ওঠে। আর তখন সেই দুর্বলতার ত্রুটি পূরণের চেষ্টায় কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে।

'আমাকে সবাই ঠকিয়ে খেয়েছে, বুঝলেন, আমাকে সবাই ভাঙিয়ে খেয়েছে। আমি যে একটা রক্তমাংসের মানুষ, আমারও যে সুখ-দুঃখ বোধ আছে, শ্রান্তি-ক্লান্তি আছে, ভাল-লাগা ভাল-না-লাগা আছে সেকথা কোনোদিন কারুর খেয়ালে আসেনি।'

খেয়ালে যে নমিতার নিজেরও আসেনি, এ কথা এখন ওকে বোঝায় কে?

'লক্ষ্মী-বৌ' নাম কেনার জন্যে, অসহায়ের পরম আশ্রয়টিকে শক্ত রাখবার জন্যে, নমিতা নিজেকে পাথরের মতো করে রেখেছিল, কাজেই নমিতার পরিবেশ-টাও ভুলে গিয়েছিল নমিতা রক্তমাংসের মানুষ।

কিন্তু ওর এই উত্তেজিত অবস্থায় বলা যায় না সেকথা। বলা যায় না, নমিতা একবার পাথরের দেবী বনে বসলে আবার রক্তমাংসের মাটিতে নেমে আসা বড় কঠিন। তুমিই তোমার মুক্তির প্রতিবন্ধক হবে। অথবা হয়তো তুমি তোমার এই নবলব্ধ স্বাধীনতাটুকুকে অপব্যবহার করে নাম-পরিচয়হীন অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

কিন্তু এসব তো অনুমান মাত্র, এসব তো বলবার কথা নয়! অথচ বলবার কথা আছেই বা কী? একজনের জীবনের সমস্যার সমাধান কি অপর একজন করে দিতে পারে?

অথচ নমিতা চাইতে এসেছে সেই সমাধান। কেবলমাত্র দেখবার ইচ্ছেয় ছুটে চলে আসার যে মধুর ভাষ্যটি নমিতা উপহার দিয়েছে অনামিকাকে, সেটার মধ্যে যে অনেকখানিটাই ফাঁকি, তা নমিতা নিজেই টের পায়নি।

নমিতা তাই সেই কথা বলার পর সহজেই বলতে পারছে, 'আপনি বলে দিন এখন আমার কোন্ পথে যাওয়া উচিত? এই প্রশ্ন করবার জন্যেই এতো কষ্ট করে আসা।'

অনামিকা আস্তে বলেন, 'একজনের কর্তব্য কি আর একজন নির্ণয় করে দিতে পারে নমিতা?'

'আপনারা নিশ্চয়ই পারেন।' নমিতা আবেগের গলায় বলে, 'আপনারা, কবিরা, সাহিত্যিকরাই তো আমাদের পথপ্রদর্শক।'

'সেটা অজ্ঞাতসারে এসে যেতে পারে—,' অনামিকা মৃদু হাসেন, 'প্রত্যক্ষ ভাবে গাইড্ সেজে কিছু বলা বড় মুশকিল। তোমার নিজের তো অবশ্যই কোনো একটা পথ সম্পর্কে পরিকল্পনা আছে?'

নমিতা একটু চুপ করে থেকে একটা হতাশ-হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'বিশেষ

করে একটা কোনো কিছু ভাবতে পারছি না আমি। অনেক পথ অনেক দিকে চলে যাচ্ছে। শুনলে হয়তো আপনি হাসবেন, হঠাৎ-হঠাৎ কী মনে হচ্ছে জানেন, একটা গরীব লোক হঠাৎ লটারীতে অনেক টাকা পেয়ে গেলে তার যেমন অবস্থা হয়, কী করবে ভেবে পায় না, আমার যেন তাই হয়েছে। আমার এই জীবনটা যেন এই প্রথম আমার হাতে এসেছে, ভেবে পাচ্ছি না সেটাকে নিয়ে কী করবো!'

অনামিকা আবার হাসলেন, 'তোমার উপমাটি কিন্তু সুন্দর নমিতা, আমারই ইচ্ছে করছে কোথাও লাগিয়ে দিতে। কিন্তু বুড়ো মানুষের পরামর্শ যদি শোন তো বলি, লটারীতে পেয়ে যাওয়া টাকাটা কী ভাবে খরচ করবো ভেবে দিশেহারা হবার আগে সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখা। তারপর ভেবেচিন্তে ধীরেসুস্থে—'

নমিতা ক্লান্ত গলায় বলে, 'কিন্তু ধীরেসুস্থে কিছু করার আমার সময় কোথায়? একজন পিসতুতো দাদার বাড়িতে এসে উঠেছি, ক'দিন আর সেখানে থাকা চলে বলুন? এখান থেকে চলে যেতেই হবে। কিন্তু কোন্ দিকে যাবো?'

অনামিকা কোমল করে বলেন, 'মনে কিছু কোরো না নমিতা, জিজ্ঞেস করছি জলপাইগুড়িতে থাকাটা কি সত্যিই আর সম্ভব হলো না?'

নমিতা চোখ তুলে তাকায়।

নমিতা বোধ করি একটু হাসেও, তারপর বলে, 'অসম্ভবের কিছু ছিল না! যেমন ভাবে ছিলাম, ঠিক সেই ভাবেই থেকে গেলে মৃত্যুকাল অবধিই থাকতে পারতাম। আমায় তো কেউ তাড়িয়ে দেয়নি। আর নতুন কোনো মনান্তর মতান্তরের ঘটনাও ঘটেনি। এতোদিন জীবনের খাতাখানার দিনের পাতাগুলো উল্টেই চলেছি, দিন থেকে রাত্তির, রাত্তির থেকে দিন—খাতার পাতা হঠাৎ কোনও জায়গায় ফুরিয়ে যেতো হয়তো। কিন্তু একসময় একটা হিসেবনিকেশ তো করতেই হবে! সেইটা করতে বসেই হঠাৎ চোখে পড়ে গেল শুধু বাজে খরচের পাহাড় উঠেছে জমে।'

'নাঃ, তোমার বাপু সাহিত্যিক হওয়াই উচিত ছিল!' অনামিকা বলেন, 'যা সব সুন্দর উপমা দিতে পারো! কিন্তু আমি বলছিলাম কি, হয়তো ওই বাজে খরচের অঙ্কটা সবটাই ঠিক নয়। হয়তো ওর মধ্যেও কিছু কাজের খরচ হয়েছে!'

'কিছু না, কিছু না। আপনি জানেন না, এতোদিনের প্রাণপাত সেবার পুরস্কারে একটুকু ভালোবাসা পাইনি। শুধু স্বার্থ, তার জন্যেই একটু মিষ্টি বুলি। বলুন যেখানে একটুখানিও ভালবাসা নেই, সেখানে মানুষ চিরকাল থাকতে পারে?'

অনামিকা মনে মনে হাসলেন।

অনামিকার মনে হলো, চোখটা তোমার হঠাৎই খুলেছে বটে। আর অন্ধত্বটা বড়ো বেশী ছিল বলেই ওই খোলা চোখে মধ্যদিনের রৌদ্রটা এতো অসহ্য লাগছে।

তবু ওই 'ভালবাসা-চাওয়া' মেয়েটার জন্যে করুণা এলো, মেয়েটার জন্যে মমতা অনুভব করলেন।

"এতোটুকু বাসা"র কাঙাল একটা ছোট্ট পাখিকে দেখলে যেমন লাগে। ওই বাসাটার আশায় পাখিটা ঝড়ের মুখে পড়তে যাচ্ছে।

বললেন, 'পৃথিবীটা এই রকমই নমিতা!'

'এই রকমই?' নমিতা উত্তেজিত হলো, 'আপনি বলছেন কি? পৃথিবীতে ভালোবাসা নেই? মমতা নেই? হৃদয় নেই? নেই যদি তো আপনি আমায় এতো ভালোবাসলেন কেন? আপনি তো আমার কেউ নন?'

অনামিকা যেন হঠাৎ একটা হাতুড়ির ঘা খেলেন। অনামিকা মরমে মরে

গেলেন। ওই নিতান্ত নির্বোধ মেয়েটার এই সরল বিশ্বাসের সামনে নিজেকে যেন একান্ত ক্ষুদ্র মনে হলো।

ভালোবাসা! কোথায় সেই ঐশ্বর্য ?

শম্পার জন্যে যে উদ্বেগ, শম্পার জন্যে যে প্রার্থনা, শম্পার জন্যে যে অগাধ ভালোবাসা, তার শতাংশের একাংশও কি এই মেয়েটার জন্যে সঞ্চিত ছিল অনামিকার ?

অনামিকা তো ওকে ভুলেই গিয়েছিলেন।

অথচ ও ভেবে বসে আছে অনামিকা ওকে ভালবাসেন!

ইস্, সত্যিই যদি তা হতো ?

অনামিকার যেন নিজের কাছেই নিজের মাথা কাটা যাচ্ছে।

আমাদের চিত্ত কতো দীন ! আমাদের প্রকৃতিতে কতো ছলনা !

আমাদের ব্যবহারের মধ্যে কতো অসত্য !

কই, অনামিকা কি স্পষ্ট করে ওর মুখের ওপর বলতে পারলেন, 'ভালবাসা ? কই বাপু সে জিনিসটা তো তোমার জন্যে আছে বলে মনে হচ্ছে না ? দেখতে তো পাচ্ছি না ? যা আছে তা তো কেবলমাত্র একটু করুণামিশ্রিত মমতা !'

না, বলতে পারলেন না।

সেই মিথ্যার মোহ দিয়ে গড়া কটি মিষ্টি কথাই বললেন, 'তুমিও যে আমায় খুব ভালোবাসো। ভালোবাসাই ভালোবাসাকে ডেকে আনে।'

'ছাই আনে ! দেখলাম তো পৃথিবীকে !'

অনামিকার মনে হলো অভিমানটা যখন 'মানুষের ছোট সংসারে'র পরিধি ছাপিয়ে সমগ্র পৃথিবীর ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ে, তখন তার স্বাভাবিক সুস্থতা ফিরিয়ে আনা শক্ত।

তবু কিছু তো বলতেই হবে, তাই বলেন, 'আচ্ছা নিজে নিজে কিছুও একটা তো ভাববে ?'

'সেই তো !' নমিতা মাথা তুলে বলে, 'আমি ওর মতো সন্ন্যাসি হয়ে যাবো ? ওর কাছে চলে যাবো ? কিছুদিন থেকে এই ভাবনাটাই পেয়ে বসেছে। সে জীবনে কতো মান-সম্মান-গৌরব ! আর এই পরের আশ্রিত জীবনে কী আছে ? মান নেই, সম্মান নেই, গৌরব নেই—'

অনামিকার সত্যিই খুব দুঃখ হয়।

অনামিকা হৃদয়ঙ্গম করেন ব্যথাটা কোথায়।

তবু আস্তে বলেন, 'ওঁর কাছে চলে যাবো বললেই তো যাওয়া যায় না ? ওঁর মতামত জানা দরকার, সেখানে থাকা সম্ভব কিনা জানা দরকার—'

'আপনিও এ কথা বলছেন ?' নমিতা যেন হঠাৎ আহত হয়ে অভিমানে ফুঁসে ওঠে, 'সেই আমার জলপাইগুড়ির আত্মীয়দের মতো ? থাকা কেন সম্ভব হবে না ? আমি তো ওঁর সঙ্গে ঘরসংসার পাতিয়ে সংসার করতে চাইছি না। তাছাড়া মতের কথা ওঠে কেন ? আমি কি ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী নই? আমার কি একটা অধিকার নেই ?'

ওর ওই সদ্যজাগ্রত অধিকারবোধের চেতনা ও স্বাধীনতার চেতনাই যে ওকে বিপর্যস্ত করছে, তাতে সন্দেহ নেই। ওর এই অস্থির-চাঞ্চল্যের মাটিতে উপদেশের বীজ ছড়ানো বৃথা, তবু অনামিকা বলেন, 'জীবনকে আরো কতো ভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে !'

'কিছু পারে না। আমার মতো মেয়েদের কিছু হয় না। আমি কি সাহিত্যিক

হতে পারবো যে লোকের কাছে বড়ো মুখ করে দাঁড়াতে পারবো? আমি কি বড় গায়িকা হতে পারবো? আমার কি অনেক টাকা আছে যে দান-ধ্যান করে নাম কিনতে পারবো? আমার পক্ষে বড়ো হবার তো ওই একটাই পথ দেখতে পাচ্ছি, ভগবানকে ডেকে ডেকে অধ্যাত্মজগতের অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারি।'

অনামিকা ওর আবেগ-আবেগ মুখটার দিকে তাকান। অনামিকা নিঃশব্দে একটু হতাশ নিঃশ্বাস ফেলেন। বড় হবার ক্ষমতা না থাকলেও যে সেটা হতে চায় তাকে বাঁচানো কঠিন।

অথচ এদিকে রাত বেড়ে যাচ্ছে, ছোট চাকরটা বার দুই ঘুরে গেছে দরজার কাছে, কারণ এই বসবার ঘরটিই তার রাত্রের শয়নমন্দির।

কতো কম ক্ষমতা আমাদের! নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন অনামিকা, কার জন্যে কতোটুকু করতে পারি?

আমরা হয়তো লোকের রোগের সেবা করতে পারি, অভাবে সাহায্য করতে পারি, সংসারে চলার পথের পাথর-কাঁকর সরিয়ে দিতে পারি, পায়ের কাঁটা তুলে দিতে পারি, কিন্তু কারো জীবনে যদি বিশৃঙ্খলা এসে যায়? যদি কারো মন তার নিজের শুভবুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে চলে যায়?

কিছু করতে পারার নেই। হয়তো কিছুটা শুকনো উপদেশ বিতরণ করে মনকে চোখ ঠারতে পারি। ভাবতে পারি, 'অনেক তো বললাম! না শুনলে কী করবো?'

তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবেই বা কতোটুকু করার ক্ষমতা আছে আমার? ভাবলেন অনামিকা, আমি কি ওকে সঙ্গে করে ওর সেই পলাতক স্বামীটার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সাহায্যটুকুই করতে পারি? পারি না। মাত্র ওকে আর্থিক সাহায্য করতে পারি। খুব সন্তর্পণে বললেন, 'তা তুমি কি তাঁর—মানে তোমার স্বামীর ঠিকানা জানো?'

'জানি।'

'চিঠিপত্র দাও?'

নমিতার দুই চোখ দিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে, 'আগে আগে অনেক দিয়েছি, জবাব দেয় না। একবার মামাকে একটা পোস্টকার্ড লিখে পাঠালো, "ওখান থেকে যে কোনো চিঠিপত্র আসে এ আমি পছন্দ করি না"। ব্যাস, সেই অবধি—'

অনামিকা সেই অশ্রুলাঞ্ছিত মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখেন, অনামিকার নিজেকেই যেন খুব অপরাধী মনে হয়। যেন এই মেয়েটার দুঃখের কারণের মধ্যে তাঁরও কিছু অংশ আছে। সারাজীবন ধরে তিনি যা কিছু লিখেছেন, তার অধিকাংশই মেয়েদের চিন্তার মুক্তির কথা ভেবে। কিন্তু মুক্তির পথটা কোথায় তা দেখিয়ে দিতে পারেননি।

কিন্তু কেউ কি পারে সেটা?

কোনো কবি, কোনো সাহিত্যিক? কোনো সমাজসেবী?

সামগ্রিকভাবে কিছু করবার ক্ষমতা এদের নেই।

'এবার ভেবেছি কোনো খবর না দিয়ে সোজা চলে যাবো। দেখি কেমন করে তাড়িয়ে দেয়!'

অনামিকা চিন্তিত হন।

বলেন, 'সেটা কী ঠিক হবে? বলছো তো আশ্রম, সেখানে নিশ্চয়ই অন্য সাধুটাধু আছেন, তাঁরা যদি—'

নমিতা প্রায় ছিটকে উঠে বলে, 'আপনার কাছে আমি নতুন কিছু শুনতে

এসেছিলাম! অথচ আপনি আমার সব আত্মীয়দের মতোই কথা বলছেন!'

লজ্জিত হন বৈকি অনামিকা।

কিন্তু কী নতুন কথা বলবেন তিনি এই হঠাৎ পাগলা-হয়ে যাওয়া মেয়েটাকে? পৃথিবীটাকে তো তিনি ওর মতো অতো কম দিন দেখছেন না?

আস্তে অপরাধীর গলায় বলেন, 'আমিও তোমার আত্মীয় নমিতা! তাই তোমাকে নতুন কথা বলে বিভ্রান্ত করতে পারবো না। তবে সত্যিই যদি তুমি যাও, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে কোনো ছেলে-টেলেকে নিতে হবে! অনেক তো খরচা হবে—কিছু যদি রাগ না করো তো বলি—'

নমিতা থামিয়ে দেয়।

নমিতা এবার নম্র গলায় বলে, 'আপনার ভালবাসা মনে থাকবে। কিন্তু খুব দরকার পড়লেও টাকার সাহায্য আমি আপনার কাছে নেব না। আমার গায়ে তো এখনো সামান্য সোনা-টোনা আছে।'

'কিন্তু নমিতা—', অনামিকা থামলেন।

এখনই ওকে হতাশার কথা শোনানো উচিত হবে? অথচ নিশ্চিত বুঝতে পারছেন, ফিরে নমিতাকে আসতেই হবে।

সাবধানে বলেন, 'কিন্তু নমিতা, ধরো যদি তোমার সেখানে ভাল না লাগে, ধরো যদি ঠিকমতো সুবিধে না হয়—'

'বলুন না, ধরো যদি তাড়িয়ে দেয়—', হঠাৎ বেখাপ্পা ভাবে হেসে ওঠে নমিতা। বলে, 'তাহলে তখন আবার আপনার কাছে আসবো। শুনবো জীবনকে আর কোন দিক থেকে গড়া যায় যা আমার সাধ্যের মধ্যে!'

ছোট চাকরটা অভ্যাসমতো একসময় এক কাপ চা ও দুটো সন্দেশ রেখে গিয়েছিল, নমিতা তাতে হাতও দেয়নি। অনামিকা কয়েকবারই উসখুস করেছেন, এখন বললেন, 'চা-টা যে ঠান্ডা হয়ে গেল নমিতা!'

নমিতা অদ্ভুত একটু হেসে বললো, 'তাই দেখছি। ঠিক আমার জীবনটার মতো, তাই না? ভরা ছিল, গরম ছিল,—কেউ খেলো না! এখন কি আর—'. পেয়ালাটা হঠাৎ তুলে নিলো, ঠান্ডা চা-টা ঢক্ঢক্ করে এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে বললো, 'তবু খেয়েই ফেললাম, নষ্ট হওয়ার থেকে ভাল হলো, তাই না?'

অনামিকা অবাক হলেন। এ ধরনের কথা ওর মুখে যেন অপ্রত্যাশিত! অনামিকা চিন্তিত হলেন।

মানসিক ব্যাধির পূর্বলক্ষণ নয় তো?

পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে নমিতা এবার ঘড়ির দিকে তাকালো, একটু চঞ্চল হলো। বললো, 'দেখছেন তো আমার ভাইপোর কান্ড! এখনো এলো না! মাসির কাছে খেয়ে-দেয়ে আসছে বোধ হয়। পরনির্ভরতার এই জ্বালা!'

ওর সহজ গলার কথা শুনে স্বস্তি পান অনামিকা, তিনিও সহজভাবে বলেন, 'তা আজকাল তো আর বাপু মেয়েরা এতো পরনির্ভর নেই, নিজেরাই তো একা একা চলা-ফেরা করে।'

নমিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা জানি। কিন্তু এযাবৎ তো পায়ে শেকল বাঁধা ছিল। অভ্যাস তো নেই। রাস্তা-টাস্তা কিছুই চিনি না। এইবার থেকে উঠে পড়ে লেগে চিনতে হবে। একটু হেসে বললে, 'শিকলিটা তো কেটেছি মনের জোর করে!' এগিয়ে এসে নিচু হয়ে আবার প্রণাম করে।

অনামিকা দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, 'কী হলো?'

'ওই যে আসছে আমায় নিতে। খুব জ্বালাতন করে গেলাম আপনাকে

হয়তো আবারও আসবো।'

বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে।

অনামিকা তাকিয়ে থাকলেন ওই হঠাৎ-শিকলি-কাটা পাখিটার গতির দিকে।

ও কি সত্যিই আকাশে উড়তে পারবে?

নাকি অনভ্যস্ত ডানায় উড়তে গিয়ে ঝটপটিয়ে মাটিতে পড়ে ডানা ভাঙবে?

'এই মেয়েটাকে আমি কোন পথ দেখাতে পারতাম?' অনামিকা নিচ থেকে উঠে এসে সিঁড়ির জানলা-কাটা দরজা থেকে বেরনো দু-ফুট বাই চার-ফুট ক্ষুদে ব্যালকনিটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবলেন, 'ও যদি আমার গল্পের নায়িকা হত, ওর জন্যে কোন্ পরিণতি নির্ধারণ করতাম আমি?'

হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগলো, আর হঠাৎই মনে এলো, বেশ বহু-বহুকাল এখানটায় এসে দাঁড়াননি! এটা যে ছিল তাই মনে পড়তো না কখনো। আজ মনে পড়লো—নিজের ঘরে 'মেজদি'র উপস্থিতি স্মরণ করে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই অতি-সংসারী মানুষটার কাছাকাছি গিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো না। যে মানুষটা নিকট আত্মীয়ত্বের দাবিতে নিতান্ত অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলতে চায়, অথচ যার কাছে বলতে চায় সে অনুভব করে কতো যোজন ব্যবধান তাদের মধ্যে। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি তারা।

এই যোজন ব্যবধান নিয়েই তো আত্মীয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। সব ক্ষেত্রে না হোক বহু ক্ষেত্রেই।

অনবরত বিদ্যুৎপাখার হাওয়া খাওয়ায় অভ্যস্ত শরীরকে এই বেশী রাত্রির উড়ো-উড়ো হাওয়াটা যেন আচ্ছন্ন করে তুলছে।

এই ক্ষুদে বারান্দাটুকুর পরিকল্পনা ছিল বকুলের মা সুবর্ণলতার। বাড়ি হয়ে পর্যন্তই এই জানলা ফুটিয়ে দরজা করে বারান্দার কথা বলে চলেছিলেন তিনি। বলতেন—'টানা উঠতে নামতে মাঝ মাঝে একটু নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা থাকা দরকার।'

তখন বকুলের বাবা রেগে রেগে বলতেন, 'কী এমন বেণীমাধবের ধ্বজার সিঁড়ি যে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে? এতো এতো নিঃশ্বাস নেবারই যে দরকারটা কী বুঝি না! দেয়াল ফেঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে! আশ্চর্য!'

অথচ সুবর্ণলতা মারা যাবার কিছুদিন পরে হঠাৎ বাবা মিস্ত্রী ডেকে, বেশ কিছু খরচা করে জানলা কাটিয়ে দরজা করে এই ক্ষুদ্র ঝুল-বারান্দা দুটো করিয়ে ফেললেন ওপর নীচে দুটো সিঁড়িতে।

কিন্তু কে কবে এসেছে নিঃশ্বাস নিতে? কে কবে আসে? নূতন নূতন বেলায় বকুলের তো আসতে পা ওঠেইনি। মনে হয়েছে মা বুঝি কোথায় বসে করুণ চোখে তাকিয়ে বলবেন, 'সেই হলো, শুধু আমারই ভোগে হলো না। তোরা বেশ—'। হ্যাঁ, এই ধরনের অনুভূতিই তখন দরজার চৌকাঠের কাছে এলেই বকুলকে হঠাৎ দাঁড় করিয়ে দিতো। অথচ তখন বকুলের মাঝে মাঝে দেয়াল ফেঁড়ে নিঃশ্বাস নেবার দরকার ছিল।

দরকার ছিল আপন চিত্তের, দরকার ছিল একটা লাজুক মানুষের আবেদনের। সুযোগ পেলেই যে বলতো, 'অমন চমৎকার "অলিন্দ" হলো তোমাদের, একটু দাঁড়াতে পারো না?'

তবু পারতো না বকুল।

দরজাটা খুললেই আকাশের তারার দিকে চোখ পড়ে যেতো। কেমন একটা অপরাধ-বোধ এসে যেতো!

তারপর?

তারপর তো বকুল অনামিকা হয়ে গেল। অনামিকার আর বাতাসের ওই একমুঠো দাক্ষিণ্য নেবার অবকাশ রইল কই?

কিন্তু অবকাশ কারই বা আছে এ বাড়িতে? দরকারই বা কই? ছুটতে ছুটতে নামা ওঠা, এই তো! জানে সিঁড়ির দরকার ওইটুকুই।

হয়তো এমনিই হয়। বাতাসের যার বড়ো প্রয়োজন সে পায় না, যে সেটা অনায়াসে পায় সে তার প্রয়োজন বোধই করে না। তবু আজ সাময়িক একটা কারণে প্রয়োজন বোধ করলেন অনামিকা আর যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

ভাবতে লাগলেন, নমিতা যদি আমার গল্পের নায়িকা হতো, কোন্ পরিণতি দিতাম আমি ওকে?

নিশ্চয়ই ওকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দেবতাত্মা হিমালয়ের শান্তিময় কোলে বসিয়ে নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলতাম না!...তাহলে আবার কি ওকে সংসার-আশ্রয়ের নিশ্চিন্ত ছায়ায় ফিরিয়ে দিতাম? সেই উত্তরবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ পরিবারের মধ্যে?

না না, ছি!

তবে?

তবে কি নিতান্তই বাজারচলতি সমাধানে ওকে নার্স করে ছেড়ে দিতাম? আর একদিন ওর সেই মিথ্যা সন্ন্যাসী স্বামীটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করে ওর করতলে সমর্পণ করতাম?

দূর! দূর!

তবে কি ওকে ডানা ভেঙে স্রেফ্ ফেলেই দিতাম পথে-প্রান্তরে?

একটু চুপ করে ভাবলেন, তারপর প্রায় নিজের মনকেই বললেন, হয়তো গল্পের নমিতাকে শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতাম! হয়তো বা তার মধ্যেই কিছু নতুনত্ব আনবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু—ওই চোখে-দেখা-সত্যি-মেয়েটার জন্যে আমি সে পরিণতি ভাবতেই পারছি না? ওর সেই স্বামীটাকে জব্দ করার জন্যেও না—'তাকে' মুখের মত জবাব দেবার জন্যেও না। আচ্ছা প্রগতিশীল মন কাকে বলে? সে মন কি নিতান্ত প্রিয়জনের জন্যে, নিকটজনের জন্যে তেমন দুঃসাহসিক প্রগতির পথ দেখাতে পারে? যে পথে অকল্যাণ, যে পথে গ্লানি?

তেমন প্রগতিশীল হওয়া আমার কর্ম নয়, ভাবলেন অনামিকা। তবে কী হবে ওর? মানে—কী করবে ও? ওর মধ্যে এখন একটা সর্বনাশা আগুন জ্বলছে, মনে হচ্ছে সে আগুন ওকে ছাড়া আর কাকে দগ্ধ করবে?

তারপর খুব হালকা এবং নেহাৎ সংসারী একটা কথা মনে এলো, এ সংসারটা যদি আমার হতো, হয়তো ওকে কিছুদিন আমার কাছে থাকতে বলতে পারতাম! তা আমিই তো বলতে গেলে আশ্রিত! নেহাৎ বাবার উইলে কী একটা আছে তাই—

তারপর মনে মনেই হেসে উঠলেন, তা তাতেই বা কি লাভ হতো নমিতার? সেই তো পরিচয় হতো পরাশ্রিত! আর ও নির্ঘাত ওর নিজস্ব স্বভাবে আমার মনোরঞ্জন করতে বসতো!...না, ওটা সমাধানের কোনো পথই নয়। ওর সত্যিকার দরকার ভালবাসার! করুণার নয়, দয়ার নয়, মমতার নয়, শুধু গৌরবময় ভালবাসার। এছাড়া আর বাঁচার উপায় নেই ওর। কিন্তু সে-বস্তু কে এনে ওর হাতে তুলে দেবে?

একমাত্র সুপথ হতে পারে, যদি ওর স্বামী মিথ্যা সন্ন্যাসের খোলস খুলে ফেলে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়—

ভাবতে গিয়ে মনটা কেন কে জানে কেমন বিরূপ হয়ে গেল। মনে হলো, ভারী জোলো আর বিবর্ণ একটা ভাবনা ভাবছি। নাঃ, সত্যি 'বিধাতা' হবার সাধ্য 'দ্বিতীয় বিধাতা'র নেই।

কিন্তু বিধাতারই বা প্লটের বাহাদুরি কোথায়?

নতুনত্বের নামও তো দেখি না। সবই তো অমনি জোলো-জোলো!...

পাশের বাড়িটার দিকে তাকালেন, বাড়িটা এখন এই দশটা সাড়ে-দশটা রাত্রেই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।...ওরই কোণের একটা ঘরে দীনহীন একটু গৃহ-সজ্জার মধ্যে নির্মলের বৌ হয়তো ঘুমে নিমগ্ন হয়ে পড়ে আছে, হয়তো বা অনিদ্রার শিকার হয়ে পড়ে পড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। ওকে দেখলে এখন আর মনেও হয় না একদা ও পরমা সুন্দরী ছিল।...

বৌদিদের আলাপ-আলোচনার মাঝে মাঝে কানে আসে ওর ছেলের বৌটি নাকি মেয়ে সুবিধের নয়, কেমন করে যেন ওকে কোণঠাসা করে ফেলে নিজে সর্বগ্রাসী হয়ে বসেছে।...বাড়িতে আর কেই বা আছে? নির্মলের জেঠি একটা ভাইপোকে পুষেছিলেন, ইদানীং সেই-ই নাকি বাড়ির অর্ধাংশ দখল করে আছে। আর তাদের সঙ্গেই নাকি নির্মলের ওই ছেলের বৌয়ের খুব হৃদ্যতা। কী পুরনো প্লট!

আগে ওই বাড়ি রাত বারোটা অবধি গমগম্ করতো, গ্রামোফোনের গান শোনা যেতো অনেক রাত অবধি, আলো জ্বলতো ঘরে ঘরে।

এখন? ওই অন্ধকারই তার উত্তর দিচ্ছে। তবে?

বিধাতার প্লটে নতুনত্বের নামও নেই। আলো জ্বালা আর আলো নিভানো এই ওঁর প্লট।...

আমি এ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখিনি কতোদিন!

তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন হঠাৎ অবাক হয়ে গেলেন অনামিকা। কবে এতো জরাজীর্ণ হয়ে গেল বাড়িটা? হয়ে গেল এমন মলিন বিবর্ণ?

একদিনে হয়নি। আস্তে আস্তেই হয়েছে।

তার মানে দিনের পর দিন, কতো কতো দিন—আর আমি তাকিয়ে দেখিনি! তার মানে—'নির্মল' নামের একটা অনুভূতিও আস্তে আস্তে ওইরকম বিবর্ণ জরা-জীর্ণই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবু—

এই শিরশিরে বাতাসে রাত্রির আকাশের নিচে চিরপরিচিত অথচ অপরিচিত জায়গায় দাঁড়িয়ে ওই বিবর্ণ জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভূতিটা আবার যেন আলোয় ভরে গেল...সেই আলোটা ওই জানলায় গিয়ে পড়লো যেন। দেখা গেল খোলা জানলার ফ্রেমে আঁটা একটা আলোর ছবি।

ঘরের মধ্যে থেকে গ্রামোফোনে গান ভেসে আসছে।...'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে—'

ধরা-ছোঁয়া নেই, তবু যেন কোথাও আছে বক্তব্যের আভাস। যারা লাজুক, যারা ভীরু—তারা পরের কথার মধ্যেই নিজের কথা মিশিয়ে দিয়ে নিবেদন করে। জানে যে ধরবার সে-ই ধরবে, যে ছোঁয়ার সে-ই ছোঁবে, আর কারো সাধ্য নেই ধরতে ছুঁতে।

'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে—', তাই 'আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।'

আজকাল আর কেউ অমন বোকার মতো আর বেচারীর মতো ভালবাসে না।

এ যুগ ওই মৃদুতাকে—ওই চারুতাকে ভালবাসাই বলবে না। দেখলে ঠোঁট

বাঁকাবে, 'রাবিশ' বলবে, অথবা 'জোলো ভাবালুতা' বলে হেসে উড়িয়ে দেবে। এ যুগ জানে ভালোবাসাটা একটা ভোগ্যবস্তু, তাকে লুটে নিতে হয়, ছিঁড়ে আনতে হয়, দখল করতে হয়।

হয়তো এরাই ঠিক জেনেছে। অথবা এরাই কিছু জানেনি, সত্যিকারের জানাটা আজও অপেক্ষা করছে কোনো এক ভবিষ্যৎ যুগের আশায়। যদিও শম্পারা ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে, 'আমরাই ঠিক জেনেছি।'

তবু সেটুকুও তো জুটছে ওদের ভাগ্যে। ওই আত্মপ্রসাদ! ওরা তো ভাবছে, 'আমরা নিলাম, আমরা পেলাম।' সে যুগের ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি।

অথচ সে যুগেও ভাবতো—ভালবাসলাম! ভাবতো এর নামই ভালবাসা!... শম্পারা—

আশ্চর্য, শম্পা আমাকেও একটা চিঠি দিল না! যদিও আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, হে ঈশ্বর, আমার অহঙ্কার খর্ব হোক, ওর মা-বাপের কাছেই আগে চিঠি আসুক। তবু যেন কোথায় একটা শূন্যতাবোধ সব সময় সব কিছুতে নিরানন্দ করে রেখেছে।

মনে মনে নিশ্চিত ভেবেছিলাম, ও আমাকে অন্তত জানাবে।

শম্পা যেন নিজের জীবনটাকে বাজি ধরে বাপের সঙ্গে খেলতে বসেছে! শম্পা তেমনি লড়ুইয়ে মেয়ে। কে জানে এ খেলায় কে জিতবে? শম্পা না শম্পার বাবা? বাবার জেতাটা তো পরম দুঃখের। অথচ বাবার হারও দুঃখের!

এ বাড়িতে আরও একটি মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে তার মা আপন সম্পত্তি ভেবে খেলতে বসেছে। সেটা আরো দুঃখের, বরং বা বলা যায় ভয়াবহও!

ওর মা এই পরিবেশ থেকে—তার নিজের ধারণা অনুযায়ী 'উঁচু'তে উঠতে চায়। অনেক উঁচুতে। যে উঁচুর নাগাল পেতে হলে খুব বড়ো কিছু একটা বাজি ধরে জুয়ায় বসতে হয়!...'জীবন' জিনিসটাই সব চেয়ে বড়ো, আর সব চেয়ে হাতের মুঠোর জিনিস।

কিন্তু ওই হতভাগা মেয়েটার মায়ের নিজের জীবনটা এখন আর চড়া দামে বিকোবে না, তাই দামী বস্তুটা নিয়েছে মুঠোয় চেপে। মেয়েটার বোঝবার ক্ষমতা নেই ওকে নিয়ে কী করা হচ্ছে, ওকে কতোখানি ভাঙানো হচ্ছে।

তা যাদের বোঝবার ক্ষমতা আছে তারাই কি কিছু প্রতিকার করতে পারছে? পারে কী?

আশ্চর্য, আমাদের ক্ষমতা কতো সীমিত!

আরও একবার নিজের ক্ষমতার পরিসর মেপে দেখে যেন লজ্জায় মরে গেলেন অনামিকা।

কী অক্ষম আমি!

আমার চোখের সামনে একটা নির্বোধ মেয়ে আর একটা বোধহীন মেয়েকে হাত ধরে কাদায় পিছল গভীর জলের ঘাটে নামতে যাচ্ছে, আমি তাকিয়ে দেখছি। খুব দূরে বসেও দেখছি না, বরং খুব কাছেই গাছের ছায়ায় বসে আছি।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো ওরা পিছলোবে, ওরা ডুবে যাবে।

ওইটাই ওদের নিশ্চিত পরিণতি জেনেও আমি 'হাঁ হাঁ' করে চেঁচিয়ে উঠছি না, ছুটে গিয়ে ওদের হাত চেপে ধরে টেনে আনার চেষ্টা করছি না, আমি শুধু ভয়ানক একটা অস্বস্তি বোধ করছি, ভয়ানক একটা নিরুপায়তার যন্ত্রণা অনুভব করছি।

কারণ, আমি ধরেই নিয়েছি আমার ভূমিকা দর্শকের।

ধরে নিয়েছি ওরা আমার কথা শুনবে না, আমার নিষেধ-বাণী শুনবে না। 'তবে কেন মিথ্যে অপমানিত হতে যাওয়া' ভেবে কথাটি কইছি না। চেষ্টা করে না দেখেই সেই কল্পিত অপমানটার ভয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে বসে ওদের ডুবতে যাওয়া দেখছি।

আমাদের অক্ষমতা হচ্ছে আমাদের অহমিকা। আমাদের নিরুপায়তা হচ্ছে আমাদের একটা অর্থহীন আত্মসম্মান-বোধ। তাই আপন সন্তানকেও হয়তো ভুল পথ থেকে নিবৃত্ত করতে হাত বাড়াই না। অনিষ্টের পথ থেকে টেনে আনতে ছুটি না। এই ভেবে নিথর হয়ে বসে থাকি, 'যদি আমার কথা না শোনে!'

সেই না শোনা মানেই তো খর্ব হবে আমার অহমিকা, ঘা পড়বে অহঙ্কারে।

আমার এই 'আমি'টাকে কী ভালই বাসি আমরা!

কই, আমি কি একদিনও ছোড়দার ঘরে গিয়ে বসে পড়ে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, 'ছোড়দা, কোনো চিঠি এলো ?'

অথচ মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, 'কি জানি হয়তো এসেছে, হয়তো গ্রাহ্য করে অথবা মান খুইয়ে বলতে আসছে না আমায়।'...

এই 'মান' জিনিসটা কী কঠিন পাথরের প্রাচীরের মতোই না ঘিরে রেখেছে আমাদের! ওর থেকে বেরিয়ে পড়বার দরজা আমাদের নেই! অথচ আশ্চর্য, কী তুচ্ছ কারণেই না জিনিসটা "খোওয়া" যায়!

ও যেন একটা ভারী দামী রত্ন, তাই 'খোওয়া' যাবার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি। ও যেন আমার প্রভু, তাই ওর দাসত্ব করি।

আচ্ছা ওকে আমার 'অধীন' করে রাখা যায় না ? আমিই প্রভুত্ব করলাম ওর ওপর ? অথবা যদি মনে করি কিছুতেই খোওয়া যেতে দেব না ওকে, দেখি কার সাধ্য নেয় ? সযত্নে পাহারা দিয়ে নয়, অযত্নে রেখে দিয়ে যদি রক্ষা করি ওকে ?

নাঃ, যতো সব এলোমেলো চিন্তা!

আসলে আমি আমার সেই মেজদির ঘুমের জন্যে অপেক্ষা করছি। বয়েস হয়েছে, রেলগাড়িতে এসেছেন, সারাদিন কথা বলেছেন, আর কতোক্ষণ পারবেন ঘুমের সঙ্গে লড়াই করতে ? নিশ্চয় এতোক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অলকা আর অপূর্বর সঙ্গে এই ক'ঘণ্টাতেই মেজদির যেন বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে। একত্রিত পরিবারে এই কৌতুক নাটকের অভিনয়টি সর্বদাই হতে দেখা যায়। বহিরাগত অতিথিরা অর্থাৎ কিনা এসে পড়া আত্মীয়েরা হঠাৎ কেমন করেই যেন ওই 'একে'র মধ্যেই 'একাধিকে'র সন্ধান পেয়ে যান! আর কেমন করেই যেন কোনো একটি বিশেষ দলভুক্ত হয়ে যান! অবশ্য বাইরের ঠাটটা সর্বজীবে সমভাবে থাকে, কিন্তু আস্তে আস্তে দলভেদটা প্রকট হয়ে ওঠে, এবং নোনাধরা যে দেওয়ালটা তবুও ছাদটাকে ধরে রাখার কাজে সাহায্য করছিল, সেটা ধ্বসে পড়ে ছাদটাকে নামিয়ে দেয়।

হতো অবশ্যই এগুলো, কালক্রমে হতো, আত্মীয় অতিথি সেটুকু ত্বরান্বিত করে দেন। হ্যাঁ, এ নাটক হামেশাই হচ্ছে ঘরে ঘরে!

কিন্তু দুটু দলকেই বা ওঁরা চট করে চিনে ফেলেন কী করে ?

সেটাই আশ্চর্য রহস্য!

অবশ্য সেই খুঁটিটাই ধরা নিয়ম।

নৌকো বাঁধতে হলে বড়ো গাছেই বাঁধতে হয়। আর কে না জানে শিষ্টের থেকে দুষ্টই শক্তিতে বড়ো!

মেজদি কেমন করেই যেন ওই বড়ো গাছটাকে চিনে ফেললেন, আর নৌকোটা বাঁধলেন।

কিন্তু উনি তো থাকতে আসেননি!

আসেননি সত্যি, তবে এখন যে ওঁর একটা অবিবাহিতা মেয়ে আছে, সেটাকে কলকাতার আবহাওয়ায় রাখতে চান, সেটা বোঝা গেছে ওঁর তখনকার কথায়।

যখন খেতে বলা হয়েছিল, এবং অনামিকা আটপৌরে শাড়িটা আটপৌরে ধরনে জড়িয়ে নিয়ে 'বকুল' হয়ে গিয়ে বসেছিলেন সে আসরে, তখন মেজদি আমিষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে বড় ভাজের পাশে খেতে বসে ইচ্ছেটা ব্যক্ত করেছিলেন, 'কলকাতার হালচাল তো দেখলে গা জ্বলে যায়, তবু এখনকার ছেলেদের তো ওই পছন্দ, মেয়েটাকে এখেনে চালান করে দেবো। বলবো, নে কতো হালচাল শিখতে পারিস শেখ।'

বলা নিষ্প্রয়োজন শ্রোত্রীবর্গ কেউই এ ইচ্ছেয় উৎসাহ প্রকাশ করেনি, এবং মেজদিও সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বুঝে ফেলে বলেছিলেন, 'অবিশ্যি কন্যে আমার থাকতে চাইবে কিনা সন্দেহ। "মা" ভিন্ন আর কিছুতে দরকার নেই তার! কোলের তো ?...তবে আমিই বলি, পরের ঘরে যেতে হবে না ? তা হারামজাদি হেসেই মরে। বলে, "যাবোই না"।'

বকুলকে মাথা নিচু করে খেতেই হয় সেখানে। এদিকে ছোড়দার বউও থাকেন, থাকে বড়দার বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাওয়া সংসারী মেয়ে হেনা। অপূর্বর নিজের বোন সে, কিন্তু বাপের বাড়ি এলে এদিকেই খায়। বলে, 'বাবা, অলকার ওখানে কে খাবে ? বাসন-মাজা ঝিতে রাঁধে, চাকর বাসি কাপড়ে জল-বাটনা করে।'

বকুল হাসে মনে মনে।

ভাবে, 'তোমার মহা বিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু—' না, কোনো কালেই হারিয়ে যায় না।

হেনা যখনই আসে বেশ কিছুদিন থাকে, কারণ ওর স্বামী অফিসের কাজে ট্যুরে যায়, আর সেটাই ওর পিত্রালয়ে আসার সময়। এসেই বলে, 'চলে এলাম! বরবিহীন শ্বশুরবাড়ি! ছ্যাঃ, যেন নুনবিহীন পান্তো!'

হেনার ছেলে-মেয়ে নেই, তাই হেনার স্বাধীনতাটা এতো বেশী।

চন্দ্র-সূর্যের গতির নিয়মেই হেনা তার নিজের ভাই-বৌয়ের থেকে খুড়ো-খুড়ীকেই ভজে বেশী। মা ? তিনি তো এখন নখদন্তবিহীন, তাঁকে বড়জোর একটু করুণা করা চলে। তাঁর কাছে তো আশ্রয় নেই!

বড়দার আরও মেয়ে-টেয়ে আছে। তারা বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর আসে না। যেমন আসা ছেড়ে দিয়েছিল চাঁপা আর চন্দন, সুবর্ণলতা মারা গেলে। বলেছিল, 'আর কোথায় যাবো ?'

কিন্তু পারুল ?

ভাবনাগুলো যেন পারার মতো, কিছুতেই হাতে ধরে রাখা যায় না, গড়িয়ে পড়ে যায়, যেখানে-সেখানে ছিটকে পড়ে, শুধু যেখানেই পড়ুক ঝকঝকে চোখে তাকায়।

পারুলের কথা মনে হতেই পারুল যেন সামনে দাঁড়িয়ে হেসে উঠলো।

যেন বললো, 'কই রে বকুল, তোর সময় আর তাহলে হলো না? অথচ বলেছিলি—"যাবো সেজদি তোর কাছে! বকুলকে আস্ত করে খুঁজে দেখবো তোর সঙ্গে একসঙ্গে। আমার কাছে কেবলই ভাঙাচোরা টুকরো।"

বলেছিল বকুল। কিন্তু সেই আস্তটা খুঁজে দেখতে যাবার সময় সত্যিই হয়ে

উঠলো না আজ পর্যন্ত।

কেন?

খাতাপত্তরের জঞ্জাল সরিয়ে তুলতে পারি না বলে? পাহাড়ের ওপর আবার পাহাড় জমে ওঠে বলে? আর সেইগুলোর 'গতি করবো' বলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বসামাত্র ফাংশানবাজেরা বাজপাখির মতো এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় বলে?... তার মধ্যিখান থেকেও ফাঁক বার করে নেবার চেষ্টার সময় দর্শনার্থী আর বিনা-মূল্যে লেখাপ্রার্থীর ভিড় এসে জোটে বলে?

যখন ইচ্ছে হবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি—'এ তো বড়ো মুশকিল, দেশসুদ্ধ সবাই তোমরা পত্রিকা প্রকাশ করবে? আর আমরা হবো সেই যূপকাষ্ঠের বলি?'

তখন খুব মধুর করে হেসে বলতে হবে, 'কি করবো, বল বাপু? সময় তো মোটে নেই, কতো কাগজ বেরোচ্ছে প্রতিদিন—?'

সমুদ্রে বালির বাঁধ-এর মতো সেই কথার বাঁধ ভেসে যাবে ওদের কথার তোড়ে বলে?

এইগুলোই সব থেকে বড়ো দরকারী?

এই দরকারগুলোর স্তূপের ওপরে সেজদি বসে বসে মিটি মিটি হাসবে, আর তারপর মুখ ফিরিয়ে নেবে, আর তারও পরে আস্তে আস্তে বুড়ো হয়ে যাবে, বদলে যাবে? হয়তো সেই চেনা সেজদিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনোদিন, হয়তো মরেই যাবে কোনোদিন, আর বকুল বসে বসে টেবিলে জমানো স্তূপ সাফ করবে? কোনোদিনই সাফ হবে না, আবার জমে উঠবে জেনেও?

এর খাঁজ থেকে একবার পালিয়ে যাওয়া যায় না?

হঠাৎ গিয়ে বলে ওঠা যায় না, 'দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা?'

অফিসের কাজেই 'পশ্চিম' থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল মোহনকে, তবু মোহন এমনভাবে এসে দাঁড়ালো, দেখে মনে হতে পারে শুধু মাকে ওই প্রশ্নটাই করতে এসেছিল মোহন, এই মাত্র যে প্রশ্নের উত্তরটা দিলো পারুল হেসে উঠে, 'ওমা, তা তাড়িয়ে দেব নাকি? এসেছে পিসির কাছে দু'দশদিন থাকবে বলে—'

মোহন রাগটা লুকোবার চেষ্টা না করেই বলে, 'একা থাকলে দু'দশদিন কেন, দু'দশ মাসই থাকতে পারতো, আপত্তির কিছুই ছিল না, কিন্তু আর একটা যা শুনলাম—'

'কী শুনলি আর একটা?' প্রশ্ন করলো পারুল।

মোহন মনে মনে ঠোঁট কামড়ালো।

মনে মনেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'মা, তোমার এই ন্যাকামিটি আর গেল না কোনোদিন? সেই ছেলেবেলা থেকে এই বুড়ো-বেলা পর্যন্ত দেখছি—তুমি ঠিক শরৎবাবুর নভেলের নায়িকার প্যাটার্ন নিয়ে কথা বলবে! আমরা অতোশত বুঝি না। গেরস্ত লোক গেরস্ত ধরনে কথা কইবো, উত্তর পাবো, মিটে গেল ল্যাঠা, তা নয়।...কেন বুঝতে পারছো না তুমি, কী শুনছি আর একটা? ঠিকই বুঝতে পারছো, তবু আমার মুখ দিয়েই বলিয়ে নিতে চাও। সাধে কি আর ছেলের বৌরা এতো বিমুখ, আমি তোমার নিজের ছেলে, তবু যেন আমাকে অপদস্থ করার মধ্যেই তোমার আনন্দ।'

বলছিল মনের মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে, কিন্তু বাইরে সেও পারুলের ছেলে।

আত্মস্থ অচঞ্চল।

'যা শুনলাম, সেটা তুমি বুঝতে পারনি তা নয়। আমি বলতে চাইছি—একটা চালকামিন ধরনের বাজে লোককে নিয়ে নাকি সে এসে উঠেছে তোমার কাছে! এবং সেটা নাকি রোগগ্রস্ত?'

'রোগগ্রস্ত? না তো—', পারুল বিস্ময়ের গলায় বলে, 'তোমাকে যে খবর দিয়েছে, সে তো দেখছি ভালো করে খবর-টবর না নিয়েই—'

'আমায় কেউ কোনো খবর-টবর দেয়নি।' বলে বসে মোহন।

পারুলের কি মনে পড়ে না, মোহন রেলের রাস্তায় অনেকটা দূর থেকে এসেছে, ওর তেষ্টা পেয়ে থাকতে পারে, খিদে পেয়ে থাকতে পারে! আর তার পর মনে পড়ে না মোহন তার নিজের পেটের ছেলে! পারুল মোহনের মা!

মনে পড়েই না হয়তো।

যাদের মন অন্য এক ধাতু দিয়ে গড়া, তাদের হয়তো ওই সব ছোটখাটো কথাগুলো মনে পড়ে না। তারা শুধু খাঁটি বাস্তবটা দেখতে পায়।

সেই বাস্তব দৃষ্টিতে পারুল মোহনকে পারুলের 'অপরাধের বিচারক' ছাড়া আর কোনো দৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছে না. অতএব পারুল নিজ পক্ষে উত্তর মজুত রাখতেই তৎপর থাকছে। আর এও স্থিরনিশ্চিত যে, অনধিকারে যদি কেউ বিচাকর সেজে জেরা করতে আসে, পারুল তাকে রেহাই-টেহাই দেবে না। 'ছেলে' বলেও না।

তাই পারুল ছেলেটার ক্লান্ত মুখটার দিকে না তাকিয়েই খুব হালকা একটু হাসির সঙ্গে বলে, 'কেউ খবর-টবর দেয়নি? ওমা, তাই নাকি? তুই তাহলে বুঝি আজকাল হাতটাত গুনতে শিখেছিস? কার বই পড়ছিস? কিরোর?'

কথাটা বলে ফেলে অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল মোহন একথা সত্যি, তাই বলে এইভাবে অপদস্থ করা? মোহন গম্ভীর হয়। মোহনের ক্লিষ্ট মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, তীব্রতা পরিহার করে গম্ভীর সুরেই বলে সে. 'আমি বেশীক্ষণ সময় হাতে নিয়ে আসিনি মা! সোজা আর সহজ ভাবে কথা বললে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।'

'ওঃ তাই বুঝি!'

পারুল চট করে নিজেকেও প্রায় সোজা করে দাঁড় করিয়ে বলে, 'তবে তুইই চটপট করে বল তোর কী জানবার আছে? কী উদ্দেশ্যে হঠাৎ এসেছিস? এক নম্বর দু নম্বর করে বল—উত্তরটা চটপট হয়ে যাবে।'

উঃ অসহ্য! বললো মোহনের মনের মুখ!

তবু বাইরের মুখটা সহ্যের ভানে রইলো, 'আমি জানতে চাই—তোমার ওই ভাইঝির সঙ্গে আর একটা লোক আছে কিনা?'

'আছে।'

যান্ত্রিক উত্তর পারুলের।

মোহনের মনের মুখ আবার চেঁচাতে শুরু করে, ওঃ, সাধে কি আর ভাবি *বাবা সাতসকালে মরে বেঁচেছেন!...*

'লোকটা কে, তার সন্ধান নিয়েছিলে?'

'দরকার বোধ করিনি।'

'ওঃ দরকার বোধ করনি? তোমার সাতজন্মে না দেখা এক ভাইঝি এসে তোমার বাড়িতে উঠলো একটা বাজে লোক নিয়ে, তুমি তার পরিচয়টা জানবারও দরকার বোধ করলে না?'

'আমার ভাইঝি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, এটাই যথেষ্ট পরিচয় বলে মনে

করেছি—'

'চমৎকার ! তোমার ভাইঝি যদি একটা রাস্তার কুলি-মজুরকে নিয়ে আসে 'সেটাও মেনে নিতে হবে। সেই কুলিটাকেই যখন সে ভাবী স্বামী বলে ঠিক করে রেখেছে !'

'অতএব তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রাখতে আপত্তি নেই, কেমন ? তোমার ওই ভাইঝির বয়েস নিশ্চয়ই এমন বেশী হয়নি যে, মানুষ চিনতে পেরে উঠবে ! লোকটা জেলপালানো আসামী কিনা—'

মোহনের দ্রুত কথার ঠাসবুনুনির মাঝখানেও আস্তে একটা পাতলা ছুরি বসায় পারুল, 'বয়েসটা অনেক বেশী হলেই মানুষ চেনবার ক্ষমতা হয়, এটা আবার তোকে কে বললো মোহন ? তা তোর তো অনেকটা বয়েস হয়েছে, আমাকে দেখছিসও জন্মাবধি, কই, চিনে উঠতে পারলি কই ?'

॥ ১৭ ॥

নমিতা যে এভাবে দড়ি-ছেঁড়া হয়ে চলে যেতে পারে একথা জলপাইগুড়ির ওরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। যে নমিতার মুখ দিয়ে কথা বেরোতো না, সে হঠাৎ কি না স্পষ্ট গলায় বলে বসলো 'আমি চলে যাবো !' বলে বসলো 'এই দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি চাই !'

আশ্রয়দাতাদের কাছে এ কথাটা লজ্জারও বটে দুঃখেরও বটে। সর্বোপরি অপমানেরও !

মামীশাশুড়ী ফেটে পড়লেন, মামাশ্বশুর পাথর, আর দিদিশাশুড়ী গাল পাড়তে শুরু করলেন।

'ও হতভাগী নেমকহারামের বেটী, যে মামাশ্বশুর অসময়ে তোকে মাথায় করে এনে আশ্রয় দিয়েছিল, তার মুখের ওপর এতো বড়ো কথা ? সে তোকে দাস্যবৃত্তি করাতে এনেছিল ? ভেতরে ভেতরে এতো প্যাঁচ তোর ? বলি যাবি কোন্ চুলোয় ? যাবার যদি জায়গা আছে তো এসেছিলি কেন কেতাথ্য হয়ে ? পড়েই বা ছিলি কেন এতোকাল ?'

অনিলবাবু ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আঃ, মা থামো। বৌমার যদি হঠাৎ এখানে অসুবিধে বোধ হয়ে থাকে, আর তার প্রতিকারের উপায় আমাদের হাতে না থাকে, বাধা দেওয়ার কথা ওঠে না।'

মামীশাশুড়ী নমিতার ওই দৃঢ় ঘোষণার পর থেকে সমগ্র সংসারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, আর তাঁর ভিতরটা ডুকরে ডুকরে উঠছিল, এই সমস্ত কাজ তাঁর ঘাড়েই পড়তে বসলো ! নমিতা চলে যাবে মানেই তাঁকেই বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে ভোর পাঁচটার সময়, উঠেই গরম জল বসাতে হবে বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ ধোবার জন্যে। হ্যাঁ, হাত-মুখ ধোওয়ার জলও গরম না করে উপায় নেই এ সময়টা, কারণ কালটা শীতকাল। কেমন বুঝে বুঝে মোক্ষম সময়টিতে চালটি চাললো ! কিছুদিন থেকেই বেশ বে-ভাব দেখা যাচ্ছিল, যেন এই সংসারে কাজ করে সেবা-যত্ন করে তেমন কৃতার্থমন্য ভাব আর নেই, যেন না করলেই নয় তাই ! তবু করছিল, সেইগুলি তাঁর ওপর এসে পড়লো, অথচ তাঁর শরীর ভাল নয়—বিশেষ করে শীতকালে মোটেই ভাল থাকে না, বেলা আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠলে

নয় না। ওই বেড্-টী-টুকু গলায় ঢেলে তবেই একটু বল পান। আর এরপর? সেই বেড্-টী তাঁকেই বানাতে হবে, আর সবাইয়ের মুখে মুখে ধরতে হবে। হতে পারে যাদের হাতগুলি মশারির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে গরম পেয়ালাটি ধরতে, তারা তাঁরই স্বামী-পুত্র-কন্যা, কিন্তু শরীরের কাছে তো কিছু না।

কিন্তু শুধুই তো ওইখানেই কর্তব্য শেষ নয়, তারপর জলখাবার বানাতে হবে, তারপর আবার চা বানাতে হবে, সাজিয়ে সাজিয়ে টেবিলে ধরতে হবে, তারপর কুটনো, তারপর রান্না, তারপর পরিবেশন, তারপর দেখতে বসা কার কী দরকার। কার ঠিক স্কুলে যাবার সময়ই জামার বোতাম ছিঁড়ে গেল, কার বইয়ের ব্যাগের স্ট্র্যাপ জবাব দিল, কার প্যান্ট ময়লা, কার গেঞ্জি শুকোয়নি, আরো কত কী!... সেই কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের পর চান করে এসে আবার শাশুড়ীর নিরামিষ দিকের রান্নাবান্না। বুড়ী গরমকালে যদিও বা এক আধদিন নিজে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারেন, শীতকালে কদাপি না। অথচ এই সময়ই যতো খাবার ঘটা—কপি, মটরশুঁটি, নতুন আলু, পালংশাক, মুলো, বেগুন—আনাজের সমারোহ। বুড়ীর হাতে-পায়ে শক্তি নেই, হজমশক্তিটি বেশ আছে। নিরামিষ ঘরে রোজই ঘটা চলে। তাছাড়া আবার কর্তারও প্রখর দৃষ্টি আর সম্যক যত্ন হচ্ছে কিনা।

অতএব শাশুড়ীর রাজভোগটি সাজিয়ে দিয়ে আবার পড়তে হবে বিকেলের জলখাবার নিয়ে। নিত্যনতুন-খাবার-দাবার করে করে নমিতা দেবী তো মুখগুলি আর মেজাজগুলি লম্বা করে দিয়েছেন। করবেন না কেন, পরের পয়সা, পরের ভাঁড়ার,—দরাজ হাতে খরচ করে করে সবাইয়ের সুয়ো হওয়া! এখন তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ার তাল। সাদামাটা জলখাবার, রুটি-মাখন কি লুচি পরোটা আর রুচবে ছেলেমেয়েদের? কে সামলাবে সেই হ্যাঁপা?

শুধুই কি জলখাবার? রাতে?

একখানি একখানি করে গরম রুটি সেঁকে পাতে দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে? না-পারলেই বাবু-বিবিদের রুচবে না হয়তো। নমিতা করতো ওসব। তবুও তো তম্বি-গম্বির কামাই ছিল না। এসব বদ অভ্যেস নমিতাই করিয়েছে। তার মানে নীরবে নিঃশব্দে মামাশ্বশুরের ভাঁড়ার ফর্সা করেছে, আর মামীশাশুড়ীর ভবিষ্যৎ ফর্সা করেছে! এসব পরিকল্পিত শত্রুতা ছাড়া আর কি?

নমিতাকে দেখে তাই বিষ উঠছে তাঁর।

আর হঠাৎ কেমন ভয়-ভাঙা হয়ে বসে আছে দেখো! বসে আছে শোবার ঘরের ভেতর, তাড়াহুড়ো করে বিকেলের জলখাবারের দিকে এগিয়ে আসছে না!

কেন? কিসের জন্যে?

অসময়ে যে আশ্রয় দেয়, তার বুঝি আশ্রিতের ওপর কোনো জোর থাকে না? যাক দিকি, কেমন যায়?

স্বামীর ওই গা-ছাড়া কথায় তাই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন ভদ্রমহিলা, রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন, 'কেন? বাধা দেওয়ার কথা ওঠে না কেন? হঠাৎ 'যাবো' বললেই যাওয়া হবে? হোটেলে বাস করছিস নাকি? তাই এক কথায় 'আমার এখানে পোষাচ্ছে না' বলে চলে যাবো? তুমি বলে দাও, এ সময় তোমার যাওয়া হতে পারে না।'

অনিলবাবু মৃদু মানুষ, মৃদু গলাতেই বলেন, 'অকারণ মাথা গরম কোরো না মৃণাল, বাধা দেবার আমি কে?'

'তুমি কেউ না?'

'জোর করবার উপযুক্ত কেউ না।'

'ওঃ! তাহলে এতদিন এতকাল গলায় বেঁধে বইলে কেন শুনি?' মৃণাল চিৎকার করে বলেন, 'কেউ যদি নও তুমি, তবে এযাবৎ ভাত-কাপড় দিয়ে পুষলে কেন? আনতে গিয়েছিলে কেন?'

'চেঁচামেচি করে লাভ কী মৃণাল, ওই কেন-গুলোর উত্তর যদি নিজেও ভালোই জানো। নীপু রীতা খোকা বীরা সবাই তখন ছোট, তোমারও শরীর খারাপ, মা পড়লেন অসুখে, সে-সময় বিজুর সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়া, আমাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদের মতই লাগেনি কি?'

মৃণালিনী চাপা তীব্র গলায় বলেন, 'ওঃ! তার মানে উপকার শুধু আমাদেরই হয়েছিল, ওর কিছু না?'

'তা কেন! উপকার পরস্পরেরই হয়েছিল, কিন্তু উনি যদি এখন এই জীবনে ক্লান্ত হয়ে ওঠেন, বলার কী আছে বল?'

'চমৎকার! কিছুই নেই? বয়সের মেয়ে, তেজ করে একা চলে গিয়ে কোথায় থাকবে, কী করবে, সেটা দেখবার দায়িত্ব নেই তোমার? তুমি ওর একটা গুরুজন নয়?'

অনিলবাবু মৃদু হেসে বলেন, 'গুরুজনের ততোক্ষণই গুরুদায়িত্ব মৃণাল, লঘুজন যতোক্ষণ গুরু-লঘু জ্ঞানটুকু রাখে। তারা যদি সে জ্ঞানটার উপদেশ মানতে না চায়, তখন আর কোন্ দায়িত্ব? নাবালিকা তো নয়?'

'আমার মনে হচ্ছে ভিজে-বেড়ালের খোলসের মধ্যে থেকে তলে তলে কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম চালিয়ে—'

'আঃ মৃণাল থামো!'

'বেশ থামছি! তবে এটা জেনো, আমাকে থামিয়ে দিলেও পাড়ার লোককে থামাতে পারবে না।'

'এর সঙ্গে পাড়ার লোকের সম্পর্ক কী?'

'আছে বৈকি সম্পর্ক। পাড়ার লোকের সঙ্গে সব কিছুরই সম্পর্ক থাকে। তারা ভাবতে বসবে না, হঠাৎ এমন চলে যাওয়া, ভেতরে নিশ্চয় কিছু ব্যাপার আছে!'

'ভাবতে বসলে নাচার!'

'তোমার আর কি! "নাচার" বললেই হয়ে গেল! দুষলে লোকে আমাকেই দুষবে। বলবে, মামীশাশুড়ী মাগী দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়েছে!'

'বললে গায়ে ফোস্কা পড়ে না।'

'যাদের গায়ে কচ্ছপের খোলস, তাদের পড়ে না, মানুষের চামড়া থাকলে পড়ে।'

'তাহলে ফোস্কার জ্বালা সইতেই হবে।'

'হবে! তবু তুমি ওকে বারণ করবে না? একটা সৎ-পরামর্শও দেবে না?'

'ঠিক আছে, দেব।' বলেছিলেন অনিলবাবু। এবং নমিতাকে ডেকে বলেছিলেনও, 'আমি বলছিলাম বৌমা, ফট্ করে চলে না গিয়ে, বরং বিজুকে একটা চিঠি লিখে বিস্তারিত জানিয়ে—'

'বিস্তারিত লেখবার তো কিছু নেই মামাবাবু।'

'না, মানে এই তুমি যে আর এখানে থাকতে ইচ্ছুক নও, সেটা জানতে পারলে —হয়তো—'

'কিছুই করবে না!' নমিতা কষ্টে চোখের জল চেপে বলে, 'করবার ইচ্ছে থাকলে চিঠি পর্যন্ত লিখতে বারণ করতেন না।'

অনিলবাবু মাথা নীচু করেই বলেছিলেন, 'তা বটে। কিন্তু তোমার এখানে

তাঁ কী অসুবিধে হচ্ছে, সেটা যদি একটু বলতে, চেষ্টা করে দেখতাম, তার কিছু প্রতিকার—'

এসময় নমিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

নমিতাও মাথা নীচু করে বলেছিল, 'অসুবিধে কিছু নেই মামাবাবু, এখানে যে সুবিধেয় ছিলাম, তা নিজের বাড়িতেও থাকিনি কোনোদিন। কিন্তু—,' একটু থেমে বলেছিল, 'আসলে এখন শুধু এই প্রশ্নটাই স্থির হতে দিচ্ছে না, এই জীবনটার কোনো অর্থ আছে কিনা!'

মামাশ্বশুরের সঙ্গে 'না-হ্যাঁ' ছাড়া কোনো কথা কখনো বলেনি নমিতা, তাই বলে ফেলে যেন থরথর করছিল, তবু বলেছিল।

অনিলবাবু একটু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, 'সে প্রশ্ন করতে বসলে, আমাদের কারো জীবনেরই কি কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে বৌমা? কিন্তু থাক্ আমি তোমায় বাধা দেব না, দ্যাখো যদি অপর কোথাও শান্তি পাও।'

অনিলের মা বেজার গলায় বলেছিলেন, 'নাতবৌ তোর সঙ্গে অতো কি কথা কইছিল রে?'

'অতো আর কি! এই যাওয়ার কথা!'

'নিলো তোর পরামর্শ? কু-মতলব ছাড়লো?'

'আমি তো কোনো পরামর্শ দিতে যাইনি মা, আমরা যে তাঁকে যেতে বাধা দেব না, সেই কথাটাই জানিয়ে দিলাম।'

'বা বা! ভ্যালারে মোর বুদ্ধিমন্ত ছেলে! এই অসময়ে দেশে লোকজনের আকাল, অমন একটা করিৎকর্মা মেয়েকে এক কথায় ছেড়ে দেয় মানুষে?'

'আমরা ওঁকে ঝি রাখিনি মা!' বলে চলে এসেছিলেন অনিলবাবু।

আর তখনই হঠাৎ ওঁর মনে হয়েছিল, কেন নমিতা তার জীবনের অর্থ খুঁজে পাচ্ছে না।

বাড়ির প্রতিটি ছেলে মেয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-রাগ করে করে নমিতাকে বিঁধেছিল, আর তাতেই হয়তো নমিতার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধা আসছিল, সেটুকু মুছে যাচ্ছিল।

শুধু নীপু বলেছিল, 'যাক, বৌদি তাহলে সত্যিই চলে যাবে? আমাদের স্রেফ মৃণালিনী দেবীর হাতে ফেলে দিয়ে?'

তখনই চোখে জল এসেছিল নমিতার। তবু চলে গিয়েছিল নমিতা।

কে জানে জীবনের কোন্ অর্থ খুঁজে পেতে!

অথচ কতো নিশ্চিন্তেই থাকতে পেতো নমিতা, যদি সে জীবনের মানে খুঁজতে না বেরোতো।

জলপাইগুড়ি শহরে অনিলবাবুর যথেষ্ট মান-সম্মান আছে, সেই বাড়িরই একজন হয়েই তো ছিল নমিতা! কোথাও কারো বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে অনিল-বাবুর স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হয়েই তো যেতে পেতো, দৃষ্টিকটু হবার ভয়ে নিজের বা মেয়ের শাড়ি-গহনা দিয়েই সাজিয়ে নিয়ে যেতেন তাকে মামী-শাশুড়ী। আর পাঁচজনের কাছে, 'ওটি আমাদের একটি বৌমা' বলে পরিচয়ও দিতেন।

এইখানেই কি অনেকটা দাম পাওয়া গেল না? অনেকটা মান?

তাছাড়া নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নমিতার খাওয়াদাওয়ারও তারতম্য করেননি কোনোদিন ভদ্রমহিলা, যদি কিছু তারতম্য ঘটে থাকে তো সে নমিতা নিজেই ঘটিয়েছে। পোড়াটা, কাঁচাটা, ভাঙাটা সে নিজের ভাগেই রেখেছে বরাবর।

তা সে যাক, অন্যদিকে তাকিয়ে দেখো, 'নিরাশ্রয় হয়ে যাওয়া' নমিতা কতোবড়ো নির্ভরতার একটি আশ্রয় পেয়েছিল. চিরদিনই বজায় থাকতো এ আশ্রয়। তাছাড়া এ বাড়িতে কেউ কোনদিন 'দূর ছাই' করেছে তাকে. বলুক দিকি কেউ ?

সকলের উপর কথা. কেউ কোনদিন নমিতার কর্তৃত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে ? বড়োজোর অনিলবাবুর মা কোনোদিন বলেছেন. 'রোজদিনই ঘটার রান্নাবান্না! পরের পয়সায় হাতধান্য! একটু বিবেচনা করে কাজ করতে হয় নাতবৌ !'

কোনদিন হয়তো অনিলবাবুর স্ত্রী বলেছেন, 'এই নমিতাই আমাদের পরকাল খেলো! এরপর আর রাঁধুনীর রান্না কারুর মুখে রুচবেই না! অবিশ্যি রাঁধুনীকে তো আমার হাততোলায় থেকে কাজ করতে হয়, নিজের হাতের বাহাদুরি দেখাবার স্কোপ্‌ও পায় না।'

নমিতা সে 'স্কোপ্' পায়। অতএব নমিতা পারে ভাল রান্না রেঁধে হাতের মহিমা দেখাতে। অর্থাৎ নমিতা রান্নাঘর ভাঁড়াঘরের সর্বময়ী কর্ত্রী! যদিও আপন স্বভাবের নম্রতায় সে দুবেলাই জিজ্ঞেস করতো. 'মামীমা. বলুন কী রান্না হবে ?'

কিন্তু মামীমা সে-ভার নিতেন না, উদার মহিমায় বলে দিতেন, 'তোমার যা ইচ্ছে করো বাছা, কী রান্না হবে ভাবতে গেলেই আমার গায়ে জ্বর আসে।"

তবে ?

এই অখণ্ড অধিকারের মর্যাদার মধ্যেও জীবনের মানে খুঁজে পেল না নমিতা ? আর সেই খুঁজে না পাওয়ার খানিকটা ভার আবার চাপিয়ে গেল অনামিকার মাথায়!

অনামিকাই কি পাচ্ছেন সে মানে ? মানে—তাঁর নিজের জীবনের মানে?

অতীতের স্মৃতি হাতড়ালে তো জীবন বলতে একটা ভাঙাচোরা অসমান. রং-জৌলুসহীন বস্তুই চোখে পড়ে. তাই বর্তমানের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাছে যখন 'সাক্ষাৎকারীরা' এসে 'সাক্ষাৎকারটা' লিপিবদ্ধ করতে চায়, তখন অতীতের স্মৃতি-কথা বলতে গিয়ে কোথাও কোনো সম্পদ সম্বল খুঁজে পান না অনামিকা।

অথচ অন্য সকলেরই আছে কিছু-না-কিছু। মানে কবি-সাহিত্যিকদের. লেখক-লেখিকাদের। তাঁরা ওদের প্রশ্নে তাই 'স্মৃতিচারণে'র মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যান. অথবা স্মৃতিকথার খাতার সিঁড়ি ধরে নেমে যান অনেক গভীরে। যেখানে হাত ডোবালেই মুঠোয় উঠে আসে মুঠোভর্তি মণিমুক্তো।

সেই টলটলে নিটোল মুক্তোগুলি দিয়ে গাঁথা যায় 'স্মৃতিকথার মালা'।

অনামিকার গোপন ভাঁড়ারে মণিমুক্তার বালাই নেই।

তাই কোনো কোনো পত্রিকার 'বিশেষ ফিচারের তালিকা'য় যখন অনামিকা দেবীর পালা আসে, তখন প্রশ্নের উত্তর দিতে রীতিমতো বিপদেই পড়ে যান অনামিকা।

হেসে বলেন, 'আমার মতন জীবন তো বাংলা দেশের হাজার হাজার মেয়ের। তার মধ্যে কেউ সংসার করে, কেউ চাকরি করে, কেউ গান গায়, আমি গল্প লিখি এই পর্যন্ত. এ ছাড়া তো কই বাড়িতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

ওরা বলে. 'আপনার বড়ো বেশী বিনয়। লেখা মানেই তো তার অন্তরালে অনেক কিছু। কোথা থেকে পেলেন প্রেরণা, উদ্বুদ্ধ হলেন কোন্ যন্ত্রণায় ? কার কার প্রভাব পড়েছে আপনার ওপর— ?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর দিতে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়।

এসব কি বলার কথা ? না বলার মতো কথা? তবু বাকিয়ে মারে।

এই তো সেদিন একটা রোগা রোগা নিরীহ চেহারার ছেলে কোন্ এক পত্রিকার তরফ থেকে এসে প্রায় হিমসিম খাইয়ে দিয়েছিল অনামিকা দেবীকে।

বায়না অবশ্য সেই একই, ভাষাও তাই, 'আমাদের কাগজে তাবৎ সাহিত্যিকের স্মৃতিকথা ছাপা হয়ে গিয়েছে, অথচ আপনারটা এখনো পাইনি—'

এটা যে ছেঁদো কথা তা বুঝতে দেরি হয় না কারোরই। অনামিকার মুখে আসছিল 'পাওনি না নাওনি'। কিন্তু মুখে আসা কথাকে মুখের মধ্যে আটকে ফেলতে না পারলে আর সভ্যতা কিসের?

তাই শুধু বললেন, 'ও!'

ছেলেটি উদাত্ত গলায় বললো, 'ঠিকানাটা জানা ছিল না কিনা। উঃ, আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে কি কম বেগ পেয়েছি! বহু কষ্টে—'

এবারও অনামিকা বলতে পারতেন, আশ্চর্য তো! অথচ বাজারে কম করেও আমার শ'খানেক বই চালু আছে, অতএব তাদের প্রকাশকও আছে, এবং প্রকাশকের ঘরে অবশ্যই আমার ঠিকানা আছে। তাছাড়া বাজার-প্রচলিত বহু পত্রিকাতেই আমার কলমের আনাগোনা আছে। সেখানেও একটু খোঁজ করলেই ঠিকানাটা হাতে এসে যেতো। বেশী খাটতেও হতো না, যেহেতু "টেলিফোন" নামক একটা যন্ত্র মানুষের অনেক খাটুনি বাঁচাবার জন্যে সদাপ্রস্তুত।

কিন্তু বলে লাভ কি?

বেচারী সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা জুৎসই কৈফিয়ত খাড়া করে আবেগের মাথায় কথা বলতে এসেছে, ওই আবেগের ওপর বরফজল ঢেলে দিয়ে কি হবে!

তার থেকে খুব আক্ষেপের সুরে বলা ভালো, 'ইস, তাই তো! তাহলে তো খুব কষ্ট হয়েছে তোমার!'

এবার ওপক্ষের ভদ্রতার পালা, 'না না, কষ্ট আর কী! শেষ পর্যন্ত যখন দেখা হলোই, তখন আবার কষ্টের কথা ওঠে না। এখন বলুন কোন্ সংখ্যা থেকে শুরু করবেন? সামনের সংখ্যা থেকেই? বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছি—'

'আরে আরে, কী মুশকিল! কথাটাই শুনি ভাল করে।'

'বাঃ, বললাম তো আমাদের "জ্যোতির্ময় স্বদেশ"-এর "স্মৃতিচারণ" সিরিজে—'

'ওটা একটা সিরিজ বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই তো! দেখেননি? এ তো প্রায় দু'আড়াই বছর ধরে চলছে। দেশের যতো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের একধার থেকে—মানে একটির পর একটিকে ধরে ধরে—'

কথাটা ঠিকভাবে শেষ করতে না পেরেই বোধ হয় ছেলেটি হঠাৎ চুপ করে গেল।

অনামিকার মনে হলো ও বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল 'এক ধার থেকে কোতল করেছি, অথবা একটির পর একটিকে ধরে ধরে হাড়িকাঠে ফেলেছি আর কোপ দিয়েছি'। বললো না শুধু সে ভদ্রতার দায়ে। যে দায়ে মুখের আগায় এসে যাওয়া কথাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আটকে ফেলতে হয়।

তবু অসমাপ্ত কথারই উত্তর দেন অনামিকা, 'যতো শ্রেষ্ঠদের? কিন্তু তার মধ্যে আমাকে কেন?'

'এ কী বলছেন! আপনাকে না হলে তো সিরিজ সম্পূর্ণ হয় না! নবীন প্রবীণ মিলিয়ে প্রায় আশিজনের স্মৃতিচারণ হয়ে গেছে—'

হঠাৎ ওর স্মৃতিচারণ শব্দটা গোচারণের মতো লাগলো অনামিকার। হয়তো ওই 'আশি' শব্দটার প্রতিক্রিয়াতেই।

—অনামিকার পুলকিত হবারই কথা।

বাংলা দেশে যে এতোগুলি 'শ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিক আছেন এ খবরটি পুলকেরই বৈকি। তবে বোঝা গেল না হলেন কিনা পুলকিত। বরং যেন বিপন্নভাবেই বললেন 'তবে আর কি, হয়েই তো গেছে অনেক—'

'তা বললে তো চলবে না, আপনারটা চাই।'

'কিন্তু আমি তো মোটেই নিজেকে আপনাদের ওই শ্রেষ্ঠ-টেষ্ঠ ভাবি না—'

'আপনি না ভাবুন, দেশ ভাবে।' ছেলেটির কণ্ঠ উদ্দীপ্ত, 'আর দেশ জানতে চায় কেমন করে বিকশিত হলো এই প্রতিভা। শৈশব বাল্য যৌবন সব কিছুর মধ্য দিয়ে কী ভাবে—'

'কিন্তু আমি তো কিছুই দেখতে পাই না—,' অনামিকার গলায় হতাশা, 'রেল-গাড়িতে চড়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফেলে-আসা-পথটা দেখলে যেমন এক জোড়া রেললাইন ছাড়া আর কিছুই বিশেষ চোখে পড়ে না, আমারও প্রায় তাই। একটা বাঁধা লাইনের ওপর দিয়ে চলে আসা। একদা জন্মেছি, একদিন না একদিন মরবেই নিশ্চিত, এই দুটো জংশন স্টেশনের মাঝখানেই ওই পথটি। মাঝখানের স্টেশনে স্টেশনে কখনো কখনো থেমেছি, জিরোচ্ছি, কখনো ছুটছি।'

'আপনাদের সঙ্গে কথায় কে পারবে? কথাতেই তো মাত করছেন। কিন্তু আমি ওসব কথায় ভুলছি না। আমি এডিটরকে কথা দিয়ে এসেছি—বিজ্ঞাপন দিন আপনি, আমি ওঁর সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলছি।'

'তুমি তো আমার ঠিকানাই জানতে না, প্রত্যক্ষ দেখোওনি কখনো, এরকম কথা দিলে যে?'

ছেলেটি একটি অলৌকিক হাসি হাসলো। তারপর বললো, 'নিজের ওপর আস্থা থাকা দরকার। যাক, কবে দিচ্ছেন বলুন?'

'কবে কি? আদৌ তো দিচ্ছি না।'

'সে বললে ছাড়ছে কে? গোড়ায় অমন সব ইয়ে—মানে সকলেই ঠিক এই কথাই বলেন, "আমার স্মৃতির মধ্যে আর লেখবার মতো কি আছে? সাধারণ ঘরের ছেলে" ইত্যাদি প্রভৃতি যতো ধানাইপানাই আর কি! তারপর? দেখছেন তো এক-একখানি? সকলের মধ্যেই কোনো একদিন-না-একদিন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ঘটেছে, তারই ইতিহাস—'

'আমার বাপু ওসব কিছুই ঘটেনি-টটেনি।'

'তাই কি হয়? ও তো হতেই হবে। আপনার বিনয় খুব বেশি তাই চাপছেন। কিন্তু আমাদের আপনি হঠাতে পারবেন না। লেখাটা ধরে ফেলুন।'

'কী মুশকিল! সত্যিই বলছি, লেখবার মতো কিছুই নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরের মেয়ে, সাত-আটটি ভাইবোনের মধ্যে একজন, খেতে-পরতে পেয়েছি, যেখানে জন্মেছে সেখানেই আছি, আশা করছি সেখানেই মরবো, ব্যস এই তো। এর মধ্যে লেখবার কী আছে?'

'বাঃ, হয়ে গেল ব্যস? মাঝখানের এই বিপুল সাহিত্য-কৃতি?'

'দেখো সেটাও একটা কী বলবো ঘটনাচক্র মাত্র। একদা শখ হলো, লিখবো! লিখলাম, ছাপা হলো। আর তখন দিনকাল ভালো ছিলো, মেয়েদের লেখা-টেখা সম্পাদকরা ক্ষমাঘেন্না করে ছাপতেনও, আবার চাইতেনও। সেই চাওয়ার সূত্রেই আবার নবীন উৎসাহে লেখা, আবার হয়ে গেলো ছাপা, আবার—মানে আর কি, যা বললাম, ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি থেকেই তোমাদের গিয়ে ওই 'বিপুল কৃতি' না কি বললে—সেটাই ঘটে গেছে।'

'তার মানে বলতে চান কোনো প্রেরণা না পেয়েই আপনি—'

'বলতে চাই কি, বলছিই তো। পাঠক-পাঠিকা এবং সম্পাদক আর প্রকাশক, এ'রাই মিলেমিশে আমাকে লেখিকা করে তুলেছেন। এছাড়া আর তো কই—'

'ঠিক আছে, ওটা যখন আপনি এড়িয়ে যেতেই চাইছেন, তখন আপনার জীবনের বিশেষ বিশেষ কিছু স্মৃতির কথাই লিখুন। জীবন-সংগ্রামের কঠিন অভিজ্ঞতা, অথবা—'

'কিন্তু গোড়াতেই যে বললাম "বিশেষ" বলে কিছুই নেই। জীবন-সংগ্রামই বা কোথা? জীবনে কোনদিন পাইস-হোটেলে খাইনি, কোনদিন গামছা ফেরি করে বেড়াইনি, কোনোদিন বাড়িওয়ালার তাড়নায় ফুটপাথে এসে দাঁড়াইনি. রাজনীতি করিনি, জেলে যাইনি, এমন কি গ্রামবাংলার অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যের মধ্যে হুটোপাটি করে বেড়াবার সুযোগও ঘটেনি। শহর কলকাতার চার দেওয়ালের মধ্যে জীবন কাটছে, বিশেষ স্মৃতি কোথায়?'

ছেলেটা তবুও দমে না। বলে ওঠে, 'নেই, সৃষ্টি করুন। কলমের যাদুতে কী না হয়!'

'বানিয়ে বানিয়ে লিখবো?' হেসে ফেলেন অনামিকা।

ছেলেটা হাসে না বরং মুখটা গোমড়াই করে বলে, 'বানিয়ে কেন, আপন অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে। তুচ্ছ ঘটনাকেই সেই রঙিন আলোয় আলোকিত করে —মানে সবাই যে-কর্মটি করেছেন!' ছেলেটা হঠাৎ মুখটা একটু বাঁকায়, 'রাংকে সোনা বললেই সোনা! যে যা লিখেছেন, তার কতটুকু সত্যি আর কতটুকু কথার খেলা, সে তো আর আমাদের জানতে বাকি নেই—'

অনামিকা হঠাৎ একটু শক্ত গলায় বলে ওঠেন, 'তাই যখন নেই, তবে আর ওতে দরকার কি?'

'বাঃ, আমি কি বলছি সকলেই বানিয়ে লিখছেন? বলছি—আপনাদের কলমের গুণে সাধারণ ঘটনাও অসাধারণ হয়ে ওঠে, সাধারণ জীবনও সাধারণোত্তর মনে হয়।'

'আমার লেখার মধ্যে তেমন গুণ থাকবে এ বিশ্বাস আমার নেই বাপু! অনুভূতির রঙে রাঙানো-টাঙানো—নাঃ, ও আমার দ্বারা হবে না।'

'তার মানে দেবেন না, তাই বলুন?'

'দেব না বলছি না তো, বলছি পেরে উঠবো না।'

'তার মানেই তাই। কিন্তু আমাকে আপনি ফেরাতে পারবেন না। আমার তাহলে মুখ থাকবে না। যাহোক কিছু না নিয়ে ছাড়বো না। আপনার শ্রেষ্ঠ বইগুলির নায়ক-নায়িকার চরিত্র কাকে দেখে লেখা সেটাই অন্ততঃ লিখুন, ওই 'আত্মকথা'র সিরিজে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

বলার মধ্যে বেশ একটু আত্মস্থ ভাব ফুটে ওঠে ওর।

অনামিকা আবার হেসে ফেলেন, 'কিন্তু কাউকে দেখে লিখেছি, এটাই বা বললো কে?'

ছেলেটি তর্কের সুরে বলে, 'না দেখলে লেখা যায়?'

'কী আশ্চর্য! গল্প-উপন্যাস মানেই তো কাল্পনিক।'

'ওটা বাজে কথা। সমস্ত ভালো ভালো লেখকদের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলিই লোককে দেখে লেখা। শরৎচন্দ্র বিভূতিভূষণ তারাশঙ্কর বনফুল, দেখুন এ'দের আপনি যদি বলেন, কিছু না দেখে লিখেছেন—'

ওকে দেখে মনে হলো যেন অনামিকা ওকে ঠকাতে চেষ্টা করছেন। অনামিকা

হাসলেন।

'কথাটা ঠিক তা নয়।' বললেন অনামিকা, 'দেখতে তো হবেই। দেখার জগৎ থেকেই লেখার জগৎ। আমি শুধু এই কথাই বলছি—আমি অন্ততঃ কোনো বিশেষ একজনকে দেখে, ঠিক তাকে এঁকে ফেলতে পারি না। অথবা সেটা আমার হাতে আসেই না। অনেককে দেখে দেখে একজনকে আঁকি, অনেকের "কথা" আহরণ করে একজনের মুখে কথা ফোটাই, আমার পদ্ধতি এই। তাই হয়তো অনেকেই ভেবে বসে, "আমায় নিয়ে লেখা"। তোমরাও খুঁজতে বসো—"দেখি কাকে নিয়ে লেখা"। অনামিকা একটু থামেন, তারপর বলেন, 'জানি না কোনো একজন মানুষকে যথাযথ রেখে গল্প লেখা যায় কিনা? শ্রীকান্ত কি যথাযথ? কিন্তু সে যাক, অন্যের কথা আমি বলতে পারবো না, আমার কথাই আমি বলছি—আমি সবাইকে নিয়েই লিখি, অথবা কাউকে নিয়েই লিখি না।'

ছেলেটা উত্তেজিত হয়।

ছেলেটা টেবিলে একটা ঘুঁষি মেরে বলে, 'তবে কি আপনি বলতে চান ওই যে আপনার কী যেন বইটা—হ্যাঁ, 'একাকী' বইটার নায়িকার মধ্যে আপনার নিজের জীবনের ছাপ আদৌ পড়েনি?'

অনামিকা ঈষৎ চমকান, অবাক গলায় বলেন, 'একাকী? ও বইটার নায়িকা তো একজন গায়িকা!'

'তাতে কি? আপনি না হয় একজন লেখিকা! ওটুকু তো চাপা দেবেনই। তা ছাড়া সব মিলছে, সেখানেও নায়িকা আনম্যারেড্, এখানেও আপনি—'

অনামিকা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। মৃদু হেসে বলেন,, 'তবে আর ভাবনা কি? আত্মজীবনী তো লিখেই ফেলেছি। ইচ্ছে হলে ওটাই তোমাদের কাগজে ছাপিয়ে দিতে পার।'

'ওটাই? মানে ওই ছাপা বইটা?'

'তাছাড়া আর উপায় কি? একটা লোকের তো একটাই জীবন। অতএব আত্মজীবনীও দু'দশটা হতে পারে না।'

'এটা আপনি রাগ করে বলছেন।' নাছোড়বান্দা ছেলেটি ধৈর্যের সঙ্গে বলে, 'হতে পারে আপনার অজ্ঞাতসারেই ওই ছাপটা এসে পড়েছে। লেখকদের এমন হয়—'

'হয় এমন? বলছো?'

অনামিকা যেন কাঠগড়া থেকে নামার ভঙ্গীতে হাঁফ ফেলে বলেন, 'তাহলে তো বাঁচাই গেল!'

'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

'আরে ঠাট্টা করবো কেন? স্বস্তি পেলাম, তাই। কিন্তু আর তো বসতে পারছি না, একটু কাজ আছে।'

কিন্তু ওই ইঙ্গিতটুকুতেই কি কাজ হয়?

পাগল!

শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি না নিয়ে ছাড়বে নাকি সেই সম্পাদক প্রেরিত ছেলেটি?

শেষ পর্যন্ত রফা—'কেন স্মৃতিকথা লিখলাম না—'

লিখতে হয়েছিল সেটা অনামিকা দেবীকে। 'জ্যোতির্ময় স্বদেশ'-এর সেই স্মৃতিচারণ সিরিজেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল তারা লেখাটা।

কিন্তু লেখাটা কি খুব সহজ হয়েছিল অনামিকার কাছে? কেন লিখলাম না?

আশীজন নবীন এবং প্রবীণ লেখক-লেখিকা যা করলেন, তা আমি কেন

করলাম না, এটা লেখা খুব সোজা নয়।

কিন্তু অনামিকা কোন্ স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দেবেন? কোন্ স্মৃতির সৌরভে ঘ্রাণ নেবেন?

অনামিকা কি তাঁর সেই ঘষা পয়সার মতো শৈশবটাকে তুলে ধরে বলবেন, "দেখো দেখো—কী অকিঞ্চিৎকর! এইজন্যেই লিখলাম না!"

তা হয় না। তাই 'কেন লিখলাম না' বলতে অনেকটাই লিখতে হয়।

অথচ সত্যিই বা কেন লিখলেন না?

লেখা কি যেতো না? বকুলের জীবনটাকেই কি গুছিয়েগাছিয়ে তুলে ধরা যেতো না?

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মতো সহসা প্রবল একটা কিছু ঘটে না যাক, কোথাও কি পাথরের ফাটল বেয়ে ঝর্ণার জল এসে আছড়ে পড়েনি?

পড়েছে বৈকি। উঠেছে তার কলধ্বনি।

হয়তো ওই থেকেই দিব্যি একখানা 'স্মৃতিচারণ' হতে পারতো।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে ভারী কুণ্ঠা অনামিকার। নিজের সম্পর্কে মূল্যবোধের বড়ই অভাব। একেবারে অন্তরের অন্তস্থলে সেই 'বকুল' নামের তুচ্ছ মেয়েটাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পান না।

নিন্দা-খ্যাতি প্রশংসা-অপ্রশংসার মালায় মোড়া অনামিকা দেবী সেই বকুলটাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন মাত্র। আবৃত করে রেখেছেন তার তুচ্ছতাকে।

তাই অনুরোধ উপরোধের ছায়া দেখলেই ঠেকাতে বসেন।

কিন্তু কেন এই অনুরোধ-উপরোধ?

কেন ওই আশীজনের পর আরও আশীজনের জন্যে ছুটোছুটি?

কোথাও কোনোখানে কি শ্রদ্ধা আছে? আছে আগ্রহ-ভালবাসা সমীহ?

যদি থাকে, তবে কেনই বা বার বার মনে হয়, ওই সিরিজ আর ফিচার, সাক্ষাৎকার আর সমাচার, স্বাক্ষরসংগ্রহ আর অভিমত—কী মূল্য এসবের? ব্যবসায়িক মূল্য ছাড়া?

এযুগে কোথায় সেই প্রতিভার প্রতি মোহ? জ্যেষ্ঠজনের প্রতি শ্রদ্ধা? পণ্ডিতজনের কথার প্রতি আস্থা?

এ যুগ আত্মপ্রেমী।

ওই যে রোগা-রোগা কালো-কালো ছেলেটা, যে নাকি নাছোড়বান্দার ভূমিকা নিয়ে এতোক্ষণ বকিয়ে গেল, সে কি সত্যিই এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনামিকা দেবী নামের লেখিকাটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল? তাঁর বক্তব্যের মধ্যেকার সুরটি শুনতে চেয়েছিল? অন্তত তাকিয়েছিল কৌতূহলের দৃষ্টিতে?

পাগল না ক্ষ্যাপা!

যা করতে এসেছি তা করে ছাড়বো, এ ছাড়া আর কোন মনোভাবই ছিল না ওর। আর ওদের ওই 'জ্যোতির্ময় স্বদেশ'-এর পৃষ্ঠায় যাদের নাম সাজিয়ে রেখেছে আর রাখতে চাইছে, তাদেরই যে ধন্য করেছে, এমন একটি আত্মসন্তুষ্টি ছিল ওর মধ্যে। ছিল, আছে, থাকবে।

বিশেষ করে মহিলা লেখিকাদের ব্যাপারে 'জাতে তুলছি' ভাবটি বিদ্যমান থাকে বৈকি।

না থাকবেই বা কেন, যুগযুগান্তরের সংস্কার কি যাবার?

ছেলেটা চলে যাবার পর অনামিকা টেবিলের ধারে এসে বসলেন। বেশ

কিছুদিন থেকে একটা উপন্যাসের প্লট মনের মধ্যে আনাগোনা করছে, তার গোড়া বাঁধা স্বরূপে সেদিন পাতা-দুই লিখে রেখেছিলেন, সেটাই উল্টে দেখতে ইচ্ছে হলো। আজ মনে হচ্ছে কোথাও যাবার নেই, লেখাটা খানিকটা এগিয়ে ফেলা যেতে পারে।

খাতাটা টেনে নিয়ে চোখ বুলোলেন...—'যে জীবনের কোথাও কোনো প্রত্যাশা নেই, নেই কোনো আলো, আশা, রং, সে জীবনটাকেও বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কেন এই আপ্রাণ প্রয়াস? পৃথিবীতে আরো কিছুদিন টিকে থাকার জন্যে কেন এই ঝুলো-ঝুলি!...ডাক্তার চলে যাবার পর বিছানার ধারের জানলা দিয়ে পড়ন্ত বিকেলের আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় শিবেশ্বর খাস্তগীর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন তবে কি মানুষের সব চেয়ে বড়ো প্রেমাস্পদ এই পৃথিবীটাই? সবখানের সব আশ্রয় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেলেও, জীবনের সব আকর্ষণ ধূসর হয়ে গেলেও, এই পৃথিবীটাই তার অনন্ত আকর্ষণের পসরা সাজিয়ে নিয়ে বলে, 'কেউ না থাকুক, আমি তো আছি! আর তুমিও আছ। আমি আর তুমি এইটুকুই কি কম? এইটুকুই তো সব। তুমি আর আমির মধ্যেই তো সমস্ত সম্পূর্ণতা, সব কিছু স্বাদ।'

'হয়তো তাই! তা নইলে আমিই বা কেন এখনো ডাক্তার ডাকছি, ওষুধ খাচ্ছি. সাবধানতার সব বিধি পালন করছি? সে কি শুধু আমার অনেক পয়সা আছে বলে? এই অপরিমিত পয়সা না থাকলে কি আমি বাঁচবার চেষ্টায়—'

আর লেখা হয়নি। টেলিফোনটা ডেকে উঠলো।

যেমন সব সময় ডাকে—চিন্তার গভীর থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে খোলা উঠোনে আছাড় মারতে।

তবু খুব শান্ত গলায় প্রশ্ন করতে হয়, 'আপনি কে বলছেন? হ্যাঁ, আমি অনামিকা দেবী কথা বলছি। কী বললেন? নাম? মেয়ের? ইস! ছি ছি, একদম ভুলে গেছি। নানা কাজে এমন মুশকিল হয়—' লজ্জায় কুণ্ঠায় যেন মরে যেতে হয়, 'আপনি যদি দয়া করে কাল সকালে একবার—কালই নামকরণ উৎসব? ও হো! তারিখটা ডায়েরিতে লিখে রাখতে বলেছিলেন? হ্যাঁ, সত্যি এখন সবই মনে পড়ছে। মানে লিখে রেখেওছি, খুলে দেখা হয়নি। আচ্ছা আপনি বরং আজই সন্ধ্যের দিকে আর একবার কষ্ট করে—নয়তো আপনার ফোন নাম্বারটাই...বাড়ি থেকে বলছেন না? আচ্ছা তা'হলে আপনিই—,'

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহাজনের ঋণশোধ করে উঠতে পারেননি। অন্ততঃ কণ্ঠে সেই কুণ্ঠা! না ফুটিয়ে উপায়ও নেই। সৌজন্যের উপরই তো জগৎ।

ভুলে সত্যিই গিয়েছিলেন, এখন মনে পড়লো, ভদ্রলোক তাঁর নবজাতা কন্যার নামকরণের জন্য আবেদন জানিয়ে আবেগ-মুগ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আর সেই সঙ্গে আশীর্বাদ করবেন, যেন আপনার মতো হতে পারে!'

এহেন কথা ভুলে গেলেন অনামিকা?

খারাপ, খুব খারাপ! অথচ সত্যিই লিখে রেখেছিলেন। ভাগ্যিস রেখে-ছিলেন! খুলে দেখলেন, আরো অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া রয়েছে। শুধু অদেখা ভদ্রলোকের মেয়ের নামকরণই নয়, পাড়ার ছেলেদের হাতে-লেখা পত্রিকারও নামকরণ করে দিতে হবে!...তাছাড়া পাড়ার সরস্বতী পুজোর স্মারক পত্রিকার জন্য শুভেচ্ছা, 'সবুজ সমারোহ' ক্লাবের রজত জয়ন্তী স্মারক পত্রিকার জন্য ছোট গল্প, 'ভারতীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানে'র কর্মীবৃন্দের রিক্রিয়েশান ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের স্মারক পত্রিকার জন্য চর্মশিল্পের উপর যাহোক একটু লেখা, 'নিভাননী' বালিকা

বিদ্যালয়ের চল্লিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ।...প্রধানা শিক্ষিকার চেহারাটি মনে পড়ে গেল অনামিকার, গোল-গোল কালো-কালো চেহারা. কালো চোখ দুটিও পরিপাটি গোল. সেই চোখ দুটি বিস্ফারিত করে চাপা গলায় বলেছিলেন ভদ্রমহিলা, 'আপনি বলছেন ছেলেগুলোকে নিয়েই যতো গণ্ডগোল, মেয়ে-স্কুলে তবু শান্তি আছে? ভুল-ভুল অনামিকা দেবী, এটি আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। প্রাইমারি সেকশন বাদ দিলে, সাড়ে চারশো মেয়ে নিয়ে ঘর করছি, বলবো কি আপনাকে, যেন সাড়ে চারশোটি ফণা-তোলা কেউটে! কথা বলতে যাও কি একেবারে ফোঁস! কীভাবে যে নিজের মানটুকু বাঁচিয়ে কোনো-মতে স্কুল চালিয়ে চলেছি, তা আমিই জানি!... এর মধ্যে থেকেই আবার সবই করতে হচ্ছে! মেয়েদের আবদার এই চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কিছু ঘটা-পটা হোক। মানে নাচ গান অভিনয় কমিক, অথচ আজকাল মেয়ে-স্কুলে ফাংশান করা যে কি দারুণ প্রবলেম! মেয়েরা জানে সবই, বুঝেও বুঝবে না। গেলবারের, মানে এই গত পুজোর সময় মেয়েরা একটা "সোস্যাল" করলো, জানতে পেরে পাড়ার ছেলেদের সে কি হামলা! বলে কিনা আমাদের দেখতে দিতে হবে!...বুঝুন অবস্থা! ওরা তো আর "দুষ্টু ছেলে" নেই, পুরো গুণ্ডা হয়ে উঠেছে, বুঝিয়ে তো পারা যায় না। শেষে ওদের দলপতিকে আড়ালে ডেকে হাত জোড় করে বলতে হলো, "বাবা, তোমাদের কথা রাখলে কি মেয়েদের গার্জেনরা আমাদের স্কুল আস্ত রাখবেন? হয়তো আইন-আদালত হবে, হয়তো এতোদিনের স্কুলটাই উঠে যাবে। এদিকে ভালো বলতে তো এই একটাই মেয়ে-স্কুল? তোমাদেরই বোনেরা ভাইঝি-ভাগ্নীরা পড়তে আসে"...ইত্যাদি অনেক বলায় কী ভাগ্য যে বুঝলো। কথাও দিলো "ঠিক আছে!"...কিন্তু বলুন, বারে বারে কি এ রিস্ক নেওয়া উচিত। মেয়েরা শুনবে না। আপনাকে বলবো কি, মনে হয় বেশীর ভাগ মেয়েই যেন চায় যে, বেশ হামলা-টামলা হোক, হৈচৈ কাণ্ড বাধুক একটা, ওই গুণ্ডা ছেলেগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি একটা দহরম-মহরম হোক! এ কি সর্বনাশা বুদ্ধি বলুন? তাই বলছি, মেয়েদের মাতে একটা শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়, সেই মতো একটি সুন্দর করে লেখা প্রবন্ধ আমাদের সুভেনীরের জন্যে দিতে হবে আপনাকে।'

অনামিকা দেবী বোধ হয় বলেছিলেন, 'আপনারা সর্বদা এত চেষ্টা করছেন, সামান্য একটা প্রবন্ধের দ্বারা কি তার থেকে বেশী হবে?'

মহিলা আবেগ-কম্পিত গলায় খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, 'হলে আপনার কথাতেই হবে। আপনাকে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা যে কী ভালবাসে—'

অনামিকা কি তখন মনে মনে একটু হেসেছিলেন? ভেবেছিলেন কি 'জ্ঞান-চৈতন্য' দেবার চেষ্টা করি না বলেই হয়তো একটু ভালোবাসে। সে চেষ্টা শুরু করলে—

কিন্তু সে হাসিটা তো প্রকাশ করা যায় না।

সাহিত্যিকের দায়িত্ব নাকি ভয়ানক গভীর! সমাজের ওঠা-পড়ার অদৃশ্য সূত্রটি নাকি তাদেরই হাতে। তবে শুধু তো নিভাননী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকাই নয়, এ ধ্বনি তো সর্বত্র সোচ্চার। অথচ—অতো কথার পরও অনামিকা দেবী কিনা সেই গুরুদায়িত্বের কণিকাটুকু পালনের কথাও স্রেফ ভুলে বসে আছেন?

দেখলেন ওঁদের চল্লিশপূর্তির উৎসবের আর মাত্র ষোল দিন বাকি, আজই অতএব দিতে পারলে ভালো হয়। ছাপবার সময়টুকু পাওয়া চাই তো ওঁদের।

বাকি সবগুলোই হয়তো আজকালই চেয়ে বসবে। কী করে যে ভুলে বসে আছেন অনামিকা দেবী!

তারপর তাকিয়ে দেখলেন টেবিলে বেশ কতকগুলো চিঠি জমে উঠেছে। উত্তর দেওয়া উচিত।

উপন্যাসের প্লটটা সরিয়ে রাখতেই হলো। হয়তো আরো অনেক দিনই রাখতে হবে। এগুলো শেষ হতে হতে আরো কিছু কিছু এসে জমবে তো।

অথচ অহরহ একটা অভিযোগ উঠছে আজকের দিনের কবি-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে, কেউ নাকি আর মননশীল লেখা লিখছেন না। সবাই নাকি দায়সারা, এবং টাকার জন্যে। আগেকার লেখকরা লিখতেন প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে, সমগ্র চেতনা দিয়ে, আর এযুগের লেখকরা লেখেন শুধু আঙুলের ডগা দিয়ে!...হ্যাঁ, ওই ধরনেরই একটা কথা সেদিন কোন একটা কলেজের সাহিত্য আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়ে বসে বসে শুনতে হয়েছিল অনামিকা দেবীকে, ছাত্রসভায় সদস্যদের আবেগ-উত্তপ্ত অভিযোগ ভাষণ!

দোষ স্বীকার করতেই হয়েছিল নতমস্তকে, নইলে কি বলতে বসবেন, আর কোন যুগে এযুগের মতো 'সাহিত্য'কে সবাই ভাঙিয়ে খাচ্ছে? সমাজের আপাদ-মস্তক তাকিয়ে দেখো, সাহিত্যিকই আজ সকলের হাতিয়ার। আর তাদের হাতে রাখতে কতো রকমের জালবিস্তার। টাকার টোপ, সম্মানের টোপ পুরস্কারের টোপ, ক্ষমতার টোপ ছড়িয়ে রাখা আছ সমাজ-সরোবরের ঘাটে ঘাটে। তা ছাড়া এই অনুরোধের বন্যা!

তবে কোন্ নিরালা নিশ্চিন্ততায় বসে রচিত হবে মননশীল সাহিত্য?

ভরসা শুধু নতুনদের।

যাদের ভাঙিয়ে খাবার জন্যে এখনও সহস্র হাত প্রসারিত হয়নি। কিন্তু সে আর ক'দিন? যেই একবার সুযোগ-সন্ধানীদের চোখে পড়ে যাবে, 'ওঁর কলম বলিষ্ঠ, ওঁর মধ্যে সম্ভাবনা'—তখুনি তো হয়ে যাবে তাঁর সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি। তাঁর সেই বলিষ্ঠ কলমকে কোন্ কোন্ কাজে লাগানো যায়, সেটাই হবে চিন্তনীয় বস্তু।

যদি আজ-কাল, পরশু-তরসু, তার পরদিন শুধু লেখাটা লিখতে পেতাম! জীবনের সব মূল্য হারিয়েও, বেঁচে থাকার চেষ্টাটা যার অব্যাহতি, সেই ব্যাধিগ্রস্ত প্রৌঢ় শিবেশ্বর খাস্তগীরের কাহিনীটা!

একটা নিঃশ্বাস ফেলে 'নিভাননী বালিকা বিদ্যালয়ে'র বালিকাদের জ্ঞানদানের খসড়াটা তৈরী করতে করতে, কয়েকটা নাম লিখে রাখলেন একটুকরো কাগজে। শুনতে মিষ্টি অথচ অসাধারণ, কেউ কোনোদিন মেয়েদের তেমন নাম রাখেনি এমন দুরূহ, মহাভারতের অপ্রচলিত অধ্যায় থেকে, অজানা কোনো নায়িকার এমনি গোটাকয়েক।

কোনোটাই হয়তো রাখবে না, নিজেরাই নিজেদের পছন্দে রাখবে, তবু অনামিকার কর্তব্যটা তো পালন করা হলো!

কিন্তু কলম নামিয়ে রেখে ভাবতে বসলেন কেন অনামিকা?

কার কথা? সেই মেয়েটার কথা কি?

যার কথা বাড়িতে আর কেউ উচ্চারণ করছে না। না, সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া মেয়েটার নাম বাড়িতে আর উচ্চারিত হয় না। তাকে খুঁজে পাবার জন্যে তলায় তলায় যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

সংসারে যেন একটা কৃষ্ণ যবনিকা পড়ে গেছে সেই নামটার ওপর। সেই প্রাণচঞ্চল বেপরোয়া দুঃসাহসী মেয়েটার মৃত্যু ঘটে গেছে।

অথচ—খুব গভীরে একটা নিঃশ্বাস পড়লো অনামিকার, অথচ ওকে যদি

অন্তত ওর মাও বুঝতে পারতো! পারেনি। ছোট্ট থেকে ও যে অভিভাবকদের ইচ্ছের ছাঁচে ঢালাই না হয়ে নিজের গড়নে গড়ে উঠেছে, এই অপরাধেই তিরস্কৃত হয়েছে। ওর কাছে 'সত্যে'র যে একটা মূর্তি আছে, সেই মূর্তিটার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখেনি, সেটাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে গণ্য করেছে।

অথচ অনামিকা? বাড়িতে আরো কতো ছেলেমেয়ে, তবু বরাবর তাঁর নারী-চিত্তের সহজাত বাৎসল্যের ব্যাকুলতাটুকু ওই উদ্ধত অবিনয়ী বেপরোয়া মেয়েটাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।

॥ ১৮ ॥

'তোমার পিসির ঘাড়ে আর কতোদিন থাকা হবে?'

বললো সত্যবান দাস নামের ছেলেটা, শম্পা যাকে একটু বদলে নিয়ে বলে 'জাম্বুবান'।

সেই শব্দটাই ব্যবহার করলো শম্পা, থার্মোমিটারটা ঝাড়তে ঝাড়তে অকাতর কণ্ঠে বললো, 'তা হাতের কাছে যখন তোমার কোনো মাসি-পিসির ঘাড় পাচ্ছি না, তখন উপায় কি?'

'আমার মাসি-পিসি? তারা ঘাড় পাতবে?' সত্যবান হেসে ওঠে, 'ওই ভদ্রমহিলার মতো এমন বোকাসোকা মহিলা দুনিয়ায় আর আছে নাকি?'

'আছে, আরোও একটি আছে—', শম্পা বলে গম্ভীরভাবে, 'আপাততঃ একটা জাম্বুবানকে ঘাড়ে করে যার জীবন মহানিশা হয়ে উঠেছে—'

'সত্যি শম্পা—'

'আচ্ছা আচ্ছা, ভদ্রতা সৌজন্য আক্ষেপ ইত্যাদি ইত্যাদি পরে হবে, এখন টেম্পারেচারটা দেখে নেওয়া হোক একবার!'

'না।'

'না? না মানে?'

'না মানে—স্পষ্ট পরিষ্কার না। জ্বরফর ছেড়ে গেছে। তবু এখনো ওই বিচ্ছিরি জিনিসটা নিয়ে তাড়া করতে আসছো কেন শুনতে চাই।'

'আশ্চর্য! তোমার মতন বেহায়া তো আর দেখিনি! দু'দুবার পাল্টে পড়েছো কিনা!'

'দুবার পড়েছি বলেই যে বরাবরই পড়বো তার মানে নেই! আমি বেশ সুস্থ-বোধ করছি, কাল চলে যাবো।'

শম্পা গম্ভীরভাবে বলে, 'খুব ভালো কথা, তা বাসাটাসা যোগাড় হয়ে গেছে?'

'বাসা? বাঃ! সেটা আবার কখন করলাম?'

'তাহ'লে? কালই যাচ্ছো—'

'কী আশ্চর্য! আমার ঘরটা কি চলে গেছে নাকি? এ মাসের পুরো ভাড়া দেওয়া আছে।'

'ওঃ, তাহলে তো ভালোই,' শম্পা যেন ভারী আশ্বস্ত হয়ে গেল এইভাবে বলে, মেসের মধ্যে মহিলা থাকায় আপত্তি করবে না তো তোমার ম্যানেজার?'

'মহিলা!' সত্যবান আকাশ থেকে পড়ে, তুমিও যাবে নাকি?'

শম্পাও আরো উঁচু আকাশ থেকে পড়ে, 'ওমা! যাবো না কোথায় থাকবো?'

সত্যবান অবশ্যই বিপন্ন বিব্রত।

সত্যবান তাই সামলানোর গলায় বলে, 'আহা এখন কটা দিন তো এখানেই থাকতে পারো, তারপর—'

'কী তারপর ?'

'তারপর বাসা-টাসা ঠিক করে—'

শম্পা জোরে জোরে বলে, 'ওঃ, ওই আশায় বসে থাকবো আমি? তাহলেই হয়েছে! তোমার ভরসায় বসে থাকলে, রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না।'

আমার উপর যখন এতই অবিশ্বাস, তখন আর আমাকে জ্বালাচ্ছো কেন?' সত্যবান বলে ওঠে, 'কেটে পড়ো না বাবা!'

'তা তো বটেই, তাহলে তো বেঁচে যাও। কিন্তু সে বাঁচার আশা ত্যাগ করো। কুমীরে কামড় দিলে বাঘেও ছাড়িয়ে নিতে পারে না, বুঝলে?'

'বাঃ, নিজের প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধা!' সত্যবান বলে।

শম্পা গম্ভীরভাবে বলে, 'নিশ্চয়! শ্রদ্ধা আছে বলেই সত্যভাষণ করছি। যাক—এখন নাও এটা—' এগিয়ে দেয় যন্ত্রটা সত্যবানের দিকে।

সত্যবান আর প্রতিবাদ করতে ভরসা পায় না। হাত বাড়িয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে দেখে ফেরত দেয়।

শম্পা সেটাকে আলোর মুখে ধরে, জ্বরের পারার অবস্থান লক্ষ্য করে হৃষ্টচিত্তে বলে, 'যাক বাবা, এযাত্রা তবু আমার মুখটা রাখলে—'

'মুখ রাখলাম!' সত্যবানের বোধ হয় কথাটা বুঝতে দেরি হয়, সত্যবান তাই কপাল কুঁচকোয়, 'মুখ রাখা মানে?'

'না, এই লোকটাকে বোধ হয় ইহজীবনেও মানুষ করে উঠতে পারা যাবে না। বলি ওই জ্বরের দাপটে টেঁসে গেলে, মুখটা থাকতো আমার? সেইটুকুর জন্যেই ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে তোমাকে!'

'বাঃ! তোমার মুখ থাকার জন্যেই শুধু আমার বেঁচে ওঠার সার্থকতা?'

'তবে না তো কি? এরপর যতবার ইচ্ছে মরো, কোনো আপত্তি নেই। শুধু এই যাত্রাটা যে কাটিয়ে দিলে তাতেই মাথাটা কিনলে।'

'এর পর যতবার ইচ্ছে মরতে পারি?'

'অনায়াসে।'

'উঃ, কী সাংঘাতিক মেয়ে! এখন ভাবছি তোমার সঙ্গে লটকে পড়ে খুব ভুল করেছি!'

'সেকথা আর বলতে—', শম্পা খুব সহানুভূতির গলায় বলে, 'একশবার! তোমার জন্যে দুঃখু হয় আমার।'

'ওঃ, দয়ার অবতার একেবারে! কিন্তু সত্যি বলে দিচ্ছি, আর এভাবে পিসির ঘাড়ে পড়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না! এ কী, আমি একটা বুড়ো মদ্দ, একটু জ্বরের ছুতো করে কাজকর্ম ছেড়ে একজন অপরিচিতা মহিলার ঘাড়ের ওপর পড়ে আছি! ভাবলেই রাগ আসছে।'

'রাগ আসা ভালো। আমার দিদিমা বলে, রাগই পুরুষের লক্ষণ। তবু জানবো একটা পুরুষের গলা ধরেই ঝুলেছি। কিন্তু বিয়েটা কবে হবে?'

'বিয়ে!'

'হ্যাঁ, বিয়ে। যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলে "বিবাহ"। যদিও আমার সেটা প্রহসন বলেই মনে হয়, তবু ওই প্রহসনটা না হলেও তো স্বস্তি নেই।'

সত্যবান ওর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বলে, 'এখনো ভাববার সময় আছে

শম্পা, ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে বসে শেষে পস্তাবে।'

সত্যবান সভ্য-ভব্য কথার ধার ধারে না, সত্যবান ওইভাবেই বলে, 'ছেড়ে দাও বাবা, আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো।'

শম্পা থার্মোমিটারকে দোলাতে দোলাতে বলে, 'তুমি বাঁচতে পারো, আমার কথা তুলছো কেন?'

'তুলছি তোমার দুর্গতির কথা ভেবে। কী যে আছে তোমার কপালে!'

'যা আছে তা তো ঠিকই হয়ে গেছে। স্রেফ একটি জাম্বুবান। তাও আমার এমনি কপাল, তাকেও "হারাই হারাই" করে মরতে হচ্ছে।'

সত্যবান একটু কড়া গলায় বলে, 'সেই মরাটা মরতেই তো বারণ করা হচ্ছে!'

'পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ।'

সত্যবান হতাশ গলায় বলে, 'কিছুতেই যদি তোমার সুমতি না করাতে পারি তো উপায় নেই। দুর্গতি তোমার কপালে নাচছে। আপাততঃ প্রথম দুর্গতি তো হচ্ছে অনশন! খেতে-টেতে পাবে না, সে-কথা প্রথমেই বলে রেখেছি মনে আছে?'

'আছে।'

'তবে আর কী করা যাবে? দাও কোথায় কি খাবারটাবার আছে, দারুণ খিদে পেয়ে গেছে।'

শম্পা সঙ্গে সঙ্গে পাক খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে চেঁচায়, 'পিসি, জ্বর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুম্ভকর্ণটা খাই-খাই শুরু করেছে—'

পারুল একটা চিঠি লিখছিল, মুড়ে রেখে অন্যমনা গলায় বলে, 'কে কী শুরু করেছে?'

'ওই যে ওই হতভাগা—ইয়ে কাকে চিঠি লিখছো গো?'

পারুল অন্যমনস্কতার রাজ্য থেকে নেমে এসে হালকা গলায় বলে, 'যাকেই লিখি না, তোকে বলতে যাবো কেন?'

'আহা তুমি তো আর ইয়ে—', শম্পা একটু থেমেই ফট্ করে বলে বসে, তেমন কাউকে তো লিখছো না—'

'তাই যে লিখছি না, কে বললো তোকে?'

'আহা!'

শম্পা হেসে ফেলে, 'তা বলা যায় না বাবা, তুমি তো আবার কবিমানুষ, তা ছাড়া বয়েস হলেও বুড়ো-ফুড়ো হয়ে যাওনি—'

'তবে?' পারুল হেসে বলে, 'তা তুই যে দুমদাম করে উঠে এলি, সে কি এই কথাটা বলবার জন্যে?'

'এই সেরেছে—', শম্পা মা-কালীর মতো জিভ কাটে, 'একদম ভুলে মেরে দিয়েছি। জাম্বুবানটা বলছিল দারুণ খিদে পেয়েছে—'

'এই দ্যাখো! আর তুই সে-কথা ভুলে মেরে দিয়ে পিসির চিঠি-রহস্য ভেদ করতে বসলি? চল্ চল্।'

পারুল তাড়াতাড়ি কলম রেখে উঠে পড়ে।

পারুলের আত্মমগ্ন নিস্তরঙ্গ জীবনে এই মেয়েটা একটা উৎপাত, এই ছেলে-মেয়ে দুটো একটা ভার, তবু পারুলের বিরক্তি আসে না কেন?

পারুলের ছেলেরা দেখলে কী বলতো?

'ও বলছিলো কালই চলে যাবে—', শম্পা পিছু পিছু যেতে যেতে বলে, বলছে তোমার পিসির ঘাড়ে আর কতোদিন থাকবো! আচ্ছা পিসি, এক্ষুণি ওকে

একা ছাড়া যায়?'

'পাগল!' পারুল উড়িয়ে দেওয়ার সুরে বলে. 'মাথা খারাপ?'

'তবে? তুমি এতো বুদ্ধিমতী, তুমিও যখন বলছো—'

'আমি যেতে দিলে তো?'

'বাঁচলাম বাবা!' শম্পা ছেলেমানুষের মতো আবার বলে ওঠে, 'কিন্তু বলো না গো পিসি. চিঠিটা তোমার ভাই-টাইকে লিখছো না তো?'

পারুল সহসা গম্ভীর গলায় বলে, 'আমায় তুই সেই রকম বিশ্বাসঘাতক ভাবিস?'

শম্পা ফট করে নিভে যায়। আস্তে বলে, 'না তা নয়, তাঁরাও তো ভাবছেন-টাবছেন নিশ্চয়, সেই ভেবে যদি তুমি—'

'নাঃ, আমি ওসব ভাবা-টাবার ধার ধারি না. নিজে যা ভাবি তাই করি।'

'ইস পিসি! তোমার মতন মনের জোর যদি আমার হতো!'

পারুল টোস্ট তাতাতে তাতাতে বলে, 'তোর মনের জোর আমার থেকেও বেশী।'

শম্পা একটু চুপ করে থেকে নেভা-নেভা গলায় বলে, 'আগে তাই ভাবতাম. কিন্তু দেখছি—'

'কী দেখছিস?'

'দেখছি মন কেমন-টেমন ব্যাপারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পিসির জন্যে এক-এক সময় এতো ইয়ে হয়! তখন নিজেকে ভীরু স্বার্থপর মনে হয়।'

'মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর রে শম্পা, কেউ বুঝে-সুঝে, কেউ না বুঝেই। এই যে লোকে স্বার্থত্যাগী বলতে উদাহরণ দেয় সন্ন্যাসীদের, স্বার্থত্যাগী সন্ন্যাসী আসলে কি সত্যিই তাই? আমার তো মনে হয় ওনারাই সব থেকে স্বার্থপর—'

'ধ্যাৎ!'

'ধ্যাৎ কি, সত্যি। অন্যের মুখ না চেয়ে, নিজের যেটি ভালো লাগছে. সেইটি করাই স্বার্থপরতা! কৃচ্ছ্রসাধনে তার সুখ. তাই কৃচ্ছ্রসাধন করছে। সংসার-বন্ধন থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোয় তার সুখ. তাই পালাচ্ছে। এতে নিঃস্বার্থতা কোথায়?'

'এই মরেছে! তুমি যে আমায় বসিয়ে দিলে গো!'

'চোখ খুলে যদি তাকাস পৃথিবীতে, দেখবি হরঘড়িই বসে পড়তে হবে।'

'তাই তো দেখছি।' শম্পা অন্যমনস্কের মতো বলে, 'আচ্ছা পিসি, আমি যেন কী বলতে এসেছিলাম তোমায়?'

পারুল হেসে ফেলে, 'যা বলতে এসেছিলি তা তো এই প্লেটে সাজানো হচ্ছে!'

'ওহো-হো। দাও দাও। হায় রে, এতোক্ষণে ঘরবাড়িই খেয়ে ফেললো? দাও।'

'আমিই যাচ্ছি চল।'

'তুমি? হতভাগা ওতে আবার লজ্জা পায়।"

পারুল মৃদু হেসে বলে. 'কেন লজ্জা কিসের? মা পিসিরা খেতে-টেতে দেয় না?'

'পিসি!' শম্পার গলাটা হঠাৎ বুজে আসে, আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার বোনেরা, তোমাদের ভাইরা একেবারে দু'রকম!'

'তা সবাই কি এক রকম হয়? তুই তোর ভাইবোনদের মতো?'

'তা নয় বটে! তবু—', শম্পা একটু থেমে বলে, 'আচ্ছা পিসি, লোকেদের

যদি ছেলেমেয়ে হারিয়ে যায়, তারা কাগজে-টাগজে বিজ্ঞাপন দেয় তো?'

পারুল ওর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখে, তারপর হালকা গলায় বলে, 'তা দেয়-টেয় তো দেখি।'

কিন্তু শম্পার গলাটা যেন আরো ভারী-ভারী লাগে. 'আর যদি রাগ-ঝগড়া করে চলে যায়. এও তো লেখে. অমুক তুমি কোথায় আছো জানাও, আমরা অনুতপ্ত।'

পারুল হেসে ফেলে. 'সেটা ছেলেকে বলে. মেয়েকে নয়।'

'ওঃ! কিন্তু কেন বল তো? মা-বাপের স্নেহটাও কি দু'তরফের জন্যে দু'রকম?'

'হয়তো তাই-ই—'. পারুল অন্যমনা গলায় বলে. 'হয়তো তা নয়। কিন্তু মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার খবর ঘোষণা করলে লোকলজ্জা যে! মেয়েদের হারিয়ে যাওয়ার একটাই মানে আছে কিনা—থাক ওসব কথা, ছেলেটার খিদে পেয়েছিল—'

পারুল খাবারের থালা হাতে নিয়ে হালকা পায়ে দ্রুত নেমে যায়।

শম্পাও নামে। আস্তে আস্তে। শম্পার এই ভঙ্গীটা একেবারে অপরিচিত।

গঙ্গার একেবারে কিনারা ঘেঁষে একটা ভাঙা শিবমন্দির তার বিদীর্ণ দেহ আর হেলে-পড়া মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালের স্বাক্ষর বহন করে। কতকাল আছে কে জানে। স্থানীয় অতি-বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও বলেন, শৈশবকাল থেকেই তাঁরা মন্দিরটার এই চেহারাই দেখে আসছেন, এমনি পরিত্যক্ত, এমনি অশ্বত্থ গাছ গজানো।

এদিকে কেউ বড় একটা আসে না। কারণ এ ধরনের পরিত্যক্ত মন্দিরের ধারেকাছে সাপখোপ থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

ডানপিটে ছেলেরা অবশ্য সাপের ভয় বাঘের ভয় কিছুই কেয়ার করে না, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে তেমন আকর্ষণীয় কোনো ফুলফলের গাছ নেই যা তাদের টেনে আনতে পারে। অতএব জায়গাটা নির্জন।

ওরা বিকেল থেকে একটু নির্জন ঠাঁই খুঁজে খুঁজে প্রায় হতাশ হবার মুখে হঠাৎ এই জায়গাটা আবিষ্কার করে ফেলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, 'যাক এতক্ষণে পাওয়া গেল।'

মন্দিরের পিছনের চাতালটা প্রায় গঙ্গার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় বিরাজমান। তার সিমেণ্ট-চটা সুরকি-ওঠা অঙ্গের মাঝখানে মাঝখানে খানিকটা খানিকটা অংশে পুরনো পালিশের কিছুটা চিহ্ন যেন যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি একটুকরো জায়গা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে বসে পড়লো ওরা।

শম্পা আর সত্যবান।

পড়ন্ত বেলায় গঙ্গার শোভা অপূর্ব, তার উপর এ জায়গাটা তো প্রায় গঙ্গার ওপরেই। শম্পা বিগলিত কণ্ঠে বলে, 'মার্ভেলাস!' তারপর দম নিয়ে বললো, এতক্ষণ জায়গা না পেয়ে রাগে হাড় জ্বলে যাচ্ছিলো বটে. এখন দেখছি ভালই হয়েছে।'

'তোমার অবশ্য হাড়টা একটু সহজেই জ্বলে!' বলে হাসলো সত্যবান।

শম্পা এ কথায় পুরোপুরিই দপ্ করে জ্বলে উঠলো, 'সহজে মানে? চল্লিশ মিনিট ধরে খুঁজে মরছি না একটু বসে পড়বার মতন জায়গা? পাচ্ছিলাম? উঃ. পৃথিবীতে এত লোক কেন বলতে পারো? অসহ্য!'

'চমৎকার! পৃথিবীতে তুমি ছাড়া আর লোক থাকবে না?' বললো সত্যবান।

ওর থেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে উচ্চাঙ্গের ভাষা দিয়ে কথা বলার ক্ষমতা ওর নেই

তাই ওইটুকুই বললো। শম্পার বান্ধবীদের দাদারা বলে, এইটুকু প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করেই অনেক কায়দার ভাষা আমদানি করে রীতিমত জমিয়ে ফেলতে পারতো। যা দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে এত বড়োটি হয়েছে শম্পা। কিন্তু অনেক প্রেমে পড়ার পর আপাততঃ শম্পা এমন এক প্রেমের মধ্যে পড়ে বসে আছে, যে প্রেমের নায়ক একটা কারখানার কুলি বললেই হয়।

অতএব সে শুধু কথা কইতে পারে, কথা রচনা করতে জানে না।

তাই সে শুধু বলে ওঠে, 'বাঃ চমৎকার, তুমি ছাড়া আর লোক থাকবে না পৃথিবীতে?'

শম্পা নিজের ভঙ্গীতে বলে, 'থাকবে না কেন, সম্ভবমতো থাকবে। এমন নারকীয় রকম বেশী লোক থাকবে কেন ? এত লোক থাকা একরকম অশ্লীলতা।'

'অশ্লীলতা!'

'তাছাড়া আবার কি! দুটো মানুষ দুদণ্ডের জন্যে স্বস্তি করে একটু বসতে চাইলে ঘরে খিল বন্ধ করা ছাড়া গতি নেই, এটা অশ্লীলতা ছাড়া আর কী? বীভৎস বিশ্রী অশ্লীল!'

'অন্যরাও আমাদের দেখে এই কথাই ভাবে।'

'শুধু ভাবে নয়, বলেও!' শম্পা বিরক্ত-তিক্ত হাসির সঙ্গে বলে, 'শুনলে না তখন ? সেই বুড়ী দুটো মন্তব্য করলো? উঃ, নেহাৎ তুমি প্রায় আমার মুখ চেপে ধরলে তাই উচিত জবাব দিয়ে আসতে পেলাম না, নইলে শিক্ষা দিয়ে দিতাম।'

'আহা বুড়ী দুটো নিশ্চয় তোমার ঠাকুমা-টাকুমার বয়িসী!'

'হতে পারে। তাই বলে যা ইচ্ছে বলবার কোনো রাইট থাকতে পারে না। দুদশদিন আগে জন্মেছে বলে মাথা কিনেছে নাকি? বলে কিনা, "কী পাপ! কী পাপ! গঙ্গাতীরে বসে একটু জপ করবারও জো নেই। সর্বত্তর ছোঁড়া-ছুঁড়ির কেত্তন! এ দুটো আবার কোন চুলো থেকে এসে জুটলো?"'

'সব কথা তুমি শুনতে পেয়েছিলে ?'

'পাবো না মানে ? আমাদের কান বাঁচিয়ে বলেছিল নাকি? বরং যাতে কানে ভালো করে এসে প্রবেশ করে তার চেষ্টা ছিল।'

'আমি কিন্তু অতো সব কিছু শুনতে পাইনি।'

'তোমার কথা ছাড়ো। মাথায় ঘিলু বলে কিছু থাকলে তো?'

'এটুকুর জন্যে ঘিলুর কোনো দরকার হয় নাকি?'

'হয় না তো কি! ঘিলু কম থাকলেই শ্রবণশক্তি কম হয়, বুঝলে?'

'বুঝলাম!' সত্যবান হেসে ফেলে বলে, 'কিন্তু পরে আর এক বুড়ীর মন্তব্য বোধ হয় তুমি শুনতে পাওনি। শুনলে নির্ঘাত তার ঘাড়ের মাংসে কামড় বসাতে।'

'বটে বটে, বটে নাকি ?'

শম্পা প্রায় লাঠির মতো সোজা হয়ে ওঠে, 'শুনি কথাটা?'

'শুনলে ক্ষেপে যাবে।'

'যাই যাবো, বল তো শুনি।'

'কথাটা আমার পক্ষে খুব আহ্লাদের নয়।'

শম্পার প্রকৃতিতে ধৈর্যর বালাই নেই, তাই শম্পা ঝেঁজে ঝেঁকে ওঠে, 'তোমার পক্ষে আহ্লাদের না হলে, আমার পক্ষেও কিছু আহ্লাদের নয়, তবু শোনাই যাক।'

'শুনে লাভ কিছু নেই। ওদিকের ঘাটে সিঁড়ির কোণায় যে একটি সিঁদুর টিঁদুর পরা বুড়ী বসেছিলেন, আমরা ওখানটায় ঢুঁ মেরে সরে আসতেই বলে উঠলেন, আহা মরে যাই, বাছার পছন্দকে বলিহারি! একটা কাফ্রী ছোঁড়াকে

টিয়ে—

সত্যবান হেসে উঠে বলে, 'শেষটা আর শুনতে পেলাম না।'

শম্পা কড়া গলায় বলে, 'সেই বুড়ীকে আবার তুমি "বসেছিলেন" "বলেছিলেন" রে মান্য দিয়ে কথা বলছো? বুড়ীটা বলতে পারো না?'

'বলে লাভ? তেনার কানে তো পৌঁছচ্ছে না!'

'না পৌঁছুক, শম্পা হাতের কাছ থেকে একটা ঘাসের চাপড়া উপড়ে নিয়ে টাকে কুচি কুচি করতে করতে বলে, 'বুড়ীগুলো আমার দু'চক্ষের বিষ। একটু ভ্য করে কথা বলতেও জানে না। কেন "মেয়ে" বললে কী হয়? কী হয় "ছেলে" লে? তা নয়—ছোঁড়া-ছুঁড়ি! শুনলে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে!'

'ওঁদেরও আমরা বুড়ী বলছি! কেন মহিলা-টহিলা বললে কী হয়?'

'দায় পড়েছে মহিলা বলতে! ওরকম অসভ্যদের আমি বুড়ীই বলবো।

'ওঁরাও তোমাকে ছুঁড়ীই বলবেন। বলবেন, ছুঁড়ী একটা কাফ্রী ছোঁড়াকে টিয়ে—'

'থাক্ থাক্ থামো। বাদাম খাও।'

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে এক ঠোঙা চিনেবাদাম বার করে ফেলে শম্পা। সত্যবানের তে কয়েকটা দিয়ে নিজে একটা ছাড়াতে ছাড়াতে বিরক্ত গলায় বলে, 'যখন নলাম এত গরম হাতে নেওয়া যাচ্ছিল না, আর জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ঠাণ্ডাই য়ে গেল।'

অতএব বোঝা গেল এতক্ষণ ধরে মনের মতো জায়গা খুঁজে বেড়াবার কারণটা ক। মাত্র ওই বাদামের ঠোঙাটির সদ্ব্যবহার করা! যদিও সত্যবান বলেছিল, 'ধ্যেৎ, ইমাত্র পিসির কাছ থেকে পেটটা পুরো ভর্তি করে বেরিয়ে এলাম, আবার এখন নেবাদাম কী?'

'কী তা তুমি বুঝবে না বুদ্ধু! বাদাম ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাওয়া আর খোলা ড়ে ছুঁড়ে ফেলার মধ্যেই তো সমস্ত কিছু। ওটাই প্রেমের মাধ্যম!'

'তা হবে।' সত্যবান হেসে উঠে বলে, 'তুমি অনেক-অনেকবার প্রেমে পড়েছো, মিই ভালো জানো।'

'তা সত্যি! তুমি যে একেবারে "র" মাল। বেচারা!'

শম্পা ওর দিকে আর কয়েকটা বাদাম এগিয়ে দিয়ে বলে, 'আচ্ছা এইবার বলো তামার কথা। সকাল থেকে তো শোনাচ্ছো একটা কথা আছে—'

'কথাটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, যা বলছি প্রথম দিন থেকে। কাল আমি চলে াই—'

শম্পা গম্ভীরভাবে বলে, 'বেশ! তারপর?'

'তারপর আবার কি? যেমন কাজ-টাজ করছিলাম—'

'ভালো, খুব ভালো। একাই যাওয়ার সঙ্কল্প স্থির তাহলে?'

'তাছাড়া যে আর কী হতে পারে বুঝছি না তো!'

'তুমি কোনোদিনই কিছু বুঝবে না। যা বুঝছি, চিরটাকাল সব কিছু আমাকেই বুঝতে হবে। যেমন আমার কপালের গেরো। নিজের হাতে নিজে বিষ খেয়ে মরেছি।'

'শম্পা!' সত্যবান গভীর গলায় বলে, 'এই যা বললে, এটাই ঠিক। সমস্তক্ষণ ঠিক ওই কথাই ভাবছি আমি। ঝোঁকের মাথায় আমার সঙ্গে ঝুলে পড়া তোমার ক্ষে বিষ খাওয়ারই শামিল।'

শম্পা হাতের বাদামের খোলাগুলো গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গভীরতর

গম্ভীর গলায় বলে, 'উপায় কি! অবস্থাটা তো ওইরকম। ওই খোলাগুলোকে আর তুলে আনতে পারবে?'

'ওটা তো তুলনা মাত্তর!'

'কোন্‌টা কি সে বোধ থাকলে তো? যাক ঠিক আছে, যা করবার আমিই করবো। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। বেশ, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না, তুমি দেখ গে গিয়ে তোমার সেই মহামূল্য চাকরিটি আছে কিনা. তারপর দেখা যাক, আমার বি. এ. পাসের ডিগ্রীটা কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা। কিন্তু সেটা পরের কথা। এখন কলকাতায় গিয়ে একটা কাজ তোমার করতে হবে। আমি একটা চিঠি লিখে রাখবো, সেটা নিয়ে পিসির হাতে পৌঁছে দিয়ে বলবে—'

'বাঃ, তুমি যে বলেছিলে তোমাদের বাড়ীর ছায়া অবধি যেন আমি কখনো না মাড়াই!'

'সে হুকুম এখনো বলবৎ। বাড়ির বাইরে কোথাও দেখা করে—মানে হরদমই তো বাইরে বেরোতে হয় পিসিকে, তেমনি কোনোখানে—'

সত্যবান হাতের খোসাগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে ফেলে বলে ওঠে, 'বাঃ, সেটা কী করে সম্ভব হবে? তিনিও কখনো আমায় দেখেননি, আমিও কখনো তাঁকে দেখিনি, চিনবো কেমন করে?'

'তিনি তোমায় দেখেননি কখনো, এটা ঠিক—', শম্পা প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায়. 'তুমি এমন একটা দ্রষ্টব্য বস্তু নও যে দেশসুদ্ধ লোক তোমায় দেখে বসে আছে। কিন্তু আমার পিসি? রাতদিন কাগজে ছবি বেরোচ্ছে। নাকি তাও দেখোনি কোনোদিন?'

আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিল, গঙ্গার অপর পারে নেমে আসছে ছায়া. সত্যবান সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে, 'জানোই তো আমি কাঠখোট্টা কুলীমজুর মানুষ, সাহিত্য-টাহিত্যের কী খবর জানবো? কম বয়সে যা কিছু পড়েছি-টড়েছি, তারপর আর কি! উচ্চ শিক্ষার উচ্চ আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পেটের ধান্ধায় ঘুরছি। তবে হ্যাঁ, এখন ওই আকাশটার দিকে তাকিয়ে, কতোকাল আগে পড়া সেই একটা পদ্য মনে পড়ছিল—'মেঘের পরে মেঘ জমেছে রঙের পর রঙ, মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজলো ঢং ঢং।' দেখ তাকিয়ে, ঠিক সেই রকমই কিনা? চারিদিকে মন্দিরে-টন্দিরে আরতি শুরু হয়ে গেছে, কাঁসরঘণ্টা বাজছে, আর রঙ-টঙ তো— তুমিই ভাল বুঝবে।' সত্যবান মৃদু হেসে কথা শেষ করে।

শম্পাও ওর কথা শুনে তাকিয়ে দেখে, শম্পার মুখটা ওই পড়ন্ত বেলার আলোয় ঝকঝকে দেখায়। শম্পা সেই ঝকঝকে মুখটা সত্যবানের দিকে ফিরিয়ে বলে, 'তুমিও কিছু কম বোঝো না! বেলাশেষের আকাশ দেখে যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে যায় তোমার! এই আকাশকে আবার একসময় উনি চিতার সঙ্গেও তুলনা করেছেন, "ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা"! পড়েছো?'

'কি জানি, মনে পড়ছে না।'

'না পড়ুক, পরে তোমায় সব পড়াবো। রবীন্দ্রনাথ না পড়লে—আচ্ছা পরের কথা পরে হবে, এখন তুমি আমার ঠাকুর্দার সেই ঝাড়িটির বাইরে কোথাও ঠাকুর্দার কন্যের সঙ্গে দেখা করবে! করে চিঠিখানা দিয়ে বলবে, শম্পা বলে দিয়েছে, আপনি যে ওর খবর পেলেন এটা যেন কাউকে জানিয়ে ফেলবেন না!'

'ঠিক আছে। কিন্তু উনি যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে হে বাপু? তখন?'

'তখন?' শম্পা হেসে উঠে বলে, 'তখন বোলো "আমি জাম্বুবান"। তাহলেই

পরিচয় পেয়ে যাবেন।'

'ওঃ, এই নামেই আমার পরিচয় দিয়ে রেখেছো তাহলে ?'

'তবে আবার কী? যার যা পরিচয়! শুনে অবশ্য পিসি বলেছিল, একটি জাম্বুবান ছাড়া আর কিছু জুটলো না তোর ভাগ্যে ? তা আমি বললাম, জাম্বুবান-দের ঘাড়টা খুব শক্ত হয়, তাই পর্বতের চুড়োটি চাপাতে ওটাই সুবিধে মনে হলো!'

'ভালই বলেছো। এখন দেখবো তোমার হুকুম পালন করে উঠতে পারি কিনা।'

'পারবে না মানে ? তোমার ঘাড় পারবে।'

'আহা বুঝছো না, ওনারা হলেন হাই সার্কেলের মানুষ, বাড়ির বাইরে মানে তোমার গিয়ে মীটিঙে-টীটিঙে তো ? সেখানে আমায় ওঁর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে দেবে কি? হয়তো আর্জি করলে বাইরে থেকেই খেদিয়ে দেবে।'

'আহা রে মরে যাই! খেদিয়ে দিলেই তুমি অমনি সুখেদে ফিরে আসবে! ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক কার্যোদ্ধার করতে হয়, এটা হচ্ছে মহাভারতের শিক্ষা।'

'ঠিক আছে।...দ্যাখো একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল!'

'গেল তার কি ?'

'আর এখানে বসে থাকা উচিত নয়, সাপটাপ আসতে পারে।'

'তবে ওঠো—', শম্পা ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, 'কপাল আমার যে, এই হতচ্ছাড়া লোকের সঙ্গে প্রেম করতে বসেছি আমি! এমন গঙ্গার ধার, এমন নির্জন জায়গা, এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর তুমি কিনা সাপের চিন্তা করতে বসলে!'

'কী করবো বল? ওটাই চিন্তায় এসে গেল যে ?'

'রাবিশ! যদি বা বাদামভাজার লোভ-টোভ দেখিয়ে তুলিয়ে-ভালিয়ে এনে ফেললাম, তারপর কিনা শূন্যি!'

অন্ধকার গভীর হয়ে আসছিল, পরস্পরের মুখ দেখা যাচ্ছিল না, সত্যবানের গলাটাই শুধু অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় হয়ে বেজে উঠলো, 'আমার সঙ্গে গাঁথলে তোমার সারা ভবিষ্যৎটাই তাই হবে শম্পা, ওই শূন্যি। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি সেটা। তাই কেবলই তোমায় খোশামোদ করছি শম্পা, তুমি কেটে পড়ো। আমার মতো হতভাগার সঙ্গে নিজের অদৃষ্টকে জড়িও না।'

শম্পা উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'দ্যাখো, আর একবার যদি ও কথা উচ্চারণ করো, ঠেলে ওই জলের মধ্যে ফেলে দেবো। কেউ রক্ষে করতে আসবে না। যা শুনলেই মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়, কেবল সেই কথা! পিসিকে যে চিঠিটা দেব, তার উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, তারপর সোজা গিয়ে উঠবো তোমার মেসে, এই হচ্ছে আমার শেষ কথা! রেজিস্ট্রিটা একবার হলে হয়, তারপর দেখো কী দুর্গতি করি আমি তোমার।'

সত্যবান হঠাৎ একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলে, 'আমার কিন্তু কী মনে হচ্ছে জানো ? এত সুখ বোধ হয় সইবে না আমার কপালে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ, আর বোধ হয় কখনো আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে কথা বলবো না।'

বেপরোয়া শম্পার সাহসী বুকটাও হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে, ওরও যেন মনে হয় সত্যিই বুঝি তাই। কিন্তু মুখে হারে না ও, বলে ওঠে, 'হাত ফসকে পালাবার তালে যা ইচ্ছে বানিয়ে বলো না, আমার কিছু এসে যাচ্ছে না। আমি পিসিকে হুকুম করেছি—অবিলম্বে আমাদের জন্যে একটা ক্ষুদ্দুর ফ্ল্যাট ঠিক করে রাখতে,

আমার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করে রাখতে. আর আমাদের বিয়ের সাক্ষী হতে। ব্যাস!'

সত্যবান হেসে ফেলে বলে, 'সাক্ষী হওয়াটা না হয় হলো! কিন্তু বাকি দুটো ? সে দুটো তো গাছের ফল নয় যে ছিঁড়ে এনে তোমার হাতে তুলে দেবেন।'

'গাছের ফল নয় বলেই তো পিসিকে ভার দিচ্ছি। গাছের ফল হলে তো যে কোনো বন্ধুবান্ধবকেই বলতে পারতাম।'

'বেশ বাবা! তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝবে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে করবো!'

'ঠিক আছে। এসো মা গঙ্গাকে নমস্কার করো।'

হাত জোড় করে শম্পা।

সত্যবানও অগত্যা।

তারপর দুজনেই নেমে আসে সেই ভগ্নদশাগ্রস্ত মন্দিরচত্বর থেকে।

কিছুক্ষণ অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন হারিয়ে যায় ওরা। শুধু ওদের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে পড়া শুকনো পাতার মৃদু আর্তনাদ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ একসময় সত্যবান বলে ওঠে, 'আমার ধারণা ছিল না তুমি এসব মানো টানো—'

শম্পা যেন অন্য জগতের কোথাও চলে গিয়েছিল, ওর কথায় চমকে উঠে বলে, 'কী সব?'

'এই মা গঙ্গা-টঙ্গা, নমস্কার-টমস্কার—'

'আমারই কি ধারণা ছিল ছাই!' শম্পা কেমন একরকম হেসে বলে, 'নিজের থেকে অচেনা আর কেউ নেই।'

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতায় কাটে, আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে ওরা, একসময় শম্পা বলে ওঠে, 'বিয়ের পর আবার এখানে আসবো আমরা। সেজপিসির কাছে।'

সত্যবান কোনো উত্তর দেয় না।

বিয়েটাই সত্যি হবে, এমন কথা নিশ্চয় করে যেন ভাবতেই পারছে না ও. সামনেটা তাকালেই কেমন ঝাপসা-ঝাপসা লাগে। এই যে সুন্দরী সুকুমারী বিদুষী আধুনিকা নারীটি এখন তার পাশে পাশে চলেছে, সত্যিই কি সে চিরজীবন তার পাশে পাশে থাকবে? একসঙ্গে চলবে পায়ে পা মিলিয়ে?

ভাবতে গেলেই ভয়ানক একটা অবিশ্বাস্য অবাস্তবতার অন্ধকারে তলিয়ে যায় ভাবনাটা।

কিন্তু আরও একটা অন্ধকার গহ্বর যে অপেক্ষা করছিল সত্যবান নামের ছেলেটার জন্যে. তা কি জানতো ছেলেটা?

কলকাতায় ফিরে দেখলো যে-আগুন অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াচ্ছিল, সে আগুন জ্বলে উঠেছে। ফ্যাক্টরীতে লক্‌আউট, মালিকপক্ষ অনমনীয়। ওদিকে ইউনিয়নের পাণ্ডারাও ততোধিক অনমনীয়, অতএব আকাশ-ফাটানো চিৎকারে গলাফাটানো চলছে ফ্যাক্টরীকে ঘিরে, সকাল সন্ধ্যে দুপুর।

সেই এক ধ্বনি, 'চলবে না, চলবে না।'

সত্যবান দেখলো, ওকে দেখে ওর সহকর্মীরা মুখ বাঁকালো। শুধু ওর বন্ধু কানাই পাল বলে উঠলো, 'এতদিন কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে ছিলে চাঁদু!'

সত্যবান শুকনো গলায় বলে, 'ঘাপ্‌টি মারা আব্বার কি! অসুখ করেছিল।'

'অসুখ! আহা রে, লা লা! চুক চুক! আর আমরা সবাই এখানে সুখের

সমন্দদুরে ভাসছিলাম!'

'অবস্থা তো বেশ ঘোরালো দেখছি।'

'আরো কত দেখবি দাদু!'

ফালতু কতকগুলো কথা হলো, তারপর ভাবতে ভাবতে চললো সত্যবান দাস, কেমন করে বাংলা সাহিত্যের সেই বিখ্যাত লেখিকা অনামিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করা যায়।

মনটা বিষণ্ণ লাগছে।

কানাই পালের গলায় যেন আগেকার সেই অন্তরঙ্গতার সুর শুনতে পেল না সত্যবান। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির মাঝখানে তার জায়গাটা যেন হারিয়ে গেছে।

আশ্চর্য, এই রকমই কি হয় তাহলে?

হৃদয়ভূমির দখলী স্বত্বটুকু বজায় রাখতেও নিয়মিত খাজনা দিয়ে চলতে হয়?

তাহলে অনামিকা দেবীর সেই ভাইঝিটির হৃদয় থেকে—

কিন্তু সত্যবানের মতো এমন একটা তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর হতভাগার জন্যে কি সত্যিই সেই অলৌকিক আশ্চর্য হৃদয়ে জমির বন্দোবস্ত হয়েছে?

'রক্তের বদলে রক্ত চাই।
খুনের বদলে লাল খুন!
জুলুমবাজি বন্ধ করো—
নিপাত যাও, নিপাত যাও!'

গাড়িটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ যেন সমুদ্র গর্জে উঠলো। থেমে পড়লো গাড়ি।

রাস্তার এক ধার থেকে অন্য ধারে যাচ্ছে ওরা, একবার দম ফেলতে-না-ফেলতে আবার গর্জন করে উঠছে।

থেমেই থাকতে হলো গাড়িটাকে। কারণ ইতিমধ্যে সামনে গাড়ির এক বিরাট লাইন হয়ে গেছে।

যতক্ষণ না ওদের দীর্ঘ অজগর দেহ পথের শেষবাঁকে মিলিয়ে যাবে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল, আকাশ সারাদিন অগ্নিবৃষ্টি করেছে, পৃথিবী এখনো সেই দাহর জ্বালা ভিতরে নিয়ে তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আকাশ হঠাৎ এখন গুম হয়ে গেছে।

নিশ্চল গাড়ির মধ্যে গরমে দম বন্ধ হয়ে আসছে। নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে আছেন অনামিকা ওই দীর্ঘ অজগর দেহটার দিকে।

গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে বাতাসের বদলে আসছে মাটি থেকে উঠে আসা একটা চাপা উত্তাপ। যতক্ষণ গাড়ি থেমে থাকবে, এই অবস্থাই চলবে। উত্তাপ বাড়তেই থাকবে।

কিন্তু উপায় কি?

গাড়িকে পিছিয়ে নিয়ে অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়বার কথাও এখন আর ভাবা যায় না। পিছনে কম করে অন্তত খান-তিরিশ গাড়ি তালখেজুরের মতো গায়ে গায়ে লেপটে দাঁড়িয়ে পড়ে আছে। ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, লরি, রিকশা, ঠ্যালাগাড়ি। তবু বাস-ট্রাম নয় এই ভালো।

এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়।

বাড়ি থেকে একটু দূরপথে পাড়ি দিতে হলে, নিত্যই পথে দু'একবার ওরকম অজগরের মুখে পড়তেই হয়। থেমে যেতে হয়। ওদের পথ তো অবারিত রাখতেই

হবে, ওরা তো আর অন্যের পথ ছেড়ে দিতে থেমে যাবে না!

'লাল খুন' জিনিসটা কি তা জানেন না অনামিকা। আজকের দিনের কতো কিছুই জানেন না তিনি। জানেন 'খুন' শব্দটাই ভয়ঙ্কর একটা লালের ইশারাবাহী।

কোন্ খুনের বদলে এই 'লাল খুনে'র ঘোষণা, সেটা ধরতে পারা যাচ্ছে না, কারণ ওদের বাকি কথাগুলো দ্রুত, অস্পষ্ট।

গর্জিত সমুদ্রের ঢেউ থেকে জলের যে বলয়রেখা শ্রবণযন্ত্রের উপর আছড়ে আছড়ে এসে পড়ছে তা হচ্ছে—'রক্ত চাই' আর 'নিপাত যাও'।

কিন্তু কে কোথায় নিপাত যাবার অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে, তা শোনবার গরজ কারো নেই। সত্যিই যদি তেমন কেউ রাতারাতি নিপাতিত হয়, আগামী সকালের কাগজেই তো দেখা যাবে। এখন যে যার গন্তব্যস্থানে যেতে পারছে না, সেটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো কথা।

আর বোধ করি এই তিরিশ-চল্লিশখানা গাড়ির মধ্যে অনামিকা দেবীর গাড়িখানা আটকে পড়ে থাকাই হচ্ছে সব চেয়ে ভয়ানক কথা।

সাড়ে ছটায় সভা শুরু হবার কথা, অথচ এখানেই সাড়ে ছটা বাজলো। এখন পাক্কা চার মাইল যেতে হবে।

একেই তো যে ভদ্রলোক তাঁর গাড়িখানি ওদের জয়ন্তী উৎসবের জন্যে ঘণ্টা দুইয়ের জন্যে উৎসর্গ করেছেন, তিনিই দেরি করে ফেলেছেন পাঠাতে, তার উপর আবার যে ছেলে দুটি সভানেত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজনের গরমে মাথা ঘুরে গিয়েছিল বলে, রাস্তায় নেমে কোকোকোলা খেতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

ভেবেছিল মেক আপ করে নেবে, হঠাৎ এই বিপত্তি।

যম জানে প্রধান কর্মকর্তা 'নেপালদা' কী করছেন এখন। এতক্ষণ তো পৌঁছে যাবার কথা তাদের সভানেত্রীকে নিয়ে। কী আর করছেন? মাথার চুল ছিঁড়ছেন নিশ্চয়।

চীফ গেস্ট বলেছিলেন ঠিক সময়ে সভা শুরু করতে হবে, আর তাঁর ভাষণটি দিয়েই চলে যেতে হব তাঁকে। কারণ মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় তিনি এই 'সবুজ শোভা সংঘ'কে দিতে পারেন, তার পরই দু-দুটো সভা রয়েছে তাঁর।

পৌরপ্রধানকে প্রধান অতিথি করতে চাইলে এ ছাড়া আর কি হবে? আর কি হতে পারে? তাঁকে যে সবাই চায়!

অবশ্য কেন যে চায়, তা তিনি ভালই জানেন, কিন্তু সে কথা তো প্রকাশ করা যায় না। তাঁকে যে কেবল 'তিনি' বলেই চায়, এটুকু শুনতেও ভালো বলতেও ভালো। তিনি বিনয়ে ভেঙে পড়ে বলবেন, 'আমার মতো অযোগ্যকে কেন বলুন তো? আমি কবি নই, সাহিত্যিক নই—'

ফাংশানটা হাওড়া নবীনগর সবুজ শোভা পাঠাগারের...পাঠাগারের বয়েসও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু নিজস্ব একটি বাড়ি তাদের নেই, একটুকরো জমি মুফতে পেয়ে গেলে বাড়িটা হয়ে যায়। সেই না থাকার বেদনাটি মুছে ফেলতে যত্নবান হচ্ছে পাঠাগারের কর্মীরা। সেই যত্নের প্রধান সোপান পৌরপ্রধানের গলায় পুষ্পমাল্য অর্পণ।

তা সেই পৌরপ্রধান এসেই তো গেছেন নিশ্চয়। মনে হচ্ছে আর্টিস্টরাও এসে গেছেন কেউ কেউ। কারণ তাঁদেরও তো দু'দশ জায়গায় বায়না।

মাসটা কী দেখতে হবে তো?

বাংলা পঞ্জিকায় জ্যৈষ্ঠ মাস হলেও আসল ক্যালেন্ডারে তো মে মাস? তার

মানে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর মাস। আবার ওদিকে বাংলা হিসেবের সুবিধেয় নজরুল জয়ন্তীটাও পাওয়া যাচ্ছে। দুটো বড় বড় 'করণীয়' ফাংশান যদি একটি আয়োজনের মধ্যে সামলে ফেলা যায়, কম সুবিধে ?

উদ্যোক্তারা ওই সুবিধেটা লুফে নিচ্ছেন। রবীন্দ্রসংগীত গাইয়ে আর নজরুল-সংগীত গাইয়ে, দুদলকেই যোগাড় করে ফেলে একই খোঁয়াড়ে পুরে ফেলে কর্তব্য পালনের মহৎ আনন্দ অনুভব করছেন।

দুজনে কাছাকাছি তারিখে জন্মে সুবিধে করে দিয়েছেন ঢের। গাইয়ে দল দুটো লাগলেও, হল্ প্যাণ্ডেল সভাপতি প্রধান-অতিথি ফুলদানি ধূপদানি মাইক মণ্ডসজ্জা, এগুলো তো দু'ক্ষেপ লাগছে না ? কম সুবিধে ?

কিন্তু এ কী অসুবিধেয় ফেললো ওই শোভাযাত্রাকারীরা !

ছেলে দুটো গাড়িতে বসে হাত-পা আছড়াচ্ছে।

অনামিকা ঘামতে ঘামতে বলেন, 'কোনোরকমে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না ?'

'পাগল হয়েছেন ! সামনে পেছনে দেখুন না তাকিয়ে !'

'কিন্তু তোমরা তো বলেছিলে, মাত্র দু'ঘণ্টার জন্যে হলটা ভাড়া করেছো তোমরা, সাড়ে আটটার মধ্যে শেষ করতেই হবে, পরে ওখানে অন্য ফাংশান আছে। হল ছেড়ে দিতে হবে !'

'সে তো হবেই। দেরি করলে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে !'

'আরে, কী যে বল !' অনামিকা কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেলেন।

ছেলে দুটো উদাত্ত স্বরে বলে, 'আপনি জানেন না স্যার, সরি মাসিমা, ওরা কী ইয়ে লোক ! সময় হয়ে গেলেই ফট্ করে আলো-পাখা বন্ধ করে দেবে !'

'তাহলে তো দেখছি তোমাদের অনুষ্ঠান আজ আর হবেই না। এখানেই তো সওয়া-সাতটা বাজলো। ওদের দল তো দেখছি অফুরন্ত, আস্তে আস্তে হেঁটে আসছে। ওরা চলে যাবে, তারপর সামনের ওই গাড়িগুলো পার হবে—তারপর আরো তিন-চার মাইল—'

'সব ভাবছি মাসিমা, মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে। ইঃ, আমরা যদি ঠিক এর আগেরটায় পার হয়ে যেতে পারতাম ! পুলিনবাবুই এইভাবে ডোবালেন !'

'পুলিনবাবু !'

'চিনবেন না।' একটা ছেলে যেন কাঠে কাঠ ঠুকে কথা বলছে, 'আমাদের সাধারণ সম্পাদকের শালা, গাড়িটা দেবেন বলেছিলেন, তাই আর ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি করা হলো না। দিলেন একেবারে লাস্ট মোমেণ্টে। ওদিকে মেয়র এসে বসে আছেন—'

অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'তিনি কি আর সভানেত্রীর জন্যে বসে থাকবেন ? এতক্ষণে ভাষণ শেষ করে চলে গেছেন।'

'তাই সম্ভব। ওঁর তো আর আপনাদের মতন অগাধ সময়—মানে ইয়ে, ওঁর তো অনেক কাজ—'

অনামিকা রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে বলেন, 'সে তো নিশ্চয়।'

ছেলেটা বলে, 'তবে আর কি, আপনাকে দিয়ে একটা প্রস্তাব তাঁর কাছে পেশ করবার কথা ছিল তো—'

'ওঃ তাই বুঝি ? কিসের প্রস্তাব ?'

'ওই আর কি, জমি-টমির ব্যাপারে, শুনবেন গিয়ে। তাই ভাবছি আপনাকে নিয়ে গিয়ে ফেলতে না পারলে, নেপালদা আমাদের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে।'

অনামিকা এই মধুর ভাষার আঘাতে প্রায় চমকে উঠে বলেন, 'তোমাদের কী

দোষ ?

ওদের মধ্যে দ্বিতীয়জন উদাস গলায় বলে, 'সেকথা আর কে বুঝবে বলুন? বলবে তোমাদের তিনটের সময় পাঠিয়েছিলাম—'

'তিনটের সময় ? বল কী ?'

ওরা পরস্পরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে বলে, 'ব্যাপারটা মানে উনি পাঠিয়ে ছিলেন পুলিনবাবুর বাড়িতে, পুলিনবাবু গাড়ি ছাড়লেন সাড়ে পাঁচটার সময়। তারপর আবার গরমে মাথা ঘুরে এ আবার শরবৎ খেতে নামলো। আর আপনার বাড়িটিও সোজা দূরে নয়!'

অনামিকা আর কথা বললেন না, মৃদু হাসলেন। কার থেকে দূরে আর কার কাছাকাছি হওয়া উচিত ছিল, সে প্রশ্ন করলেন না।

অবশেষে কোনো এক সময় পথ মুক্ত হলো, সামনের গাড়ি সরলো, গাড়ি নবীনগরের দিকে এগোলো।

ওরা যখন সভানেত্রীকে নিয়ে পৌঁছলো, তখন সমাপ্তি-সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। সভানেত্রীর প্রতি আর কেউ বিশেষ দৃষ্টিপাত করলো না, সম্পাদক মশাই থমথমে মুখে ওঁকে হলের পিছন দরজা দিয়ে নিয়ে মঞ্চে তুললেন একবার। ঘোষণা করলেন, অনিবার্য কারণে সভানেত্রী ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারেননি, এখন এসে পৌঁছুলেন।

সেই 'অনিবার্য'টা যে কার তরফের, সেটা ব্যক্ত হলো না।

গান চলতে লাগলো।

হলের মালিকের লোক তাড়া দিচ্ছে, সভানেত্রীর ভাষণ হবার সময় নেই, তবু তিনি যে সত্যিই তিনি, এইটুকু জানাতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়াতেই হলো।

তার আগে অনামিকা প্রশ্ন করলেন, মানে শুধু একটু কথা বলার জন্যেই বললেন, 'প্রধান অতিথি এসেছিলেন?'

সম্পাদক গম্ভীর মুখে বললেন, 'না, জরুরী কাজে আটকা পড়ে গেছেন— ফোন করে জানালেন।'

হল্ ছেড়ে দিতে হলেও, অনামিকা ছাড়ান পেলেন না। লাইব্রেরীর ঘরে গিয়ে বসতে হলো ওঁকে। চা-সন্দেশ না খাইয়ে তো ছাড়বে না! তাছাড়া লাইব্রেরীর জন্ম-পত্রিকা দেখানো থেকে তার এই তেইশ বছরের জীবনের ইতিহাস সমস্ত শোনানোও তো দরকার। অনামিকার সঙ্গে পৌরপ্রধানের আলাপ হয়েছে, উনি যদি—

অর্থাৎ এতটা পেট্রল খরচ করে এনে কোনো কাজে লাগাতে না পারলে---

রাস্তায় বিঘ্নের কথা উঠলো।

স্থানীয় এক ভদ্রলোক উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওদের দোষ কি বলুন? ওদের সামনে আশা নেই, ভরসা নেই, ভবিষ্যৎ নেই—বেকারত্বের যন্ত্রণায় সর্বদাই খুন চেপে আছে ওদের মাথায়—জানেন, বাংলা দেশে আজ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কতো ? চাকরি নেই একটা—'

সাধারণতঃ এ ধরনের কথায় তর্ক করেন না অনামিকা, করা সাজেও না, এ কথার প্রতিবাদ করা মানেই তো সহানুভূতিহীন, অমানবিকতা, কিন্তু আজ বড় কষ্ট গেছে, বৃথা কষ্ট, তাই হঠাৎ বলে ফেললেন, 'খুন যে কার কখন চাপে, তার হিসেব কি রাখা যায় ? চাকরি নেই বলে কি কিছুই করার নেই ?'

'কী করবে?'

উনি প্রায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'ব্যবসা ? মূলধন দেবে কে?'

অনামিকা তর্কেই নামলেন, কারণ ভদ্রলোকের ভঙ্গী দেখে মনে করা যেতে

পারে, এই বিপুলসংখ্যক বেকারের জন্য অনামিকাও বুঝি অনেকাংশে দায়ী।

অনামিকা বললেন, 'কেউ কাউকে কিছু দেয় না, বুঝলেন? সে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। নিজের জীবনের মূলধন নিজেই সংগ্রহ করতে হয়।'

'হয় বললেই হয়!' ভদ্রলোক প্রায় খিঁচিয়েই ওঠেন, 'একটা যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলুন!'

অনামিকা গম্ভীর হেসে বলেন, 'আমার কাছে একটাই যুক্তিগ্রাহ্য কথা আছে, আমাদের এই বাংলা দেশে অবাংলা প্রদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ বেকার এসে হাজির হয়, বছরে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে, তারা সকলেই দেশ থেকে রাশি রাশি মূলধন নিয়ে আসে এ বিশ্বাস আমার নেই। অথচ তারা যে ওই টাকাটা লোটে এটা অস্বীকার করতে পারেন না। এই বাংলা দেশ থেকেই লোটে। কী করে হয় এটা?'

ভদ্রলোক এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন, তারপর আবার পূর্ণোদ্যমে বলেন, 'ওদের কথা বাদ দিন। ওরা একবেলা ছাতু খেয়ে, একবেলা একটু লঙ্কার আচার দিয়ে আটার রুটি খেয়ে কাটিয়ে "ব্যেবসা-ব্যেবসা" করে বেড়াতে পারে। আমাদের ঘরের ছেলেরা তো আর তা পারবে না!'

'কিন্তু কেন পারবে না?'

ভদ্রলোক তীব্রকণ্ঠে বলেন, 'এ আর আমি কি বলবো বলুন? বাঙালীর কালচার আলাদা, রুচি আলাদা, শিক্ষাদীক্ষা আলাদা—'

'তবে আর কি করা!' হাসলেন অনামিকা।

ঠিক এই সময় একটি ছেলে এসে বলে ওঠে, 'একটা লোক আপনাকে খুঁজছে।'

'আমাকে?' চমকে উঠলেন অনামিকা। 'কী রকম ছেলে?'

'মানে আর কি এমনি! খুব কালো, একটু ইয়ে ক্লাসের মতো—

খুব কালো! একটু ইয়ে ক্লাসের মতো!

অনামিকা এক মুহূর্তে আকাশপাতাল ভেবে নিলেন। বললেন, 'কী বলছে?'

'বলছে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবে—'

'কারণ বলছে না কিছু?'

'বলেছে। বলেছে, আপনার কাছে কার একটা চিঠি পৌঁছে দিতে এসেছে।'

কী চিঠি? কার চিঠি?

সমস্ত মনটা আলোড়িত হয়ে উঠলো। আস্তে বললেন, 'আচ্ছা এখানেই নিয়ে এসো।'

ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠলো। এখানে কেন রে বাবা?

কে কী মতলবে খোঁজ করছে? দিনকাল খারাপ।

খোঁজ করলে ওঁর নিজের বাড়িতে করুক গে না, হঠাৎ এরকম জায়গায়?

অথচ সভানেত্রীকে মুখ ফুটে বলা যায় না, আপনি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখুন না। সকলেই তাই একটু শুধু ঠিক হয়ে বসেন।

লোকটা এসে দরজার কাছে দাঁড়ায়, বোধ করি সকলের উদ্দেশেই একটি নমস্কার করে, তারপর খুব সাবধানী গলায় বলে, 'আপনাকে দেবার জন্য একটা চিঠি ছিল—'

অনামিকা একবার ওর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নেন, সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে ওঠে, 'এ সেই।'

না, কোনো দিন অনামিকা ওকে চোখে দেখেননি, তবু যেন চেনাই মনে হলো। চেয়ার থেকে উঠে একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'কে দিয়েছে চিঠি?'

'পড়লেই বুঝতে পারবেন।'

প্যান্টের পকেট থেকে টেনে বার করে বাড়িয়ে ধরলো।

মুখ-আঁটা খাম!

কিন্তু খামের ওপরে লেখা অক্ষরগুলোর ওপরেই যে ভেসে উঠলো একখানা ঝকঝকে মুখ!

অনামিকা আস্তে বললেন, 'কোথায় আছে ও ?

'সবই লেখা আছে।'

'আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও, চলে যেও না।' ঘুরে দাঁড়ালেন অনামিকা। এঁদের বললেন, 'দেখুন একটু জরুরী দরকারে আমায় এক্ষুনি যেতে হবে, দয়া করে যদি গাড়িটা—'

'সে কি! আপনি তো চা-টা কিছুই খেলেন না ?'

'থাক্, ইচ্ছে করছে না। গাড়িটা একটু—'

একটু!

তার মানে তাড়াতাড়ি?

কিন্তু সেটা হবে কোথা থেকে?

পুলিনবাবুর গাড়ি তো আর বসে নেই, সে তো সভানেত্রীকে পৌঁছে দিয়েই পুলিনবাবুর কাছে পৌঁছে গেছে।

অতএব ?

অতএব ট্যাক্সি।

অতএব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

চিঠিখানা হাতের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের মতো জ্বলছে।

কিন্তু এখানে কোথায় খুলবেন ?

এ চিঠি কি এইখানে খুলে পড়বার?

যে ভদ্রলোক তর্ক ফেঁদে ছিলেন, তিনি হতাশ হয়ে যান এবং বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বুড়োদাকে বললেন, 'যত সব এঁড়ে তর্ক, বুঝলে বুড়োদা ? এত বড় একটা সমস্যাকে উনি একেবারে এক কথায় নস্যাৎ করে দিতে চান। যেন বেকার সমস্যাটা একটা সমস্যাই নয়!'

'বলবেন না কেন ভায়া? বড়লোকের মেয়ে, বে-থা করেননি, বাপের অট্টালিকায় থাকেন, নিজে কলম পিষে মোটা মোটা টাকা উপায় করছেন, বেকারত্বের জ্বালাটা যে কী, বুঝবেন কোথা থেকে ?'

'কিন্তু ওই নিগ্রো প্যাটার্নের ছোঁড়াটা কে বল তো? চিঠিটাই বা কার? হাতে নিয়েই মুখটা কেমন হয়ে গেল, দেখলে ?'

'দেখলাম। অথচ খাম খুলে দেখলেন না, সেটা দেখলে?'

'দেখেছি সবই। তার মানে জানাই ছিল চিঠি আসবে আর কী চিঠি আসবে!'

'কিছু ব্যাপার আছে, বুঝলে? চিঠিটা দেখেই যাবার জন্যে কি রকম উতলা হলেন দেখলে। বলা হলো জরুরী দরকার! আরে বাবা, চিঠিটা তুমি খুললে না—লোকটাও কিছু বললো না, অথচ জেনে গেলে জরুরী দরকার. এক্ষুনি যেতে হবে ?'

'বললাম তো জানা ব্যাপার। কে জানে কোনো পার্টির ব্যাপার কিনা, ভেতরে ভেতরে কে যে কি করে, জানবার তো উপায় নেই!'

'ছোঁড়াটার চেহারা মোটেই ভদ্রলোকের মত নয়।'

'থাক, এখন মানে মানে পৌঁছে দাও।'

'সঙ্গে যাচ্ছে কে?'

'স্বপন এনেছে, স্বপনই যাবে।'

'ছোঁড়াটাকে তো দাঁড়াতে বললেন, যতদূর বুঝছি, ওকেও সঙ্গে নেবেন।'

'তবেই তো মুশকিল! স্বপনকে সঙ্গে দেওয়াটা ঠিক হবে? কি জানি কোন পার্টি-ফার্টির—'

যতক্ষণ না ট্যাক্সি আসে, চলতে থাকে গোপন বৈঠক এবং নিশ্চিত বিশ্বাসে ঘোষণা হয়, মহিলাটির ওপরের আবরণ যাই থাক্ কোনো পার্টির সঙ্গে যোগ-সাজস আছেই।

সন্দেহটা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হলো যখন অনামিকা দেবী বললেন, 'গাড়িটা যখন ঘরের গাড়ি নয়, ট্যাক্সি, তখন আর এ ছেলেরা কষ্ট করে অত দূর যাবে কেন, ফিরতে অসুবিধে হবে, এই ছেলেটি আমার চেনা ছেলে, ওই দিকেই যাবে, ওর সঙ্গেই বরং—'

এঁরা গূঢ় অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, তারপর সবিনয়ে বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে? আমরা নিয়ে এলাম—'

'তাতে কি, আমি তো নিজেই বলছি, চিন্তার কিছু নেই!'

গাড়িতে উঠলেন। কাফ্রীর মত দেখতে ছেলেটাকে ডাকলেন, 'তুমি উঠে এসো।'

গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার পর ওঁরা বললেন, 'দাঁড়ান একটু দাঁড়ান, আপনার ইয়েটা—' পকেটে হাত দিলেন।

অনামিকা বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

ওঁরা পকেটের হাত পকেট থেকে বার করে নিয়ে বললেন, 'না না, এ কী! আপনি নিজে কেন—'

গাড়ি চলার শব্দে ওদের কথা মিলিয়ে গেল।

একটু সময় পার করে অনামিকা বললেন, 'তোমার নাম সত্যবান?'

সত্যবান মাথা নিচু করে বললো, 'হ্যাঁ।'

'ওর সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?'

'সে তো অনেক কথা—'

'একটুখানি কথায় বুঝিয়ে দাও না?'

সত্যবান হঠাৎ মাথাটা সোজা করে বসে।

স্পষ্ট গলায় বলে, 'রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে উনি আমার মেসে উঠেছিলেন, তার পর আমাকে নিয়ে চন্দননগরে সেজপিসির বাড়ি—'

'চন্দননগরে! সেজপিসির বাড়ি!' অনামিকা প্রায় আর্তস্বরে বলে ওঠেন, 'ওইখানেই আছে শম্পা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমিও ছিলাম। ফিরে আসার উপায় ছিল না, খুব অসুখ করে গিয়েছিল—'

আস্তে আস্তে শম্পার খবর জানা হয়।

অনামিকার হঠাৎ সেজদির উপর দারুণ একটা অভিমান হয়। কত কষ্ট পাচ্ছিল বকুল, সেটা কি খেয়ালে আসা উচিত ছিল না সেজদির?

মনের অগোচর কিছু নেই, স্বয়ংবরা শম্পার পছন্দর খুব তারিফ করতে পারছিলেন না অনামিকা। তবু মনের মধ্যে একটি প্রত্যয় ছিল শম্পা সম্পর্কে। তাই ওর সঙ্গে মমতার সঙ্গেই কথা বলছিলেন।

'কি লিখেছে তুমি জানো?'

'না। এমনি বন্ধ খামই দিয়েছেন।'

দিয়েছেন! অনামিকার একটু হাসি পেল।

এই সমীহ নিয়েই কি ওরা ঘর করবে? বাদশাজাদি ও কাফ্রী ক্রীতদাসের মত?

রাত হয়ে গিয়েছিল যথেষ্ট, ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি বেশ ভালই চলছিল, হঠাৎ আবার তখনকার মতই থামতে হলো। আবার শোভাযাত্রা!

না, এখন আর রক্তের বদলে রক্ত চাইছে না শোভাযাত্রীরা। আলোর রোশনাইয়ে চোখ ঝলসে দিয়ে ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে।

বর যাচ্ছে বিয়ে করতে।

অনামিকার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠলো। আজকের যাত্রাটা মন্দ নয়। যাত্রাকালে খুনের বদলে লাল খুন, ফেরার কালে বাজনা-বাদ্যি-আলো-বাতি।

তবে পথ আটকাচ্ছে দুটোতেই।

এই হচ্ছে কলকাতার চরিত্র।

ও এক চোখে হাসে, এক চোখে কাঁদে। এক হাতে ছুরি শানায়, অন্য হাতে বাঁশী বাজায়।

বাড়ির কাছাকাছি আসার আগেই সত্যবান বললো, 'আমি নেমে যাই!'

'কিন্তু চিঠিটা তো আমি এখনো পড়িনি। পড়ে দেখি যদি কিছু জবাব দেবার থাকে!'

'না, না, সে আপনি চিঠিতেই দেবেন। আমি তো এখন আর যাচ্ছি না।'

অনামিকা এবার সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেছে?'

ও মাথা নিচু করে, 'না।'

'তাহলে এভাবে এতদিন একত্রে ঘুরছো যে?'

অনামিকার কণ্ঠ কঠোর।

আসামী মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, 'আপনি কি বলেন, বিয়ে হওয়া উচিত?'

'আমার বলার উপর কিছু নির্ভর করছে না। সেজপিসি তোমাদের এ বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'না।'

সত্যবান হঠাৎ কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, 'উনি এক আশ্চর্য মানুষ! অদ্ভুত ভালো। আমি এ রকম উঁচুদরের মানুষ জীবনে দেখিনি। কোথা থেকেই বা দেখবো! গ্রামঘরের ছেলে, কুলিমজুরের কাজ করি—অবশ্য ওর মুখে আপনার কথাও শুনেছি—মানে শম্পা দেবীর মুখে—'

অনামিকা হেসে ফেলেন, 'যাক, আমি তোমাদের সেজপিসিকে হিংসে করবো না, তবে আমার মতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি করে ফেলাই ভালো।'

'উনিও তাই বলেন—মানে, শম্পা দেবী। আমি ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে—'

'কেন? তোমার মনস্থির নেই?'

সত্যবান ম্লানমুখে বলে, 'সত্যিই বলেছেন। আমার ভয় করে। সত্যিই তো আমি যোগ্য নই।'

'নিজের যোগ্যতার বিচার সব সময় নিজে করা যায় না বাপু। অনিবার্যকে মেনে নিতেই হয়। মেয়েটা যখন বাড়ি থেকে চলে গিয়ে তোমাকে ধরেই ঝুলে পড়েছে, তোমার আর করার কিছু নেই। কিন্তু একটু বসে যাবে না?'

'ও, না না। আপনাদের ওই বাড়ির কাছাকাছি যাওয়া নিষেধ।'

ও নেমে পড়ে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

অনামিকা আর একটু এগিয়ে এসে নামেন, ভাড়া মিটোন। আস্তে আস্তে বাড়ি ঢোকেন, তিন তলায় ওঠেন।

নিজে নিজেই ভারী অবাক লাগছে।

ওই ধরনের একটা ছেলেকে পাশে বসিয়ে গল্প করতে করতে আসছেন, আগে কখনো এমন ঘটেনি। অথচ বিতৃষ্ণা আসছিল না। তাছাড়া কেমন একটু স্নেহ-স্নেহ মমতা-মমতাই লাগছে। আহা বেচারী, ভয় পেতেই পারে।

কিন্তু শম্পার এ খেয়ালই কি টিকবে? আমার শম্পা নতুন হৃদয় খুঁজতে যাবে না তো?

চিঠিখানা হাতের মধ্যে থেকে ব্যাগে পুরেছিলেন, তবু যেন হাতটায় কিসের স্পর্শ লেগে রয়েছে। ভিতরে কী তোলপাড়ই চলছে! তবু শান্ত মূর্তির অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন। সারাজীবন ধরে যা রপ্ত করেছেন।

চিঠিটা কি পড়ে ফেলতে পারতেন না এতক্ষণ? রাস্তায় কি আলো ছিল না?

কিন্তু পড়েননি। নিজেকে সংবরণ করেছেন এতক্ষণ।

কারণ চট্ করে ওই পরম পাওয়াটি ফুরিয়ে ফেলার ইচ্ছে হচ্ছিল না। ধীরে-সুস্থে নিজের ঘরে বসে আস্তে ওর আবরণ উন্মোচন করবেন, আস্তে আস্তে উপভোগ করবেন। তাই অনুমান পর্যন্ত করতে চেষ্টা করছেন না কী লেখা আছে চিঠিতে! কী থাকতে পারে?

হয়তো ডাকে আসা চিঠি হলে এ ধৈর্য রাখতে পারতেন না, ভয় হতো, কোথাও কোনোখানে বিপদের মধ্যে পড়েনি তো মেয়েটা!

কিন্তু ধৈর্য ধরতে পারছেন, কারণ চিঠিটা এসেছে একটা ভরসার হাত ধরে।

* * *

অক্ষরগুলো যেন পুরনো বন্ধুর মুখ নিয়ে হাসিতে ঝলসে উঠলো।

'পিসিগো, একটা আস্তানার অভাবে বিয়ে করতে পারছি না, বল তো এমন হাড়দুঃখী ত্রিজগতে আর আছে? যাক গে, এখন অগতির গতি তোমাকেই ধরাচ্ছি, চট্‌পট যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলো। আর শোনো—একটা চাকরিও খুব তাড়াতাড়ি দরকার। মানে সামনের মাস থেকেই জয়েন করতে চাই। জানো তো সবই, তাছাড়া দেখলেই বাকিটা বুঝতে পারবে (মানে পত্রবাহকই তো সেই অবতার)। চালাতে পারবে না বলে রেজিস্ট্রী অফিসের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে যেতে রাজী হচ্ছে না। ঝোঝো আমার জ্বালা!

বুঝে নিয়ে চট্‌পট ওই দুটো ঠিক করে ফেলে খবর দাও। নইলে মুখ থাকবে না।

সেজপিসির বাড়িতেই রয়েছি এযাবৎ, বোঝো কী রকম বীরাঙ্গনা! বাপের ওপর তেজ দেখিয়ে বাপের বোনের বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠলাম। আবার একা নয়, সবান্ধবে! পিসি তাকে খাইয়ে শুইয়ে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ-পথ্যি করিয়ে আবার পথে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ছাড়া গরু পাছে হারিয়ে যায় এই ভয়ে মরছি। তাড়াতাড়ি খোঁয়াড়ে পুরে ফেলা দরকার। তাই ওই খোঁয়াড়টাই আগে দ্যাখো, বুঝলে? অবিশ্যি সঙ্গে সঙ্গে চাকরিটাও। নিজের স্বার্থেই কর বাবা, নচেৎ যতদিন না জুটবে, তোমার ঘাড়ই তো ভাঙবো। শাখামৃগের মতো এ শাখা থেকে ও শাখা, এ পিসির ঘাড় থেকে ও পিসির ঘাড়ে।

বলবে না তুমি অবিশ্যি, তবে বলতে পারতে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময়

তো একবার বলেও গেলি না, আর ডুব মেরে বসে আছিল তো আছিসই, এখন কোন্ লজ্জায় এতো জোর খাটাতে এলি ? অন্য কেউ হলে বলতো নির্ঘাত।

কিন্তু অন্য কেউ হলে কি জোরটা খাটাতে বসতাম ? তুমি বলেই তাই। আচ্ছা পিসি, সেজপিসি আর তুমি—ঠাকুর্দার এই দুটো মেয়ে পালিতা কন্যা-টন্যা নয় তো ? কুড়নো-টুড়নো ? নইলে ধমনীতে রাজরক্তের চিহ্ন দেখি না কেন ? যাক, দেখা হলে অনেক গল্প হবে। এখন দেখার যোগাড়টা যাতে হয় তাড়াতাড়ি করো। বাসাটায় একটু বারান্দা যেন থাকে বাপু, আর পার তো দুটো বেতের মোড়া কিনে রেখো।...কী ? ভাবছো তো, আহা যোগাড় করেছেন তো একটি নিধি ! চাষা কুলি, তার জন্যে আবার বেতের মোড়ার চিন্তা ! কী করবো বল ? যেমন কপাল ! ও ছাড়া তো জুটলোও না আর। তবে চুপি চুপি বলি পিসি, মালটা খাঁটি। নির্ভেজাল।... তোমার ভাই-ভাজের খবর কী ? কন্যাহারা চিত্ত নিয়ে দুজনে পরস্পরের দোষ দিয়ে অহরহ ঝগড়া করছেন ? এবার তাহলে কলম রাখছি।

আর একবার কথা দুটো মনে করিয়ে দিচ্ছি।

ভালবাসা নিও।

ইতি

সেই পাজি মেয়েটা

অনামিকার মনে হলো অনেকদিনের অনাবৃষ্টির পর বড় সুন্দর বড় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

নেমে এলেন।

আহ্লাদে মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কী আনন্দ, কী মুক্তি !

অবিশ্যি এমন দুটি কাজের ভার দিয়ে বসেছে, যা গন্ধমাদন-তুল্য। তবু ভারী হাল্কা লাগছে।

কিন্তু এখন কী করা যায় ?

ছোড়দা-ছোটবৌদিকে জানাবেন না ?

আহা, তাই কী উচিত ? বেচারীরা কী অবস্থায় রয়েছে !

তাছাড়া ছোড়দার কাছে কথা দেওয়া আছে। খবর এলেই জানাবো।

কথা দেওয়ার কথা আলাদা।

তবে শম্পার মা-বাপ খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই। যদিও খারাপের ভান করছেন।

আসলে কিন্তু মেয়ের খবর তাঁরা অনেকদিনই পেয়েছেন। পারুলের ছেলে মোহনলাল জানিয়ে দিয়েছিল তার মামার বাড়িতে।

মামাদের সঙ্গে সাতজন্মে যোগাযোগ নেই। তাতে কি ? এরকম এমার্জেন্সি কেসএ সেসব মান-অভিমান মনে রাখা চলে না।

অবশ্য মামার বাড়িতে খবর দেবার উদ্দেশ্যটা ঠিক মামার দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে নয়, ভেবেছিল খবর পেলেই মামা মেয়েকে ঘাড় ধরে নিয়ে চলে আসবে, আর সেই অসভ্য বাঁদরটাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে।

বুদ্ধিমান মামা সেদিক দিয়ে যায়নি।

পারুলের কাছে আছে। এর পর আর কি আছে ?

কিন্তু অনামিকা তা জানতেন না।

অনামিকা তাই ভাবতে ভাবতে নামলেন, কী ভাবে কথাটা উত্থাপন করবেন। ওরা যদি বলে, কই চিঠিটা দেখি !

নিচে এলেন।

খাবার ঘরের সামনে ছোটবৌদি দাঁড়িয়ে।

অনামিকাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এসেই ওপরে উঠে গেলে, একটা কথা বলার ছিল—'

চকিত হলেন অনামিকা।

ব্যাপারটা কি ? কি কথা বলার জন্যে উনি অমন মুখিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ? সভ্যবানকে কেউ দেখেছে নাকি ? অনামিকার সঙ্গে এক গাড়িতে আসতে ? হয়ত তাই।

তার মানে কাঠগড়ায় তুলবেন ইনি ওঁর ননদিনীকে। অনামিকা শান্ত হাসি হেসে বললেন, 'কী বলো ?'

বৌদি বললেন, 'আচ্ছা এখন থাক্, খেয়ে নাও আগে।'

বৌদির গলার সুরে যেন ঈষৎ করুণা।

যেন যা বলবেন, খাইয়ে-দাইয়ে বলবেন।

অর্থাৎ বক্তব্যটা অন্য ধরনের। কিম্বা ফাঁসিই দেবেন, তাই তার আগে—

'খেয়ে নেবার কী আছে ? কী হয়েছে ? হঠাৎ কী হলো ?' বললেন অনামিকা দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু কী হয়েছে, কী হলো, তা কি অনামিকার ধারণার ধারে কাছে ছিল ?

অথচ একেবারে না থাকারও কথা নয়। আশী বছর বয়েস হয়েছিল সনৎকাকার।

কিন্তু সেটাই কি সান্ত্বনার শেষ কথা ? বয়েস হয়েছিল, অতএব পৃথিবীর ক্ষতির ইতিহাসের খাতায় আর তাঁর নাম উঠবে না ? তাঁর চলে যাওয়ার দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে পৃথিবী !

পৃথিবীর হিসেবে তাই বটে। তাই অনামিকার কানের মধ্যে একটা ঘর্ঘর শব্দ যেন বলেই চলেছে, 'অবিশ্যি দুঃখের কিছু নেই, বয়েস হয়েছিল !'

'বয়েস হয়েছিল ?' অতএব তার আর পৃথিবীর কাছে কোনো পাওনা নেই। তার জন্যে যদি কোথাও কোনোখানে হাহাকার ওঠে, সেটা হাস্যকর আতিশয্য।

সোনা পুরনো হয়ে গেলে তার মূল্য কমে যায় না, অথচ ভালবাসার পাত্র পুরনো হয়ে গেলে তার মূল্য কমে যায়। কারণ সে আর প্রয়োজনে লাগছে না। বিচার করে দেখো, 'শোকে'র মূল কথা প্রয়োজনীয় বস্তু হারানো। যে যতো প্রয়োজনীয় তার জন্যে ততো শোক। যে পৃথিবীর আর কোনো প্রয়োজনে লাগছে না, লাগবে না, তাকে অম্লানচিত্তে বিদায় দিয়ে বলো, 'বয়েস হয়েছিল !' বলো, 'মানুষ তো চিরদিনের নয় !' আর যদি কিছুটা সৌজন্যের আবরণ দিতে চাও তো বলো, মৃত্যু অমোঘ, মৃত্যু অবধারিত, মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর মতো সত্য আর কি আছে ?'

অতএব যার ভিতরে ঋণের বোঝা, যার চিত্তে মূল্যহ্রাসের প্রশ্ন নেই, তাকে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে হবে, 'তা তো সত্যি !'

তার আর বলা সাজবে না, 'ঠিক এই মুহূর্তে খাবার থালার সামনে বসা শক্ত হচ্ছে আমার।'

তাছাড়া অনামিকা জানেন, ওই অক্ষমতাটুকু প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে মুঠো মুঠো সান্ত্বনার বাণী এসে হৃদয়ের গভীরতর অনুভূতিটির উপর হাতুড়ি বসাবে। সেই সঙ্গে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেবে লোকে, যার জন্যে তোমার এই অক্ষমতা তার বয়েস হয়েছিল।

তার থেকে অনেক ভালো খাবার পাত্রের সামনে নিঃশব্দে গিয়ে বসা, নীরবে যতোটুকু সম্ভব গলা দিয়ে নামানো। কিন্তু তাতেই কি পুরো মুক্তি পাওয়া যায়?

অনামিকাকে যারা ভালবাসে, অনামিকার জন্যে যাদের দরদ মমতা তারা কি ব্যস্ত হয়ে বলবে না, 'এ কী হলো? একটা গ্রাসও তো মুখে দিলে না? সারাদিন পরে—বাইরেও তো কোথাও কিছু খাও না তুমি। ছি, ছি, ইস, সবই যে পড়ে রইলো! এই জন্যেই বলেছিলাম, খাওয়াদাওয়ার পরে শুনো। তুমিও ব্যস্ত হলে, আমিও বলে ফেললাম। আমারই অন্যায়, পরে বললেই হতো। আচ্ছা অন্ততঃ দুধটুকু খেয়ে নাও—'

অনামিকাকে এমন করে মায়ামমতা দেখাবার সুযোগ সংসার কবে পায়? ভাগ্যক্রমে আবার অনামিকার স্বাস্থ্যটাও অটুট, কাজেই ওদিকে সুবিধে নেই। অথচ যারা ভালবাসে তাদের তো ইচ্ছে করে কখনো দুটো মমতার কথা বলি। তাই ছোটবৌদি,—যে ছোটবৌদির ঠিকরে উঠে ছাড়া কথা বলার অভ্যাস নেই, তিনিও নরম গলায় বলেন, 'জানতামই এ খবর শুনে তোমার মনটা খারাপ হয়ে যাবে, সত্যি নিজের কাকার মতোই ভালবাসতেন তোমায়, আর তুমিও সেই রকমই ভক্তিশ্রদ্ধা করতে, কিন্তু আক্ষেপের তো কিছুই নেই। যেতে তো একদিন হবেই মানুষকে।'

অনামিকাকে জ্ঞান দিচ্ছেন ছোটবৌদি।

বয়সে অনামিকার থেকে ছোট হলেও, দাদার স্ত্রী হিসেবে সম্পর্কটা মর্যাদার।

দুধটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে উঠে পড়লেন অনামিকা।

তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকেও একটা খবর দেবার ছিল, সুখবর। শম্পার একটা চিঠি পেয়েছি আজ। ও চন্দননগরের সেজদির কাছে রয়েছে।'

চন্দননগরের সেজদির বাড়িতে শম্পা রয়েছে এ খবরটা ছোটবৌদির কাছে আনকোরা কথা নয়, আকস্মিকও নয়, তবু সেটা দেখানো দরকার পরিস্থিতি যখন সেইভাবেই সাজানো।

ছোটবৌদিকে তাই চমকে উঠতে হয়। বলে উঠতে হয়, 'তার মানে? সেজদির কাছে? আর আমরা মরে পড়ে আছি? তোমার ছোড়দা তো তলে তলে পৃথিবী ওটকাচ্ছেন!'

অনামিকা শুধু বললেন, 'সেই তো।'

যে খবরটির প্রত্যাশায় দিনরাত্রির সমস্ত মুহূর্তগুলি ছিল উন্মুখ হয়ে, যে খবরটির জন্যে সমস্ত মনটা যেন উশলে ওঠবার অপেক্ষায় উদ্বেলিত হয়েছিল, সেই খবরটা কী একটা ব্যর্থ লগ্নেই এসে পৌঁছলো!

আর এমন হাস্যকরভাবে পরিসমাপ্তি। এতো উদ্বেগ, এতো উৎকণ্ঠা, এতো দুশ্চিন্তার পর এই। বাপের ওপর রাগ করে পিসির বাড়ি গিয়ে বসে আছেন মেয়ে! কী লজ্জা! কী লজ্জা! সত্যি যেন লজ্জাই করলো অনামিকার ওই হাস্যকর খবরটা দিতে। এর থেকে অনেক ভালো ছিলো শম্পা যদি একটা বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়ে অনেক কষ্ট পাওয়ার খবর জানাতো।

মনের অগোচর পাপ নেই, সত্যিই মনে হচ্ছিল অনামিকার—শম্পা কেন কোনোখান থেকে বিপন্ন হয়ে একটা চিঠি দিলো না! অথবা শম্পা কেন সগৌরবে খবর পাঠাতে পারলো না, 'পিসি! বিয়েটা মিটিয়ে ফেলেছি, এখন ভাবলাম তোমাদের সেই শুভ খবরটি জানানো দরকার। তোমাকে জানালেই সবাই জানবে।'

তা নয়, এমন দীন-হীন একটা খবর পাঠিয়েছে যে অনামিকার সেটা পরিবেশন করতে লজ্জা করলো।

তবু ঠিক পরিবেশনের মুহূর্তে ওই খবরের ওপর যদি আর একটা হিমশীতল খবর এসে না পড়তো! এখন কার কথা ভাবতে বসবেন অনামিকা? যাঁর কাছে আকণ্ঠ ঋণের বোঝা, অথচ জীবনের কোনোদিনই শোধ করা যায়নি, অথবা যা শোধ করা যায় না, শুধু আপন চিত্তের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে স্মরণ করতে হয় মাথা নত করে, তাঁর কথা? না ওই যে মেয়েটা দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসতে চাইছে এক গভীর বিশ্বাসের নিশ্চিন্ততায়, তার কথা?

শম্পা জানে, সে যতো দোষই করুক, যতো উৎপাতই ঘটাক, অনামিকার হৃদয়-কোটরে তার অক্ষয় সিংহাসন পাতা।

ছোটবৌদি এবার স্বক্ষেত্রে নামেন, 'কিন্তু এও বলি ভাই, সেজদির কি উচিত ছিল না তলে তলে খবরটা আমাদের দেওয়া? আমরা কোন্ প্রাণে রয়েছি সেটা তিনি টের পাচ্ছিলেন না?'

অনামিকার দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। ইচ্ছে হচ্ছিল এই আলো আর শব্দের জগৎ থেকে সরে গিয়ে একটু অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় নিতে, কিন্তু সে ইচ্ছে মিটবে কি করে? খাল কেটে কুমীর তো নিজেই আনলেন!

অনামিকা কি বুঝতে পারেননি শম্পার খবরটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এই শব্দের কুমীরটা তাঁকে গ্রাস করতে আসবে, সহজে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পারবেন না?

বুঝতে পেরেছিলেন বৈকি, হয়তো সেই জন্যেই একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন ভেবেছিলেন আপাতত ভুলে যাওয়ার ভান করলে কী হয়? যদি আগামীকাল সকালে বলা যায়, 'দেখো বাড়ি আসতে-না-আসতেই ওই খবরটা পেয়ে শম্পার চিঠিটার কথা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম!' তাহলে?

কিন্তু তাহলে কি আরো বহু শব্দের ঝাঁকের মুখে পড়তে হতো না? হিসেব হতো না অনামিকার কাছে কার মূল্য বেশী? যে হারিয়ে গেল, না যে হারিয়ে গিয়ে ফিরে এলো!

ভবিষ্যতের সেই শব্দের ঝাঁকের ভয়ে অনামিকা ইতস্ততঃ করেও এখনই খালটা কাটলেন। তাছাড়া মমতাবোধও কি কিছু কাজ করেনি? মনে হয়নি খবর পেয়ে বাঁচবে মানুষটা?

কিন্তু বেঁচে গেলেই কি বর্তে যাবে মানুষ? অন্যের উচিত অনুচিতের হিসেব নিতে বসবে না?

অনামিকা নিষ্প্রাণ গলায় বলেন, 'খুবই ঠিক। বোধ হয় শম্পাটা খুব করে বারণ করে দিয়েছিল।'

'বাঃ, বেশ বললে ভাই—'

ছোটবৌদির ক্ষণপূর্বের মমতাবোধটুকুর আর পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'তোমাদের বোনে বোনে এক অন্য বিধাতার গড়া বাবা! ও যদি বারণ করেই থাকে, করবেই তো, যে মেয়ে বাপের ওপর তেজ করে বাড়ি ছাড়ে, সে আর খবর দিতে বারণ করবে না? কিন্তু সেটাই একটা ধর্তব্যের কথা হলো?'

হলো না, সেটা অনামিকাও মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না। সেজদির ওপর দুরন্ত একটা অভিমানে তাঁরও তো মনটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। তবু সায় দেওয়ার একটা দায়িত্ব আছে। সেটা যেন গলা মিলিয়ে নিন্দে করার মতো মনে হলো অনামিকার। তাই আস্তে বললেন, 'মেয়েটা তো বড্ডো জবরদস্তওলা কিনা!'

ছোটবৌদি এতক্ষণে নিজস্ব ভঙ্গীতে ঠিকরে উঠতে পান।

বলে ওঠেন, 'বললে তুমি রাগ করবে ভাই, বাইরে তোমার কতো নামডাক, কতো মান্য-সম্ভ্রম, তোমার বুদ্ধি নিয়ে কথা বলা আমার মতো মুখ্যুর সাজে না, তবু না বলে পারছি না—পিসির আস্কারাতেই মেয়ে অতো দুর্ধর্ষ হয়েছে !'

এ অভিযোগ আজ নতুন নয়, সুযোগ পেলেই একথা বলে থাকেন ছোটবৌদি বলে আসছেন চিরকাল, আজ তো একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়েছেন, তাই চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই নামডাকওলা মান্যগণ্য অনামিকা দেবীর।

ছোটবৌদি আবারও শুরু করেন,' এখন আবার আরও পৃষ্ঠবল বাড়লো। যে পিসিকে জন্মে চোখে দেখিনি, আবার তাঁর সোহাগও জুটলো। তলে তলে চিঠি চাপাটি চলতো নিশ্চয়, নইলে মেয়ের এতো দুঃসাহসই বা আসে কোথা থেকে, আর চট্ করে ওখানে গিয়েই বা ওঠে কেন ? যাক, তোমাদের আর দোষ কি দেব, আমারই কপাল ! নিজের মেয়েকে কখনো নিজের করে পেলাম না। তাই নিজের ইচ্ছেমতো গড়তে পেলাম না।

হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটে যায়। যা অনামিকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাই হয়ে যায়। হঠাৎ বলে বসেন অনামিকা, 'মেয়েকে নিজের করে পেয়ে, নিজের ইচ্ছেমতো গড়ার নমুনাও তো দেখছি—'

বলে ফেলেই নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন অনামিকা, ছি ছি, এ তিনি কী করে বসলেন! এই হঠাৎ অধৈর্য হয়ে পড়া মন্তব্যটির জন্যে ভবিষ্যতে কতো ধৈর্যশক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ছোটবৌদি কি একথা অপূর্ব-অলকার কানে না তুলে ছাড়বে ?

তারপর ? আর তো কিছু না, মারবে না কেউ অনামিকাকে, কিন্তু ওই শব্দ ! শত শত শব্দের তীরের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে অনামিকাকে।

যদিও নিজে ছোটবৌদি অহরহই এমন মন্তব্য করে থাকেন, তাঁর ভাশুরপো-বৌ অলকা যে ফ্যাশান দেখাতে গিয়ে মেয়ের পরকাল ঝরঝর করেছে, একথা কারণে অকারণেই বলেন। আর হয়তো বা অকারণেও নয়। অলকার ওই মেয়ে, ডাকনাম যার অনেক রকম, ভালো নাম সত্যভামা, সে মেয়েটা সম্পর্কে অনেক রকম কথাই কানে এসেছে। প্রবোধচন্দ্রের এই পবিত্র কুলে, কুলের ওই কন্যাটির দ্বারা নাকি বেশ কিছু কালি লেপিত হয়েছে, তবে মা বাপ তার সহায়, সে কালি তলে তলে মুছেও ফেলা হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা তো অসতর্কতার অভিশাপ বহন করে বেড়াতে বাধ্য করায় না!

তবে ইদানীং যা করাচ্ছে অলকা মেয়েকে দিয়ে, সেটা প্রবোধের কুলে কলঙ্ক লেপন করলেও অলকা সগৌরবেই প্রকাশ করছে। কিছুদিন এয়ার হোস্টেসের চাকরি নিয়ে অনেক ঝলমলানি দেখিয়ে এখন সত্যভামা আর এক ঝলমলে জগতের দরজা চিনে ঢুকে গিয়েছে। চিনিয়েছে ওর এক দূর সম্পর্কের মাসির মেয়ে, কিন্তু এখন নাকি সত্যভামা তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

সত্যভামা নাকি ক্যাবারে নাচছে হোটেলে হোটেলে। অলকাই সগর্বে বলে বেড়ায়, এক জায়গায় বাঁধা চাকরিতে ওকে নাকি তিষ্ঠোতে দেয় না লোকে, নানা হোটেল থেকে ডাকাডাকি করে টেনে নিয়ে যায়। গুণ থাকলেই গুণগ্রাহীরা তার সন্ধান পায় এটাও যেমন স্বাভাবিক, গুণীকে টানাটানি করাও তেমনি স্বাভাবিক। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে অলকা এসব বানিয়ে বলে না।

অবশ্য প্রথম যখন সত্যভামার এয়ার-হোস্টেসের চাকরির খবরটা প্রবোধচন্দ্রের ভিটের সংসারভূমিতে এসে আছড়ে পড়েছিল, তখন মস্ত একটা ধূমকুণ্ডলী উঠে

অনেকটা আলোড়ন তুলেছিল!

অনামিকা পর্যন্ত অলকাকে ডেকে জিজ্ঞেস না করে পারেননি, 'কথাটা কি সত্যি অলকা?'

অনামিকা বিস্ময় প্রকাশ করেননি, বিস্ময় প্রকাশ করলো অলকা। বললো, 'সত্যি না হবার কী আছে পিসিমা? মেয়েরা তো আজকাল কতো ধরনেরই চাকরি করছে। আর এ তো বিশেষ করে মেয়েদেরই চাকরি।'

ওর ওই বিস্ময়টাই যে ওর বল, তা বুঝতে পেরে অনামিকা আর কথা বাড়াননি। শুধু কথার সুতোর মুখ মুড়তেই বোধ হয় বলেছিলেন, 'তা বটে। তবে কষ্টের চাকরি। খাওয়া-শোওয়ার টাইমের ঠিক নেই। নাইট-ডিউটি ফিউটি দিতে হবে হয়তো—'

'সে তো হবেই।' অলকা মুখটি মাজাঘষা মসৃণ করে উত্তর দিয়েছে, 'কণ্ট্রাক্টে তো সেকথা আছেই। কিন্তু সে সমস্যা তো জগতের সব চেয়ে পবিত্র পেশার নার্সদেরও আছে।'

অনামিকা আর কথা বলেননি, কিন্তু বলেছিলেন অনামিকার ছোড়দা। অলকাকে ডেকে নয়, অপূর্বকে ডেকে।

নিজেকে বংশমর্যাদার ধারকবাহক হিসেবে ধরে নিয়ে প্রবোধচন্দ্রের পরিত্যক্ত মশালটি তুলে ধরে তীব্র প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাড়িতে এসব কী হচ্ছে অপূর্ব? তোমরা কি ভেবেছো বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে? বাড়িতে বসে যা খুশি করবে?'

অপূর্ব খুব শান্ত গলায় বলেছিল, 'হঠাৎ কী নিয়ে এমন উত্তেজিত হচ্ছো ছোটকাকা বুঝতে পারছি না তো!'

ছোটকাকা আরো উত্তেজিত হবেন, এতে আশ্চর্য নেই। সেটা হয়েই তিনি বলে ওঠেন, 'ন্যাকা সেজো না অপূর্ব! মেয়েকে "এয়ার হোস্টেসের" চাকরি করতে পাঠিয়েছো, একথা কী অস্বীকার করবে?'

'কেন? অস্বীকার করতে যাবো কেন?' অপূর্ব বলেছিল, 'মেয়েকে তো আমি চুরিডাকাতি করতে পাঠাইনি! চাকরি করতেই পাঠিয়েছি। তাতে আপত্তি করলে—'

ছোটকাকা ভাইপোর কথা শেষ করতে দেননি, প্রবোধচন্দ্রের উত্তরাধিকারীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আমি বলবো চুরি করতেই পাঠিয়েছো। তোমরা—তোমরা দুই স্বামী-স্ত্রীতে মিলে নিঃশব্দে বসে সিঁদ কেটে কেটে এ বংশের মানসম্ভ্রম, সভ্যতা-ভব্যতা সব কিছু চুরি করেছো ওই মেয়েটিকে দিয়ে।'

'ও বাবা, ছোটকাকা যে খুব ঘোরালো উপমা-টুপমা দিচ্ছো দেখছি! তাহলে বলতে হয়, ডাকাতির ভারটা তুমি বোধ হয় তোমার নিজের মেয়ের ওপর দিয়েছো?'

তখনো শম্পা পালায়নি।

কিন্তু উড়ছিল তো?

সেই আকাশে উড়ন্ত চেহারাটা সকলেরই চোখে পড়েছিল।

ছোটকাকা তথাপি বলেছিলেন, 'বাপ-কাকাকে অপদস্থ করার মধ্যে কোনো সভ্যতা নেই অপূর্ব!' বললেন প্রবোধচন্দ্রের ছোট ছেলে। যৌবনকালে নিজের যাঁর ওইটাতেই ছিল রীতিমত আমোদ।

কিন্তু যৌবনকাল তো চিরকালের নয়, যৌবনকাল কখন কোন্ ফাঁকে তার ঔদ্ধত্য আর উন্নাসিকতা, অহমিকা আর আত্মমোহ, প্রতিবাদ আর পরোয়াহীনতার পোর্টফোলিওটি ফেরত নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ে। হৃতসর্বস্ব প্রৌঢ়ত্ব তখন আপন অতীতকে বিস্মৃত করে যৌবনের খুঁত কেটে বেড়ায়, যৌবনের ঔদ্ধত্য দেখে ক্রুদ্ধ হয়।

অপূর্বর ছোটকাকা হলেন ক্রুদ্ধ, বললেন, 'আমার মেয়েকে আমি কিছু আর প্রশংসা করে বেড়াচ্ছি না, আর প্রশ্রয়ও দিচ্ছি না তাকে। তাছাড়া বাড়ির মধ্যে নাচুক, কুঁদুক, যা হয় করুক, বাইরে বংশের প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে।'

'মেয়েরা চাকরি করলে বংশের প্রেস্টিজ চলে যায়, একথা এযুগে বড়ো হাস্যকর ছোটকাকা!'

'চাকরি করাটাই দোষের এ কথা তো তোমাকে বলিনি, ওই চাকরিটা ভদ্র লোকের মেয়ের উপযুক্ত নয়, সেটাই বলেছি।'

ধারেকাছে কোথায় অলকা ছিলো, সে এসে পড়ে খুব আস্তে বলেছিল, 'একথা এখানে যা বললেন, বাইরে বলবেন না ছোটকাকা! বরং খোঁজ নিয়ে দেখবেন যেসব মেয়েরা ওখানে রয়েছে, তারা কী রকম ঘর থেকে এসেছে।'

ছোটকাকা একবার দিশেহারার মত চারিদিকে তাকিয়ে বোকার মত বলেন, 'তারা বাঙালী নয়।'

বলা বাহুল্য এবার হেসে না উঠে পারেনি অলকা, বলেছিল, 'বাঃ, তাহলে আপনার মতে যারা বাঙালী নয়, তারা ভদ্রলোক নয়?'

'সেকথা হচ্ছে না—', ছোটকাকা তীব্র হন, 'তোমার তো চিরকালই এঁড়েতর্ক তাদের সমাজে যা চলে আমাদের সমাজে তা চলে না। বাঙালীর একটা আলাদা কালচার আছে—'

'ওই থাকার আনন্দেই আমরা মরে পড়ে আছি ছোটকাকা, কোন কালে মরে ভূত হয়ে যাওয়া কালচারের শবসাধনা করছি! আমি ওসব মানি না! আমি বিশ্বাস করি যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে।'

কিন্তু পরে, এই অপূর্বই তবে ছোটকাকার মেয়ে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ব্যঙ্গ-হাসি না হেসে উদ্বিগ্নের ভূমিকা নিয়েছিল কেন? উদ্যোগী হয়ে পিসিকে জেরা করতে গিয়েছিল কেন, তার ঠিকানার সন্ধানে?

কারণ আছে, গূঢ় কারণ।

যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে গিয়ে হঠাৎ পা ফসকে অপূর্বর মেয়ে সত্যভামা তখন আবার দিনকয়েকের জন্যে 'মামার বাড়ি' বেড়াতে গেছে, ব্যঙ্গ-হাসির প্রতি-ক্রিয়াটা যদি সহসা সেই 'মামার বাড়ির' ঠিকানাটা আবিষ্কার করে বসে!

কিন্তু মেয়ে যদি স্বাস্থ্য-শক্তি উদ্ধার করে মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসে আবার পরোয়াহীনতার ভূমিকা নেয়, অপূর্বর তবে আবার যুগের সঙ্গে পা মেলানো ছাড়া উপায় কি! নতুন এই পালা বদলের পালায় অপূর্বর মেয়ে 'ক্যাবারে' নাচে প্রাপ্ত হয়েছে। অপূর্ব কথাচ্ছলে লোককে শুনিয়ে বলে, 'মেয়ের ব্যাপারে ওর মা যা ভাল বুঝছে করছে, আমি ওর মধ্যে নাক গলাতে যাই না। আজকের সমাজে কী চলছে আর কী না-চলছে ওর মা'ই ভালো বোঝে।'

অতএব অন্যেরাও ভালো বুঝে চুপ হয়ে গেছে। অপূর্বর মা'র ছেলে-বৌয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ অনেক দিন, মেয়েরা আসে, মায়ের ঘরে বসে মীটিং করে, চলে যায়, অলকা বলে, 'আমার শাপে বর! নইলে ওই চারখানি ননদিনীর হ্যাঁপা সামলাতে হতো বারো মাস!'

অপূর্বও সেটা স্বীকার করে বৈকি!

সত্যভামার এই নৃত্য তো শুধুই ভূতের নেত্য নয়। ও থেকে পয়সা আসে ভালোই। তবে? এও তো একটা চাকরি! বাজার আগুন, সংসারের চাল বেড়ে গেছে যথেষ্ট, একার উপার্জনে চাল বজায় রেখে চলেই না তো! মেয়ে এবং ছেলে যখন সমাজে সমান বলে স্বীকৃত, তখন বাপের সংসারের অচল রথকে সচল করে

তোলার দায়িত্ব মেয়ে বহন করলেই বা লজ্জা কি?...কিন্তু প্রবোধচন্দ্রও তো লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে অন্তরীক্ষ থেকে বজ্র নিক্ষেপ করলেন না কোনো দিন? যাতে ভিটেটা তার কলঙ্ক সমেত চূর্ণ হয়ে যায়?

কিন্তু লজ্জা আশপাশের লোকের।

তাই অনামিকা তাঁর ছোটবৌদির আক্ষেপের মুখে বলে ফেললেন, 'মেয়েকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করার নমুনা তো দেখলাম!'

বলেই বুঝলেন, খুব অসতর্কতা হয়ে গেছে। এই অসতর্কতা ছোটবৌদিকে শত্রুশিবিরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কী আর করা! হাতের ঢিল মুখের কথা একই বস্তু, এ তো চিরকালের কথা।

ছোটবৌদি অবশ্যই ফোঁস করে উঠলেন।

বললেন, 'সবাই সমান নয় ছোটঠাকুরঝি!' রাগের সময় উনি ঠাকুরঝি শব্দটা ব্যবহার করেন। বললেন, 'অলকার সঙ্গে আমার তুলনা করো না। কিন্তু দেখাতে পেলাম না, এই আমার দুর্ভাগ্য!'

অনামিকা এই আক্ষেপের মুখোমুখি কতোক্ষণ আর দাঁড়িয়ে যুঝবেন? বললেন, 'আচ্ছা খবরটা ছোড়দাকে দিও—'

চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

ছোটবৌদি বললেন, 'চিঠিটা কই?'

অনামিকা বললেন, 'চিঠিটা! সে তো আমার ঘরেই রয়েছে।'

'আচ্ছা তুমি যাও, তোমাকে আর নামতে হবে না—আমি গিয়ে নিচ্ছি।' বললেন ছোটবৌদি।

অনামিকা প্রমাদ গনলেন। বললেন, 'আর বোলো না, সে এক পাগলের চিঠি! মোট কথা, ওইটাই জানিয়েছে।'

অর্থাৎ ধরে নাও চিঠিটা তিনি দেখাবেন না।

ছোটবৌদি কালি মুখে বলেন, 'ওঃ! কিন্তু চিঠিটা তুমি পেয়েছো কখন? আমি তো এই বিকেলের ডাকের পর পর্যন্ত লেটার-বক্স দেখে এসেছি—প্রসূনের চিঠি এসেছে কিনা দেখতে।'

'ও! ডাকে তো আসেনি। একটা লোক এসে হাতে দিয়ে গেল।'

'লোক? কি রকম লোক?' ছোটবৌদির কণ্ঠে আর্তনাদ।

অনামিকা মিথ্যা ভাষণ দিলেন না, বললেন, 'রামকালো একটা লোক—'

'রামকালো!' অতএব নিশ্চিন্ত হতে পারো।

আবার কী ভেবে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন অনামিকা, 'ছোড়দা কি কাল চন্দননগরে যাবে?'

'চন্দননগরে? তোমার ছোড়দা?'

ছোটবৌদি তীক্ষ্ণ হন, 'প্রাণ থাকতে নয়। আর যদিও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যেতে চায়, আমি ঘরে চাবি দিয়ে আটকে রেখে দেব।'

অনামিকার পাশ কাটিয়ে ছোটবৌদিই আগে তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।

অনামিকা আস্তে আস্তে সিঁড়ি উঠতে লাগলেন। তিনতলা পর্যন্ত উঠতে হবে।

এসে চিঠিখানা আবার হাতে নিলেন, কিন্তু পড়লেন না। ভাবতে লাগলেন, সনৎকাকার বাড়িতে একবার যাবার দরকার আর এখন আছে কিনা।

শুনেই ভেবেছিলেন, তখুনি খবর এসেছে, ছুটে গেলে শেষযাত্রার কালেও

দেখা হতে পারে, কিন্তু না। ছোটবৌদি বলে উঠেছিলেন, 'সে কি! এখন গিয়ে কি করবে? উনি তো কাল-সকালে মারা গেছেন!'

কাল সকাল! আর এখন আজ রাত্তির!

তার মানে আকাশে-বাতাসে কোথাও কোনখানে চিতার ধোঁয়াটুকুও নেই। তবে আর ছুটোছুটিতে লাভ কী?

কিন্তু আগামী কাল? অথবা তার পরদিন? কি জন্যে? নীরুদার শোকে সান্ত্বনা দিতে? নাকি অভিযোগ জানাতে? অনামিকাকে কেন খবর দেওয়া হয়নি? অনামিকা পাগল নয় যে এই ধৃষ্টতাটুকু করতে যাবেন! না গেলে কী হয়। পরে কোনো একদিন দেখা হলে নীরুদা যদি বলে, 'কী? তুমি তো কাকাকে খুব ভাল-টাল বাসতে, কই মরে যাওয়ার খবর শুনেও তো এলে না একবার।'

এই আক্রমণটুকু থেকে আত্মরক্ষা করতে?

দূর!

আগে, মানে অনেক দিন আগে হলে হয়তো এটা করতেন অনামিকা। নিজেকে ত্রুটিশূন্য করবার একটা ছেলেমানুষী মোহ ছিল তখন। সেই ত্রুটিশূন্য করবার জন্যে প্রাণপাত করেছেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়েছেন, নিজের সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে থেকেছেন।

সেই ছেলেমানুষী মোহটা আর নেই।

এই ব্যর্থ চেষ্টাটা যে শুধু নিজের ভিতরেই ক্ষয় ডেকে আনে, এটা ধরা পড়ে গেছে। অতএব নীরুদার সঙ্গে সৌজন্য করতে না গেলেও চলবে।

তবে?

তবে চলে যাওয়া যায় চন্দননগরে।

বহুদিনের অদেখা সেজদির কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায়। একটা আগ্রহ অনুভব করলেন, ডায়েরী বইয়ের পাতাটা খুলে দেখলেন আগামী কাল এবং পরশু-তরশু, এই দু-তিনদিনের মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁদে পড়ে আছেন কিনা।

দেখলেন নেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু বাড়িতে কি বলবেন কথাটা?

'বলবো না' ভাবতেও লজ্জা করছে, বলে কয়ে যাবো ভাবতেও খারাপ লাগছে। শম্পার মা বাপ স্থির হয়ে বসে রইলো, আর পিসি ছুটলো—এটা মেয়েকে আস্কারা দিয়ে নষ্ট করবার আর একটি বৃহৎ নজীর হয়ে থাকবে।

থাক্! কী করা যাবে?

ঠিক এই মুহূর্তে কোথাও একটু চলে যাবার জন্যও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

গতকাল সকালে মারা গেছেন সনৎকাকা, এই শহরেরই এক জায়গায়, অথচ অনামিকা যথানিয়মে খেয়েছেন ঘুমিয়েছেন, ওই পাড়ারই কাছাকাছি রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে বেরিয়ে গেছেন 'রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা' পালন করতে।

হঠাৎ আবার অনেক দিন আগের সেই একটা দিনের কথা মনে পড়লো। মানুষ কী পারে আর কী না পারে! সেদিনও তো 'সভা' করেছেন অনামিকা, যেদিন নির্মলের খবরটা পেয়েছিলেন সভামণ্ডপে দাঁড়িয়ে!

সত্যদ্রষ্টা কবি বলে রেখেছেন, 'জানি এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে, কাটবে গো দিন যেমনি আজও দিন কাটে—'

পরম সত্য তাতে আর সন্দেহ কী! তবু সেই 'দিন কাটার' অন্তরালে কোথাও কি একটু সুর কেটে যায় না?

নিঃশ্বাস পড়লো মৃদু-গভীরে।

শুয়ে পড়লেন ঘরের আলো নিভিয়ে। আর হঠাৎ মনে হলো, তখন ছোটবৌদির সঙ্গে বৃথা কথায় সেই সুরের তার যেন ছিঁড়েখুঁড়ে ঝুলে পড়ে গেলো। অনামিকা একটি মধুর গভীর সুরের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেন।

শোকেরও একটি আস্বাদ আছে বৈকি। গভীর গম্ভীর পবিত্র।

পবিত্র মাধুর্যময় গভীর-গম্ভীর সেই আস্বাদনের অনুভূতিটি টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গেল। সেগুলিকে কুড়িয়ে তুলে নিয়ে আর সম্পূর্ণতা দেওয়া যাবে না। আর ফিরে পাওয়া যাবে না সেই প্রথম মুহূর্তের স্তব্ধতা। এও একটা বড় হারানো বৈকি।

পারিবারিক জীবনে এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে, যেগুলো নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও না করে উপায় নেই। না করলে পারিবারিক আইন লঙ্ঘন করা হয়।

আপন গতিবিধির নিখুঁত হিসেব পরিবারের অন্যান্য জনের কাছে দাখিল করা তার মধ্যে একটি। তোমার হঠাৎ ইচ্ছে হলে কোথাও চলে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই, মনের উপর চাপানো আছে ওই আইনভার।

চলে যাওয়াটাই তো শেষ কথা নয়? তার পেছনে 'ফিরে আসা' বলে একটা কথা আছে! ফিরে আসার পর পরিজনেরা জনে জনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুধোবে না, 'কী আশ্চর্য! না বলে চলে গেলে? কোথায় গেলে কাউকে জানিয়ে গেলে না?'

পারিবারিক শাস্ত্রে এটা খুব গর্হিত অপরাধ। যেন অন্যদের অবমাননা করা। যেন ইচ্ছে করে স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখানো।

অতএব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোট সুটকেসটা গুছিয়ে রেখে নিচের তলায় নামতে হলো অনামিকাকে।

চাকরটাকে ডেকে বললেন, 'ছোটমা কোথায় রে?'

'ছোটমা? তিনি তো এখন পুজোর ঘরে!'

শুনে বিস্মিত হলেন অনামিকা, ছোটবৌদির এ উন্নতি কবে হলো? জানতেন না তো? যাক্‌, কতো কি-ই তো ঘটছে সংসারে, তিনি আর কতোটুকু জানেন? এ একটা অদ্ভুত জীবন তাঁর, 'না ঘরকা না ঘাটকা!' এ সংসারে আছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যেন সম্যক যোগ নেই। যেহেতু যথারীতি যথাসময়ে অন্য সংসারে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হননি, সেইহেতু অনামিকা যেন একটা বাড়তি বস্তুর মতো এখানে চেপে বসে আছেন। আজন্মের জায়গা, তবু জন্মগত অধিকারটুকু কখন যে চলে যায়। মেয়েদের জীবনে এ একটা ভয়ঙ্কর কৌতুক।

আচ্ছা, বাড়ির কোনো ছেলে যদি অবিবাহিত থাকে, এমন তো অনেকেই থাকে, আরও কি এই রকম কেন্দ্রচ্যুত হয়ে 'বাড়তি'তে পরিণত হয়?

ভাবতে ভাবতে আবার দোতলায় চলে এলেন অনামিকা, ছোড়দার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'ছোড়দা!'

ছোড়দা সাড়া দিলেন না, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন। কুঞ্চিত ভ্রূ, অপ্রসন্ন মুখ।

অনামিকা ওঁর প্রশ্নের অপেক্ষা রাখলেন না, বললেন, 'ছোটবৌদি তো শুনেছি পুজোর ঘরে নাকি, ওকে একটা কথা বলার ছিলো, তুমি বলে দিও, আজ যেন আমার, মানে-আজ কাল পরশু এই দুটো-তিনটে দিন যেন আমার রান্না-টান্না করতে দেয় না! আমি একটু যাচ্ছি—' বলেই মনে হলো কথাটা খুব বেখাপ্পা ভাবে বলা হলো।

ছোড়দা চায়ের পেয়ালা শেষ করে শ্লেষাত্মক গলায় বলেন, 'তিনদিনের জন্যে : সভাটা কোথায় ?'

ছোড়দা কি বুঝতে পারেননি, অনামিকা কোথায় যাচ্ছেন! অনামিকার মনে হলো বুঝতে পেরেও ছোড়দা যেন ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন।

অনামিকারই ভুল।

গোড়াতেই স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বললেই ভালো হতো, 'ছোড়দা, আমি দিন তিনেকের জন্যে চন্দননগরে সেজদির কাছে বেড়াতে যাচ্ছি।'

এবার বললেন, 'না, সভাটভা তো না, সেজদির কাছে একটু বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছি।'

'সেজদির কাছে? মানে চন্দননগরে ?'

ছোড়দা তিক্ত গলায় বলেন, 'আশা করি আহ্লাদ করে কাউকে নিয়ে আসবে না !'

'নিয়ে? কাকে ?'

অনামিকাও এবার প্যাঁচ কষলেন, বললেন, 'নিয়ে আসার কথা কী বলছো ?'

'কী বলছি, তুমি একেবারেই বুঝতে পারোনি এটা আশ্চর্যের কথা ! তুমিই গতকাল জানিয়েছো তোমার সেই ধিঙ্গী ভাইঝি চন্দননগরে আর এক আশ্রয়দাত্রীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন ! এবং বোঝা যাচ্ছে আজ তুমি সেখানে ছুটছো—'

অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'ছুটছি হয়তো এমনিই। মনটা ভালো লাগছিলো না, তবে হয়তো অজানিতে তাকে দেখতেই ছুটছি, আনবার কথা ভাবতে যাবো কোন্ সাহসে ছোড়দা ? কার বাড়িতে নিয়ে আসবো একটা বেয়াড়া দুষ্টুবুদ্ধিহীন মেয়েকে ?'

ছোড়দার কি একটু আগের চা-টা গলায় বেধেছিল ? তাই হঠাৎ অমন 'বিষম' খেলেন ? কাসতে কাসতে সময় চলে গেল অনেকটা। তারপর বললেন, 'সেকথা বলতে পারো না তুমি, বাবা তোমার এ বাড়ির ওপর বেশ কিছু অধিকার দিয়ে গেছেন।'

অনামিকা তেমনিই হেসে বলেন, 'আমি তো সেই অদ্ভুত বাজে ব্যাপারটাকে বাবার ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই ভাবি না ছোড়দা ! নেহাৎ তোমাদের গোত্রেই রয়ে গেলাম, তাই তোমাদের বাড়িতেও থেকে গিয়েছি। যাক্ ওকথা, আমি তাহ'লে বেরুচ্ছি।'

ছোড়দা এবার দাদাজনোচিত একটি কথা বলেন, 'একাই যাচ্ছো নাকি ?'

যদিও একা বেড়ানোর অভ্যাস অনামিকার আদৌ নেই, সভাসমিতির ব্যাপারে এখানে-সেখানে যাচ্ছেন বটে সর্বদা, সে তো তারা গলবস্ত্র হয়ে নিয়েই যায়। যাবার ঠিক করে ফেলার আগে সামান্য একটু চিন্তা যে না করেছেন তাও নয়, তবু খুব হাল্কা গলাতেই উত্তর দিলেন, 'এই তো এখান থেকে এখান, সকালের গাড়ি, এর আর একা কি ?'

ছোড়দা আর কিছু বললেন না, ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন, আর ছোড়দার শুধু ঢিলে গেঞ্জি পরা পিঠটা দেখে অনামিকার মনটা হঠাৎ কেমন মায়ায় ভরে গেল। কী রোগা হয়েছে ছোড়দা! পিঠের হাড়টা গেঞ্জির মধ্য থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে। বেচারী ! মুখে তেজ দেখিয়ে মান বজায় রাখে, ভিতরে ভিতরে তুষ হয়ে যাচ্ছে বৈকি।

রাগ, দুঃখ, অপমান, লজ্জা, দুশ্চিন্তা, মেয়ের প্রতি অভিমান—সব কিছুর ভার আর জ্বালা নিজের মধ্যেই বহন করে চলেছে ও।

একটু অন্তরঙ্গ গলায় একটু কিছু ভালো কথা বলতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু কী-ই বা বলবেন!

ছোড়দা যদি অন্য ধরনের রাগ দেখিয়ে বলতো, 'যাচ্ছিস যদি তো সেই পাজী মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে চলে আয়—', তাহ'লে হয়তো সেই অন্তরঙ্গ হবার সুবিধেটা হতো।

কিন্তু 'যদি' আর 'হয়তো'গুলো চিরদিনই 'চিত্তচাঞ্চল্যে'র করাণ হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজে লাগে না!

নিজ মনে ভাবনা করার পক্ষে রেলগাড়ি জায়গাটা আদর্শ। একগাড়ি লোকের মধ্যেও তুমি দিব্য নিশ্চিন্ত মনে একা থাকতে পারো। তোমার মুখ দেখে কেউ মনের ভাব পড়বার চেষ্টা করবে না।

অনামিকা দেবী এখন তাই ভাবতে পাচ্ছেন, সেজদির সঙ্গে প্রথম দেখার অবস্থাটা কেমন হবে! দেখেই কি উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে আসবে সেজদি? না শান্ত গম্ভীর অভ্যর্থনায় জমানো অভিমান প্রকাশ করবে?

অনামিকা কি তবে গিয়েই হৈ হৈ করবেন? 'উঃ সেজদি, কতোদিন পরে দেখলাম তোকে!'...অথবা, 'কী রে চিনতে-টিনতে পারছিস, না চেহারাটা ভুলেই গেছিস?' না, ও কথায় আবার উল্টো চাপ পড়তে পারে, সেজদি হয়তো ফট্ করে উত্তর দিয়ে বসবে, 'চেহারা ভোলবার জো কি? কাগজপত্রে তো মাঝে মাঝেই 'চেহারা' দেখতে পাওয়া যায়!'

অবিশ্যি কাগজপত্রে ছাপা 'চেহারা' নিয়ে কিছু হাসাহাসি করা যায়, কিন্তু মনের চেহারাটা যেন তার অনুকূল নয়। যেন সেই মনটা শুধু 'সেজদি' বলে ডেকেই চুপ করে যেতে চায়। আর কোনো কথা নয়।

কিন্তু এ তো গেল সেজদির কথা।

আর সেই মেয়েটা? তাকে কি বলবেন? সে কি বলবে?

সে নিশ্চয় ছুটে এসে জড়িয়ে পিষে গায়ে নাক ঘষে একাকার করবে!

হাওড়া থেকে চন্দননগর, ইলেকট্রিক ট্রেনের ব্যাপার, তবু যেন মনে হচ্ছে পথটা ফুরোতে চাইছে না। সেই মেয়েটার প্রথম আবেগের ঝড়টা কল্পনা করতে করতে ধৈর্য কমে আসছে!

কিন্তু গতকাল থেকে অনামিকার জন্যে বুঝি ভাগ্যের হাতের চড় খাওয়াই লেখা ছিল। তাই সেই ঝড়টা এসে আছড়ে পড়লো না।

সেজদি ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, আস্তে বললো, 'তুই!'

তারপর আরো আস্তে আস্তে বললো, 'তুই এখন এলি!'

হঠাৎ ভয়ানক একটা ভয়ে বুকটা হিম হয়ে গেল অনামিকার। মনে হলো গত কালকের মতো আজও বুঝি নিদারুণ একটা সংবাদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

অনামিকা কি সিঁড়িতেই বসে পড়বেন?

পারুল বোধ হয় মুখ দেখে মনের কথা বুঝলো, তাই আস্তে বললো, 'ভয় পাস নে, তবে খবরটা সত্যিই খুব খারাপ। সেই ছেলেটা, জানিস তো সবই, কদিন আগে চলে গিয়েছিল, সকালে হঠাৎ কে একটা লোক এসে খবর দিল—'

সেজদি একটু থামলো, তারপর বললো, 'সেই ছেলেটা বুঝি কোন কারখানায় কাজ করতো, সেখানে বুঝি কার সঙ্গে কী গোলমাল হয়েছিল, বোমাটোমা মেরেছে নাকি, বেঁচে আছে কি নেই, এই অবস্থা ছেলেটার। শোনামাত্রই মেয়েটা এমন করে চলে গেল, ভালো করে বুঝতেই পারলাম না।'

অনামিকা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সেই লোকটা চেনা না অচেনা?'

'চেনা আবার কোথায়? একদম অচেনা।'

'কী আশ্চর্য, কালই ছেলেটার সঙ্গে আমার দেখা হলো। খবরটা আদৌ সত্যি না হতে পারে, কোনো খারাপ লোক কোনো মতলবে—'

'বলেছিলাম রে সেকথা, কানেই নিলো না। উন্মাদের মত ছুটে চলে গেল তার সঙ্গে। আর তুইও এতোদিন পরে আজ এলি বকুল!'

বকুল নিঃশ্বাস ফেললো।

বকুলের মনে হলো কোথায় যেন একটা বাক্স ছিল তার ভরা-ভর্তি, সেই বাক্সটা হঠাৎ খালি হয়ে গেলো। কিসের সেই বাক্সটা? কী ভরা ছিল তাতে?

'চল্, বসবি চল্।'

বললো সেজদি, তারপর প্রাথমিক অভ্যর্থনা-পর্বও সারলো। কিন্তু এতদিন পরে দুটি ভালোবাসার প্রাণ এক হয়েও কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলো। সুরটা কেটে গেছে। মাঝখানে যেন একটা বোবা দেয়াল।

সেই একটা উন্মাদ মেয়ে বকুলের অনেক কষ্টের দুর্লভ আয়োজনটুকু ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু কোথায় গেল?

কোথায় খুঁজতে যাওয়া যাবে তাকে?

তা যে লোকটা খবর দিতে এসেছিল, সেই লোকটা যদি খাঁটি হয় তো খোঁজবার জায়গা আছে, এন্টালির কাছে একটা অখ্যাতনামা হাসপাতালের নাম করেছে সে। আর খাঁটি না হলে তো কথাই ওঠে না। যে মেয়েটা 'হারিয়ে যাবো' প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তবু হারিয়ে যেতে পারেনি, তার দুষ্ট নক্ষত্র এইবার সেই যোগাযোগটা ঘটিয়ে দিলো। এই অসংখ্য লোকের ভিড়ে ভরা পৃথিবীর কোন একখানে হয়তো হারিয়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ পরে গঙ্গার ধারের সেই বারান্দাটায় বসলো দুজনে, আর এতক্ষণ পরে শম্পার কথা ছাড়া একটা কথা বললো বকুল। বললো, 'তুই যে কেন এখান থেকে একদিনের জন্যেও নড়তে চাস না তা বুঝতে পারছি সেজদি!'

'পারছিস?'—সেজদি হাসে, 'তুই কাজের সমুদ্রে হাবুডুবু খাস, আর আমি অকাজের অবসরে গঙ্গাতীরে বসে বসে ঢেউ গুনি।'

'তোকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে সেজদি। মনে হচ্ছে যদি তোর মতো জীবনটা পেতাম!'

পারুলের অভ্যস্ত কৌতুকপ্রিয়তা জেগে ওঠে। পারুল বলে, 'ওরে সর্বনাশ, বাংলাদেশ তাহলে একটি দুর্দান্ত লেখিকা হারাতো না?'

'ক্ষতি ছিল না কিছু।'

'লাভ ক্ষতির হিসের কি সব সময় নিজের কাছে থাকে?' পারুল বলে, 'মেয়েটা কি বুঝলো, তার এই পাগলের মতো ছুটে চলে যাওয়ায় কোথায় কি লোকসান হলো?'

অর্থাৎ ঘুরেফিরে সেই মেয়েটার কথাই এসে পড়লো।

'অদ্ভুত মেয়ে।' পারুল আবার বলে, 'দুর্লভ মেয়ে! ওকে ওর মা-বাপ বুঝতে পারলো না। অবশ্য না পারাই স্বাভাবিক! সাধারণতঃ যে মালমশলা দিয়ে আমাদের এই সংসারী মানুষগুলো তৈরী হয়, ওর মধ্যে তো সেই মালমশলার বালাই নেই। যা আছে সেটা সংসারী লোকেদের অচেনা।'

'তোর মধ্যেও তো তেমনি উল্টোপাল্টা মালমশলা—', বকুল আস্তে হাসে, 'তোকেও তাই কেউ বুঝতে পারলো না কোনো দিন সেজদি।'

'আমার কথা ছেড়ে দে, নিজেকে নিয়ে নিজেই বইছি।'

'মোহন-শোভনের খবর কী রে সেজদি?'

'ভালো, খুব ভালো। প্রায় প্রায় আরো পদোন্নতির খবর দেয়, পুরনো গাড়ি বেচে দিয়ে নতুন গাড়ি কিনেছে, সে খবর জানায়।'

বকুল একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'আচ্ছা সেজদি' পৃথিবীতে সত্যিকার "আপন লোক" বলতে তাহলে কি কিছুই নেই?'

'থাকবে না কেন?' পারুল অবলীলায় বলে, 'তবে তাকে সম্পর্কের গণ্ডির মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। দৈবক্রমে যদি জুটে যায় তো গেল!'

'ভেবেছিলাম দু'তিনদিন থাকবো—', বকুল বলে, 'কিন্তু আমার ভাগ্যে অতো সুখ সইলে তো!'

পারুল হৈ-হৈ করে ওঠে না, বলে, 'তাই দেখছি। কাল থেকে কতো-শতবার যে আমি কলকাতায় 'চলে গিয়েছি', আর এই হাসপাতালটা খুঁজে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। কিন্তু সত্যিকার কিছু করার ক্ষমতা নেই, তুই এলি, তোর সঙ্গে যেতে পারা যায়।'

'তুই যাবি?'

'ভাবছিলাম। ছেলেটা এতদিন থাকলো, অসুখে ভুগলো, মায়া-টায়া পড়ে গেল—'

পারুল চুপ করে গেল।

আরো কিছুক্ষণ কথা হলো, লোকটা সত্যি কথা বলছে কিনা এই নিয়ে। এইভাবে কত জোচ্চুরিই ঘটছে শহরে।

তবু শম্পা নামের সেই মেয়েটাকে তো হারিয়ে যেতে দিতে পারা যায় না!

অনেকক্ষণ পরে বকুল বলে, 'তখনই যদি ওই ওর সঙ্গে চলে যেতিস!'

'পরে একশোবার তাই ভাবলাম রে, কিন্তু ব্যাপারটা এত আকস্মিক ঘটে গেল! কে ডাকছে বলে নিচে নামলো, তার দুমিনিট পরেই ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠে এসে বলল, 'সেজপিসি, সত্যবানকে বোমা মেরেছে, বোধ হয় মরে গেছে, আমি যাচ্ছি।'

'যাচ্ছিস? কোথায় যাচ্ছিস? কে বললো?'—এসব প্রশ্নের উত্তরই দিলো না, যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নামলাম, দেখলাম লোকটাকে, কলকারখানার লোকেরই মতো, গুছিয়ে কথা বলতেও জানে না। যা বললো তার মর্মার্থ ওই।...তাও যে একটু জেরা করবো তার সময়ই পেলাম না। পোড়ারমুখো মেয়ে বলে উঠলো, 'জিজ্ঞেস করবার সময় অনেক পাবে পিসি, এখনো যদি একেবারে মরে গিয়ে না থাকে তো গিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে!' বলে লোকটা যে সাইকেল-রিকশায় চেপে এসেছিল সেইটায় চড়ে বসলো তার পাশাপাশি। চোখের সামনে গড়গড় করে চলে গেল রিকশাটা।'

'ওরা গড়গড় করে চলে যেতে পারে।' নিঃশ্বাস ফেলে বলে বকুল, 'জল মানে না, আগুন মানে না, কাঁটাবন মানে না, গড়গড়িয়ে এগিয়ে যায়। এ শক্তি ওরা কোথা থেকে আহরণ করেছে কে জানে!'

পারুল মৃদু হেসে বলে, 'তোদেরই তো জানবার কথা, সমাজতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব, এই নিয়ে কাজ যাদের। তবে আমি ওই অকেজো মানুষ, গঙ্গার ঢেউ গুনে গুনে যেটুকু চিন্তা করতে শিখেছি, তাতে কী মনে হয় জানিস? সব ভয়ের মূল কথা হচ্ছে অসুবিধেয় পড়ার ভয়। সেই ভয়টাকে জয় করে বসে আছে ওরা।'

বকুল আস্তে বলে, 'অসুবিধেয় পড়ার ভয়!'

'তা নয় তো কি বল্? আমি বলছি "অসুবিধে"র তুই না হয় বলবি 'বিপদে'। তা ওই "বিপদ" জিনিসটাই বা কি? "অসুবিধে" ছাড়া আর কিছু আমাদের অভ্যস্ত জীবনের, আমাদের অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোথাও একটু চিড় খেলেই আমরা বলি "কি বিপদ"। তাই উচ্চ থেকে তুচ্ছ বিশৃঙ্খলা মাত্রেই আমাদের কাছে বিপদ। রোগশোকও যতটা বিপদ, ছেলের চাকরি যাওয়াও ততটাই বিপদ।... জামাইবাড়ির সঙ্গে মতান্তর, পড়শীর সঙ্গে মতান্তর, দরকারী জিনিস হারানো, দামি জিনিস খোয়া যাওয়া, বাজার দর চড়ে ওঠা, পুরনো চাকর ছেড়ে যাওয়া সবই আমাদের কাছে "বিপদ"। তার মানে ওই সব কিছুতেই আমাদের অসুবিধে ঘটে। আবার মোহনের বৌ তো চাকরের একটু অসুখ করলেই "কী সর্বনাশ! এ কী বিপদ!" বলে "সারিডন" খেয়ে শুয়ে পড়ে।

হেসে ওঠে দুজনেই।

তারপর পারুল আবার বলে, 'এই সব দেখেশুনে অর্থাৎ এতোকাল ধরে মানবচিত্ত আর সমাজচিত্র অনুধাবন করে বুঝে নিয়েছি, সব ভয়ের মূল কথা ওই বিপদের ভয়। এই যে আমি কাল থেকে কতো-শতবার সেই 'না-দেখা' হাসপাতালটার আশেপাশে ঘুরে মলাম, কই 'যা থাকে কপালে' বলে বেরিয়ে পড়তে তো পারলাম না! ভয় হলো, কি জানি বাবা, কতো রকম বিপদে পড়ে যেতে পারি! ওরা সেই ভয়টা করে না। ওরা শুধু ভেবে নেয়, এইটা আমায় করতে হবে, আর সেই করাটার জন্যে যা করতে হয় সবই করতে হবে। অসুবিধেয় পড়বো, বিপদ হবে, এ চিন্তার ধার ধারে না।'

গঙ্গার খুব হাওয়া উঠেছে, গা শিরশির করে উঠছে, তবু বসেই থাকে ওরা।

বকুল অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'আরো একটা বড় জিনিসের ভয় করে না ওরা, সেটা হচ্ছে লোকনিন্দের ভয়! "লোকে কি মনে করবে", এ নিয়ে এ যুগ মাথা ঘামায় না। যেটা নাকি আমাদের যুগের সর্বপ্রধান চিন্তার বস্তু ছিল।'

পারুল একটু হাসলো, 'তা বটে। আমার একজন সম্পর্কে দিদিশাশুড়ী ছিলো, বুড়ী কথায় কথায় ছড়া কাটতো, বলতো, যাকে বলো ছিঃ, তার রইলো কী? বলতো, যার নেই লোকভয়, সে বড় বিষম হয়।'

'আমাদের কাল আমাদের ওই জুজুর ভয়টা দেখিয়ে দেখিয়ে জব্দ করে রেখেছে!' বকুল বললো নিঃশ্বাস ফেলে, 'অথচ ওই মেয়েটা যেদিন চলে এলো কত সহজেই চলে এলো। বাপ বললো, 'আমার বাড়িতে এসব চলবে না—'

মেয়ে বললো, 'ঠিক আছে, তবে আমি চললাম তোমার বাড়ি থেকে।' ব্যস হয়ে গেল! এক মিনিট সময়ও ভাবলো না, এই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, একবারও ভাবলো না আমার এই চলে যাওয়াটা লোকে কি চক্ষে দেখবে। মেয়েমানুষ দৈব-দুর্বিপাকে পড়েও যদি একটা রাত বাড়ির বাইরে থাকতো, তার জাত যেতো—এ তো এই সেদিনের কথা!'

'উলঙ্গের নেই বাটপাড়ের ভয়—', পারুল বলে, 'যারা জাত শব্দটাকেই মানে না, তাদের আর জাত যাবার ভয় কি? এরা দেখছে সুবিধাবাদীরা ধুনি জেবলে জেবলে ধোঁয়ার পাহাড় বানিয়ে বলছে, 'এ হচ্ছে অলঙ্ঘ্য হিমালয়।' ব্যস, অলঙ্ঘ্য। যেই না এ যুগ তাকে ধাক্কা দিয়ে দেখতে গেল, দেখলো পাথর নয়, ধোঁয়া,—পার হয়ে গেল অবলীলায়।'

'হুঁ, মেয়েটাও তাই চলে গেল মিথ্যে পাহাড়টা ফুটো করে। যে মুহূর্তে জানলো, বাবার এখানে আমার যা কিছু থাক, মর্যাদা নেই, সেই মুহূর্তেই ঠিক

রে ফেললো, অতএব এখানটা পরিত্যাগ করতে হবে।—এমন মনের জোর... আমাদের ছিল কোনো দিন? কতো অসম্মানের ইতিহাস, কতো অমর্যাদার গ্লানি বহন করে আশ্রয়টা বজায় রেখেছি। এখনো রাখছি—এখনো স্থিরবিশ্বাস রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের ওই ইঁটের খাঁচাখানার মধ্যেই বুঝি আমার মর্যাদা, আমার সম্মান। ওর গন্ডি থেকে বেরিয়ে এলেই লোকে আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাবে। ওই খাঁচাটার শিকগুলোয় মরচে পড়ে গেছে, তবু তাই আঁকড়েই বসে আছি।'

পারুল বলে, 'যার যেমন মনের গড়ন। তুই যদি সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারতিস, দেখতিস সেটাই মেনে নিতো লোকে।'

'সেই কথাই তো হচ্ছে, সাহস কই?'

পারুল একটু হেসে ফেলে, 'তুই এতো লেখিকা-টেখিকা, তবু তোর থেকে আমার সাহস অনেক বেশী। এই দ্যাখ একা রয়ে গেছি। আত্মীয়জনের নিন্দের ভয় করি না, ছেলেদের রাগের ভয় করি না, চোরের ভয় ভূতের ভয় কিছুই করি না!'

'তেমনি সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছিস! সবাই তোকে ত্যাগ দিয়েছে—' বললো বকুল ঈষৎ হেসে।

পারুল আবার হাসলো। বললো, 'যারা অতি সহজেই আমাকে ত্যাগ দিতে পারে, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদে ক্ষতিটা কোথায় বল? যেটা নেই, সেটা হারানোয় আবার লোকসান কি? সবটাই তো শূন্যের ওপর!'

'তোর হিসেবটাই কি সম্পূর্ণ ঠিক সেজদি? ও পক্ষেও তো এরকম একটা হিসেব থাকতে পারে?' বকুল বলে, 'সোজাসুজি তোর ছেলেদের কথাই ধর, ওরাও তো ভাবতে পারে, মার মধ্যে যদি ভালবাসা থাকতো, মা কি আমাদের ত্যাগ করতে পারতো?'

'ব্যাপারটা ভারী সূক্ষ্ম রে বকুল, ও বলে বোঝানো শক্ত, অনুভবেই ধরা যায় শুধু। তুই তো আবার ও-রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস! জগতের যে দুটি শ্রেষ্ঠ রস, তার থেকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে কাল্পনিক মানুষদের দাম্পত্যজীবন, আর মাতৃস্নেহ নিয়ে কলম শানাচ্ছিস। আমি ওদের মুক্তি দিয়েছি, ওরা বলছে, "মা আমাদের ত্যাগ করেছে", আমি যদি ওদের আঁকড়াতাম ওরা বলতো, "ওরে বাবা, এ যে অক্টোপাশের বন্ধন"। তবেই বল্, মার মধ্যে যদি সত্যি ভালবাসা থাকে, তবে সে কী করবে? নিজের সুনাম-দুর্নাম দেখবে? না সন্তানকে সে অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে?'

'তোর কি মনে হয় সবাই ওই বন্ধনটাই ভাবে?'

'তোর কি মনে হয়?'

'কি জানি।'

'আরে বাবা সেটাই তো স্বাভাবিক।' পারুল বলে, 'পাখির ছানাটা যখন ডিম থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়তে যায়, তখন কি সে "আহা এতোদিন এর মধ্যে ছিলাম" ভেবে সেই ডিমের খোলাটা পিঠে নিয়ে উড়তে যায়? যদি বাধ্য হয়ে তাকে সেটাই করতে হয়, ওড়ার আকাশটা তার ছোট হয়ে যাবে না?'

'তবে আর দুঃখ করবার কি আছে?'

'কিছু নেই। এটা শুধু আলোচনা। আর এটা তো আজকের কথা নয় রে, চিরদিনের কথা। "আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে", কই সে নিধি?'

' "মনের মানুষ" ওটা হচ্ছে সোনার পাথরবাটি, বুঝলি সেজদি! ও কেউ পায়

না।' বকুল বলে, 'তবু গোবিন্দভোগ না জুটলে খুদকুঁড়ো দিয়েই চালাতে হবে।'

'চালাক। যাদের চলতেই হবে, তারা তাই করুক।' পারুল বলে, 'যে পথের ধারে বসে পড়েছে, তার সঙ্গে পথ-চলাদের মিলবে না। বসে বসেই দেখবে সে, চলতে চলতে তার জন্যে কেউ বসে পড়ে কিনা।'

বাতাস জোরে উঠেছিল, পরস্পরের কথা আর শোনা যাচ্ছিল না।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গল্প করাটা হাস্যকর, সে চেষ্টা করলো না।

শীত করছিল, গায়ে আঁচল টেনে চুপ করে বসে দেখতে লাগলো ঝোড়ো হাওয়ায় গঙ্গার দৃশ্য।

কিন্তু 'ঝড়ের মুখে থাকবোই' বললেই কি আর সত্যি বসে থাকা যায়?'

কতোক্ষণ পরে পারুল বললো, 'ঘরে চল।'

পারুলের ঘরের অনাড়ম্বর সাজসজ্জা চোখটা জুড়িয়ে দিল বকুলের। কত স্বল্প উপকরণে চলে যায় পারুলের।

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের বাড়িটার কথা মনে পড়লো বকুলের। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত সেই বাড়িখানা যেন কুশ্রীতার পরাকাষ্ঠা দেখাতে 'ঢিপি' হয়ে বসে আছে। ওকে হালকা করতে পারবে, এমন সাধ্য আর কারো নেই। অলকার ছিল সাধ্য, অলকা সে সাধ্যকে কাজে লাগিয়েছে। অলকা তার অংশের যতো 'ডেয়ো ঢাকনা' শাশুড়ীর ঘরে চালান করে দিয়ে নিজের অংশটুকু সাজিয়ে-গুছিয়ে সুখে কালাতিপাত করছে।

আর অলকার শাশুড়ী?

তিনি এই পুরনো সংসারের যেখানে যা ছিল, সব বুকে করে নিয়ে এসে নিজের ঘরের মধ্যে পুরে রেখেছেন। ছিরিছাঁদহীন সেই সব আসবাবপত্র কেবলমাত্র বড়গিন্নীর মূঢ়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

সে ঘরে যে কী আছে আর কী নেই!

বকুল অবশ্য দৈবাৎই বাড়ির সব ঘরে দালানে পা ফেলবার সময় পায়, তবু যেদিন পায়, সেদিন বড় বৌদির ঘরে ঢুকলে ওর প্রাণ হাঁফায়।

বকুল জানে না বাড়িতে যত দেশলাই বাক্স খালি হয়, সেগুলো কোন্ মন্ত্রে বড়বৌদির ঘরে গিয়ে ঢোকে। আর বড় বৌদির কোন্ কর্মেই বা লাগে তারা? বকুল জানে না কোন্ কর্মে লাগে তাঁর, বাড়ির ইহজীবনের যত তার-কেটে-যাওয়া ইলেকট্রিক বালব, সংসারের সকলের পচে ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ির পাড়, যাবতীয় খালি হয়ে যাওয়া টিন কৌটো শিশি বোতল।

বৈধব্যের পর থেকে যেন বড় বৌদির এই জঞ্জাল জড়ো করার প্রবৃত্তিটা চতুর্গুণ বেড়েছে। একটা মাত্র বালিশেই তো চলে যায় তাঁর, অথচ মাথার শিয়রে চৌকিতে অন্তত ডজনখানেক বালিশ জড়ো করা আছে তাঁর ভালয়-মন্দয় ছোটয়-বড়য়।

ওনার এই কুড়িয়ে বেড়ানো দেখে কেউ হাসলে খুব বিরক্ত হয়ে বলেন, 'রাখবো না তো কি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাসিয়ে দিতে হবে?...গেলে আমায় আর কেউ করে দিতে আসবে? একটা জিনিস দরকার পড়লে তক্ষুনি কেউ যোগান দিতে আসবে?'

বড় বৌদির ছেলে মা সম্পর্কে উদাসীন বলেই কি এমন দুশ্চিন্তা ওঁর?

কিন্তু পারুলের ছেলেরা?

তারাই বা মা সম্পর্কে এত কি সচেতন?

অথচ পারুল কোনো দিন তাদের কাছ থেকে কিছুর প্রত্যাশা করে না। পারুল

যেন সব কিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। মনে হয় 'দরকার' নামক বস্তুটাকে পারুল জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছে।

পারুলের ঘরখানা তাই রিক্ততায় সুন্দর। যেমন সুন্দর পারুলের নিরাভরণ হাত দুখানা।

পারুলের ঘরে বাহুল্যের মধ্যে দেয়ালে একখানা বেশ বড় মাপের রবীন্দ্রনাথের ছবি। বাকী সমস্ত দেয়ালগুলোই শূন্য সাদা।

পারুলের ঘরটা দেখে বকুলের অবাক লাগছে, ভাল লাগছে।

হেসে বললো, 'তোর ঘরবাড়ি দেখে আমার হিংসে হচ্ছে সেজদি।'

'আমার ঘর দেখে তোর হিংসে হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'তাহলে কর হিংসে। তবে অতিবড় মুখ্যুরও এটা হতো না।'

'মুখ্যুর হয়তো হতো না। কিন্তু নিজেকে তো মুখ্যু ভাবি না!'

পারুল বললো, 'কতদিন কারো খবর জানি না, বল শুনি, আমার অজ্ঞাতসারে এতোদিন কি কি ঘটেছে সংসারে?'

বকুল হেসে ওঠে উত্তর দেয়, 'ভাল লোককেই বলছিস। আমার জ্ঞাতসারের পরিধি বড় অল্প, সেজদি আমি বাড়িতে থেকেও কিছুই জানি না!'

'প্রসূন তো ফেরেনি?'

'ওই একটা দুঃখের ইতিহাস। শুনতে পাই চিঠির সংখ্যা কমতে কমতে ক্রমশই শুধু শূন্যের সংখ্যা।'

'ছোড়দার কথা ভাবলে, বড় মন-কেমন করে। কেমন "ডাঁটুস"টি ছিল। নিজের ছেলেমেয়ে থেকেও যত যন্ত্রণা।'

'ওকথা থাক সেজদি, তোর কথা বল।'

'আমার? আমার আবার কথা কী রে? "কথা"কেই জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে বসে আছি। আজ সমাজ-সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখছি।'

'দেখছিসটা কী?'

'দেখছি ওর বজ্রআঁটুনি থেকে কেমন গেরো ফস্কে পালিয়ে এসেছি।'

'ভাগ্যিস সেই "অ-কবি লোকটা" তোর জন্যে এমন একটা বাড়ি বানিয়ে রেখে গেছে, তাই না এতো কবিত্ব তোর?'

পারুল অকপটে বলে, 'তা সত্যি। শুধু এইটির জন্যেই এখন লোকটার প্রেমে পড়তে শুরু করছি।'

তারপর পারুল বললো, 'এবার তা হলে জিজ্ঞেস করি, বকুলের কাহিনীর কী হলো?'

'আমিও তো তাই ভাবি কী হলো!' বকুল বললো।

তারপর আস্তে বললো, 'আর লিখেই বা কী হবে? নির্মল তো পড়বে না।'

দুজনেই চুপ করে গেল।

হয়তো অনেকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া নির্মল নামের সেই ছেলেটার মুখ মনে করতে চেষ্টা করলো।

অনেকক্ষণ পরে পারুল বললো, 'নির্মলের বৌ কোথায় আছে রে?'

'ঠিক জানি না, বোধ হয় ওর ছেলে যেখানে কাজ করে।'

বকুল কি কোনো কারণেই কোনো দিন কারো সামনে নির্মলের নাম উচ্চারণ করেছে? কই মনে পড়ছে না। আজই হঠাৎ বলে বসলো, 'লিখেই বা কি হবে? নির্মল তো পড়বে না।'

এর স্বীকারোক্তি বকুলের নিজের কানেও কি অদ্ভুত লাগলো না? বকুল নিজেই কি আশ্চর্য হয়ে গেল না? বকুল কি কখনো ভেবেছে লিখে কি হবে, নির্মল তো পড়বে না?

ভাবেনি, ওই ভাবনাটুকু ভাববার জন্যে যে একান্ত গভীর নিভৃতিটুকুর প্রয়োজন তা কোনো দিন বকুলের জীবনে নেই। বকুল হাটের মানুষ, কারণ বকুল স্বেচ্ছায় হাটে নেমেছিল, তার থেকে কোনো দিন ছুটি মিললো না তার। তাই নিজেই সে কোনোদিন টের পায়নি অনেক গভীরে আজও একদার সেই ছদ্মবেশহীন বকুল উদাসীন মনে বসে ভাবে, 'সে-কথা লিখে কি হবে, নির্মল তো পড়বে না।'

আজ এই নিতান্ত নির্জন পরিবেশ, এই গঙ্গার ধারের বারান্দার ঝোড়ো হাওয়া আর আবাল্যের সঙ্গিনী সেজদির মুখোমুখি বসে থাকা—সকলে মিলে যেন সেই কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত লাজুক বকুলকে টেনে তুলে নিয়ে এলো তার অবচেতনের গভীর স্তর থেকে।

হয়তো শুধু এইটুকুও নয়। মস্ত একটা ধাক্কা দিয়ে গিয়েছে সেই মেয়েটার গড়গড়িয়ে চলে যাওয়া গাড়ির চাকাটা। ওই মেয়েটা বকুলকে ধিক্কার দিয়েছে, ধিক্কার দিয়েছে বকুলের কালকে। সেই কাল মাথা হেঁট করে বলতে বাধ্য হলো, 'তোমাদের কাছে আমরা হেরে গেছি। আমরা জীবনে সব থেকে বড়ো করেছিলাম নিন্দের ভয়কে, তোমরা সেই জিনিসটাকে জয় করেছো। তোমরা বুঝেছো ভালবাসার চেয়ে বড়ো কিছু নেই, তোমরা জেনে নিয়েছো, নিজের জীবন নিজে আহরণ করে নিতে হয়, ওটা কেউ কাউকে হাতে করে তুলে দেয় না। সেই জীবনকে আহরণ করে নিতে তোমরা তোমাদের রথকে গড়গড়িয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারো কাঁটাবনের উপর দিয়ে।'

বকুলের ছদ্মবেশটা অনেক পেয়েছে, অনেক পাচ্ছে, হয়তো আরো অনেক পাবে। সেখানে কতো ঔজ্জ্বল্য, কতো সমারোহ, কিন্তু ছদ্মবেশ যখন খুলে রাখে বকুল, কি নিঃস্ব, কী দীন, কী দুঃখী!

কিন্তু শুধুই কি একা বকুল? ক'জনের জীবন ভিতর-বাহির সমান উজ্জ্বল?

'সনৎকাকাকে তোর মনে পড়ে সেজদি?' অনেকক্ষণ পরে বললো বকুল।

পারুলের সঙ্গে সনৎকাকার তেমন যোগাযোগ ছিল না, পারুল তো অনেক আগেই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল।

সনৎকাকার এক বিশেষ বন্ধু একদা মহা সমারোহে একখানি পত্রিকা খুলে বসেছিলেন, সেই পত্রিকার সূত্রেই বকুল পেয়েছিল একটি বিশাল বটছায়া। বকুল কি তার আগে কোনো দিন জেনেছিল জগতে ছায়া আছে? বকুল জানতো জগতে শুধু প্রখর রৌদ্র থাকে। বকুল কি জানতো জগতে আলো আছে? আকাশ আছে? ওসব জানবার অধিকার মুক্তকেশীর মাতৃভক্ত পুত্র প্রবোধচন্দ্রের সদ্বংসারভুক্তদের ছিল না!

সনৎ নামের সেই মানুষটি প্রবোধচন্দ্রের অচলায়তনের গণ্ডি ভেঙে বকুলকে আকাশের নিচে নিয়ে গিয়েছিলেন, নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য এক জগতে। সনৎকাকার সাহায্য না পেলে হয়তো বকুলের জীবনের ইতিহাস অন্য হতো।

পারুল জানে, তবু হয়তো সবটা জানে না। তাই পারুল বললো, 'ওমা মনে থাকবে না কেন? বাবার সেই কি রকম যেন ভাই না? অন্য জাতের মেয়ে বিয়ে করে জাতেঠেলা হয়েছিলেন? ওঁর সেই বন্ধুর কাগজেই তো তোর প্রথম লেখা বেরোয়? বাবা ওঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাই না রে?'

'হ্যাঁ, সংসারে যারা একটু উদারতা নিয়ে আসে, কেউ তাদের দেখতে পারে না।'

পারুল একটু হাসলো. 'আজ এই একটা পুরনো মানুষ দেখে তোর বুঝি যতো পুরনো মানুষদের মনে পড়ছে?'

বকুল ঠিক ওই কথাটার উত্তর না দিয়ে আস্তে বললো, 'মারা গেছেন সনৎকাকা।'

'মারা গেছেন!'

পারুল হঠাৎ ফট্ করে একটা বেখাপ্পা কথা বলে বসলো। বললো, 'ওমা এতোদিন বেঁচে ছিলেন নাকি?'

তারপর বোধ করি বকুলের মুখটা দেখতে পেয়ে বললো, 'কারুর কোনো খবর তো জানতে পারি না, রাখিও না। অনেক দিনের মানুষ তো, তাই ভাবছিলাম—'

বকুল শান্ত গলায় বললো, 'হ্যাঁ, অনেক অনেক দিনের মানুষ।'

'ছিলেন কোথায়?'

'কলকাতাতেই। নীরুদার কাছেই থাকতে হয়েছে শেষ জীবনে। দিল্লীতে থাকতেন, নীরুদা রিটায়ার করে কলকাতায় এলে—কলকাতাতেই চলে এসেছিলেন। দেখা করতে গেলে বলেছিলেন, "নীরুর সংসারের মালপত্তরগুলোর মধ্যে আমিও' তো একটা, আমায় নিয়ে আসা ছাড়া আর গতি কি ওদের?"

পারুল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'নীরুদা ভাইপো বলেই যে সনৎকাকাকে ওর সংসারের "মালপত্রে"র সামিল হয়ে যেতে হয়েছিল, তা ভাবিস না বকুল! নীরুদা ওঁর নিজের ছেলে হলেও তফাৎ হতো না কিছু। খুব অবহেলার মধ্যে থাকতে হয়েছে বোধ হয়, না রে?'

বকুল প্রায় হেসে উঠেই বলে, 'উঁহু, মোটেই না। আদর-যত্নের বহর দেখবার মতো। নীরুদার বৌ কোলের বাচ্চা ছেলের মতো শাসন করে দুধ খাইয়েছে, ওষুধ খাইয়েছে, নীরুদা শহরের সেরা ডাক্তারদের এনে জড়ো করেছে।'

'অনেক টাকা ছিল বুঝি সনৎকাকার?' মুচকি হেসে বললো পারুল।

'নাঃ, তুই দেখছি আগের মতই কুটিল আছিস—', বকুল এবার গলা খুলে হেসে ওঠে, 'গঙ্গার এই পবিত্র হাওয়া তোর কোন পরিমার্জনা করতে পারেনি। ঠিক আগের মতই কার্যের পিছনের কারণটা চট করে আবিষ্কার করে ফেলতে পারিস।'

তারপর আবার গম্ভীর হয়ে যায়, পারুলের মুখের সকৌতুক রেখার দিকে তাকিয়ে বলে, 'ছিল বোধ হয় অনেক টাকা, মাঝে মাঝে গিয়েছি তো কখনো কখনো, একদিন বলেছিলেন, বরাবর ভাবতুম, সারাজীবন ব্যয়ের থেকে আয়টা বেশী হয়ে যাওয়ায় যে ভারটা জমে বসে আছে, মরার আগে সেটা কোনো মিশনে-টিশনে গিয়ে দিয়ে যাবো, কিন্তু এখন দেখছি সেটা রীতিমত পাপকর্ম হবে। অতএব বরাবরের ইচ্ছেটা বাতিল করছি। তোর কি মনে হয়, এটাই ঠিক হলো না?'

বললাম, 'আপনাকে আমি ঠিক-ভুল বোঝাবো?'

সনৎকাকা বললেন, 'তা বললে কি হয়? শিশুদের তো বড়দের বুদ্ধি নেওয়া উচিত, আর আমার এখন দ্বিতীয় শৈশব চলছে।'

বলেছিলাম, অবশ্য হেসেই বলেছিলাম, 'বোধ হয় এটাই ঠিক, কারো আশা-ভঙ্গের অভিশাপ লাগবে না।...কিন্তু ভারী দুঃখ হয়েছিল সেদিন। অনেক সমারোহের আড়ালে হঠাৎ যখন ভিতরের নিতান্ত দৈন্যটা ধরা পড়ে যায়, দেখতে কী করুণই লাগে! শুধু অনেক টাকা থাকলেও কিছু হয় না রে সেজদি, গদি বজায় রাখতে অনেক খাটতে হয়। ওদের দুজনের ছলনায় গড়া ওই উচ্চ আসনটি

বজায় রাখতে কম খাটতে হয়েছে বুড়ো মানুষটাকে। ও-বাড়িতে গিয়ে বসলেই কী মনে হতো জানিস, যেন স্টেজে একটা নাটক অভিনয় হচ্ছে, সনৎকাকাও তার মধ্যে একটি ভূমিকাভিনেতা।'

পারুল বলে, 'তোর এখনো এই সব নাটক-ফাটক দেখে আশ্চর্য লাগে, এটাই যে ভীষণ আশ্চর্যি রে!—মোহন শোভন মাঝে মাঝে দু'এক বেলার জন্যে বৌ ছেলে নিয়ে বেড়াতে আসে, দেখলে তোর নিশ্চয় খুব ভাল লাগতো। অভিনয়ের উৎকর্ষও তো একটা দেখবার মতো বস্তু।'

'তাহলে আর বলার কি আছে?' বকুল বলে, 'এই রকমই হয় তাহলে?'

'ব্যতিক্রমও হয় বৈকি, নাহলে ইহসংসার চলছে কিসের মোহে? তবে তোর নিজের জীবনেই কি তুই দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পেরেছিস! জানি না ঠিক, পরলোকগত প্রবোধচন্দ্রের সংসারমঞ্চের মধ্যে তোকে যারা দেখছে, দেখার চোখ থাকলে তারাও হয়তো তাই বলবে।'

বকুল নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'হয়তো তা নয়, হয়তো তাই। কজন আর তোর মতো মঞ্চ থেকে সরে পড়ে দর্শকের চেয়ারে বসে থাকতে জানে বল্?'

'বলেছিস হয়তো ভুল নয়,' পারুল মৃদু হেসে বলে, 'ওই চেয়ারের টিকিটটা কাটতে তো দাম দিতে হয় বিস্তর। বলতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়েই কিনতে হয়।'

বকুল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তোর আর আমার মনের গড়ন চিরদিনই আলাদা। আমার হচ্ছে সব কিছুর সঙ্গেই আপস, আর তোর কোনোদিন কোনো অপছন্দর সঙ্গেই আপস নেই।'

বহুদিন পরে কম বয়সের মতো প্রায় রাত কাবার করে গল্প করলো বকুল আর পারুল।

যখন ছোট ছিল, যখন মনের কোনো বক্তব্য তৈরী হয়নি, তখনও ওরা দুই বোন এমনি গল্প করেছে অনেক রাত অবধি, বাবার ঘুম ভাঙার ভয়ে ফিসফিস করে।

মা-বাবার ঘরের পাশেই তো ছিল ওদের দুই বোনের আস্তানা! সরু ফালি-মতো সেই ঘরটায় এখন সংসারের যতো আলতুফালতু জঞ্জাল থাকে। বকুল কোনো কোনো দিন ওদিকের ঘরে যেতে গেলে দেখতে পায়, ঘরটাকে এখন আর চেনা যায় না। অবশ্য তখনো যে একেবারেই শুধু তাদের দুই বোনের ঘর ছিল তা নয়, সে ঘরে দেয়াল ঘেঁষে ট্রাঙ্কের সারি বসানো থাকতো। থাকতো জালের আলমারি, জলের কুঁজো। বকুল-পারুলের জন্যে খাট-চৌকিও ছিল না, রাত্রে মাটিতে বিছানা বিছিয়ে শুতো দুজনে। তবু ঘরটাকে ঘর বলে চেনা যেতো, এখন আর যায় না।

যখন চেনা যেতো, তখন দুটি তরুণী মেয়ের অপ্রয়োজনীয় অবান্তর অর্থহীন কথায় যেন মুখর হয়ে উঠতো। রাত্রি না হলে তো পারুলের কবিতার খাতা উদ্ঘাটিত হতো না! বকুলের খাতা তখনো মানসলোকে।

তারপর যখন বিয়ে-হয়ে-যাওয়া পারুল মাঝে মাঝে এসেছে, রাত ভোর করে গল্প করেছে। বকুলের খাতা তখন আস্তে আস্তে আলোর মুখ দেখছে।

আর পারুলের খাতা আলোর মুখ দেখবার কল্পনা ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহবাতিক অথচ একেবারে পত্নীগতপ্রাণ স্বামী 'অমলবাবু'র পুঞ্জীভূত আক্রোশ যে ওই খাতাটার উপরই, সেটা বুঝে ফেলে ঔদাসীন্যের হাসি হেসে খাতাটা বাক্সের নীচে পুরে ফেলেছে পারুল।

বকুল বলতো, 'ইস! এখানেও নিয়ে আসিসনি? আমি তো দেখতাম!'

পারুল বলতো, 'দূর! আর লিখিই না। কী হবে কতকগুলো বাজে কথা লিখে?'

ওটা পারুলের বিনয়, লেখাটা ছাড়তে পারেনি সে, শুধু তাকে একেবারে গভীর অন্তরালের বস্তু করে রেখেছিল।

এখনো কি লেখে না মাঝে মাঝে?

বকুল বললো, 'লক্ষ্মীটি সেজদি, বার কর না, দেখি এই অনির্বচনীয় নিরালায় কি লিখেছিস তুই এতোদিন ধরে?'

পারুল হাসলো, উঠলো, কিন্তু আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখলো কোন্ ফাঁকে 'ফিউজড্' হয়ে বসে আছে।'

'দেখলি তো—', ছেলেমানুষের মত হেসে উঠলো পারুল, 'আমার জীবনের এবং কবিতার এটা হচ্ছে প্রতীক! আলো ফিউজড্!'

বকুল হাসলো না, একটু চুপ করে থেকে বললো, 'ভোরের গাড়িতে যাবার কথা, তোর তো অনেক আগে উঠে গুছিয়ে-টুছিয়ে নেওয়ার দরকার ছিলো, অন্ধকার হয়ে থাকলো—'

পারুলের গলার সেই হাসির আমেজটা মুছে গেলে, পারুল বললো, 'না রে' আমি আর যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছিস না?'

"নাঃ! ভেবে দেখছি আমার এই যাওয়াটার কোন মানে হবে না। তোর পায়ে পায়ে ঘুরে শুধু বাধাই সৃষ্টি করবো। তাছাড়া—', একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বললো, 'সেটা অবশ্য আমার ইচ্ছের ফসল, তবু ভাবছি, যদি মেয়েটা কোনো ঘটনার চাপে আবার ফিরে আসে আজকালের মধ্যে!'

কথাটা অযৌক্তিক নয়।

বকুল বললো, 'তবে ঘুমো। আমি যাবার সময় ডেকে তুলে বলে যাবো।'

পারুল বললো, 'তার থেকে তুই ঘুমো, আমিই তোকে ডেকে তুলে দেবো।'

হেসে ফেললো আবার দু'জনই। জানে ঘুম কারুরই হবে না।

॥ ১৯ ॥

বকুল যখন বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলো, তখন আকস্মিক ভাবেই ছোড়দার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল ঢলঢলে একটা গেঞ্জি আর আধময়লা একটা ধুতি পরে। গেঞ্জির গলার ফাঁক দিয়ে পৈতের একটু-খানি দেখা যাচ্ছে।

ছোড়দাকে দেখে বাড়ির বামুনঠাকুর-টাকুর মনে হচ্ছে, বকুলের আবার ছোড়দাকে দেখে মন-কেমন করলো। ছেলেবেলায় সব ভাইদের মধ্যে ছোড়দাই সবচেয়ে শৌখিন ছিলো।

বলতে যাচ্ছিল, 'কী ছোড়দা, এখানে দাঁড়িয়ে যে?'

তার আগেই ছোড়দা বলে উঠলো, 'কী, তুই আজই ফিরে এলি যে?'

বকুল দেখতে পেলো ছোড়দা গাড়ির মধ্যে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

হয়তো বকুলের চোখের ভ্রম, হয়তো বকুলের মনের কল্পনা, তবু বকুলের মনে হলো, সেই সন্ধানী দৃষ্টির অন্তরালে একটি প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল,

সেটা নিভে গেল।

বকুল মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'চলেই এলাম।'

তারপর আর প্রশ্ন করবে না ছোড়দা, জানা কথা। হয়তো অন্যদিন হলে বকুলও আর কথা বলতো না, আজ কি জানি কেন নিজে থেকে বললো, 'মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলো না।'

অসতর্কেই বোধ হয় ছোড়দার মুখ থেকে প্রায় আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো, 'দেখা হলো না ?'

'নাঃ! কালই সকালে চলে গেছে।'

ছোড়দা একটু চুপ করে থেকে বললো, 'গেলেন কোথায় ?'

'সেজদি তো বললো, কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। একটু গোলমেলে ব্যাপার আছে।' বললো, কারণ ভাবলো বলাই উচিত।

ছোড়দা ধিক্কারের গলায় বলে উঠলো, 'ভালো। এ যুগের ছেলেমেয়েরা তো গোলমাল বাধানোই বাহাদুরি বলে মনে করেন। নির্মলের ছেলের অতোটুকু ছেলেটা যা করেছে—আচ্ছা শুনো পরে, এখন বাড়ির মধ্যে যাও।'

'নির্মলের ছেলের অতোটুকু ছেলেটা যা করেছে—'

এটা আবার কোন্ ভাষা ?

বকুল ওই শব্দ কটার অর্থ আবিষ্কার করতে পারে না। অবাক হয়ে ছোড়দার মুখের দিকে নয়, নির্মলদের বাড়িটার দিকে তাকায়। যেন বাড়িটার ওই জীর্ণ দেয়ালটার গায়ে অর্থটা লেখা আছে।

ওই বাড়িটা থেকে 'নির্মল' নামের অস্তিত্বটা কতো-কতোদিন আগে যেন মুছে গিয়েছিল, ওর দিকে তাকিয়ে দেখার কথা আর মনে পড়েনি এতো দিন।

বদলির চাকরি করতো নির্মল, ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি আসতো, সে ঘটনা কবেকার? বকুল তার সব খবর জানতো বৌদিদের কলকাকলীর মধ্যে থেকে। কানে এসেছে মা-বাপ মারা যাওয়ার পর নির্মল আর কলকাতায় আসে না, ছুটি হলে বরং অন্য দেশে যায়। নির্মলদের ঘরগুলো চাবি বন্ধই পড়ে থাকে।

আর বাকি সারা বাড়িটা?

সেটা নাকি নির্মলের প্রবলপ্রতাপ জেঠিমার দখলে ছিল ? সেটার দখলদার তখন জেঠিমার দুই ভাইপো। জেঠিমা যখন নিঃসন্তান, তখন তাঁর ভাইপোরা তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এটাই স্বাভাবিক। শেষ বয়সে তাঁকে দেখবার জন্যেও তো লোক চাই ?

সেই নিঃসন্তানা ভদ্রমহিলা, শ্বশুরকুলের যাদের জন্যে জীবনপাত করলেন, জা, দ্যাওর, দ্যাওরপো, দ্যাওরঝি ইত্যাদি, তাঁরা কি তাঁকে দেখলো ? জা দ্যাওর দিব্যি তাঁর আগে মরে কর্তব্য এড়িয়ে গেল, আর দ্যাওরপো দ্যাওরপো-বৌ 'বাসা'য় গিয়ে মজায় কাটাতে লাগলো. তিনি তবে পিতৃকুলের শরণ নেবেন না কী করবেন ?

দ্যাওরপোরই না হয় চাকরি ; কী করবে পরের দাসত্ব, কিন্তু বৌ থাকতে পারতো না ছেলেদের নিয়ে কলকাতায়? কলকাতায় ছেলেদের পড়াবার মত ইস্কুল নেই ? তাই 'নানাস্থানী' বাপ শেষ অবধি ছেলেদের বোর্ডিঙে, হোস্টেলে রেখে মানুষ করছে। তা তো নয়, 'কর্তা-গিন্নী' কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না।

তা জগৎসংসারে সবাই যখন আপন স্বার্থটি দেখছে, জেঠিমাই বা কেন না দেখবেন? দেখেছেন তিনি। ভাইপোদের আনিয়ে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এসব খবর ছিট্‌কে ছিট্‌কে কানে এসেছে বকুলের, তার সঙ্গে এও কানে এসেছে, একেই বলে রাজা বিনে রাজ্য নষ্ট! কী বাড়ি কী হলো! কোথা থেকে

উড়ে এসে জুড়ে বসে ওই জেঠির ভাইপো দুটো বাড়িটাকে যেন নরককুণ্ডু করলো গো! করবে না কেন, নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটে তো নয় যে মনে একটা ইয়ে আসবে? তাই সারা বাড়িটার খোপে খোপে ভাড়াটে বসিয়েছে। এখানে টিনের ঘের, ওখানে ক্যাম্বিসের পর্দার আড়াল, সেখানে নিরাবরণ ইঁটের দেওয়াল তোলা আবরণ। এমন কি গেটের ধারের চাকরের ঘরটাতে পর্যন্ত পানের দোকানদার বসিয়েছে।

অতএব 'নরককুণ্ডু' বলাটা আতিশয্য নয়। তবে? কে তাকাতে যায় নরক-কুণ্ডুর দিকে? বকুলদের তিনতলার সিঁড়ির থেকে নামতে মাঝামাঝি চাতালটা থেকে যে ছোট্ট বারান্দাটুকু যেন আকস্মিকভাবে বেরিয়ে পড়েছে, সেখান থেকেও শুধু ওদের বাড়ির সেই কোণের দিকটা দেখা যায়। যেদিকটা চাবিবন্ধ পড়ে থাকে।

তারপর তো হঠাৎ একদিন খবর এলো, ওই অংশের মালিক 'ছুটি পেয়ে' অন্যত্র চলে গেছে। আর কোনোদিন এসে ওই তালার চাবি খুলবে এমন আশা নেই।

নির্মলের বৌ হয়তো কদাচ কখনো এসেছে, তারপর ছেলের কাছে কোথায় যেন থেকেছে। সেই ছেলে যে এতো বড়ো হয়ে গেছে, যার ছেলে একটা গোল-মাল বাধাতে পারে, এটা বুঝতে সময় লাগলো বকুলের।

তারপর আস্তে আস্তে মনে পড়ল, 'অসম্ভব' হতে যাবে কেন? দিন মাস বছর গড়িয়ে চলেছে নির্ভুল নিয়মে।

আমরা যদি কাউকে ভুলে যাই, ভুলে থাকি, সে কি বাড়তে ভুলে যাবে? কিন্তু সেই 'অতোটুকু'টা কতোটুকু? কোথায় বসে বাধালো সে গোলমাল? ওই জরাজীর্ণ দেয়ালটার ওধারের চাবিবন্ধ ঘরগুলোর চাবি খোলা হয়েছে নাকি? রাস্তা থেকে শুধু সামনের ওই পানের দোকানটা, আর দোতলার বারান্দার রেলিং এর জানলার কার্ণিশে ভাড়াটেদের ঝুলন্ত জামা কাপড় গামছা লুঙ্গি বিছানা শতরঞ্চি ব্যতীত আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

তবু বোকাটে চোখে ওই বাড়িটার দিকেই তাকালো বকুল। যেন ছোড়দার বলা ওই শব্দগুলোর পাঠোদ্ধার হবে ওখানের দেয়ালে দেয়ালে।

ছোড়দা যে বকুলকে বাড়ির ভেতরে যেতে বললো সেকথা ভুলে গিয়ে বকুল আস্তে বললো, 'কতো বড়ো ছেলে?'

'আরে কতো বড়ো আর হবে? বছর বারো-তেরো! নিজেরও তেমন সাত-সকালে বিয়ে হয়েছিল, ছেলেরও তো তাই দিয়েছিল! দিয়েছিল ভালই করেছিল, জীবনের কাজ-কর্তব্য চুকিয়ে গেছে। আমারই কিছু হোলো না। যাক শুনো পরে—'

ছোড়দার কথায় যেন একটা ক্ষুব্ধ আক্ষেপের সুর! যেন নির্মল নামের সেই চালাকচতুর লোকটা বকুলের ছোড়দার থেকে জিতে গেছে।

বকুলের চিন্তার মধ্যে এখন আর ওই বয়েসের অংকটা ঢুকলো না, ওর শুধু মনে হলো জীবনের কাজ-কর্তব্য বলতে কি ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে ফেলা? ছোড়দা সেটা পেরে ওঠেনি বলে ছোড়দা ক্ষুব্ধ?

ছোড়দা আবারও নির্দেশ দিলো, 'শুনো পরে।'

কী সেই গোলমেলে ব্যাপারটা? যা অতোটুকু ছেলের দ্বারা সংঘটিত হতে পারে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর প্রশ্ন চলে না। তবু বকুল আর একটা কথা বললো। বললো, 'তুমি এসময় এভাবে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে?'

ছোড়দা যেন আত্মধিক্কারের গলায় বলেন, 'আমাদের আবার এভাবে সেভাবে! দাঁড়িয়ে আছি বাড়ির মধ্যে ছটফটানি ধরলো বলে।'

'তোমার—', থেমে গেল বকুল।

বকুলের হঠাৎ মনে পড়লো, শীগগিরের মধ্যে রিটায়ার করার কথা ছিল ছোড়দার, বোধ হয় সেই ঘটনাটাই ঘটেছে। তাই 'তোমার অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে না?' বলতে গিয়ে থেমে গেল।

ভিতরে ঢুকতেই আর এক পরম লজ্জার মুখোমুখি দাঁড়াতে হলো বকুলকে। বকুল সত্যিই এটা ভাবেনি। ওকে ঢুকতে দেখেই ছোটবৌদি বলে উঠলো, 'পেয়ারের ভাইঝিকে নিজের তিনতলায় নিয়ে তোলো গে বাবা, তোমার দাদা দেখলে পরে আগুন হয়ে উঠবে। একেই তো নানা কাণ্ডয় ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।'

তার মানে এরা ধরেই রেখেছিল বকুল খবর পেয়ে শম্পাকে আনতে ছুটলো! এবং এ-ও ধরে রেখেছিল, আমরা যতই বারণ করি ও যা করতে যাচ্ছে ঠিকই তা করবে!

ছোড়দার ওপর মায়া হয়েছিল, কিন্তু এখন যেন আর সে-বস্তুটা তেমন এলো না। বকুল নিজস্ব স্থিরতার খোলসে ঢুকে পড়ে বললো, 'গাড়ি থেকে নামতেই ছোড়দাও এইরকম কী একটা বললো, মানে বুঝতে পারিনি, তোমার কথারও পারছি না। আমি শম্পাকে নিয়ে এসেছি এরকম একটা ধারণা কেন হলো তোমাদের?'

ছোটবৌদি এই পরিষ্কার ধারালো কথাটার উত্তরের দিক দিয়ে গেল না, কেমন ফ্যাকাশে-হয়ে-যাওয়া মুখে বললো, 'আসেনি?'

বকুল তেমনি স্থির গলায় বলে, 'আসার কথাটাই যে উঠছে কেন তা বুঝছি না, তাছাড়া তোমরা তো বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলে?'

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো।

অপ্রত্যাশিত এবং অভূতপূর্বও বটে!

ছোটবৌদিকে কে কবে কেঁদে ফেলতে দেখেছে?

অন্তত বকুল কখনো দেখেনি এটা নিশ্চিত। সেই হঠাৎ কেঁদে ফেলা বিকৃত গলায় বলে উঠলো ছোটবৌদি, 'সেই বারণ করাটাই এতো বড়ো হলো তোমার কাছে?'

বকুল স্তব্ধ হয়ে গেল।

বকুলের নিজেকে হঠাৎ ভারী ছোট মনে হলো। বকুল বরাবর যাকে (অস্বীকার করার উপায় নেই) মনে মনে প্রায় অবজ্ঞাই করে এসেছে, সে যেন সহসা বকুলের থেকে অনেকটা উঁচু আসনে উঠে গেল।

বকুলের ইচ্ছে হলো ছোটবৌদির খুব কাছে সরে যায়, ওর গায়ে একটু হাত ঠেকায়, মমতার গলায় বলে, 'ওটা আমি মনের দুঃখে বলেছিলাম ছোটবৌদি, ওর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো নিয়ে না এসে ছাড়তাম না, কিন্তু দেখাই হয়নি।'

কিন্তু অনভ্যাসের বশে পারলো না বকুল।

ওই অন্তরঙ্গতার সুর অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছে বকুল। অথবা ছিলই না কোনোদিন। হয়তো তাই। ছিলই না কোনোদিন।

ছেলেবেলা থেকেই অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতার দুর্গে বাস বকুলের।

সেখান থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা নেই তার, ক্ষমতা নেই কারো অন্তরঙ্গ হবার। সে দুর্গের একটি মাত্রই দরজা আছে, সে দরজার চাবি তো অন্যের কাছে!

অথচ লোকে কত সহজেই অন্তরঙ্গ হতে পারে। ওই ছোটবৌদির ব্যাপারেই দেখেছে একদা যখন বড়বৌদির সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি নেই, সেইরকম সময় হঠাৎ ছোটবৌদির বাবা মারা যাওয়ার খবর এলো। বকুল কাঠ হয়ে ছোটবৌদির ধারে-

কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, দেখলে বড়বৌদি কী অবলীলায় ছোট জাকে তুলে ধরে প্রায় বুকে টেনে নিয়েই পৃথিবীর 'নিয়মতত্ত্ব' বোঝাতে বসলেন। বোঝাতে বসলেন, মা-বাপ চিরদিনের বস্তু নয়।

যেন আর সবাই চিরদিনের।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল বড়বৌদি ছোট জাকে জোর করে তুলে শরবৎ খাওয়াচ্ছেন, হবিষ্যিকালে নেশার জিনিস খেতে নেই এটা মানলেও চা খেতে বিধান-দিচ্ছেন এবং ছোট জায়ের চতুর্থীর যোগাড় করে দিতে কোমরে আঁচল জড়িয়ে খাটছেন।

দেখে দেখে বকুল হাঁ হয়ে গেছে। বকুলের সাধ্য নেই অমনটি করবার।

কিন্তু ওই না-পারাটা যে একটা বড় রকমের অক্ষমতা, এটা কোনোদিন মনে আসেনি বকুলের। আজ হঠাৎ বকুল টের পেল মস্ত একটা অক্ষমতা আছে তার। তবু বকুল যেটা পারে সেটা করলো। গলাটা নরম করে আস্তে বললো, 'বারণ করাটা বাজে কথা বৌদি, ওর সংগে আমার দেখাই হয়নি!'

'দেখাই হয়নি?'

ছোড়দার প্রশ্নটাই করলো ছোটবৌদি। তবু স্বরের পার্থক্য।

ছোড়দা কেমন যেন অবাক আর হতাশ গলায় উচ্চারণ করেছিল প্রশ্নটা। ছোটবৌদির গলায় অবিশ্বাসের ঝাঁজ।

সহসা কেঁদে-ওঠা গলায় এই ঝাঁজটা খুব বেমানান লাগলো, আর আরো 'বেচারী' লাগলো মানুষটাকে।

বকুল আস্তে বললো, 'সত্যিই দেখা হয়নি ছোটবৌদি! আমি যাওয়া মাত্রই সেজদি বলে উঠলো, তুই আজ এলি বকুল? কালকে এলেও মেয়েটার সংগে দেখা হতো।'

'এতোদিন তো ছিল—'

প্রশ্ন না উক্তি?

ঝাপসা গলায় যেটা উচ্চারণ করলো শম্পার মা?

এতোদিন যে ছিল সেখানে, সে খবর তো শম্পার মার জানা। শুধু কিছুতেই নত হবো না এই নীতিতেই চুপ করে ছিল। হয়তো বা নিরাপদ একটা আশ্রয়ে আছে জেনে নিশ্চিন্তও ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা ভেঙে আসছিল বৈকি।

শান্ত বাধ্য বিনীত সন্তানের বিচ্ছেদব্যথা মাতৃহৃদয়কে যত কাতর করে, তার চেয়ে অনেক বেশী কাতর করে উদ্ধত অবাধ্য দুরন্ত সন্তানের বিচ্ছেদব্যথা। সেই অবাধ্য সন্তানের স্মৃতিমন্থনে যে দুঃসহ বোঝা জমে ওঠে, সে বোঝা তো আপন অপরাধের বোঝা।

অবাধ্য সন্তানকে যে নিষ্ঠুর শাসন না করে উপায় থাকে না, কটু কথা না বলে উপায় থাকে না, দুর্ব্যবহার না করে পারা যায় না, সেইগুলোর স্মৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মতো প্রতি মুহূর্তেই তো ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে সেই হৃদয়।

সমস্ত নিষ্ঠুর শাসন শতগুণ হয়ে ফিরে আসে নিজেরই কাছে।

শম্পার মার এই ভিতরে ভিতরে গুঁড়ো হয়ে-যাওয়া মনটা বাইরে শক্ত হয়ে থাকবার সাধনায় আরো গুঁড়ো হচ্ছিল, তাই বুঝি মনে মনে একান্তভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল, বকুল তাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে মেয়েটাকে নিয়ে আসবে।

বকুলের কথা সেই লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

বকুলের কথায় সেই প্রত্যাশার পাত্রটি চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, শম্পার অহঙ্কারী মা তার চিরদিনের অহঙ্কারটাকেও তাই আর ধরে রাখতে পারলো না।

বকুল সেই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া অহংকার আর গুঁড়ো হয়ে যাওয়া প্রত্যাশার পাত্রখানা দুটোই দেখতে পেলো। বকুল নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'আমার ভাগ্য! ছিল তো এতদিন, পরশু পর্যন্ত ছিল। কাল আমি গেলাম, আর কালই শুনলাম। মুশকিল এই—কোথায় যে যেতে পারে বোঝা যাচ্ছে না—'

তারপর বকুল আস্তে আস্তে সাবধানে পারুলের কাছে শোনা ঘটনাকে ব্যক্ত করে।

ছোটবৌদির কান্নার চোখ শুকিয়ে উঠেছিল, পাথরের মত বসে থেকে সবটা শুনে বলে ওঠে সে, 'এ আমাদের পাপের ফল বকুল, বুঝতে পারছি। সব জেনেও আমরা—ওকে আর ফিরে পাব না বকুল। ওকে নিশ্চয় কোনো বদমাইস ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে! ঠিকই হয়েছে, উচিত শাস্তি হয়েছে আমার। চিরদিন তোমার উপর একটা হিংসের আক্রোশে ওকে আমি মায়ের প্রাণটা বুঝতে দিইনি, আর ওকেও বুঝতে চেষ্টা করিনি—'

বকুল চমকে তাকায়।

এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির সামনে বকুল আর একবার মাথা নত করে। এ সত্য বকুলের অবোধ্য ছিল না, কিন্তু ওই মানুষটারও যে সে বোধ ছিল, তা তো কোনোদিন বিশ্বাস করেনি। ভেবেছে নিতান্তই অবচেতনে এটা করে চলেছে ও।

অথবা হয়তো সত্যিই তাই।

শুধু আজকেই মেয়েটাকে সত্যি হারিয়ে ফেলে ওর বোধের দরজা খুলে গেল। আঘাতেই তো রুদ্ধ চৈতন্যকে ঘা মেরে জাগায়!

বকুল ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে না, নিজেও যে সে ওই হাহাকারের শরিক! বকুল শুধু নরম গলায় বলে, 'ছোড়দার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি কী করা যায়। কিন্তু নির্মলদের বাড়ির কী কথা বলছিলো ছোড়দা?'

ছোটবৌদি কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'সে-ও এক কাণ্ড!...বারো-তেরো বছরের ছেলেটা, কিনা বোমা বানাতে গিয়ে হাত-পা উড়িয়ে হাসপাতালে গেছে!'

'বোমা বানাতে গিয়ে?'

অবাক হয়ে তাকায় বকুল।

নির্মলের বংশধর না ছেলেটা?

সে গিয়েছিল বোমা বানাতে?

ছোটবৌদি বলে, 'তাই তো খবর! কুসঙ্গে পড়ে যা হয়! কোথায় কোন্ বস্তির মধ্যে কার কোন্ আড্ডায় এই সব চলছিল, আশেপাশেরও কেউ জানতো না, হঠাৎ বোমা ফেটে—'

'কোথায় ছিল ওরা?'

যন্ত্রের মত উচ্চারণ করে বকুল।

'ওমা, এইখানেই তো আজ কতোদিন আছে নির্মলবাবুর বৌ। তা বছর দেড়েক তো হবেই। ছেলে তো বদলির জ্বালায় সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়ায়, বাপের চাকরিটাই পেয়েছে, কোম্পানী দিয়েছে দয়াধর্ম করে। নাতিটার পড়া হচ্ছে না বলে ঠাকুমা তাকে নিয়ে এসে ওই পচা বাড়ির মধ্যেই এসে বাস করছিল। ইস্কুলে ভর্তিও করে দিয়েছিল, কিন্তু মেয়েমানুষ ঘরে বসে কেমন করে জানবে গুণধর নাতি ইস্কুলে যায় না, মাইনেগুলো নিয়ে পার্টির চাঁদা দেয়, তার নিজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করতে—'

কিন্তু ছোটবৌদির এসব কথা কি আর মাথায় ঢুকছিল বকুলের?

বকুলের মাথার মধ্যে যেন একটা ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছিল ওর সেই প্রথম

কথাটার পর থেকেই।

নির্মলবাবুর বৌ তো অনেক দিনই এখানে রয়েছে!

অথচ বকুল তার খোঁজ রাখে না। বকুল তাকে দেখতে যায়নি।

মাধুরী-বৌ কি জানছে বকুলকে কেউ বলেনি একথা? কেউ খবরটা দেয়নি? না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নির্মলের বৌ জানছে, জেনে নিশ্চিন্ত আছে, বকুল নামের সেই মেয়েটা 'অনামিকা দেবী' হয়ে গিয়েছে। যশের, খ্যাতির আর অর্থের অহঙ্কারে 'বকুল'কে সে জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করেছে।

হয়তো একটু দার্শনিক হাসি হেসেছে নির্মলের বৌ।

কিন্তু এখন কোন্ কাজটা করবে বকুল?

অপরাধীর মুখ নিয়ে সেই দার্শনিক হাসির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে যাবে—বিশ্বাস করো আমি জানতাম না, আমায় কেউ বলেনি!

নাকি শম্পা নামের বিদ্যুতের শিখাটুকু কোথায় হারিয়ে গেল তার খোঁজ করতে ছুটবে?

আস্তে আস্তে উঠে গেল তিনতলায় নিজের এলাকায়।

টেবিলে তাকিয়ে দেখলো, অনেকগুলো চিঠি এসে জমে রয়েছে। যত্ন করে পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে গেছে কেউ।

হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেল বকুল।

ভাবলো আমি এই সংসার থেকে এই সেবা-যত্ন সহৃদয়তা পাই, কিন্তু কোনোদিন তো ভেবে দেখিনি এগুলো পাচ্ছি! জন্মসূত্রের অধিকারে এগুলো প্রাপ্য বলেই ভেবেছি, অথবা কিছু ভাবিনি। হয়তো ভেবে দেখা উচিত ছিল, হয়তো সেটা দেখলে আমার প্রকৃতিতে কিছু বদল হতো। নিজের চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

উঠে দাঁড়ালো। এদিকের জানলাটা খুলে দেখলো। কিন্তু জানলাটা থেকে তো শুধু পেছনের দেয়ালটাই দেখা যায় ও-বাড়ির!

শ্যাওলা-পড়া নোনাধরা বিবর্ণ।

আমাদের মনগুলোও ক্রমশঃ এইরকমই হয়ে যায়, এইরকম শ্যাওলা-পড়া, নোনাধরা বিবর্ণ!

ভাবি সেই বিবর্ণ চেহারাটা অন্যের চোখে পড়ে না। কিন্তু সত্যি কি পড়ে না?

॥ ২০ ॥

মাধুরী-বৌ বললো, 'কী যে বলো ভাই! তুমি ইচ্ছে করে আমাকে ভুলে গেছো, এই কথা ভাববো আমি? জানি তুমি কতো ব্যস্ত মানুষ।'

তারপর হেসে বললো, 'তুমি আমাদের মেয়েদের গৌরব। কতো নামডাক তোমার, কতো ভক্ত তোমার। তার মধ্যে আমিও একজন।'

বকুল ওর নিরাভরণ একখানা হাত মুঠোয় চেপে চুপ করে বসেছিল, আস্তে তাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'অনেকের মধ্যে একজন মাত্র, এই কথাটা তোমার সম্পর্কে বোলো না।'

মাধুরী চুপ করে রইল।

বকুল তাকিয়ে দেখল ঘরটার দিকে। আশ্চর্য, বকুলের ছেলেবেলায় বকুল

এই ঘরটার যা সাজসজ্জা দেখেছে, এখনও অবিকল তাই রয়েছে। সেই একদিকের দেয়ালে দুদিকে দুটো থামের মতো মেহগনি পালিশের স্ট্যান্ডের ওপর লম্বা একখানা আরশি দাঁড় করানো। সেই ঘরে ঢুকেই সামনের দেয়ালের উঁচুতে একটা হরিণের শিঙের ব্র্যাকেটের ওপর পেতলের লক্ষ্মীমূর্তি, সেই সারা দেওয়াল জুড়ে ফটোর মালা, সেই আরশির স্ট্যান্ডটার মতোই মোটা মোটা বাজুদার উঁচু পালঙ্ক, তার ওধারে মাথাভরা উঁচু আলনা, তার কোলে একটা সরু-সরু পায়া ছোট টেবিলে দু'চারটে বই, এধারের দেয়ালে টানা লম্বা বেঞ্চের ওপর সারি সারি ট্রাঙ্ক, বাক্স, হাতবাক্স!

শুধু সব কিছুতে সময়ের ধুলোয় ধূসর বিবর্ণ ছাপ।

আরশির কাঁচে গোল গোল কালো দাগ, ফটোগুলি মলিন হলুদ, ট্রাঙ্ক-বাক্সর ঢাকনিগুলো জীর্ণ, আর দেয়ালগুলো বালি-ঝরা স্যাঁৎসেঁতে বোবা-বোবা।

চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন শুধু আলনাটার। তখন ওই আলনার গায়ে ঝোলানো থাকতো চওড়া-চওড়া পাড়ের হাতে কোঁচানো শাড়ি, আর লম্বা লম্বা সেমিজ। এখন সে আলনায় ঝুলছে পাট করা ধোয়া থান, আর সাদা ফর্সা সায়া ব্লাউজ।

এ ঘরটা নির্মলের মার ঘর ছিল। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটাতেই বকুলের অবারিত অধিকার ছিল। নির্মলের মা পশম বুনতেন। বকুল বসে বসে দেখতো আর বলতো 'বাবাঃ, ওই সরু সরু দুটো কাঠি দিয়ে এইটুকুন এইটুকুন ঘর তুলে বড়ো বড়ো জিনিস তৈরী! দেখলেই আমার মাথা ঝিমঝিম করে, তার শিখবো কি?'

নির্মলের মা হাসতেন।

বলতেন, 'শিখলে দেখবি নেশা লেগে যাবে।'

'তাহলে বাবা শিখেই কাজ নেই আমার।'

নির্মলের মা বলতেন, 'না শিখলে বিয়ে হবে না।'

মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা, মিষ্টি মানুষ।

বড়ো জায়ের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। সুবিধে পেলেই এই ঘরটির মধ্যেই যেন আত্মগোপন করে থাকতেন।

মাধুরী-বৌও কি তিনতলার এই ঘরটা নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে পৃথিবী থেকে আত্মগোপন করে থাকবার জন্যে? কিন্তু আজকের পৃথিবী কি কাউকে নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে দেয়? লুকিয়ে থাকা নিজস্ব কোটর যদি কোথাও থাকে, তার ওপর আঘাত হেনে হেনে 'পেড়ে' না ফেলে ছাড়ে?

বকুল যেন অবাক হয়ে ঘরটার পুরনো চেহারাটা দেখছিল। বকুলদের বাড়িতে ঘর-দালান জানলা-দরজাগুলো ছাড়া আর কোথাও কিছু আছে যাতে বকুলের মার হাতের স্পর্শ আছে!

আস্তে বললো, 'ঘরটার কোনোখানে কিছু বদলাওনি, নড়াওনি? অবিকল রয়েছে সব! কী আশ্চর্য!'

মাধুরী বিষণ্ণ একটু হেসে বললো, 'জিনিসপত্র নাড়িয়ে আর কী নতুনত্ব আনবো ভাই, জীবনটাই যখন অনড় হয়ে বসে আছে!'

বকুল ঘাড় নীচু করে বসেছিল।

বকুল এবার সোজা হয়ে বসে বললো, 'অনড় হয়ে থাকতে পারছো কই? জীবনের মূল শেকড় ধরে তো নাড়া দিচ্ছে আজকের যুগ!

'তা দিচ্ছে বটে—', মাধুরী বললো, 'শুনেছো তাহলে?'

'শুনলাম ছোড়দার মুখে—, বকুল বললো, 'শুনে বিশ্বাস করতে দেরি লাগলো। ছেলেটার বয়েস হিসেব করতে গিয়ে সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল।'

'তোমার কি, আমারই গুলিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সত্যিই কি ওর তের বছর বয়েস!'

বকুল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'এখন আছে কেমন?'

'ডাক্তার তো বলছে সারতে সময় লাগবে। আর চিরকালের মতই অকর্মণ্য হয়ে গেল। ডান হাত তো উড়েই গেছে।' গলাটা বুজে গেল বলেই বোধ করি। চুপ করে গেল মাধুরী।

কোনো কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ করি বকুল বললো, 'দেখতে যাও?'

মাধুরী জানলার বাইরে চোখ ফেলেছিল, বললো, 'একদিনই দেখতে যেতে দিয়েছিল। পুলিসের হেপাজতে তো? ওর মা-বাপও তাই। একদিনের জন্যে এসেই চলে গেল। বললো, দেখতেই যখন দেবে না! আর—'

কেমন একটু হেসে থেমে বললো মাধুরী, 'আর বললো, সেরে উঠে যাবজ্জীবন জেল খাটুক এই আমাদের প্রার্থনা।'

বকুল মাধুরীর মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

কেউ যদি এখন মাধুরীকে দেখিয়ে বলে, একদা এ স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী সুন্দরী ছিল, এর হাসি দেখলে মনে হতো মাধুরী নাম সার্থক, তাহলে লোকে হেসে উঠবে। অতো ফর্সা রং যে এতো কালো হয়ে যেতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। পুড়ে যাওয়ার মত সেই জ্বলে-যাওয়া রঙের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকে বকুল। মাধুরীর সামনের চুলে কালোর চেয়ে সাদার ভাগ বেশী। মাধুরীর শীর্ণ গালে পেশীর রেখা।

অথচ বকুল প্রায় ঠিকঠাকই আছে।

বকুলের নিজের মেজদিই বলে গেছে—'থাকবে না কেন বাবা! শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা খেতে হয়নি, সংসার-জ্বালা পোহাতে হয়নি, আমাদের মতন দু'বছর অন্তর আঁতুড়ঘরে ঢুকতে হয়নি, যেমন ঝিউড়ি মেয়ে ছিল তেমনিই রয়ে গেছে। নইলে বকুলই মার পেটের মধ্যে নিরেস ছিল।'

তার মানে বকুলের মার পেটের সরেস চেহারার সন্তানরা ওই সব জ্বালায় বদলে গেছে।

কিন্তু মাধুরী-বৌ?

মাধুরী-বৌয়ের তো ওসব কিছু না।

মাধুরী-বৌ বরের সঙ্গে বাসায়-বাসায় ঘুরেছে, শ্বশুরবাড়ির গঞ্জনা কাকে বলে জানেনি। মাধুরী সেই কোন্ অতীতকালে দুবার আঁতুড়ঘরে গিয়েছিল, আর যায়নি, তবে?

যখন মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসতো নির্মল, তখন মাধুরী কেমন দেখতে ছিল মনে আনতে চেষ্টা করে বকুল।

কিন্তু তখন কি মাধুরীর দিকে চোখ থাকতো বকুলের?

তবু ভেবে মনে আনলো, সেই স্বর্ণ-চাঁপা রংটাই মনে পড়লো, অথচ এখন রংজ্বলা মাধুরীকে বকুলের থেকে ময়লা লাগছে।

বকুল মনে মনে বললো, 'আমি তোমার কাছে মাথা হেঁট করছি। তোমার ভালবাসায় সর্বস্ব সমর্পণ ছিল।'

বকুল ওই ক্ষুব্ধ হাসির ছাপ লাগা মলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, 'মাও বললো এই কথা?'

'মা-ই' বেশী করে বললো। তার সঙ্গে অবশ্য আমাকেও অনেক কিছু বললো।' মাধুরী শীর্ণ মুখে আর একবার তেমনি হেসে বললো, 'বলতেই পারে। বিশ্বাস করে আমার কাছে ছেলে রেখে দিয়েছিল—'

আর একটু চুপ করে থেকে বললো, 'ভগবানের সহস্র নামের মধ্যে "দর্পহারী" নামটাই প্রধান নাম বুঝলে বকুল! মনে মনে দর্প ছিল বৈকি। দর্প করেই তো ভেবেছিলাম, ঘুষখোর বাবা আর লোভী মার কাছে থেকে ছেলেটা খারাপ হয়ে যাবে। আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখি ওদের আওতামুক্ত করে। ধারণা ছিল না জগৎ-সংসারে আরো কতো আওতা আছে।'

কিন্তু শেষের কথাগুলো কি চমকে-ওঠা বকুলের কানে ঢুকেছিল?

'ঘুষখোর বাবা' এই শব্দটুকুই যেন বকুলের অনুভূতিটাকে ঝাপসা করে দিয়েছিল। ঘুষখোর! নির্মলের ছেলে ঘুষখোর!

বকুল একটু পরে বলে, 'তোমার ছোট ছেলে?'

'ছোট? সে তো অনেকদিনই নিজেকে সকলের আওতামুক্ত করে স্বাধীনতার সুখের স্বাদ নিচ্ছে। ময়ূরভঞ্জে চাকরি করে, সেখানেই বিয়ে-টিয়ে করেছে, আসে না—'

মাধুরী-বৌয়ের ছেলেরা এমন উল্টোপাল্টা হলো কেন?

মনে মনেই প্রশ্ন করেছিল বকুল! তবু মাধুরী উত্তরটা দিলো। বললো, 'আমাদেরই অক্ষমতা। ছেলেদের ঠিকমত বুঝতে পারিনি। লেখাপড়া শেখানোটাই মানুষ করার একমাত্র উপায় বলে ভেবেছি। সেই ভাবনাটা যে ঠিক হয়নি সে-কথা যখন বুঝতে পারলাম তখন আর চারা নেই।...তোমার নির্মলদা মানুষটা ছিলেন বড়ো বেশী ভালোমানুষ, আর আমি?'

মাধুরী আবার একটু ব্যঙ্গমাখানো ক্ষুব্ধ হাসি হাসলো, 'আমি একেবারে স্রেফ হিন্দু নারী। পতি ছাড়া অন্য চিন্তা নেই—অতএব—চোখ-কান বন্ধ করে শুধু—' চুপ করে গেল।

বকুল কিন্তু ওই জীবনে বিধ্বস্ত মুখটার মধ্য থেকেও একটা আশ্চর্য উজ্জ্বল আলোর আভাস দেখতে পেলো। বকুলের মনে হলো 'বিধ্বস্ত', কিন্তু ব্যর্থ নয়।

মাধুরী তারপর বললো, 'কিন্তু ওসব তো সাধারণ ঘটনা, জানা জগতের কথা। এই তেরো বছরের ছেলেটাই আমায় তাজ্জব করে দিয়েছে। বড়ো বড়ো কথা বলতো ইদানীং। জেঠিমার যে ওই ভাইপোরা আছেন সারা বাড়িটা জুড়ে, তাঁদেরই কার একজনের ছেলের সঙ্গে খুব মেলামেশা ছিল। দুজনে খুব কথাবার্তা বলতো, কানে আসতো। ছেলেমানুষের মুখে পাকা কথা শুনে হাসি পেতো। বলতো, "এই বুর্জোয়া সমাজের মৃত্যুদিন আসছে, ওরা নিজেরাই নিজেদের কবর রচনা করেছে, নিজেদের চিতা বানিয়েছে।"...বলতো, "বিপ্লব আসছে, তাকে রোখবার ক্ষমতা অতিবড় শাসকেরও নেই।" আরো কত কী-ই বলতো ভাই দুজনে ওদের দালানে বসে। "চোখে ঠুলি বেঁধে বসে থাকলেই কড়া রোদকে অস্বীকার করা যায় না, রোদ তার নিজের কাজ করে, চামড়া পোড়ায়।" জেঠিমার ভাইপোর ছেলেটা তো কত বড়ো, তবু বুবুন যেন তার সমান সমান এইভাবে আড্ডা দিতো...আমি ভাবতাম বুবুন ওই শোনা কথাগুলো আওড়াচ্ছে, হাসি পেতো। বলতাম বুবুন, "বুর্জোয়া বানান জানিস?" বলতাম, "বুবুন, দেশে বিপ্লবের রক্তগঙ্গা বওয়াবার ভারটা তাহলে তোরাই নিয়েছিস? তুই আর তোর ওই পল্টুদা?"...ও এই ঠাট্টায় লজ্জা পেত না, কেমন একরকম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাতো।...ক্রমে ক্রমে সেই চোখে ফুটে উঠতে দেখলাম অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিদ্বেষ আর নিষ্ঠুরতা। তবু তখনও তার গুরুত্ব বুঝতে

পারিনি ভাই। বরং মাঝে মাঝেই বলেছি, "তোর ওই পল্টুদার সঙ্গে মেশাটা কমা দিকি ! ও তোর বয়সী নাকি? যতো রাজ্যের পাকা কথা তোর মাথায় ভরছে।"... ক্রমশঃ দেখলাম ওদের সেই আড্ডা-আলোচনাটা কমে গেল, পল্টুকে তো বাড়িতে দেখতেই পাওয়া যায় না। বুবুনও যথাসময়ে খেয়ে ইস্কুলে যায়। ইস্কুল থেকে ফিরতে অবশ্য দেরি হতো বিস্তর, রাগ করলে বলতো, "কাজ ছিলো।"...যদি রেগে বলতাম, "তুই এতোটুকু ছেলে, তোর আবার কাজ কি?" অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে বলতো, "বোঝবার ক্ষমতা নেই। জানো তো শুধু সুশীল সুবোধ বালকদের খাইয়ে খাইয়ে মোটা করতে!" তবু তোমায় বলবো কি বকুল, ধারণা করতে পারিনি বুবুন ইস্কুলে যায় না, ইস্কুলের মাইনেটা নিয়ে পার্টিকে চাঁদা দেয়,...বোমা তৈরীতে যোগ দেয়। বরং ভেবেছিলুম পল্টুর প্রভাবমুক্ত হয়েছে বোধ হয়। কে ভেবেছে পল্টু ওকে গ্রাস করেছে!...'

থামলো মাধুরী!

নিরাভরণ হাতটা তুলে কপালে উড়ে আসা একটা মাছি তাড়ালো।

তারপর আস্তে বললো, 'শুধু আমার বুবুনই নয় বকুল, দেশ জুড়ে হাজার হাজার বুবুন এইভাবে প্রতিনিয়ত গ্রাসিত হচ্ছে। কিন্তু এর মূলে হয়তো আরো গভীর কারণ আছে। আজকের ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা তারা শ্রদ্ধা করবার মত লোক পাচ্ছে না। ওদের মনের নাগাল পায়, এমন মা-বাপ পাচ্ছে না। ওদেরকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে পারে, এমন ভালবাসার দেখা পাচ্ছে না। আমরা আমাদের নিজের মনের মত করে ভালবাসতে জানি, ওদের মনের মত করে নয়।...হয়তো আগের যুগ ওতেই সন্তুষ্ট থাকতো, এ যুগের মন-মেজাজ দৃষ্টি-ভঙ্গী আলাদা, কারণ যে কারণেই হোক এদের চোখ কান বড় অল্প বয়সেই খুলে গেছে। এরা তাই "লোভ"কে লোভ বলে বুঝতে শিখেছে, দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে চিনতে শিখেছে। তাই এদের সবচেয়ে নিকটজনদের ওপরই সব চেয়ে ঘৃণা।'

'তুমি তো খুব ভাবো—' আস্তে বলে বকুল।

মাধুরী বোধ করি এতোক্ষণ একটা আবেগের ভরেই এতগুলো কথা বলে চলছিল, হঠাৎ লজ্জা পায়। লজ্জার হাসি হেসেই বলে, 'এতো কাল এতো সব কিছুই ভাবিনি বকুল। যেদিন বুবুনের বোমা বানানোর খবর পেলাম, খবর পেলাম চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে যাওয়ার, তখন থেকে ভাবতে শিখেছি। ভাবতে ভাবতেই যেন চোখ খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। বুঝতে পারছি—ওদের মধ্যেকার ভালোবাসতে না পারার ভার, শ্রদ্ধা করতে না পারার ভার, চোখ খুলে যাওয়া মনের জ্বালার ভার ওদের মধ্যে সব কিছু ধ্বংস করবার আগুন জ্বালিয়েছে। নইলে অতটুকু একটা ছেলের মধ্যে এতো ঘৃণা এতো অবজ্ঞা আসে কোথা থেকে? যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম, বললো কী জানো?—"কী দেখতে এলে। যেমন কর্ম তেমনি ফল? ভাবো, তবু জেনে রাখো যে হাতটা আস্ত আছে, সেই হাতটা দিয়েই আবার ওই কাজই করবো দেখো!" সেই অবধি ভেবেই চলেছি। আর ভাবছি আমাদের বুদ্ধিহীনতা, আমাদের অন্ধতা, আর আমাদের আপাত-জীবনের প্রতি লোভই আমাদের এই ভাঙনের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।' মাধুরীবৌ আবার একটু লজ্জার হাসি হাসলো, বললো, 'এই দ্যাখো থামবো ভেবেও আবার বড়ো বড়ো কথা বলে চলেছি। আসল কথা, এমন একটি বড়োসড়ো লেখিকাকে দেখেই জিভ খুলে গেছে। সত্যি ভাই, কথা বলতে পাওয়াও যে একটা বড়ো পাওয়া, সেটা যতো দিন যাচ্ছে ততো টের পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে অনেক দিন পরে যেন বাঁচলাম।'

বকুলের বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল একবার জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল নির্মলদার?' কিন্তু কিছুতেই ওই নামটা উচ্চারণ করতে পারলো না।

যেন ওই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটি পবিত্র বস্তুর শুচিতা নষ্ট হয়ে যাবে. যেন একটি গভীর গম্ভীর সঙ্গীত হালকা হয়ে যাবে।

মাধুরী বললো, 'এতোক্ষণ শুধু নিজের কথাই সাতকাহন করলাম, তোমার কথা একটু বলো শুনি।'

'আমার আবার কথা কী?' বকুল ঈষৎ হেসে বলে, 'আমার তো আর ছেলে বৌ নাতি নাতনী নেই যে তাদের নিয়ে কিছু কথা জমে আছে।'

'তোমার তো শত শত ছেলেমেয়ে, তাদের সুখদুঃখ ভাঙাগড়ার সংসারটি নিয়ে তুমি তো সদা ব্যস্ত বাবা!'

'তা বটে।'

'এতো অদ্ভুত ভালো লেখো কী করে বল তো?' মাধুরী হাসে. 'আমি তো ভেবেই পাই না, কী করে এমন করে ঠিক মনের কথাটি বুঝতে পারো। তোমার লেখার এমন গুণ যেন প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের সঙ্গে চিন্তার সঙ্গে মিলে যায়। পড়লে মনে হয় যেন আমার কথা ভেবেই লিখেছো। এতো প্লটই যে কোথায় পাও বাবা. ভেবে অবাক লাগে।'

এ কথার আর উত্তর কি? চুপ করে থাকে বকুল।

কেমন করে বোঝাবে লেখার মধ্যে প্লটটাই সর্বাপেক্ষা গৌণ। ওটার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু কেউ যখন বলে 'ভাল লাগে' তখনই একটা চরিতার্থতার স্বাদ না এসে পারে না। অনেক শুনেছে বকুল এ কথা। সব সময়ই শোনে তবু নতুন করে একটা সার্থকতার সুখ পেলো। আস্তে বললো, 'পড়ো-টড়ো?'

'ও বাবা! পড়বো না? ওই নিয়েই তো বেঁচে আছি। মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, যদি বই জিনিসটা না থাকতো, কী উপায়ে দিনগুলো কাটাতাম।'

এই সামান্য কথাটুকুর মধ্য দিয়েই একটা শূন্য হৃদয়ের দুঃসহতা ধরা পড়লো।

নিজের উপর ধিক্কার এলো বকুলের।

বকুলের এতো কাছাকাছি থেকে এইভাবে দুঃসহ শূন্যতার বোঝা নিয়ে পড়ে আছে মাধুরী, অথচ বকুল কোনদিন তার সন্ধান নেয়নি। বকুল ভালবেসে নিজের দুখানা বই নিয়ে এসে বলেনি, 'মাধুরী-বৌ, তুমি গল্পের বই ভালোবাসো—'

তবু বর্তমানের সমস্যাটা ওই শূন্যতার থেকে অনেক বাস্তব।

বুবুনের ব্যাপারে কী ভাবছো মাধুরী সেটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল বকুল, বাড়ি থেকে ওদের ঝি এলো ডাকতে, 'পিসিমা, আপনাকে একজন মেয়ে এসে খুঁজছে।'

বকুল বিরক্ত গলায় বলে 'আশ্চর্য! একটু এসেছি, এর মধ্যেই—, কী নাম? কোথা থেকে এসেছে?'

ঝি সুবাসিনী বললো, 'কী জানি বাবা, কী যেন বললো।'

বাইরে থেকে ঢুকতেই সামনের ঘরখানা বাইরের লোকের বসবার ঘর। বকুল ও-বাড়ি থেকে চলে এসে ঘরে পা দিয়েই সেকেন্ড কয়েক প্রায় অভিভূতের মত তাকিয়ে রইলো।

বকুলের অভিভূত অবস্থার মধ্যেই জলপাইগুড়ির নমিতা নমিত হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললো, 'আবার এলাম আপনার কাছে—'

নিচু হয়ে প্রণাম করার সময় নমিতাকে খুব আড়ষ্ট দেখতে লাগলো। কারণ নমিতা তার পরনের সাটিনের শাড়িটা আষ্টেপৃষ্ঠে 'পিন' মেরে এমন ভাবে গায়ে জড়িয়েছে যে কোনখানে ভাঁজ রাখেনি। নিচু হবার পর উঠে দাঁড়াতেই নমিতার কর্ণাভরণের ঝাড় এমন ভাবে দুলে উঠলো যে সারা ঘরের দেওয়ালে যেন তার ঝিলিক খেলে গেল। ওই ঝাড়লণ্ঠনের মতো গহনাটার দোদুল্যমান পাথরগুলো নকল বলেই বোধ করি এতো ঝকমকে।

অনেকখানি গলাকাটা ব্লাউজের ওপরকার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নমিতা যে কণ্ঠাভরণখানি স্থাপিত করেছে তার দ্যুতিতেও চোখ ঝলসায়। নমিতার মাথার উপর দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের 'গোপুরম্' সদৃশ একটি খোঁপা, নমিতার উগ্র পেণ্ট করা মুখটায় একটা ভাবলেশশূন্য ভাব, আর নমিতার লম্বা ছুঁচলো নখগুলো অদ্ভুত চকচকে একটা রঙে এনামেল করা।

বকুলের হঠাৎ একটা বাজে প্রশ্ন মনে এলো। জলপাইগুড়ি ছেড়েই কি নখ রাখতে শুরু করেছিল নমিতা, না হলে এতো বড় বড় হলো কী করে! নানা ছাঁদের নকল নখ যে বাজারে কিনতে মেলে, এটা বকুলের জানা ছিল না। বকুল চিরদিনই অলক্ষিত একটা জগতের রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের চেষ্টায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, লক্ষিত জগতের হাটে যে কতো কী রহস্যের বেচাকেনা চলে, তার সন্ধানই রাখে না।

নমিতা বললো, 'অনেক দিন ধরেই ভাবছি, হয়ে উঠছে না। কতকটা সাহসের অভাবেও বটে।'

নমিতার যা কিছু আড়ষ্টতা এখন বোধ করি শুধু পোশাকে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছে, কথাবার্তার স্বরে লেশমাত্রও নেই।

বকুল চমৎকৃত না হয়ে পারে না।

বকুল তাই একটু চমৎকার হেসে বলে, 'কেন, সাহসের অভাব কেন?'

'অভাব হওয়াই তো উচিত,' বললো নমিতা হাতের দামী ব্যাগটা মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে।

বকুল বললো, 'বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

তারপর বললো, 'উচিত কেন? এটা তো তোমার চেনা জায়গা? আমিও অপরিচিত নই?'

নমিতা বসলো।

তারপর কাজলটানা চোখটা একটু তুলে বললো, 'তা ঠিক। আপনি আমার চেনা, কিন্তু আমি কি আপনার চেনা? আমাকে কি আপনার আর 'জলপাইগুড়ির নমিতা' বলে মনে হচ্ছে?'

বকুল হেসে ফেলে, 'তা অবশ্য ঠিক হচ্ছে না।'

'এটাই চেয়েছিলাম আমি—,' নমিতা বেশ দৃঢ় আর আত্মস্থ গলায় বলে ওঠে, 'চেয়েছিলাম আমার সেই দীনহীন পরিচয় মুছে ফেলতে। তাই আমার নিজের কাছ থেকেই "অতীত"টাকে মুছে ফেলেছি।'

বকুল ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় একটু। পেণ্ট-এর প্রাণহীন সাদাটে রঙের নীচে থেকে একটা উত্তপ্ত রক্তোচ্ছ্বাস ঠেলে উঠতে চাইছে যেন। তার মানে মুছে ফেলার নিশ্চিন্ততাটুকু নিতান্তই আত্মসন্তুষ্টি। ওই ঠুনকো খোলাটায় একটু টোকা দিয়ে দেখতে গেলেই হয়তো কাজলের গৌরব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে!

বকুল সেই টোকা দেওয়ার দিকে গেল না।

বকুল ঐ ঠুনকোটাকেই শক্ত খোলা বলে মেনে নেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'তা ভালো। দুটো জীবনের ভার বহন করা বড় শক্ত। একটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাকি ভারটা সহজ হয়ে যায়।'

'ঠিক বলেছেন আপনি—,' নমিতা যেন উল্লসিত গলায় বলে, 'আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম। এখনো ভাবছি।'

বকুল কৌতুকের গলায় বলে উঠতে যাচ্ছিল, 'মহাজনেরা একই পদ্ধতিতে ভাবেন—' কিন্তু থেমে গেল। এই মেয়েটার সঙ্গে এ কৌতুকই কৌতুককর।

বকুল খুব সাদাসিধে গলায় বললো, 'এখন আছো কোথায় ?'

'খুব খারাপ জায়গায়—', নমিতা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে আপনাকে বলা যায় না।'

বকুল এবার একটু কঠিন হলো। বললো, 'থাকার জায়গাটা খারাপ হলেও তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে খারাপ নেই, বেশ ভালোই আছো!'

'হ্যাঁ, ভালো ভালো জামা-কাপড় গহনা-টহনা পরেছি—', নমিতা হঠাৎ বুনোর মতো বলে ওঠে, 'এটাই সংকল্প করেছি, যদি নামতেই হয় তো শেষ পর্যন্ত নেমে দেখবো। পাতাল থেকে যদি রসাতলেও যেতে হয় তাই যাবো।'

বকুলের মনে হলো, নখটা না হয় নমিতা জলপাইগুড়ি ছেড়ে অবধিই রাখতে শুরু করেছে, কিন্তু কথাগুলোও কি সেই ছাড়া থেকে শিখতে শুরু করেছে? না দীর্ঘদিন ধরে শিখে শিখে পুঁজি করছিলো ?

বকুল আর একটু কঠিন আর নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'নিজের জীবন নিয়ে নিজস্ব সংকল্পের অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু আমার কাছে এসেছো বলেই জিজ্ঞেস করছি নমিতা, 'তুমি কি "নামবার" সংকল্প নিয়েই তোমার "দীনহীন" পরিচয়ের আস্তানা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলে ?'

নমিতা হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো।

তারপর আস্তে বললো, 'জানি না। এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি শুধু ওদের সকলকে দেখাতে চাই, শুধু দুটি খেতে-পরতে দেওয়ার বিনিময়ে যার মাথাটা কিনে রেখেছি ভেবেছিলে, সে অতো মূল্যহীন নয়।...আর—আর আমার সেই স্বামীকেও দেখাতে চাই, উচিতমতো ট্যাক্স-খাজনা না দিয়েও চিরকাল সম্পত্তিকে অধিকারে রাখা যায় না। সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়।'

বকুল এই প্রগল্ভ কথার উত্তর দেবে কি দেবে না ভেবেও বলে ফেলে, 'তুমি তো দেখছি এই ক'দিনে অনেক কথা শিখে ফেলেছো!'

নমিতা নড়েচড়ে বসে।

নমিতা হাতব্যাগের মুখটা একটু খুললো, ছোট্ট একটি রুমাল বার করে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বেশ দৃঢ় গলায় বলে, 'এই ক'দিনে? মোটেই তা নয়, অনেক অনেক দিন ধরে এসব ভাবনা ভেবেছি, এসব কথা শিখেছি। তবু চেষ্টাও

করে চলেছিলাম যে গণ্ডির মধ্যে জন্মেছি, আছি, সেখানেই যাতে থাকতে পারি। কিন্তু হঠাৎ চোখটা খুলে গেল। মনে হলো—এই "ভালো থাকার" মানে কী? এই সৎ জীবনের মূল্য কী? একজন লক্ষ্মী বৌকে ওরা দাম দেয়? 'আমি' মানুষটাকে দাম দিচ্ছে? তখনই ঠিক করলাম নিজের দাম যাচাই করতে বেরোবো। ভয় ছিলো, লেখাপড়া শিখিনি, সহায়-সম্বল কেউ নেই, এই অচেনা পৃথিবীতে কোথায় হারিয়ে যাবো। হঠাৎ সে ভয়ও একদিন দূর হয়ে গেল। আমার বাপের বাড়ির আত্মীয়রা আবার যখন আমাকে জলপাইগুড়িতে ঠেলে দেবার চেষ্টা করলো, তখনই হঠাৎ মনে হলো, কাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবার ভয়? বাইরের জগতে মেয়েমানুষের দুটো ভয়। একটা যা সব মানুষেরই আছে, প্রাণের ভয়। সেটা আমার মতো মেয়ের পক্ষে বেশী নয়। আর একটা ভয়—দুর্গতিতে পড়বার ভয়। তা মনে যদি সঙ্কল্প করে নিই যে কোনো দুর্গতিই আসুক লড়ে দেখবো, তাহলে আর ভয় কী রইলো? তারপর তো দেখছেনই।'

'তা তো দেখছিই।' বকুল নমিতার প্রায় ফেটে-পড়া-মুখটার দিকে তাকিয়ে একটা আক্ষেপের অনুভূতিতে কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। সেই বিষণ্ণ গলাতেই বলে, 'আত্মীয়-সমাজের কাছে ছাড়াও আরও একটা হারানো আছে নমিতা, সেটা হচ্ছে নিজের কাছে নিজেকে হারানো—'

নমিতা আরও একবার যেন কেঁপে উঠলো। তারপর বললো, 'আমি মুখ্যসুখ্যু একটা মেয়ে, অতো কথা বুঝি না। আমি শুধু দেখাতে চাই আমি একেবারে ফেলনা ছিলাম না।'

বকুল আর কথা বাড়ায় না।

বকুল আবার সাদাসিধে গলায় বলে, 'তা যাক, আজ হঠাৎ এসে পড়লে যে? এদিকে কোথাও এসেছিলে বুঝি?'

'না, আপনার কাছেই এসেছিলাম।'

নমিতা ঈষৎ ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'আপনি আমায় মানুষ বলে গণ্য না করলেও আমি আপনাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি। তাই জীবনে একটা নতুন কাজে নামবার আগে আপনাকে—'

বকুল লজ্জিত গলায় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'একথা বলছো কেন নমিতা? মানুষ" বলে গণ্য করি না এটা কেমন কথা? কী নতুন কাজে নামছো বলো শুনি?'

নমিতা আবার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল থেকে আমার ছবির সুটিং আরম্ভ, মানে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে। নায়িকার রোলই দিচ্ছে।'

'শুনে খুশী হলাম,' বকুল বলে, 'একটা কর্মজীবন পেয়েছো, এটা মঙ্গলের কথা।'

'মঙ্গলের কথা?'

'তা নিশ্চয়। হয়তো এর মধ্যে থেকেই তোমার ভিতরের শিল্পী-সত্তা আবিষ্কৃত হবে।'

'বলছেন?' নমিতা যেন উৎসুক গলায় বলে, 'আপনার কি মনে হয় আমার মধ্যে কিছু আছে?'

বকুল মনে মনে বলে, 'আপাততঃ তো মনে হচ্ছে না! তুমি শিল্পকে ভালবেসে এখানে আসছো না বাপু, আসছো নিজের মূল্য যাচাই করতে। তবু বলা যায় না, কার মধ্যে কি থাকে।'

মুখে বলে, 'সকলের মধ্যেই কিছু-না-কিছু থাকে নমিতা, পরিবেশে সেটার বিকাশ হয়। হয়তো তুমি একজন নামকরা আর্টিস্টই হবে ভবিষ্যতে। খুব ভাগ্যই

বলতে হবে যে এতো শীগগির পন্থা পেয়ে গেছো। প্রথমেই নায়িকার রোল সহজে কেউ পায় না।'

নমিতা একটুক্ষণ স্থিরচোখে তাকিয়ে রইলো বকুলের চোখের দিকে। তারপর আস্তে বললো, 'আমাকে দেখে কি আপনার মনে হচ্ছে "সহজে"ই পেয়েছি?'

এবার বকুলই বুঝি কেঁপে উঠলো।

জলপাইগুড়ির নমিতা যে এমন একটা প্রশ্ন করে বসতে পারে, তা যেন ধারণা ছিল না বকুলের।

বকুলও আস্তে বললো, 'তা হয়তো মনে হচ্ছে না। তবু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো তোমার শিল্পী-জীবনটাই বড়ো হয়ে উঠুক। তীর্থযাত্রার পথেও তো কতো কাঁটা-খোঁচা থাকে, থাকে কাদা-ধুলো।'

নমিতার কাজলের গৌরব হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়। নমিতা বোধ করি সেটা গোপন করতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে নীচু হয়ে বকুলের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, 'আপনার আশীর্বাদ সার্থক হোক। যাই।'

'আরে সে কি!'

বকুল আবহাওয়াটা হালকা করতেই হালকা গলায় বলে, 'এক্ষুনি যাবে কি? একটু মিষ্টিমুখ না করে যেতে পাবে নাকি? এতোদিন পরে এলে!'

'নাঃ, আজ যাই—'

বলে নমিতা তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তারপরই নমিতা আশ্চর্য একটা কাণ্ড করে বসে।

নমিতা সারা শরীরে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে হিল্লোল তুলে মোচড় খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'জলপাইগুড়ির নমিতা একদিন আপনাকে তার জীবন নিয়ে গল্প লিখতে বলেছিল, তাই না? সে লেখার আর দরকার নেই, জলপাইগুড়ির নমিতা মরে গেছে ; তার নতুন জন্মের নামটা আপনাকে বলা হয়নি—নাম হচ্ছে "রূপছন্দা"। বুঝলেন? রূপছন্দা! হয়তো ভবিষ্যতে তার "কথা" নিয়ে লেখবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, সাক্ষাৎকারের জন্যে বাড়িতে ভিড় জমবে।...আচ্ছা চলি। ছবিটা রিলিজ করলে আপনাকে নেমন্তন্নর কার্ড দিয়ে যাবো।'

আকস্মিক এই আঘাতটা হেনে নমিতা দ্রুত গিয়ে গাড়িতে ওঠে। রাস্তার ধারের ওই মস্ত গাড়িটা যে নমিতার, ও-বাড়ি থেকে আসবার সময় সেকথা স্বপ্নেও ভাবেনি বকুল। এখন দেখলো দরজায় দাঁড়িয়ে। দেখলো উর্দি পরা ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়ালো, নমিতা উঠে পড়লো।

বকুল একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

বকুলের বুক থেকে একটা নিঃশ্বাস পড়লো। বকুলের অনেকদিন আগের পড়া একটা প্রবন্ধর কথা মনে পড়লো। বাজে প্রবন্ধ, লেখকও অখ্যাত, এবং ভাষাও ধারালো ছিল বলে মনে পড়ছে না, কিন্তু তার যুক্তিটা ছিল অদ্ভুত।

লেখকের বক্তব্য ছিল—ইহ-পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল্যে দিতে আত্মবিক্রয় না করছে কে? অর্থোপার্জনের একমাত্র উপায়ই তো নিজেকে বিক্রি করা। কেউ মগজ বিক্রি করছে, কেউ অধীত বিদ্যা বিক্রি করছে, কেউ চিন্তাকল্পনা স্বপ্ন-সাধনা ইত্যাদি বিক্রি করছে, কেউবা স্রেফ কায়িক শ্রমটাকেই। মেয়েদের ক্ষেত্রেই বা তবে শরীর বিক্রিকে এমন 'মহাপাতক' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে কেন? বহুক্ষেত্রেই তো তার একমাত্র সম্বল ওই দেহটাই।

লেখকের যুক্তি সমর্থনযোগ্য এমন কথা ভাবতে বসলো না বকুল, শুধু হঠাৎ সেটা মনে পড়লো।

কিন্তু এ কথাও তো জোর গলায় বলে উঠতে পারলো না ওর সামনে—'নমিতা তোমার ওই "রূপছন্দা" হয়ে ওঠার কোনো দরকার ছিল না। জগতে বহু অখ্যাত অবজ্ঞাত অবহেলিত মানুষ আছে, থাকবেও চিরকাল! তোমার সেই জলপাইগুড়ির "নমিতা বৌ" হয়ে থাকাই উচিত ছিল। তাতেই সভ্যতা বজায় থাকতো. থাকতো সমাজের শৃঙ্খলা, আর তোমার ধর্ম।'

পিছনে কখন ছোটবৌদি এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি বকুল। চমকে উঠলো তার কথায়।

'মেয়েটা কে বকুল ?'

বকুলের কাছে যারা আসে-টাসে বা অনেকক্ষণ কথা বলে, বসে থাকে, চা খায়, তাদের সম্পর্কে ছোটবৌদির কৌতূহল এবং অগ্রাহ্য সংমিশ্রিত মনোভাবের খবর বকুলের অজ্ঞাত নয়. অলক্ষ্য কোন স্থান থেকে তিনি এদের দেখেন শোনেন এবং প্রয়োজন-মাফিক অবহেলা প্রকাশও করেন. কিন্তু এমনভাবে ধরা পড়েননি কোনোদিন। না. একে 'ধরা পড়া' বলা যায় কি করে, বরং বলতে পারা যায় 'ধরা দেওয়া'।

হঠাৎ নিজেকে ধরা দিতে এলেন কেন ইনি ?

বকুল কারণটা ঠিক বুঝতে পারলো না। তাই আলগা গলায় বললো. 'ওই একটা মেয়ে। ইয়ে জলপাইগুড়িতে—'

'ও কি সেই লক্ষ্মীছাড়ীর কোনো খবর এনেছিল ?'

আর একবার চমকে উঠতে হল বকুলকে।

বাঁধ ভেঙে গেলে বুঝি এমনিই ঘটে।

বকুল এই বাঁধভাঙা মূর্তির দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে। সেই নীচু মাথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নীচু গলায় বলে. 'না তো! ও এমনি একটা মেয়ে। জলপাইগুড়িতে আলাপ হয়েছিল—'

'ও! অনেকক্ষণ কথা বলছিল কিনা, আমি ভাবলাম—' ছোটবৌদি একটু থেমে বোধ করি নিজের দুর্বলতাটুকু ঢাকতেই এমনি হালকাভাবে বলবার মতো বলে ওঠে, 'বড়লোকের মেয়ে, না! বাবাঃ. কী সাজ! যেন নেমন্তন্নয় এসেছে! কী বলছিল এতো ?'

বকুল মৃদু হেসে বলে, 'কী বলছিল ? ও সিনেমায় নামছে. সেই খবরটা আমায় জানিয়ে প্রণাম করতে এসেছিল।'

'সিনেমায় নামছে! ভালো ঘরের মেয়ে ?'

বকুল হেসে ওঠে, 'কী যে বলো ছোটবৌদি! ভালো ঘরের মেয়ে হবে না কেন ? খুব ভালো ঘরের মেয়ে. ভালো ঘরের বৌ!'

ছোটবৌদি বলে. 'তা বটে। এখন তো আর ওতে নিন্দে নেই। আগের মত নয়।'

তারপর হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে ছোটবৌদি. 'লক্ষ্মীছাড়া যদি এরকমও কিছু করতো!'

বকুল স্তব্ধ হয়ে যায়।

বকুলের মনে পড়ে না—এ কথার বিরুদ্ধে হাজারো প্রতিবাদ করবার আছে। বকুলকে তাই চুপ করে থাকতে হয়।

শম্পা নামের মেয়েটা হারিয়ে গিয়ে যেন এ সংসারের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে গেছে। পরাজিতের মূর্তিতে বসে আছে সবাই। যখন সে নিজে তেজ করে চলে

গিয়েছিল, তখন এদের মধ্যেও ছিল রাগ অভিমান তেজ। কিন্তু এখনকার পালা আলাদা, এখন সে এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীর কোনো চক্রান্তে হারিয়ে গেছে. কে জানে চিরকালের জন্যেই মুছে যাবে কিনা শম্পা নামটা!

অথচ শম্পার মা আর বাবা কিছুদিন আগেও যদি তাদের তেজ অভিমান অহঙ্কারকে কিছুটা খর্ব করতো, হয়তো সব ঠিকঠাক হয়ে যেতো। শম্পার মার ভিতরের হাহাকার তাই শোকের থেকেও তীব্র। শোকের হাহাকার বাইরে প্রকাশ করা যায়, অনুতাপের হাহাকার শুধু ভিতরকে আছাড় মেরে মেরে ভেঙে গুঁড়ো করে।

শম্পার মা-বাপ যখন পারুলের ছেলের চিঠিতে জেনেছিল শম্পা পারুলের কাছে গিয়ে আড্ডা গেড়েছে, তখন কেন ছুটে চলে যায়নি তারা? কেন অভিমানিনী মেয়ের মান ভাঙিয়ে বলে ওঠেনি, 'রাগ করে একটা কথা বলেছি বলে সেটাই তোর কাছে এতো বড়ো হয়ে উঠলো?'

তা তারা করেনি।

নিষ্কম্প বসে থেকে আস্ত সুস্থ মেয়েটাকে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। তাদের বয়েস, বুদ্ধি, বিবেচনা, হিতাহিতজ্ঞান কিছুই কাজে লাগেনি। একটা অল্পবয়সী মেয়ের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছে সেই সব জিনিসগুলো—বুদ্ধি, বিবেচনা, হিতাহিতজ্ঞান।

ছোটবৌদি বকুলকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার নিজেই কথা বলে, 'মনটা খারাপ হয়ে থাকলেই যতো আবোল-তাবোল চিন্তা আসে, এই আর কি! ওই মেয়েটা আইবুড়ো না বিয়ে হওয়া?'

'বিয়ে-হওয়া! ওর স্বামী সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, সেই রাগে ও ঘর ছেড়ে-

'সাধু হয়ে গেছে? সেই রাগে? কী কান্ড! এতো এতো অসাধু স্বামী নিয়ে ঘর করছে মেয়েরা, আর—'

বকুল হেসে ফেলে বলে, 'আহা সে তো তবু ঘর করছে! সাধু স্বামী যে ওইটিতেই বাদ সেধেছে। অথচ মেয়েরা জানে ঘর করতে পাওয়াই মেয়েদের জীবনে চরম পাওয়া—'

ছোটবৌদিও হেসে ফেলে, 'সবাই আর ভাবে কই সে-কথা?'

এটা অবশ্য বকুলের প্রতি কটাক্ষপাত।

আবহাওয়াটা যে কিঞ্চিৎ হালকা হয়ে গেল এতে যেন ছোটবৌদির প্রতি কৃতজ্ঞ হয় বকুল। হেসে হেসে বলে, 'তা যে মেয়ের ভাগ্যে ঘর-বর না জোটে তার আর উপায় কী?'

'ওই এক ধাঁধা—'

ছোটবৌদি বলে, 'তোমার বাপ-ভাই বিয়ে দিলেন না, না তুমিই করলে না তা জানি না! আমি তো তখন তোমার দাদার চাকরির চাকায় বাঁধা হয়ে দিল্লী-সিমলে টানাপোড়েন করছি—'

এই সব কথা কোনোদিন বলেনি বকুলের ছোটবৌদি। অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে মানুষটা। স্বল্পভাষীত্বের গৌরব নিয়েই এ সংসারে বিরাজিত ছিল সে। হঠাৎ যেন কথা বলার জন্যে পিপাসার্ত হয়ে উঠেছে।

'তা বটে।' বকুল কথায় সমাপ্তিরেখা টেনে দেয়।

'চলো খেতে চলো—'

বলেও আবার দাঁড়ায় শম্পার মা, বলে ওঠে, 'আমার পোড়ামুখে বলার মুখ নেই, তবু তুমি বলেই বলছি—ও-বাড়ির খবর জানো?'

'ও-বাড়ি?'

'ও-বাড়ি মানে তোমাদের পুরনো বাড়ি গো! তোমার কাকা-জ্যাঠার বাড়ি!'

'ওঃ! কী হয়েছে? কেউ মারা-টারা—'

থেমে যায়। ঠিক যে কে কে আছে সেখানে তা ভাল করে জানে না বকুল। জ্যাঠামশাই এবং কাকারা এবং তাঁদের পত্নীরা যে কেউই অবশিষ্ট নেই তা জানে। না, বোধ করি ছোটখুড়ী ছিলেন অনেক দিন, আসা-যাওয়া বিরল হয়ে গেছে।

অতএব থেমেই যায়।

ছোটবৌদি মাথা নেড়ে বলে, 'না, মারা-টারা যাওয়া নয়, ও বাড়ির জ্যাঠার নাতনী সাইকেলে "বিশ্বপরিভ্রমণে"র দলে মিশে পাড়ি দিয়েছে। ছটা ছেলে আর তার সঙ্গে কিনা ওই একটা মেয়ে। মেয়েকে খুব আহ্লাদী করে মানুষ করেছেন আর কি!'

বকুল একটু অবাক না হয়ে পারে না সত্যিই। দর্জিপাড়ার গলির তাদের ওই নিকট-আত্মীয়দের কোনদিনই ভাল করে তাকিয়ে দেখেনি। এইটুকুই শুধু ধারণা ছিল ওরা বেশ পিছিয়ে থাকা, ওদের গলি ভেদ করে সূর্য সহজে উঁকি মারতে পারে না। ওর জেঠতুতো দাদার বৌয়ের অনেকদিন আগের দেখা চেহারাটা মনে পড়লো, একগলা ঘোমটা, নরম-নরম গলা, বয়সে ছোট ছোট দ্যাওর-ননদদের পর্যন্ত 'ঠাকুরপো', 'ঠাকুরঝি' ডেকে কী সমীহ ভাবে কথা বলা! আর মনে পড়লো তাঁর বাঁ হাতখানা। অন্ততঃ ডজন-দেড়েক লোহাপরা দেখেছে তাঁর হাঁতে শাঁখা-চুড়ির সঙ্গে। কথার মাঝখানে কেন কে জানে, যখন-তখন সেই লোহাপরা হাতটা কপালে ঠেকাতেন আর দু'কানে হাত দিতেন! মনে হতো—সর্বদাই অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত।

সে কতোদিনের কথা?

মেয়েটা কি তাঁরই মেয়ে?

তবু এ সংবাদে কৌতুকই অনুভব করে বকুল। বলে, 'তা ভালো তো! একটা ছেলে আর একটা মেয়ে থাকলেই বিপদের আশঙ্কা, এ ছ'জন একজনকে পাহারা দেবে।'

'পাহারা দেবে, না সদলবলেই আহার করবে কে জানে!' ছোটবৌদি বলে, 'এই ভেবে অবাক হচ্ছি, তোমাদের সেই বাড়িতেও এতো প্রগতির হাওয়া বইলো!'

'বাঃ! কাল বদলাবে না? যুগ কি বসে থাকবে?'

'ওঁদের বাড়িটা দেখলে তো মনে হতো বুঝি "বসেই আছে"। হঠাৎ একেবারে—'

বকুল অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'হয়তো এমনিই হয়। ঘরে দরজা-জানলা না থাকলে, একদিন ঘরে আটকানো প্রাণী দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে চায়।'

'তা বলে বাপু এতোটা বাড়াবাড়ি—', ছোটবৌদি বলে ওঠে, 'থাক, আমার কোনো কথা বলা শোভা পায় না।'

বকুল ওর অপ্রতিভ ভাবটাকে না দেখতে পাওয়ার ভান করে বলে, 'তাড়াতাড়ি করতে গেলেই বাড়াবাড়ি করতে হয় ছোটবৌদি, হঠাৎ যখন খেয়াল হয় "ছি ছি, বড্ড পিছিয়ে আছি", তখন মাত্রাজ্ঞানটা থাকে না।'

'হবে হয়তো' বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে শম্পার মা। হয়তো এই কথায় তার নিজের মেয়ের কথাই মনে এসে যায়।

কিন্তু এমন কী দরজা-জানলা এঁটে রেখেছিল তারা? তাই তাদের মেয়ে দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে গেল? আমরা তো যা করেছি ওর ভালোর জন্যেই! তা আমরা ওকে বুঝিনি, ওই বা আমাদের বুঝবে কেন?

অদ্ভুতভাবে ভেঙে পড়েছে বলেই একটু বুঝতে পারছে শম্পার মা। আস্ত থাকলে কি বুঝতো? না বুঝতে চাইতো?

এই বাড়িতেই আর একটা অংশেও চলছিল একটা নাটকীয় দৃশ্য।

অলকা ঘর-বার করছিল, অলকা বার বার জানলার ধারে এসে দাঁড়াচ্ছিল, তবু অলকা তার মুখের রেখায় একটা 'যুদ্ধং দেহি' ভাব ফুটিয়ে রাখছিল বিশেষ চেষ্টায়। কারণ কাঁচ-ঘেরা বারান্দার একধারে ক্যাম্বিসের চেয়ারে উপবিষ্ট অপূর্বর মুখের দিকে মাঝে-মাঝেই কটাক্ষপাত করছিল অলকা।

সে মুখ ক্রমশঃই কঠিন কঠোর আর কালচে হয়ে আসছে, আর তার আগুন-জ্বলা চোখ দুটো বার বার বুককেসের উপর রাখা টাইমপীসটার উপর গিয়ে পড়ছে।

উঃ, লোকটা কী ধড়িবাজ! ভাবলো অলকা, সেই থেকে টেলিফোনটার গা ঘেঁষে বসে আছে, এক মিনিটের জন্য নড়ছে না। একবার বাথরুমে যাবারও দরকার পড়তে পারতো না এতোক্ষণ সময়ের মধ্যে? অলকা তো তাহলে ওই টেলিফোনটার সহায়তায় ব্যাপারটা ম্যানেজ করে ফেলতে পারতো! বলে উঠতে পারতো, 'এই দ্যাখো কান্ড, এখন তোমার কন্যে ফোন করলেন, "ফিরতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাপীকে ভাবনা করতে বারণ কোরো"।'

তারপরই ব্যাপারটাকে লঘুতর করে ফেলবার জন্যে হেসে গড়িয়ে বলতো, বুঝছো ব্যাপার? "মা তুমি ভেবো না" নয়, "বাপীকে ভাবনা করতে বারণ কোরো।" জানে তার বাপীই সন্ধ্যেরাত্তির থেকেই ঘড়ির দিকে তাকাবে আর জানলার দিকে তাকাবে। আর জগতে যতরকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, মনে মনে তার হিসেব কষবে।...মা বেচারীও যে ভেবে অস্থির হতে পারে সে চিন্তা নেই মেয়ের।'

হ্যাঁ, এইভাবেই কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে পরিস্থিতি হালকা করে নিতে পারতো অলকা, বরাবর যেমন নেয়। কতো 'ম্যানেজ' করে আসছে এযাবৎ তার ঠিক আছে? মেয়ে বড় হয়ে ওঠার আগে থেকেই চলছে অলকার এসব কলাকৌশল।

ওই অপূর্ববাবুটি বাইরের লোকের কাছে যতই প্রগতিশীলের ভান করুক, আর উদারপন্থীর মুখোশ আঁটুক, ভিতরে কি তা তো জানতে বাকি নেই অলকার। মনোভাব সেই আদ্যিকালের পচা পুরনো! মেয়েরা একটু সহজে স্বচ্ছন্দ জীবন পেতে চাইলেই সেই সেকালের সমাজপতিদের মত চোখ কপালে উঠে যায়। নেহাৎ নাকি এই আমি খুব শক্ত হাতে হাল ধরে বসে আছি, তাই আধুনিক যুগের সামনে মুখটা দেখাতে পারছি।

তবু শুধুই কি জোরজুলুম চালাতে পাই? কতো রকমেই ম্যানেজ করতে হয়। সাজিয়ে বানিয়ে গুছিয়ে কথা বলে, রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে।

এই এখুনি সামলে ফেলা যেতো, যদি লোকটা ওই টেলিফোনের টেবিলটার গায়ে বসে না থাকতো।

মেয়ের ওপরও রাগে মাথা জ্বলে যায় অলকার। জানিস তো সব, তবে এতো বাড়াবাড়ি কেন? যা রয়-সয় তাই ভালো।...বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিকে গেছিস, বেশ করেছিস, তাই বলে রাত এগারোটা বেজে যাবে বাড়ি ফিরবি না? এতো রাত অবধি কেউ পিকনিকের মাঠে থাকে?

ভাবতে থাকে এসব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দিকে যুক্তি শক্ত করতে আপন মনে বলে ওঠে, 'বাবা জানেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কিনা।'

'বাবা' অবশ্য সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুদেব। অলকার পিত্রালয়ের

সম্পর্কসূত্রে যিনি অলকারও গুরুদেব। শুধু অলকারই বা কেন, সত্যভামারও।

উদার প্রগতিবান সেই 'বাবা'র মত এই 'মানুষ' হচ্ছে সোনার জাত, ও কখনো অপবিত্র হয় না। তা ছাড়া এও বলেন. 'ভালমন্দ, ভুল-ঠিক, এ সবের বিচার করবার তুই কে রে? "মন" হচ্ছে মহেশ্বর, সে যা চাইবে তা করতে দিতে হবে তাকে, ফলাফলের চিন্তার দরকার নেই, সব ফলাফল গুরুর চরণে সমর্পণ করে তুড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিবি ব্যস্।'

এমন উদারপন্থী 'বাবা'র শিষ্যাশিষ্যার সংখ্যা যে অগুনতি হবে. তাতে আর সন্দেহ কি? অলকার পিতৃকুলের কি মাতৃকুলের কেউ একজন হয়তো আদি শিষ্যত্বের দাবি করতে পারেন, কিন্তু তারপর তিনকুলের কেউ আর বাকি নেই।

তবে অলকার এমনি কপাল, তরুণ মেয়েটাকেও 'বাবা'র চরণে সঁপে দিতে পেরেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত স্বামীটিকে নোওয়াতে পারলো না। অথচ ঘরে বাইরে সবাই বলে অলকার ভাগ্যে যেমন বশংবদ স্বামী, কটা মেয়ের ভাগ্যে তেমন জোটে?...আর শাশুড়ী ননদরা তো স্পষ্টাস্পষ্টি 'স্ত্রৈণ'ই বলে।

হায়! যদি তারা জানতে পারতো. স্বামীকে কেবলমাত্র লোকচক্ষে ওই স্ত্রৈণ-রূপে প্রতিভাত করতেই কত কাঠখড় পোড়াতে হয় অলকাকে, কতখানি জীবনী-শক্তি খরচ করতে হয়!

নেহাৎ নাকি গুরুবলে বলীয়ান বলেই পেরে চলছে অলকা।

এখনো তাই অবস্থাকে সেই হতভাগা মেয়ের অনুকূলে আনতে বলে ওঠে অলকা, 'বাবা জানেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কিনা—'

অগ্নিগর্ভ মানুষটা এতোক্ষণকার স্তব্ধতা ভেঙে চাপা গলায় গর্জে ওঠে, 'দুর্ঘটনা!'

প্রশ্ন না মন্তব্য? সমর্থন না প্রতিবাদ? কে জানে!

অলকার মনে হয় বোধ হয় অবস্থার হাতলটা চেপে ধরতে পারলো। তাই তেমনি উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'তাই ভাবছি! "বাই কারে" গেছে তো সব। ফেরার সময় গাড়িফাড়ি বিগড়োলো, না আরও কিছু ঘটলো—', অলকা গলার স্বর আরো খাদে নামায়, 'বুকের মধ্যে কি যে করছে! আজকাল তো রাতদিনই অ্যাকসিডেন্ট!'

আগুনের শিখা আর একবার ঝলসে ওঠে, 'তা যদি হয়ে থাকে তো বলবো তোমাদের ভগবান মারা গেছেন। এতোক্ষণ তো আমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম যেন অ্যাকসিডেন্টই হয়। এমন হয় যাতে তোমার ওই নাচিয়ে মেয়ের পা দুখানা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যায়।'

অলকা যথারীতি ঠিকরে উঠলো।

অলকা যখন ভাবছিল অবস্থা আয়ত্তে আসি-আসি করছে. তখন কিনা এই কথা! এতোখানি অপমান তো আর বরদাস্ত করা যায় না?

অলকা যথারীতি ঝঙ্কারে বললো, 'কী বললে?'

'যা বলেছি আবারও বলছি। প্রার্থনা করছি তোমার মেয়ে যেন ঠ্যাং ভেঙে বাড়ি ফেরে!'

অলকা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। 'তা ওইটুকুই বা আর রেখে-ঢেকে বলা কেন? বলো যে—প্রার্থনা করছি—যেন আর বাড়ি না ফেরে। যেন গাড়ির তলায় পেষাই হয়ে যায়। আশ্চর্য প্রাণ বটে। তুমি না বাপ!'

'সেই তো. সেটাই তো অস্বীকার করার উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। যদি পেতাম!'

'ওঃ! বটে! বলতে লজ্জা করছে না? বাড়ির আর একটি মেয়েও তো

দেখলাম। মেয়ে বাপের নাকের সামনে দিয়ে তেজ করে বেরিয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরলো না, অথচ কোন নিন্দে নেই। যত দোষ আমার মেয়ের!'

'নিন্দে নেই কে বললো? এই তো তুমিই নিন্দে করছো। তবে তুমিও জানো আর আমিও জানি, সে মেয়ে পাতালের সিঁড়িতে পা বাড়াবে না।'

'থামো থামো! মেয়েমানুষ একলা রাজরাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কে তাকে স্বর্গের সিঁড়িতে তুলে দিতে আসে?...আমি বলছি—'

অলকা যে কি বলতো কে জানে, সত্যভামা এসে পড়লো হুড়মুড়িয়ে, বলে উঠলো, 'বাপী খুব রাগ করছো তো? জানি করবেই। ওদের না বাপী, এতো করে বললাম সারাদিন এতো কাণ্ডর পর আবার নাইট শোর সিনেমা? বাপী বাড়ি ঢুকতে দেবে না। তা শুনলো না গো।...মেয়েগুলো কী পাজী জানো? বলে কিনা "আমরা বুঝি একটা বাড়ির মেয়ে নয়? আমাদের বুঝি মা-বাপ নেই?" ...তবু আমি শীলাকে ধরে বেঁধে তুলে নিয়ে ছবি শেষ হবার আগেই চলে এলাম। সবাই যা ঠাট্টা করলো!...ও বাপী, কথা বলছো না যে? বা—পী—'

বাপের গলা ধরে ঝুলে পড়ে সত্যভামা. 'আমি বলে বন্ধুদের কাছে মুখ হেঁট করে আগে আগে চলে এলাম, তুমি রেগে আছো বলে, আর তুমি কিনা হাঁড়ি-মুখ করে—হাসো হাসো বলছি। ও—বাপী! না হাসলে আমি দারুণ ভাবে কেঁদে ফেলবো—'

বাপীকে নরম না করা পর্যন্ত থামবে না সে নিশ্চিত।

॥ ২২ ॥

নমিতার জীবনে নাটক ছিল না, নমিতা এক দীনহীন পরিচয়ের মধ্যে অতি সাধারণ জীবন বহন করছিল. নমিতার প্রাপ্তির ঘর ছিল শূন্য। তাই নমিতার মধ্যে থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল, দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছিল সেই প্রতিবাদ. তাই নমিতা আকস্মিক এক নাটকীয়তায় মোড় নিয়ে ওর জীবনটাকেই নাটক করে তুললো, কিন্তু অনেক প্রাপ্তির গৌরব বহন করে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চেই যাদের ঘোরাফেরা, তাদের মধ্যে থেকেও প্রতিবাদ ওঠে কেন?

পারুলের ছোট ছেলে শোভনের বৌ রেখার স্বামী তো তার সম্পত্তির ট্যাক্স খাজনা দিতে কসুর করেনি? তবু সে তার সম্পত্তিকে হাতে রাখতে পারছে না! দশ বছরের বিবাহিত জীবনযাপনের পর রেখা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে, 'এই ফাঁকিতে ভরা দাম্পত্যজীবন বহনের কোনো মানে হয় না।'

অথচ এযাবৎ সকলেই দেখেছে আর জেনেছে, ওদের সেই জীবন একেবারে ভরাভরন্ত। তাতে ফাঁকই বা কোথায়, ফাঁকিই বা কোথায়?

উপরওলা মুক্ত সংসার, সুখী পরিবার, বশংবদ স্বামী, বিনীত ভৃত্য, অগাধ প্রাচুর্য, অবাধ স্বাধীনতা, ছবির মত বাড়ি, সাহেববাড়ির মত ড্রইংরুম, ফুলে ভরা বাগান, ফুলের মত ছেলেমেয়ে, অনুরক্ত প্রতিবেশী, পদমর্যাদায় সমৃদ্ধ স্বামীর অনুগত অধস্তনের দল, এক কথায় যে কোনো মেয়ের ঈর্ষাস্থল এই জীবনে মণ্ডিত রেখা নামের মহিলাটি তো একেবারে পাদপ্রদীপের সামনে বিরাজ করেছে এতোদিন—ঝলমলে মূর্তিতে। রেখার চলনে-বলনে, আচার-আচরণে, দৃষ্টির ভঙ্গিমায়, ঠোঁটের বঙ্কিমরেখায় উচ্ছ্বসিত হয়েছে সেই ঝলমলানির ছটা, হঠাৎ এ কী?

জীবনভার নাকি দুর্বহ হয়ে উঠেছে তার! যে স্বামীর সঙ্গে তার চিন্তায়-ভাবনায়, ইচ্ছায়-বাসনায়, রুচিতে-পছন্দে কোনোখানে মিল নেই, সে স্বামীর সঙ্গে একত্রে বসবাস তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

পারুল ছেলের পরাজিত পর্যুদস্ত মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, 'তুই ঠাট্টা করছিস না তো শোভন?'

'সেটা হলে আমার পক্ষে ভালো হতো অবশ্যই,' শোভন আস্তে বলে, 'কিন্তু হঠাৎ তোমার সঙ্গে এমন ঠাট্টা করতে আসবো কেন বল? ছেলেটাকে তোমার কাছে রাখতে এলাম, মেয়েটাকে ছাড়লো না। হোক সেটা বাপ-মরার মত মামার বাড়িতে মানুষ!'

পারুল মনে মনে কেঁদে উঠে বলে, 'তার মানে তোকে দুজনকেই ছেড়ে থাকতে হবে?'

'তাছাড়া উপায় কি!'

'পারবি?'

প্রশ্নটা করে ফেলে পারুল, কিন্তু করেই লজ্জিত হয়, সত্যি 'না পারা' শব্দটার কি কোনো অর্থ আছে? মানুষ কী না পারে?

সেই প্রশ্নটাই করে শোভন, 'না পারা শব্দটার কোনো মানে আছে মা?'

'তা বটে! কিন্তু—', ঈষৎ দ্বিধায় থেমে পড়ে অবশেষে মনের জোর করে বলে ফেলে পারুল, 'তোদের কি তাহলে ছাড়াছাড়িটা পাকা হয়ে গেছে শোভন?'

বেপরোয়া পারুলেরও 'ডিভোর্স' শব্দটা মুখে আটকায়। সন্তানের বিধ্বস্ত মুখ বড় গোলমেলে জিনিস।

শোভন অদ্ভুত একটু হেসে বলে, 'পাকাপাকি? না কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছয়নি এখনো, এক্ষুনি ওঠাতে গেলে অসুবিধে আছে। তাতে অনেক হাঙ্গামা। জানো তো সবই। একজনকে "মহা পাপিষ্ঠ" প্রতিপন্ন করতে না পারলেও কাজটা সহজে হয় না। এটা তার থেকে সুবিধের, ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামা। বছর তিনেক সেপারেট থাকতে পারলেই বিচ্ছেদটা অনায়াসে হবে। কোর্ট আপত্তির পথ পাবে না।'

যতোক্ষণ শ্বাস, ততোক্ষণ আশ।

পারুল তবু যেন মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। হয়তো এই দূরে থাকার অবকাশে পরস্পরের অভাব অনুভব করে ভুল বুঝতে পারবে, হয়তো নিত্য সাহচর্যের বিতৃষ্ণা ধুয়ে মুছে গিয়ে নতুন আগ্রহ অনুভব করবে। হয়তো এই বাচ্চা দুটোই একটা দারুণ সমস্যা ঘটিয়ে ওদের সমস্যাকে লঘু করে দেবে।

ছেলেটাকে ছেড়েই কি থাকতে পারবে রেখা? যে রেখা বরাবর সমস্ত পরিবেশ-টাকে সবলে চেপে ধরে রাখতে চেয়েছে আপন বাসনামুঠির মধ্যে, যে রেখা কোনদিন নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায়নি! ছেলের জন্যে মন কেমন করলেই সে প্রবল হয়ে উঠবে, আপন অনুকূলে স্রোতকে বইয়ে নেবে।

শোভন?

ও হয়তো তখন কৃতার্থ হয়ে ভাববে 'বাঁচলাম বাবা।'

একেবারে সব সম্ভাবনার মূলে যে একেবারে কোপ পড়েনি, এটুকুই আশার।

শোভনের ছেলেটাকে একটা গল্পের বই দিয়ে গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসিয়ে রেখে এসেছে, তাই কথা চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ছেলের সামনে চায়ের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে পারুল বলে, 'কিন্তু তোদের এই

রুচির অমিলটা হলো কখন? নিজেকে গলিয়ে-টলিয়ে দিব্যি তো এক ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছিলি?'

ঈষৎ হালকাই হয় পারুল, ইচ্ছে করেই হয়।

শোভন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোমার তাই মনে হতো?'

'শুধু আমার কেন বাবা, সকলেরই হতো।'

'সকলের কথা থাক্, তোমার নিজের কথাই বলো।'

'তা আমারই বা না হবে কেন বাপু? দেখে তো এসেছি কিছুটা। "তোকে" তো কোথাও খুঁজে পাইনি।'

শোভন একটু হেসে বলে, 'যে বস্তুটি তুমি হেন মেয়েও খুঁজে পাওনি, সেই সূক্ষ্ম সুগভীর বস্তুটি তোমার বৌ ঠিক খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করে ফেলেছে মা! আর ফেলেই ক্ষেপে উঠেছে।'

শোভন চায়ের পেয়ালায় মনোযোগী হয়।

পারুল আস্তে বলে, 'কিন্তু নিজেদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বই বড়ো হয়ে উঠলো তোদের কাছে? ছেলেমেয়ে দুটোর কথা ভাববি না?'

'আমাদের কাছে এ কথা ভাবছো কেন মা? আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করিনি?'

'বেশ না হয়ে ওদের মার কাছেই। কিন্তু তোর কোনো রকমে সাধ্য হলো না ওটা ম্যানেজ করা?'

'কই আর হলো?'

শোভন বলে, 'সব কিছুরই শেষ পর্যন্ত তো একটা সীমা আছেই মা। "ম্যানেজ" করারও আছে!'

'তাহলে এখন দাঁড়াচ্ছে, তুই তোর কাজের জায়গায় চলে যাচ্ছিস, বৌমা বাপের বাড়ি থাকছে, এবং ছেলেটা এখানে আর মেয়েটা সেখানে। অর্থাৎ ভাই-বোনের যে একটা সুখের সঙ্গ, সেটা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে বেচারারা। মেয়েটা তবু মা পাচ্ছে, ছেলেটা তাও না।'

শোভন একটু হালকা গলায় বলে ওঠে, 'তেমনি বাবার মাকে পাচ্ছে।'

'থাম্ তুই!' পারুল প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'বাজে কথা রাখ। যে বাবার মাকে বেচারী জন্মে জীবনে চক্ষে দেখেনি বললেই হয়, তাকে পেয়ে তো কৃতার্থ হয়ে যাবে একেবারে! সত্যি, আমি তো ওটার মুখের দিকে তাকাতেও পারছি না। বুড়ো ধাড়ী দুটো মা-বাপ তাদের হৃদয়-সমস্যাকে এতো জটিল করে তুললো যে, ভেবে দেখছে না ওদের মুখগুলো হেঁট হয়ে গেল! এতোদিনের আনন্দের, আহ্লাদের, গৌরবের জীবন থেকে হঠাৎ যেন তোরা ওদের একটা দারুণ লজ্জার, দুঃখের আর অপমানের জীবনে গড়িয়ে ফেলে দিলি। এই পৃথিবীতে ওদের পরিচয়পত্রটা কতো মলিন বিবর্ণ হয়ে গেল সে হুঁশ আছে? জীবনে কখনো ওরা মা-বাপকে ক্ষমা করতে পারবে?'

'পারলেই অবাক্ হবো। পারবে না।'

'সেই গ্লানির বোঝা তাদের জীবনকে ভারী করে তুলবে না?'

পারুল স্বভাবতঃ কখনোই উত্তেজিত হয় না, কিন্তু এখন পারুলকে উত্তেজিত দেখালো।

শোভন বিধ্বস্ত গলায় বলে, 'জানি তুলবে। অসহনীয় করে তুলবে। কিন্তু আমি কি করবো বলো? এ সব যুক্তি যে দেখাইনি তা তো নয়?'

'কিন্তু তোদের বিরোধটা কোথায় ঘটলো? কবে কখন কী সূত্রে?'

পারুল যেন জিনিসটাকে লঘু করে দেখিয়ে ছেলের মনের ভারটা লঘু করে

দিতে চায়। যেন দুটো অবোধ ছেলেমেয়ে ঝগড়াঝাঁটি করে নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনছে, পারুল তাদের সামলে দেবে।

শোভন হয়তো মায়ের এই মনোভাব বোঝে, হয়তো বা বোঝে না, ভাবে মা ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারছেন না।

শোভন তাই মার দিকে সরাসরি তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলে, 'বিরোধ? সর্বক্ষেত্রে। বরাবর চিরদিন। তবু অবিরত চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টায় হেরে গেলাম। ও বলছে আমি নাকি কোনোদিন চেষ্টা করিনি।'

পারুলের একটা নিঃশ্বাস পড়ে, গভীর গাঢ়। পারুল জানলা দিয়ে চোখ ফেলে দেখে শোভনের ছেলেটা গল্পের বইখানা মুড়ে রেখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। পারুলের হঠাৎ মনে হলো এর থেকে করুণ দৃশ্য সে বোধ করি জীবনে আর কখনো দেখেনি।

পারুল নিজের ছেলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'হার মানলি?'

'মানলাম। পারা গেল না।'

পারুল অন্য প্রসঙ্গে এলো।

বললো, 'তোর ছেলে তো কেষ্ট-বিষ্টু বাবাদের ছেলের রীতিতে বিলিতি ইস্কুলে পড়তো, এখানে ওর দশা কী হবে?'

'এখন যে দশায় উপনীত হয়েছে তার সঙ্গে ম্যানেজ করতে হবে। ঠাকুমার হাতের বড়ির ঝোল খাবে, আর বাংলা ইস্কুলে পড়বে।'

পারুল একটু কঠিন মুখে বলে, 'তার মানে যে-কালকে তোরা "সেকাল" বলে নাক কোঁচকাতিস, সেই কালের থেকে এক পা-ও এগোসনি। তোরাও সে যুগের মতো ছেলেপুলেগুলোকে "নিজেদের জিনিসপত্তর" ছাড়া আর কিছুই ভাবিস না। অথবা তোদের খেলনা পুতুল। সেকালেও তো এই ছিল? ওদের মুখ কে চাইতো? ওরা যেন নিজেদের শখ-সাধ মেটানোর উপকরণ মাত্র। নিজেদের সুবিধে-অসুবিধের বশেই তাদের ব্যবস্থা, কেমন? কিন্তু এ যুগে তো তোরা অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছিস, ওদের জন্যে অনেক ব্যবস্থা অনেক আয়োজন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটা বদলালো কই? সন্তানের জন্যে যে স্বার্থত্যাগের দরকার আছে, জেদ অহঙ্কার ত্যাগের দরকার আছে, তা তো ভাবছিস না তোরা একালের মা-বাপ? তোদের সুবিধের অনুপাতে ওদের জীবনের ছক। এতোদিন তোরা ওকে তোর পদমর্যাদা আর ঐশ্বর্যের মাপকাঠিতে ফেলে—খাওয়া শোওয়া পড়ায় খেলায় প্রতিটি ব্যাপারে 'সাহেব' করে মানুষ করছিলি, হঠাৎ এখন তোদের ইচ্ছে-বাসনার ছাঁচে ফেলে ওর জন্যে ঠাকুমার হাতে বড়ির ঝোল আর পাততাড়ি বগলে পাঠশালে যাওয়া বরাদ্দ করছিস, আবার যদি হঠাৎ খেয়াল হয়, হয়তো মাথা ন্যাড়া করে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে পাঠিয়ে দিবি, অথবা একেবারে পাশা উল্টে ফেলে ছুঁচলো জুতো আর ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরিয়ে আমেরিকায় চালান করতে চাইবি! ওরও যে একটা মন আছে দেখবি না, আর সে মনে মা-বাপের জন্যে কী সঞ্চিত হচ্ছে ভেবেও দেখবি না?'

শোভন একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে।

শোভন বলে, 'ভেবো না মা, এসব কথা আমি ভাবিনি। অথবা রেখাকে বোঝাতে চেষ্টা করিনি। কিন্তু কিছুতেই যদি না বোঝে কী করবো বল? তাহলে ছেলেটাকেও ওর হাতে তুলে দিয়ে নিজে একেবারে দেউলে বনে যেতে হয়।'

পারুলের মনটা বেদনায় টনটন কর ওঠে। পারুলের নিজের বক্তব্যের জন্য লজ্জা হয়, সত্যি, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তো মায়ের কাছে ছুটে এসেছে বেচারা।

এখানে তো অহমিকাকে বড় করে তোলেনি।

পারুল অতএব বাতাস হালকা করবার চেষ্টা করে। বলে ওঠে, 'তা বৌমার এতই বা কাঠ-জেদ কেন বল্ তো বাপু? তুই এই বুড়ো বয়সে আর কারুর বৌয়ের প্রেমে-ট্রেমে পড়ে বসিসনি তো?'

শোভন হঠাৎ মাথা হেঁট করে। তারপর আস্তে বলে, 'শ্রদ্ধা বলেও একটা বস্তু থাকে। ও সেটাকেও বরদাস্ত করতে পারে না।'

পারুল ছেলের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। পারুল যেন রহস্যের মূল দরজা খুঁজে পায় হঠাৎ। তবে সেটা বলে ফেলে না। বলে, 'সেটা কি একটা বিরোধের বস্তু?'

'শুধু সেটাই নয়, বললাম তো, প্রতিপদে রুচির অমিল, এ জীবন ওর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি সংকীর্ণচিত্ত, ও উদার। আমি গ্রাম্য, ও আধুনিক। আমি ভগবান বিশ্বাসী, ওর মতে সেটা কুসংস্কার।'

পরদিন রাত্রে পারুল তার চিঠির কাগজের প্যাডটা নিয়ে বসলো।

শোভন ছেলে রেখে চলে গেছে, কারণ ছুটি নেই তার। ছেলেটা পারুলের চৌকির কাছে আর একটা সরু চৌকির ওপর শুয়ে আছে। মশারির মধ্যে থেকে বোঝা যাচ্ছে না ও ঘুমিয়ে পড়েছে না জেগে আছে।...এখন খোলা জানলা দিয়ে গঙ্গার বাতাস এসে মশারিটাকে দোলাচ্ছে, কিন্তু সব দিন বাতাস থাকবে না, গুমটের দিন আসবে, সেদিন কী হবে ওর? জন্মাবধি যার বিজলী পাখার হাওয়ায় অভ্যাস! পারুলের এই মফঃস্বলের বাড়িতে তো ও জিনিসটি নেই!

শুধু ও জিনিসটি কেন, অনেক অনেক জিনিসই তো নেই যাতে ও অভ্যস্ত। প্রতি মুহূর্তেই কি বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না ওর মন? অথবা নিজেকে হতভাগ্য বেচারী ভেবে হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়বে না?

'—আমার মনে হচ্ছে তাই হবে,' লিখলো পারুল, 'এরকম মৃদু আর চাপা স্বভাবের ছেলেমেয়েরা তাই হয়। পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই এরা আছে, এই হতভাগ্যের দল। আমাদের সমাজেও এলো। প্রতিরোধের উপায় নেই। কিন্তু বকুল, আমরা কি মেয়েদের এই স্বাধীনতারই স্বপ্ন দেখেছিলাম? আমরা, আমাদের মা-দিদিমারা? তুই তো গল্প-উপন্যাস লিখিস, কতো জীবন তৈরী করিস, আমার অভিজ্ঞতা সত্যি মানুষ নিয়ে, তাই আজকাল যেন ভেবে ভেবে বল পাচ্ছি না। এ যুগ কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে এদেশেও সেই একটা হতভাগ্য জাতি সৃষ্টি করলো, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরা যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে! যে হতভাগ্যেরা শিশুকালে বাল্যকালে তাদের জীবনের পরম আশ্রয় হারিয়ে বসে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে, স্বেচ্ছাচারী হবে, সমাজদ্রোহী হবে, অথবা একটা হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে জীবনের আনন্দ হারাবে, উৎসাহ হারাবে, বিশ্বাস হারাবে।

বিশ্বাস হারানোর মত ভয়ংকর আর কী আছে বল? ক'দিন আগেও যে-ছেলেটা জানতো না, আমার এই রাজপুত্তুরের পোস্ট্‌টা চোরাবালির ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমার রাজ্যপাট আবুহোসেনের রাজ্যপাটের মত এক ফুঁয়ে ফর্সা হয়ে যাবে, আজ আচমকা এই অবস্থায় পড়ে গিয়ে সে যদি পৃথিবীর ওপরই আর বিশ্বাস রাখতে না পারে, তাকে দোষ দেব কেমন করে?

ভগবানের মার'ও অবস্থার বিপাক ঘটায়, কিন্তু তা'তেও দুঃখ থাকে, বেদনা থাকে, হয়তো এক রকমের লজ্জাও থাকে, কিন্তু অপমান থাকে না, গ্লানি

থাকে না!

ও যখন ভাবতে বসবে তার এই দুর্দশার জন্যে দায়ী তারই মা-বাপ, যাদের কাছে এযাবৎ নিতান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে কাটিয়ে আসছিল, তখন ওর ভিতরটা কী জ্বালায় জ্বলবে ভাব্।

তোর মনে আছে বকুল, যেদিন হিন্দু বিবাহে বিচ্ছেদের আইন 'পাস' হলো, সেদিন আমি ঠাট্টা করে আক্ষেপ করেছিলাম, আহা আমাদের মায়ের আমলে যদি এটি হতো, তাহলে সে ভদ্রমহিলা সারাজীবন এমন বেড়া-আগুনে পুড়ে মরতেন না। ঠাট্টাই, তবু আক্ষেপের কোথাও একটু সত্যিও কি ছিল না? আজ মনে হচ্ছে আমাদের মায়ের জীবনে তেমন সুযোগ এলে আমাদের কি দশা ঘটতো?

শোভন চলে যাবার পর থেকে ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। শুনি ছোট বোনটাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে, সেটাকে ওর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, কী নিষ্ঠুরতা! নিজের ছেলেকেই আমার একটা হৃদয়হীন পিশাচ মনে হচ্ছে।

অথচ কারণটা কি? শুধু জেদ, অহমিকা!

শুধু রুচির অমিল, শুধু মতের অমিল। অর্থাৎ বনিয়ে থাকতে পারার অক্ষমতা! কিন্তু ওই অমিলের কারণগুলো যদি শুনিস মনে হবে সবই ঠাট্টা।

একজন চেয়েছে জীবনযাত্রা প্রণালীটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ধর্মী হোক, অন্যজন চেয়েছে প্রণালীটা পাশ্চাত্য-ধর্মী হয় হোক, তবু তা'তে প্রাচ্যের একটু আভাস মেশানো থাক। ছেলেমেয়েরা সাহেব হোক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তারা যে আসলে বাঙালী, সেটা যেন ভুলে না যায়।

অতএব প্রথমজন বলেছে, খিচুড়ি চলবে না, যা হবে তা একরকম হবে, অপরজন বলেছে, জন্মসূত্রটা তো এড়াতে পারবে না, ওটা তো বদলাবার বস্তু নয়, অতএব।

শেষ পর্যন্ত বিরোধটা গিয়ে ঠেকেছে সংঘর্ষে।

এক হিসেবে দোষটা আমার ছেলেরই।

বেড়ালটাকে পয়লা রাত্তিরেই কাটতে হয়।

প্রথম দিকে আত্মমহিমা অথবা উদারতা দেখাতে, অথবা নিতান্তই মোহাচ্ছন্ন বশ্যতায় বেড়ালকে ইচ্ছামত খেলতে দিয়েছো তুমি, এখন হঠাৎ সে 'পাতে মুখ দিয়েছে' বলে তলওয়ার বার করে কাটতে চাইলে চলবে কেন?

ভালবাসার বশ্যতা এক, আর নিরুপায়ের ভূমিকায় অন্ধ আত্মসমর্পণ আর এক। এ যুগের পুরুষটা ওই বিভেদটার সীমারেখা নির্ণয় করতে অক্ষম হয়েই তো জীবনে অনিষ্ট ডেকে আনছে।

মনে হচ্ছে সমাজের চাকাটা হঠাৎ যেন আমূল ঘুরে গেছে। যেখানে একটু নড়লে কাজ ঠিক হতো, সেখানে এই একেবারে উল্টোটা চোখে কেমন ধাক্কা মারছে।

জানি না আমার বড় ছেলের সংসারেও আবার এই ঢেউ এসে লাগে কি না। সেখানেও তো অমিলের চাষ। আর ওই ছেলেমেয়ে নিয়েই। মোহনের মতে—ছেলেমেয়েদের দোষ-ত্রুটি হলে বুঝিয়ে শিক্ষা দিয়ে সংশোধন করা উচিত, মোহনের বৌয়ের মত পিটিয়ে সায়েস্তা করাই একমাত্র উপায়। এ বিষয়ে সে আমাদের পিতামহী প্রপিতামহীদের সঙ্গে একমত! আসলে 'গ্রাম্যতা' বস্তুটা একটা চরিত্রগত ব্যাপার। ওটা শহুরে জীবনের পরিবেশ পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার নয়।

অথচ আবার দেখছি, মোহন ছেলেকে একটু কঠিন কথা বলে শাসন করতে গেলে, তার বৌয়ের এমনই প্রাণ ফেটে যায় যে তদ্দণ্ডে ছেলেকে মাথায় তুলে আদর করতে বসে দেখিয়ে দেখিয়ে। মা-বাপের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে, ওরা খানিকটা বেশ মজা

পায়। আবার কখনো ওদের উলুখড়ের দশা ঘটে।

বিরোধ পদে-পদেই! একজনের মতে ওদের খাওয়া নিয়ে জুলুম করা পীড়নেরই নামান্তর, অন্যজনের মতে অহরহ জগতের যাবতীয় পুষ্টিকর খাদ্য তাদের একটি ক্ষুদ্র উদর ভাণ্ডে চালান করে দেবার তালে সর্বদা জুলুম করাই মাতৃ-কর্তব্য!

অন্য দিকেও মোহনের ইচ্ছা তার অধস্তনেরা অফিসেই বিরাজ করুক, 'বসে'র বাড়িতে এসে 'বস'-গিন্নীকে বৌদি ডেকে চাকরগিরি না করুক, অথচ মোহনের বৌয়ের ইচ্ছে তার স্বামীর অধস্তনেরা সবাই এসে তার পায়ে পড়ুক। যেন 'বস'-গিন্নী মরতে বললে মরে, আর বাঁচতে বললে বাঁচে।

মোহনের মতে যা করবে মাত্রা রেখে। বন্যাত্রাণ তহবিলে মোটা চাঁদা দিতে চাও দাও, শ্লোগান দিয়ে পথে নেমে পড়বার অথবা অভিনয় করতে স্টেজে ওঠবার কী দরকার? বৌয়ের মতে সেটাই জরুরী দরকার।

মোহন যদি বলে বৌয়ের রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে আড্ডা দেওয়াটা বাড়াবাড়ি, বৌ পরদিন রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরে তার মহিলা সমিতির কাজের ছুতোয়।

তবু নাকি মোহনের বৌ তার বন্দীজীবনকে ধিক্কার দেয়।

এ শুধু আমার সংসারের কথা নয়, প্রায় সব সংসারেরই কথা। হয়তো কলসী থেকে দৈত্যকে বার করলে এই দশাই ঘটে।

অথবা, দৈত্যটা বেরিয়েই ছাড়তো, এ যুগের হতভাগারা সেটাই লোকচক্ষে আড়াল দেবার জন্যে বশংবদ স্বামীর ভূমিকা অভিনয় করে চলে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত অসহ্য হয়ে ওঠে।

এক যুগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপর যুগ করে, এই বোধ হয় ইতিহাসের নিয়ম। কিন্তু ইতিহাসটা যখন প্রিয়জনের জীবনে আবর্তিত হয়, তখন নির্লিপ্তের ভূমিকায় থাকা শক্ত বৈকি। ভেবেছিলাম ওতে পটু হয়ে গেছি। দেখছি ধারণাটা মজবুত নয়।'

সেজদির চিঠি বকুল কখনো পাওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে না, কিন্তু আজ পড়ছিল, লেটার বক্সের কাছ থেকে একটুখানি সরে এসেই। আজকে ওর মনে হলো হয়তো একটা ভাল খবর বয়ে এনেছে চিঠিটা। হয়তো চিঠি খুলেই দেখবে, 'পোড়ারমুখী মেয়েটা হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে রে বকুল! দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাই চিঠি লিখতে বসলাম।'

এই ধরনের একটু আশা নিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বুলোতে গিয়ে বকুল যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল। এ কী খবর! এ কোন্ ধরনের কথা!

বকুল নিচতলার বসবার ঘরটাতেই বসে পড়লো। চিঠিখানা আর একবার উল্টে নিয়ে গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলো, আবার খানিকটা পড়ে মুড়ে রাখলো।

মনে পড়লো বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল যেদিন পাস হলো, লিখেছিল বটে ওই কথাটা সেজদি। লিখেছিল, 'আমাদের মা বেঁচে থাকতে যদি এ আইনটা চালু হতো রে বকুল! ভদ্রমহিলা হয়তো—,' কিন্তু প্রয়োজন যেখানে তীব্র, আইনের সুবিধে কি সেখান পর্যন্ত পৌঁছয়? ওই 'সুযোগ' বস্তুটা তো অপব্যবহারেই ব্যবহার হয় বেশী। নইলে শোভনের বৌ—

ভাবনায় ছেদ পড়লো, হঠাৎ বাইরে রীতিমত একটা সোরগোল শোনা গেল। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর একসঙ্গে কলবর করে আসছে, হৈ চৈ করছে, কাকে যেন ডাক দিচ্ছে।

পাশের খোলা দরজাটা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো বকুল, একটা খোলা ট্রাক ভর্তি

করে একদল ছেলেমেয়ে এসে এ-বাড়ির সামনেই গাড়িটাকে থামিয়েছে। তাদের সকলের হাতে একখানা করে রঙিন রুমাল, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তারা সেই রুমাল উড়িয়ে পত্‌পত্‌ করে নাড়ছে, আর দুর্বোধ্য একটা শব্দের চিৎকারে কাকে যেন ডাকছে।

বকুল বুঝতে পারলো না ওরা কে।

ওদের সাজসজ্জাই বা এমন অরুচিকর কেন! ছেলেগুলো টাইট ট্রাউজারের ওপর একটা করে বহুবর্ণ রঞ্জিত কলার দেওয়া গেঞ্জি পরেছে, সেটাও আবার এমন টাইট যে ভেবে অবাক লাগছে মাথা গলিয়ে পরে দেহটাকে ওর খাপে খাপে ঢুকিয়েছে কী করে! আর মেয়েগুলো? চোখ বুজতে ইচ্ছে হলো বকুলের। ইঞ্চি কয়েক কাপড়ে তৈরী যে ব্লাউজগুলো পরেছে তারা, তার হাতা আর গলা এতোখানি কাটা যে মনে প্রশ্ন জাগে ওই কয়েক ইঞ্চি কাপড়ই বা খরচ করা কেন? আর শাড়ি কি ওরা পরতে শেখেনি এখনো? তা নইলে অমন অদ্ভুত রকমের শিথিল কেন? কোমরের বাঁধন কোমর থেকে খসে পড়ে বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে ভিতরের সায়াটাকে দৃশ্যমান করে তুলেছে, আঁচলের যে সামান্য কোণটুকু কাঁধে থাকবার কথা সেটুকু কাঁধ থেকে নেমে হাতের উপর পড়ে আছে, চুল রুক্ষ আলুথালু, হাত ন্যাড়া, দু'একজনের কানে এতো বড় বড় দুল ঝুলছে যেটা ওই ন্যাড়া হাতের সঙ্গে বিশ্রী বেমানান।

হাত তুলে রুমাল ওড়ানো আর উল্লাসভঙ্গীর ফলেই বোধ করি বেশবাস এমন অসংবৃত, মনে হচ্ছে ওই স্বল্পাবৃত দেহটা বোধ করি এখনি পুরো অনাবৃত হয়ে পড়বে।

আর চুলগুলো? জীবনে তেল তো দূরস্থান, চিরুনিও পড়েনি যেন।

কে এরা?

এদের ভঙ্গীই বা এমন অশ্লীল কেন? এমনিতে তো দেখে ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েরা এমন কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে? আর ওই চিৎকার! শেয়ালের ডাকের মত একটা বিচিত্র 'হু' ধ্বনি দিয়ে দিয়ে সমস্ত রাস্তাটাকে যেন মুহূর্তে সচকিত করে তুললো ওরা।

হয়তো উদ্দেশ্যটা তাই। ওদের পার্শ্ববলয়ে যারা রয়েছে তাদের সচকিত করে তোলা, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটাই লক্ষণীয় হবার পদ্ধতি ওদের।

এ ধরনের বল্‌গা-ছাড়া উল্লাসধ্বনি একমাত্র খেলার মাঠেই দেখা যায়, এ রকম উল্লাসভঙ্গী বারোয়ারী পুজোর বিসর্জনকালে 'ধুনুচি নৃত্যে'!

কিন্তু এ-বাড়ির দরজায় থেমেছে কেন ওরা? ডাকাডাকি করছে কাকে?

ওদের বেশবাসে, আচরণ-ভঙ্গীতে কোনো রাজনৈতিক পার্টি বলেও মনে হচ্ছে না, নেহাতই একটা অভব্য বেপরোয়া হুল্লোড়ের দল। দল বেঁধে কোথাও চলেছে, এ-বাড়ির কাউকে ডেকে নিতে এসেছে বোধ হয়।

কিন্তু ঐ দলে এ বাড়ি থেকে কে যাবে? তবে কি—

ভাবতে হলো না বেশীক্ষণ, যাকে ডাকাডাকি করছে সে নেমে এলো সাজসজ্জা সমাপ্ত করে। এই ঘর দিয়েই বেরোবে। হাতের ব্যাগ লোফালুফি করতে করতে ঢুকে এলো। আর—

এখানে বকুলকে দেখে ঈষৎ থমকে গিয়ে বলে উঠলো, 'আপনি, এখানে বসে যে?'

অপূর্বর মেয়ে।

বকুল প্রায় বিহ্বল হয়েই তার নাতনীর দিকে তাকিয়ে দেখলো। এই সাজে সেজে এই অসভ্য ছেলেগুলোর সঙ্গে হুল্লোড় করতে যাবে অপূর্বর মেয়ে!

ও মেয়ের অনেক ইতিহাস আছে, অনেক ঘটনা জানা আছে বকুলের। তবু চোখের সামনে ওকে দেখে, আর ওদের সংগীদের দেখে বকুল যেন এখন একটা অশুচি স্পর্শের অনুভূতিতে সিঁটিয়ে গেল।

ব্লাউজের গলার এবং পিঠের কাঠ এতো নামিয়ে ব্লাউজটা গায়ের সঙ্গে আটকে রেখেছে কি করে সত্যভামা? নাভির এতো নীচে শাড়িটাকে পরেছে কি করে? ওই নখগুলো এতো লম্বা লম্বা হলো কী করে? ও কি নিজেই বুঝে ফেলেছে ওর ওই দেহখানা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই, নেই কোনো সম্পদ? তাই ওই দেহটাকেই—

কী অশ্লীল! কী অরুচিকর!

তবু ওর কথার উত্তর দিতে হলো, কারণ ও এ-বাড়ির। ও অপূর্বর মেয়ে!

বকুল বললো, 'ওরা কি তোকেই ডাকতে এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ তো—', কৃত্রিম একটা গলায়, অবাঙালীর মুখের বাংলা উচ্চারণের মত উচ্চারণে বলে ওঠে সত্যভামা, 'পিকনিকে যাচ্ছি আমরা।'

'ওরাই সংগী?'

'তবে?'

'কোথায় পিকনিক?'

'কী জানি!' অপূর্বর মেয়ে তার আধ-ইঞ্চি প্রমাণ 'ফল্‌স্‌ নখ' বসানো হাত দুটো একটি অপূর্ব কায়দায় উল্টে বলে, 'যেখানে মন চাইবে। আচ্ছা টা'টা!'

একটি লীলায়িত ছন্দে কোমর দুলিয়ে ঘরের সামনের সিঁড়ি দুটো ডিঙিয়ে নেমে গেল ও।

সঙ্গে সঙ্গে ওই ট্রাকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড উল্লাসরোল যেন ফেটে পড়লো—'এস্‌সেছে—এস্‌সেছে—'

একটা ছুঁচলো দাড়িওলা ছেলে হঠাৎ রুমালখানা হাত থেকে ছেড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সুর করে গেয়ে উঠলো—'এসে গেছে বিপিন সুধা—বাতের ওষুধ আর খেও না।'

কিন্তু বকুল কেন অপলক তাকিয়ে আছে?

বকুল কি মুখটা ফিরিয়ে নেওয়া যায় এ কথা ভুলে গেছে?

তাই বকুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, টপাস করে ট্রাক থেকে একটা ছেলে লাফিয়ে নেমে পড়ে প্রবোধচন্দ্রের প্রপৌত্রীকে দুহা'তে ধরে উঁচু করে তুলে ধরলো, আর ট্রাকের উপর থেকে গোটা দুই ছেলে ঝুঁকে পড়ে বাগিয়ে তুলে নিলো তাকে।

বিরাট গর্জন করে গাড়িটা ছেড়ে গেল।

সমবেত কণ্ঠে একটা ইংরিজি গানের লাইন শুনতে পাওয়া গেল। বাজল সুর।

সেই সুরটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত শুনতে পেলো বকুল।

কিন্তু সেই সুরে কি একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল বকুল? তাই অনড় হয়ে বসেই রইলো?

বকুলের মা একদা বিধাতার কাছে মাথা কুটে এই হতভাগা দেশের মেয়েদের বন্ধনগ্রস্ত জীবনের মুক্তি চেয়েছিল। চেয়েছিল তার মা-ও, সেই প্রার্থনার বর কি এই রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে?

এই মুক্তিই কি চেয়েছিল তারা?

তাদেরই ঘরের মেয়ের এই স্বচ্ছন্দবিহারের বিকাশ দেখে স্বর্গ থেকে পুলকিত হচ্ছে তারা?

বকুল একটু আগেও ভাবছিল ওরা কে? ওরা কোন্‌ সমাজ থেকে বেরিয়ে

এসেছে?

বকুল এখন তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। ওরা প্রবোধচন্দ্রের সমাজ থেকেই বেরিয়েছে। হয়তো প্রবোধচন্দ্রের দাদা সুবোধচন্দ্রের যে প্রপৌত্রী সাইকেলে ভারত ভ্রমণ করতে বেরিয়েছে, সেও এমনি প্রগতিশীল, সেও হয়তো ধরে নিয়েছে অসভ্যতাটা সভ্যতার চরম সীমা। ধরে নিয়েছে উচ্ছৃংখলতাই মুক্তির রূপ, ধরে নিয়েছে সব কিছু ভাঙাই হচ্ছে প্রগতি।

সুবর্ণলতা। তোমার কান্নায় উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠেই ক্রূর বিধাতা তোমার জন্য একটি কুটিল ব্যঙ্গের উপঢৌকন প্রস্তুত করছিলেন। অথবা একা তোমার জন্যে নয়, তোমার দেশের জন্য!

অনেকক্ষণ পরে বকুল তিনতলায় নিজের ঘরে উঠে গেল, আর তখনই ওর আচ্ছন্নতা কেটে সহজ চিন্তা ফিরে এলো।

এরাই সমাজের সবখানিকটা নয়।

ওই পিকনিক-পার্টিরা!

পারুলের চিঠিখানা আবার খুলে চোখকে মেলে দিলো বকুল তার উপর।

॥ ২৩ ॥

কিন্তু 'শম্পা' নামের সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটা কি সত্যিই হারিয়ে গেল? সমাজ থেকে, পৃথিবী থেকে, আলোর জগৎ থেকে?

হয়তো 'আলোর জগৎ' সেই হিসেবই দেবে, কিন্তু শম্পার হিসেব তো চিরদিনই সৃষ্টিছাড়া, তাই ওর মতে ও একটা উজ্জ্বল আলোর জগতে বাস করছে।

অন্ততঃ এখন ওর মুখে অন্ধকারের চিহ্নমাত্র নেই। যদিও পরিবেশটা দেখলে ওর মা-বাপ বা পরিচিত জগৎ হয়তো মূর্ছাহত হয়ে পড়ে যেতে পারে।

মানিকতলায় একটা মাঠকোঠার নড়বড়ে বাঁশ-বাখারির বারান্দায় বসে আছে ও একটা প্যাকিং কাঠের টুলে, সামনে জীর্ণ একখানা ক্যাম্বিশের চেয়ারে সত্যবান নামের সেই লোকটা। হিসেবমতো বলা যেতে পারে ওর জীবনের শনি অথবা রাহু।

সত্যবান নিজেও নিজেকে সেই আখ্যাই দিয়েছে। সর্বদাই বলেছে, 'আমিই তোমার শনি, রাহু, কেতু। কী কুক্ষণেই যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার!'

এখনো বলছিল সেই কথাই, আরও একজন বারান্দায় উঠে এলো বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে। সত্যবানের চেয়ে কিছু বড়ো বলে মনে হয়। চেহারাটা নিতান্ত হতভাগ্যের মতো, আধময়লা একটা পায়জামা-শার্ট পরা, চুলগুলো তেল অভাবে রুক্ষ।

ছেলেটার হাতে দু'তিনটে ঠোঙা।

সেগুলো নামাতে নামাতে বলে, 'উঃ, এতো দেরি হয়ে গেল! রাস্তায় তো সব সময় মেলার ভিড়!'

শম্পা বলে ওঠে, 'যাক্ বাবা, তুমি এসে গেছো বংশীদা, বাঁচলাম। এই অকৃতজ্ঞ লোকটা না আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছিল প্রায়। আর বেশী দেরি করলে তুমি হয়তো আমাকে আর দেখতেই পেতে না।'

বংশী একটা ঠোঙা খুলে একটা কমলালেবু বার করে ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, 'তা ওরকম দুর্ব্যবহার করার কারণটা কী?'

'সেই পুরনো কারণ। কী কুক্ষণে দেখা হয়েছিল! আগে তবু বলছিলো

ওই আমার জীবনের শনি, এখন উল্টো গাইছে। বলছে, আমিই নাকি ওর জীবনের শনি। আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ইস্তক ওর সুখ গেছে, স্বস্তি গেছে, স্ফূর্তি গেছে. শেষ পর্যন্ত পা দু'খানাও গেল।'

বংশী ছাড়ানো লেবুর কোয়াগুলো লেবুর খোসার আধারে রেখে সত্যবানের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, 'নে, খা।' তারপর একটু হেসে বলে, 'জাম্বোটার কি ধারণা তুই-ই গুণ্ডা লাগিয়ে বোমা ফেলিয়ে ওর পা উড়িয়ে দিয়েছিস?'

'তা নয়, ওর ধারণা আমার গ্রহ-নক্ষত্রই গুণ্ডা হয়ে ওর পিছু পিছু ধাওয়া করে ওকে পেড়ে ফেলেছে।'

'গ্রহ-নক্ষত্তর! সেটা আবার কী বস্তু রে শম্পা?'

'সে একটা ভয়ঙ্কর বস্তু বংশীদা! ইহ-পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সব কিছুই নাকি ওই ওনাদের নির্দেশে। হিমালয় পাহাড় থেকে তৃণখণ্ড পর্যন্ত সবাই ওনাদের অধীনে।'

'তা হলে তো কোনো বালাই-ই নেই।' বংশী বলে, 'এখন এই মশলাপাতি-গুলো নিয়ে যা, রান্নাটা করে ফ্যাল।'

'বংশীদা,' সত্যবান প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'তুমি ওকে ওর বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসবে কি না?'

'আমি দিয়ে আসবো? ও কি নাবালিকা নাকি?'

'তারও অধম। এমন বোকার মত বোলো না বংশীদা। ও যেন আমার মাথায় পর্বতভার হয়ে চেপে বসে আছে।'

'উঃ, দেখছো বংশীদা, একেই বলে অকৃতজ্ঞ পৃথিবী!'

শম্পা ঠোঙাগুলো গুছিয়ে নিয়ে দেখতে দেখতে বলে, 'আবার কেন গাজর নিয়ে এলে বংশীদা? ওই গাঁইয়াটা তো গাজরের ঝোল খেতে চায় না।'

সত্যবান উত্তেজিত ভাবে বলে, 'এভাবে চালিয়ে চললে আমি আর কিছুই খাবো না বংশীদা। এই জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমায় তোমরা নিশ্চিন্তে মরতে দাও।'

'শান্তিতে মরতে দেবো?' শম্পা গুছিয়ে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'দেখছো বংশীদা, কী "তুচ্ছ" জিনিসটিই চাইছেন বাবু! শান্তিতে মরা! ভারী সস্তা, না? বলি তুমি আমায় শান্তিতে মরতে দিলে?'

'আমি তোমায় বলেছিলাম, গোয়েন্দার মত আমার পিছু নিয়ে নিজে অশান্তিতে মরতে আর আমায় অশান্তিতে মারতে?'

বংশী হেসে ওঠে, 'কে কাকে কী বলে জাম্বো? ইহ-পৃথিবীতে কে কাকে দিয়ে বলে-টলে কী করাতে পারে বল? যার ঘাড়ে যা চাপে, যে যার ঘাড়ে চাপে। যে মহীয়সী পেতনীটি তোর ঘাড়ে চেপে বসেছে, সে তোকে মরার পরেও ছাড়বে মনে করেছিস? হয়তো সাতজন্ম তোর পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াবে!'

'বংশীদা আমায় পেতনী বললে?'

'আহা লক্ষ্য করিস তার আগে একটা উচ্চাঙ্গের বিশেষণ জুড়েছি।'

'সেটা আরো বিচ্ছিরি।'

সত্যবান সামনের টুলটার ওপর একটা ঘুষি বসিয়ে বলে ওঠে, 'যার সবটাই বিচ্ছিরি, তার কোনখানটাকে আর ভালো বলবে? এই যে তুমি একটা প্রতিষ্ঠাপন্ন ঘরের মেয়ে, তোমার উচ্চবংশের মুখে চুনকালি লেপে বাবা-মার মাথা হেঁট করে দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আমার মতন একটা হাভাতে লক্ষ্মীছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছো, এর মধ্যে কোনখানটা ভালো শুনি?'

শম্পা ওর কথার মাঝখানে বাধা দেয়নি, শুধু কৌতুকের মুখে তাকিয়ে ছিল, এখন হেসে উঠে বলে, 'দেখছো বংশীদা, আমার হাওয়া লেগে লেগে জাম্বোবাবুর ভাষাজ্ঞানের কতোটা উন্নতি হয়েছে? লক্ষ্য করেছো? 'প্রতিষ্ঠা-পননো', 'উচ্চ বংশ', আরো কী যেন একটা! নাঃ, আমার ক্যাপাসিটি স্বীকার করতেই হবে তোমায় বংশীদা!'

বংশী সস্নেহে হেসে বলে, 'ছোঁড়াকে সর্বদা অতো জ্বালাস কেন বল্ দেখি শম্পু?'

'ওই! ওই!' সত্যবান রেগে রেগে বলে, 'ওর নাম হচ্ছে ওর ভালোবাসা!'

'যাক, এতোদিনে তাহলে আমার স্বরূপ চিনলে?' শম্পা আরো জোরে জোরে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'তাহলে আর বৃথা বিদ্রোহ করতে চেষ্টা কোরো না।'

'শম্পা!' সত্যবান হতাশ গলায় বলে, 'সত্যিই আমি শান্তিতে মরতে চাই।'

'যে যা চায় তা যদি পেতো, তাহলে তো পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যেতো হে মশাই! আমি তো একখানি চতুষ্পদ জীব চেয়েছিলাম, পেয়েও ছিলাম, কপালক্রমে সে-ই দ্বিপদেই দাঁড়ালো! চারখানার দু-খানা গেল। তবেই বোঝো।'

বংশী হেসে বলে, 'তোদের এ ঝগড়া তো সারাজীবনেও মিটবে না, চালা বসে বসে, আমি তোর বাসন মাজবার জলটা তুলে এনে দিই।' বংশী চলে যায়।

সত্যবান চড়া গলায় বলে ওঠে, 'কেন? জলই বা তুলে এনে দেওয়া হবে কেন? বস্তির ওই সব মেয়েদের মত 'টিপকলে' গিয়ে কোঁদল করে করে বাসন মাজাটাই বা হয় না কেন?'

শম্পা অম্লান গলায় বলে, 'ওই কোঁদলটা রপ্ত করবার সময় পাচ্ছি না যে! তোমার সঙ্গে কোঁদল করতে করতেই—'

সত্যবান ওর দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় বলে, 'সত্যি বলছি শম্পা, তোমার এই আত্মত্যাগ—না তা নয়—আত্মহত্যা, আমাকে যেন বেঁধে মারছে।'

শম্পা হঠাৎ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'আচ্ছা! আরও দুটো বাড়লো। "আত্মত্যাগ" "আত্মহত্যা"!...নাঃ, আর কিছুদিনের মধ্যেই তোমাকে একখানি অভিধান করে তুলতে পারবো!...বংশীদা, ও বংশীদা, শুনে যাও।'

সত্যবান আর কথা বলে না।

টুলটার ওপরই হাত জড়ো করে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে।

শম্পা একটুক্ষণ তাকিয়ে দেখে।

লোকটাকে যেন একটা ধ্বংসস্তূপের মত দেখতে লাগছে। শম্পা কি ব্যর্থ হবে? তাই কখনো হতে পারে? ওকে বাঁচাতেই হবে। তা ভিন্ন শম্পার বাঁচবার উপায় কি?

ওর আবেগকে প্রশমিত হতে দেবার জন্যে সময় দিতে শম্পা চুপচাপ তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। আর হঠাৎ একটা চিন্তায় যেন আশ্চর্য একটি কৌতুকের স্বাদ পায়। মাঠকোঠার বাখারি-ঘেরা বারান্দায় বসেও আকাশের রং তো সমানই নীল লাগছে।

ভাবতে গিয়েই পিসির ঘরের সামনের সেই ছাদের বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে পড়লো শম্পা। যেটাতে অনেকদিন দাঁড়ায়নি, যেটাকে সহজে কাছে আসতে দেয় না শম্পা, আসতে চাইলেই প্রায় হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

ছাদের বারান্দার সামনের আকাশটাও একই রকম নীল। ওই হালকা নীলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শম্পা একটি প্রিয় পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনতে পায়, 'শম্পা! তুই! এতোদিন কোথায় ছিলি রে? আমরা তোকে খুঁজে খুঁজে—'

শম্পা ওই কণ্ঠের অধিকারিণীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমি যে হারিয়ে গিয়েছিলাম পিসি!'

তারপর পিসি তার সুন্দর ছিমছাম ঘরটায় টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে বলে, 'বল্ তোর হারিয়ে যাওয়ার গল্প! হারিয়ে গিয়ে কোথায় গিয়ে পড়েছিলি?'

শম্পা দুই হাত উল্টে বলে, 'হনলুলুও নয়, কামস্কাটকাও নয়, স্রেফ নিজের মধ্যেই হারিয়ে মরেছি, হারিয়ে বসে আছি। এ থেকে আর খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে না আমায়।'

পিসি আস্তে বলে, 'কিন্তু তোর মা? বাবা?'

শম্পা মাথা নীচু করে বলে, 'পিসি, তোমরা তো সাবিত্রীর কাহিনী বলো. বেহুলার কাহিনী বলো, ওদের মা-বাবার কথা তো বলো না!'

'তবু তোকে এমন পাষাণ ভাবতে ইচ্ছে হয় না রে শম্পা।'

শম্পা আস্তে বলে, 'পিসি, আমি তাঁদের কাছে এসে দাঁড়াবো, মাথা নীচু করে আশীর্বাদ চাইবো। বলবো, বাবা, স্বামীর সঙ্গে শত দুঃখবরণ এ তো এ দেশেরই গল্প! সাবিত্রী দময়ন্তী শৈব্যা সীতা চিন্তা দ্রৌপদী এঁদের গল্প তো তুমিই শুনিয়েছো ছেলেবেলায়, কিনে দিয়েছো এঁদেরই বই। আমার শুধু চেহারাটা আধুনিক, আমার শুধু কথাবার্তা এ যুগের, আমার শুধু গতিভঙ্গী বর্তমানের। আর কি তফাত আছে বল?'

পিসি আস্তে জিজ্ঞেস করলো, 'বিয়েটা কি হয়ে গেছে শম্পা?'

শম্পা মুখ তুলে হেসে বলে, 'অনুষ্ঠান-ফনুষ্ঠান যে কিছু হয়নি সে তো বুঝতেই পারছো পিসি, তবে এই একটা আইনের লেখালেখি। ওটা না করে উপায় কী বলো? শুধু ওই তোমার গিয়ে 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' জিনিসটার দাবি তো ইহসংসারে টেঁকে না। ওই লেখালেখির কাগজটুকু সঙ্গে না থাকলে তিষ্ঠোতে দেবে নাকি সংসার? একখানা মাঠকোঠার ঘরের সুখের ওপরও পুলিস লেলিয়ে দেবে। তাই হাসপাতালেই ওই কর্মটি সেরে নিয়ে 'আপন অধিকারবলে' ওকে 'হাস-পাতাল থেকে বার করে এনে সুখে-স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ততায় আছি। তবে ওই যা বলেছিলে তুমি প্রথম নম্বরে—'হতভাগা'। হতভাগাই বটে! এখনো বলে কিনা, 'ওর কোনো মানে নেই। একটা আস্ত মানুষের সঙ্গে একটা আধখানা মানুষের'—ও, তুমি তো আবার সব কথা জানোও না, ওর বন্ধুর দলের কোনো এক পরম বন্ধু যে বোমা মেরে ওর পা দুখানা উড়িয়ে দিয়েছে—বাকি জীবনটা চাকাগাড়ি চড়ে বেড়াতে হবে হতভাগাকে—তা সেই কথাই বলে, 'একট আস্ত মানুষের সঙ্গে একটা আধখানা মানুষের বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়।...তাছাড়া আমি তখন প্রায় জ্ঞানশূন্য রোগী, অতএব তুমি আমায় ছেড়ে কেটে পড়ো।'...শম্পা পিসির গায়ে মাথা রেখে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলে, 'মুখ্যুটা বলে কিনা "তোমার উপস্থিতি আমার অসহ্য!"...বাংলাটা খুব ভালো শিখে ফেলেছে, বুঝলে?...বলে, "আমায় শান্তিতে মরতে দাও।" বোঝো! আমি হেন একখানা ভগবতীকে হাতের মুঠোয় পেয়েও নেয় না, বলে "বিদেয় হও! শান্তিতে মরতে দাও!" বুঝছো তো? শুধু হতভাগা নয়, হাড়-লক্ষ্মীছাড়া।

তারপর পিসি আরো কথা বলে।

বলে, 'সেজপিসিকেও তো একটা খবর দিতে পারতিস!'

শম্পা অপরাধী-অপরাধী গলায় বলে, 'সত্যি খুব উচিত ছিলো। কী বলবো পিসি, মাথায় আর মাথা ছিল না। বোমা তো ওর পায়ে পড়েনি, পড়েছিল আমার মাথায়! জ্ঞানগম্যি ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কেবল ওকে কী করে বাঁচিয়ে তুলবো

সেই চিন্তায়—ভাগ্যিস বংশীদাকে পেয়েছিলাম, তাই সেটা সম্ভব হলো।'

পিসি বললো, 'বংশীদা কে?'

শম্পা গভীর চোখে তাকালো পিসির দিকে, আস্তে বললো, 'বংশীদা কে বলে বোঝানো যাবে না পিসি, কিছুই বলা হবে না। দেখে বুঝবে। তুমি তো এক নজরেই বুঝবে।...হ্যাঁ, ওকে তো আনতেই হবে। তোমাদের কাছে যেদিন আশীর্বাদ নিতে আসবো, একা কি পারবো? বংশীদা ওকে বলে, "তোর বন্ধুরা তোর পা দুটো উড়িয়ে না দিয়ে যদি মাথাটা উড়িয়ে দিতো, এর থেকে ভালো হতো। মাথাটায় তো গোবর ছাড়া কিছু নেই, ওটা থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি।" বোঝো কী মজার লোক!'

হি হি করে হেসে ওঠে শম্পা।...

সত্যবান চমকে মাথা তুলে তাকায়, বলে, 'কী হলো? শুধু শুধু হঠাৎ হেসে উঠলে যে?'

শম্পা শিথিল ভঙ্গী ত্যাগ করে সোজা হয়ে বসে বলে, 'পাগল-ছাগলরা তো তাই করে। কেউ শুধু শুধু হাসে, কেউ শুধু শুধু কাঁদে!'

সত্যবান সেই একফালি আকাশের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'শুধু শুধু কেউ কাঁদছে না।'

শম্পা ওর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বংশীদা ভুল বলে। বলে, পাটার বদলে মাথাটা গেলে কম লোকসান হতো, গোবর ছাড়া তো কিছু নেই। দেখছি গোবর শুকিয়ে দিব্যি ঘুঁটে হয়ে উঠেছে! কথা ফেললেই কথা বুঝে ফেলতে পারছো। তবে আমি তো "শুধু শুধু" ছাড়া কারণ কিছু দেখছি না।'

সত্যবান হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা তুমি কি সহজ করে কথা বলতে জানোই না? না—বলবে না প্রতিজ্ঞা?'

শম্পা মৃদু হেসে বলে, 'জানো পিসিও ঠিক এই কথাই বলতো! আমি উত্তর দিতাম, "যদি খুব সহজ আর সাধারণ কথাই বলতাম শুধু, ভাল লাগতো তোমার?" সেই উত্তরটাই তোমাকেও দিচ্ছি। না না, উত্তর তো নয়, প্রশ্ন। দাও এখন প্রশ্নটার উত্তর!'

সত্যবান আস্তে মাথা নাড়ে।

'দিতে পারবো না।'

'পারলে না তো? পিসি পারতো। বলতো, দূর, পাগল হয়েছিস!'

॥ ২৪ ॥

একখানা অনামী পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে দেখছিলেন অনামিকা দেবী। এ পত্রিকাটি কোনোদিন অনামিকা দেবীর দৃষ্টিগোচরে আসেনি, নামও শোনেন নি কখনো, এবং পত্রিকার চেহারা দেখে অন্ততঃ ওই না-দেখা বা না-শোনার জন্য লোক-শান-বোধ আসছে না।

তবু মন দিয়েই দেখছিলেন।

কারণ এখানি অনামিকা দেবীর একজন হিতৈষী বন্ধু নিজের খরচায় কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ এমন একটা আজেবাজে পত্রিকা যত্ন করে পাঠিয়ে দেবার হেতু প্রথমটা

বুঝতে পারেননি অনামিকা দেবী। যে অধ্যাপক বন্ধুটি পাঠিয়েছেন তাঁর যে 'সাহিত্য রোগ' আছে এমন সন্দেহ করবার কোন কারণ কোনোদিন ঘটেনি, কাজেই একথা ভাবলেন না—'বোধ হয় ওনার কোনো লেখা ছাপা হয়েছে—'

তবে?

যে ছেলেটিকে দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, অনামিকা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিছু বলে দিয়েছেন নাকি? কিংবা কোনো চিঠিপত্র?'

সে সবিনয়ে জানালো,'না।' তারপর আভূমি প্রণাম করে বিদায় নিলো।

বইটা খুলে দেখতে পেলেন অনামিকা দেবী, বন্ধুর যা বলবার বইয়ের ভিতরেই লিখে দিয়েছেন। সূচীপত্রের পৃষ্ঠার মাথায় লাল পেন্সিলে লেখা রয়েছে —"২৩ পৃঃ দ্বিতীয় কলমটা লক্ষ্য করবেন। কী স্পর্ধা দেখুন!"

অনামিকা একটু হেসে পাতা ওল্টালেন।

অনামিকা দেবীর অনেক ভক্ত পাঠক আছে, অনেক হিতৈষী বন্ধুও আছেন। ওঁরা এ ধরনের কাজ মাঝে মধ্যে করে থাকেন। অনামিকার লেখা সম্পর্কে কোথাও কোনো সমালোচনা দেখলেই তাঁরা হয় টেলিফোনযোগে জানিয়ে দেন, নয় সেই কাগজখানাই পাঠিয়ে দেন। যদি উক্ত সমালোচনা অনামিকার চোখ এড়িয়ে যায় বা তেমন খেয়াল না করেন, তাই তাঁদের এই ব্যাকুল প্রচেষ্টা।

অবশ্য সব সমালোচনাই যে তাঁদের ব্যাকুল করে তা নয়। সমালোচনার মধ্যে অনামিকা-সাহিত্যকে ভূপাতিত করবার চেষ্টা অথবা নস্যাৎ করবার চেষ্টা দেখলেই তাঁদের বন্ধু-হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বাংলার বাইরে অবস্থিত বন্ধুরাও অনেক সময় ডাকবায় খরচা করে করে এই মহৎ বন্ধুকৃত্য করে থাকেন। মহৎ ইচ্ছাই সন্দেহ নেই। অনামিকাকে কে কি বলছে, তাঁর রচনা সম্পর্কে কার কী ধারণা, এটা অনামিকার জানা দরকার বৈকি। নইলে ভুল সংশোধনের চেষ্টা আসবে কী করে?

অনামিকার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য ('বন্ধুকৃত্য' সম্পর্কে) আলাদা, তাঁর কোনো বন্ধু সম্পর্কে বিরূপ কোনো সমালোচনা দেখলে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, আহা ওর চোখে যেন না পড়ে। সভাসমক্ষে সে প্রসঙ্গ উঠলে স্রেফ মিথ্যা-চারের আশ্রয় নিয়ে বলেন, 'কই, দেখিনি তো! পড়িনি তো! পত্রিকাগুলো জানেন, বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই বাড়ির বাইরে বেড়াতে চলে যায়।'

যাক্, সকলের দৃষ্টিভঙ্গী তো সমান নয়।

পত্রিকার নাম 'ভস্মলোচন'।

নামটার মৌলিকত্ব আছে।

অনামিকা বেদী দেখলেন, জনৈক ছদ্মনামী সমালোচক রীতিমত উষ্ণ হয়ে লিখছেন—'যারা ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে বাংলা-সাহিত্যের হাটের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, পত্রিকা-সম্পাদকদেরই উচিত তাঁদের বয়কট করা। তাঁদের এই লোভ ও নির্লজ্জতার প্রশয়দাতা পত্রিকা-সম্পাদকদের কাছে আমার নিবেদন, তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নামের মোহ ত্যাগ করে তাঁরা সাহিত্যের হাটে নতন মুখ ডেকে আনুন। প্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে ওই নামী লেখকরা যে কী রাবিশ পরিবেশন করছেন তা সম্পাদকদের অনুধাবন করে দেখতে অনুরোধ করি।

এই যে বর্তমান সংখ্যা 'বেণুমর্মরে' শ্রীমতী অনামিকা দেবীর একটি ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে, কী এটি? এর কোন মাথামুণ্ডু আছে? কোনো যুক্তি আছে? নায়ক কেন অমন অদ্ভুত আচরণ করে বসলো—তার কোনো ব্যাখ্যা আছে? যা খুশি চালাবার অধিকার লাভ করলেই কি সেই অধিকারের অপব্যবহার করতে

হয়? আগে শ্রীমতী অনামিকার লেখায় সে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, যে মননশীলতা দেখা যেতো, আজ আর তার চিহ্ন চোখে পড়ে না।

আসল কথা—তেল ফুরোবার আগেই আলো নিভিয়ে দেবার শিক্ষা এঁরা লাভ করেননি। অনামিকা দেবী প্রমুখ বর্তমানের কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত লেখকের নাম করে ভদ্রলোক বলেছেন, 'এক সময়কার পাঠক এঁদেরকে নিয়েছিল, তখন এঁরা যথেষ্ট যশ-খ্যাতি এবং অর্থ অর্জন করেছিলেন, আজ এদের যশ নির্বাপিত, খ্যাতি বিলুপ্ত, তবু ওই শেষ বস্তুটির লোভেই ওঁদেরকে ঘাঁটি আগলে পড়ে না থেকে আসর ছেড়ে বিদায় নেবার সভ্যতা শেখাচ্ছেন না। ওঁদের জন্যেই তরুণদের কাছে সুযোগের দরজা বন্ধ, দরজার মুখে ওঁদেরই ভিড়।'

ভাষাটি জ্বালাময়ী সন্দেহ নেই। আর তাজা রক্ত সন্দেহ নেই।

অনামিকা দেবী একটু হেসে কাগজখানা সরিয়ে রেখে ওই ছদ্মনামী সমালোচকের উদ্দেশে মনে মনে বললেন, 'ওহে বাপু, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে সাহিত্যের হাটে এসে পড়া এইসব লেখকগোষ্ঠী যখন হাটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, পূর্বতন প্রতিষ্ঠিতেরা কি বিবেকতাড়িত হয়ে অথবা সভ্যতাতাড়িত হয়ে এদের জন্যে আসন ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন? বলেছিলেন কি—এসো বৎস, এই নাও আমার ছত্রমুকুট, এখন থেকে তোমাদের দিন!'

আস্তে আস্তে হাসিটা মিলিয়ে গেল।

ভাবলেন, কিন্তু অভিযোগটার মূলে কি ভিত্তি নেই? সত্যিই কি প্রথম জীবনের মতো সময় দিতে পারছেন তিনি? সময়ের কল্যাণেই না লেখার মননশীলতা, নিখুঁত নিপুণতা, সূক্ষ্মতা, চারুতা? ছুটতে ছুটতে কি শিল্পকর্ম নিটোল হয়ে উঠতে পারে?

নিজের ইদানীংকালের লেখায় নিজেই তো লক্ষ্য করেছেন অনামিকা, বড় বেশী দ্রুত ভঙ্গীর ছাপ। লেখাটা হাতছাড়া করে দিয়ে মনে হয়, হয়তো আর একটু মাজা-ঘষার দরকার ছিল।

কিন্তু সেই দরকারের সময় দিচ্ছে কে?

অজস্র পত্রপত্রিকায় ভরা এই আসরে প্রায় প্রতিদিনই জন্ম নিচ্ছে আরো পত্রিকা। এ যুগের তরুণদের প্রধান 'হবি' পত্রিকা প্রকাশ।...যেনতেন ক'রে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। আর আশ্চর্য, সকলেরই দৃষ্টি ওই তৈল ফুরিয়ে যাওয়া হতভাগ্য প্রতিষ্ঠিতদের দিকেই। প্রত্যাশা পূরণ না হলে তারা ব্যথিত হয়, ক্ষুব্ধ হয়, ক্রুদ্ধ হয়, অপমানিত হয়।

অতএব 'যাহোক কিছু দাও।'

এই যাহোকের দাবী মেটাতে মেটাতে কলমও চালাক হয়ে উঠতে চায়। যাহোক দিয়েই সারতে চায়। চাওয়াটা অসংগত নয়, সকলেরই একটা ক্লান্তি আছে।

তাছাড়া—

কলমটা টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে ভাবতে থাকেন অনামিকা দেবী, এ যুগে আমরা কী বিরাট একটা ঝড়ের সঙ্গে ছুটছি না? আমাদের কর্মে মর্মে জীবনে, জীবনযাত্রায়, আমাদের বিশ্বাসে, মূল্যবোধে, রাষ্ট্রচেতনায়, সমাজব্যবস্থায়, শিক্ষায়, সংস্কারে অহরহ লাগছে না ঝড়ের ধাক্কা? প্রতিমুহূর্তে আমরা আশান্বিত হচ্ছি আর আশাহত হচ্ছি। সোনার মূল্য দিয়ে সোনা কিনে হাতে তুলে দেখছি রাং। অভিভূত দৃষ্টি মেলে দেবতার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ছে দেবতার পা কাদায় পোঁতা।

এই চোখ-ধাঁধানো ঝড়ের ধুলোর মাঝখানে উৎক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত মন নিয়ে ছুটতে

ছুটতে কোথায় বসে রচিত হবে আগের আদর্শের মননশীলতা?

এ যুগের পাঠকমনও তো দ্রুতগামী।

তবু নিজের সপক্ষের যুক্তিতে আমল দিতে চাইলেন না অনামিকা। বেদনার সঙ্গেই স্বীকার করলেন আগের মতো লেখার মধ্যে সেই ভালবাসার মনটি দিতে পারছেন না। যে ভালবাসার মনটি অনেক বাধা, অনেক প্রতিবন্ধকতা, অনেক দুঃখ পার করে করে বহন করে নিয়ে চলতো তার আত্মপ্রকাশের সাধনাকে।

তবে কি সত্যিই কলম বন্ধের সময় এসেছে? বিধাতার অমোঘ নির্দেশ—আসছে ছদ্মনামীর ছদ্মবেশে। ছেলেবেলায় ছেলেখেলার বশে কলমটা হাতে নিলেও, কোথাও কোনোখানে বুঝি একটা অঙ্গীকার পালনের দায় ছিল, ছিল কোনো একটা বক্তব্য, সে অঙ্গীকার কি পালন করতে পেরেছেন অনামিকা? পাঠক-হৃদয়ে পেশ করতে পেরেছেন সেই বক্তব্য?

নাকি সেগুলো পড়ে আছে ভাঁড়ার ঘরের তালাবন্ধ ভারী সিন্দুকের ভিতর, অনামিকা শুধু আপাতের পসরা সাজিয়ে জনপ্রিয়তার হাটে বেচাকেনার ঝুলি নিঃশেষিত করছেন?

কিন্তু বক্তব্য কি শুধু পুঁজিতেই থাকে?

দিনে দিনে জমে ওঠে না সে?

আপাতের পসরায় সাজানো হয় না তাকে?

যখন শম্পা ছিল, মাঝেমাঝেই বলতো, 'তুমি ওই সব পিতামহী প্রপিতামহীদের গল্প রেখে দিয়ে আমাদের নিয়ে গল্প লেখো দিকিন? স্রেফ এই আমাদের নিয়ে। আমরা যারা একেবারে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে চরে বেড়াচ্ছি। নিজের চিন্তাভাবনা নিয়ে যাকে বলে তোমার গিয়ে "উদ্বেলিত" হচ্ছি, নিজেদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর উৎকট জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ছটফটাচ্ছি।'

অনামিকা তখন হেসে বলেছিলেন, 'ও বাবা, তোদের আমি চিনি?'

শম্পা পা দোলাতে দোলাতে বলেছিল, 'চিনতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না।'

শম্পার কথাটা মনে পড়তেই একটা কথা মনে পড়ল।

কতদিন যেন চলে গেছে শম্পা।

অনামিকা বলবার সুযোগ পেলেন না, 'তবে এ যুগের পরম প্রতীক তোকে নিয়েই হাত পাকাই আয়।'

সেদিন একটা আলোচনা-সভায় আধুনিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে বসে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই একটি উদ্ধত তরুণ সভানেত্রীকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, 'এখনকার যুগকে নিয়ে আপনি লিখতে চেষ্টা করবেন না মাসীমা। ওটা আপনার এলাকা নয়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে বারুদের বস্তা, বুঝলেন? তারা অসভ্য উদ্ধত বেয়াড়া, কিন্তু ভেজাল নয়। তারা সৎ এবং খাঁটি।'

অনামিকা ভেবেছিলেন, এইখান থেকেই কি আমি এ যুগকে চেনা শুরু করবো? না কি ওই অসভ্যতা অভব্যতা ঔদ্ধত্য বেয়াড়ামিটাও একটা চোখ-ধাঁধানো মেকী জিনিস? যাতে ওদের নিজেদেরও চোখ ধেঁধে আছে?

ছেলেরা আরো বললো, 'আপনি জানেন আমরা এ যুগের ছেলেরা কোন্ ভাষায় কথা বলি? আপনাদের ওই রঙিন পাখির সোনালী পালক-গোঁজা সুসভ্য ভাষা নয়। স্রেফ্ পোশাক পালিশ ছাড়া নগ্ন ভাষা, বুঝলেন? ধারণা আছে আপনার এ সম্বন্ধে? গিয়ে বসেছেন কোনো দিন আমাদের মধ্যে?'

সভানেত্রী হেসে বলেছিলেন, 'লেখকদের আর একটা চোখ থাকে জানো তো? কাজেই তোমাদের আড্ডায় গিয়ে না বসলেও, ধারণা হয়তো আছে। কিন্তু ওই তোমাদের পোশাক ছাড়াটাড়াগুলো নিজের হাতে লেখবার ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না।'।

'তবে?' ছেলেটা বিজয়গর্বে বলেছিল, 'সেইজন্যেই বলছি—ওটা আপনার এলাকা নয়। না বুঝে বারুদে হাত দিতে যাবেন না।'

এরাই ডেকে নিয়ে গেছে সভানেত্রীকে, ফুলের মালাটালাও দিয়েছে। অতএব হাসতেই হয়। হাসতে হয় 'অমৃতং বালভাষিতং' নীতিতে।

তবু প্রশ্ন উঠছে মনে।

এরাই কি সব?

এদের নিয়েই কি যুগের বিচার?

শম্পাটার ওপর মাঝে মাঝেই ভারী রাগ হয়। সেদিনও হয়েছিল। শম্পাটা থাকলে ডেকে বলতে পারতেন, 'ওহে, বারুদের বস্তার তুমিও তো একটি নমুনা? এখন বল দেখি এ বারুদ তোমরা আত্মরক্ষার কাজে লাগাবে, না আত্মধ্বংসের কাজে?'

কি যে করছে কোথায় বসে, কে জানে!

ভাবতে ভাবতে আবার নিজের দিকে ফিরে তাকালেন।

নাঃ, সত্যিই হয়তো এবার কলমকে ছুটি দেবার সময় এসেছে, সত্যিই হয়তো ফুরিয়ে এসেছেন তিনি।

ভাবলেন, নাহলে লিখে আর সেই আনন্দবোধ নেই কেন? কেন মনে হয় রাজমিস্ত্রীর ইঁটের পর ইঁট সাজানোর মতো, এ কেবল শব্দের পর শব্দ গেঁথে চলেছি?

ঘরের পূর্ব দেয়ালে একটা বুককেসে অনামিকার বইয়ের এক 'কপি' করে রাখা আছে। আছে শম্পারই প্রচেষ্টায়। অবিশ্যি প্রথম দিকের বইগুলো সব নেই। দেখে রেগে গিয়েছিল শম্পা, 'এ কী অবহেলা? একটা করে 'কপি'ও রাখবে তো?'

অনামিকা হেসে বলেছিলেন, 'তুই যে তখন জন্মাসনি, বুদ্ধি দেবার কেউ ছিল না তো।'

তবু ওর চেষ্টাতেই অনেকগুলো রয়েছে।

সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন অনামিকা, এও ওজন হিসেবে কম নয়। কিন্তু অনামিকার হঠাৎ মনে হল, সবই বৃথা কথার মালা গাঁথা! যে অঙ্গীকার ছিল, তা পালন করা হয়নি। করবার ক্ষমতা হয়নি। যে কথা বলবার ছিল তা বলা হয়নি।

আবার একটু হাসি পেলো।

যা পেরেছি, আর যা পারিনি, কিছুই তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। এ যুগ দ্রুত-গতির যুগ, তাই মুহূর্তে সব সাফ করে ফেলে। পরক্ষণেই ভুলে যায়।

অধ্যাপক সাহিত্যিক অমলেন্দু ঘটকের কথা মনে পড়লো।

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন, ক'দিনেরই বা কথা সেটা? মৃত্যুর সদ্য আঘাতের মুখে মনে হয়েছিল, দেশ কোনোদিনই বুঝি এ ক্ষতি সামলাতে পারবে না। ভেঙে পড়েছিল দেশ, ভেঙে পড়েছিল দেশের মানুষ।

কতো ফুল, কতো মালা, কতো শোকসভা! কতো শোক প্রস্তাব! আশ্চর্য, এই বছরখানেকের মধ্যেই যেন দেশ অমলেন্দু ঘটকের নামটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে।

আর স্মৃতিরক্ষা কমিটি? সে যেন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অথচ নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে কী গভীর মূল্যবোধ ছিল অমলেন্দু ঘটকের।

অমরত্বের স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে।

অমলেন্দু ঘটককেই যদি লোকে মাত্র তিনশো পঁয়ষট্টিটা দিনের মধ্যেই ভুলে যেতে পারলো, অনামিকাকে দুটো দিন মনে রাখবারই বা দায় কার?

একটি সহকর্মীর বিয়োগ একটি বড় শিক্ষা। নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে। অভিযোগের কিছু নেই, ধূলির প্রাপ্য খাজনা তো ধূলিকেই দিতে হয়।

সব কথার মাঝখানে কেমন করে যেন শম্পার কথা মনে এসে যায়, সব চিন্তার মধ্যে শম্পার মুখ।

ইচ্ছে হল খুব চেঁচিয়ে, শম্পা যেখানে আছে যেন তার কানে যায়, অমনি জোরে চেঁচিয়ে বলেন, শম্পা, আমি তোদের যুগকে আর কিছু জানি না জানি, জেনে ফেলেছি তোদের এই যুগ বড় নিষ্ঠুর। এই পরিচয়টাই বোধ হয় তার সব থেকে স্পষ্ট পরিচয়।

ইচ্ছে হচ্ছে চুপ করে একটু বসে থাকতে, কিন্তু সময় কই? ওই 'ভস্মলোচন'-টাই উল্টে দেখে নিতে থাকেন খানিক খানিক।

॥ ২৫ ॥

বকুলের প্রকৃতিতে পারুলের মত নিজের মধ্যে ডুবে, গভীরে তলিয়ে যাওয়ার সুখ নেই। বকুলের সে সময়ও নেই। বকুল বর্তমানের স্রোতের ধাক্কায় ছুটেই মলো জীবনভোর!

পারুলের কথা আলাদা।

পারুল চিরদিনই আত্মমগ্ন। এখন তো আরো বেশী হয়েছে। পারুলের চোখের সামনে গঙ্গার অফুরন্ত তরঙ্গ। পারুলের জীবনটা নিস্তরঙ্গ। সেই নিস্তরঙ্গ জীবনের মাঝখানে আচমকা একটা বড় ঢিল পড়ার মত তরঙ্গ তুলেছিল শম্পা নামের মেয়েটা, পারুলেরও যে এখনো কারো জন্যে কিছু করবার আছে, পারুল এখনো কারো প্রয়োজনে লাগতে পারে এ স্বাদ এনে দিয়েছিল, কিন্তু সেও তো মিলিয়ে গেল ক্ষণিক বুদ্বুদের মত।

'আমাকে আর কারো কোনো দরকার নেই।' এই এক শ্মশানের শান্তি নিয়ে আবার থিতিয়ে বসেছিল পারুল, আবার এক তরঙ্গ এল তার জীবনে।

পারুলের ছেলে তার ছেলেকে রেখে গেল মায়ের কাছে। তার সমারোহময় জীবনে মার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল, রসুনচৌকি থেমে যাওয়া বিধ্বস্ত জীবনে আবার এল সেই প্রয়োজন!

পারুল বলেছিল, 'ও কি একা এই বুড়ীর কাছে থাকতে পারবে?'

ছেলে বলেছিল, 'পারা অভ্যাস করতে হবে। তা নইলেই তো বোর্ডিঙের জীবন? সেটা আমি চাইছি না—'

হ্যাঁ, পারুলের ছেলে এখন আর চাইছে না ছেলেকে কনভেণ্টে রেখে 'সভ্য ভাবে' মানুষ করতে। অথচ কিছুদিন আগেও সে চাহিদা ছিল তার। আর একটু বড় হলেই কোথাও পাঠিয়ে দেবার বাসনা এবং চেষ্টা ছিল। হঠাৎ মন ঘুরে গেছে তার, সে 'প্রাচীন কালে'র আদর্শে আর সনাতনী পদ্ধতিতে ছেলেকে মানুষ করতে চায়। অতএব মার কাছেই শ্রেয়। প্রথম দিন এর জন্যে ছেলেকে বকেছিল পারুল, বলেছিল, 'ছেলে-মেয়ে কি তোদের হাতের বল? যে নিজেদের যখন যেমন মতিগতি হবে, তখন ওদের "গতি"ও তাই হবে? এই কদিন আগেও তুই

ওকে বলেছিলি, "তুই সাহেব হ!" আজ বলছিস, "তুই সনাতনী হ!" ছেলে-মানুষ এ ধাক্কা সামলাতে পারবে কেন?'

ছেলে বলেছিল, 'জীবনে আরও অনেক বড় ধাক্কা আসতে পারে মা, এটা ধর সেটা সইবার ক্ষমতা-অর্জনের প্রস্তুতি।'

'তা আমার কাছে যে দিচ্ছিস, আমাকে কি তোর খুব সনাতনী মনে হয়? আমি তো একটা সর্বসংস্কারবর্জিত কালাপাহাড়!'

ছেলে মার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেছিল, 'তবু তো খাঁটি! নির্ভেজাল কালাপাহাড়! ভেজাল দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি মা!'

'তবে দিয়ে যা ছেলেকে। তবে গ্যারাণ্টি দিতে পারব না বাপু, তোমার ছেলেকে তোমার মনের মত গড়ে তুলতে পারব কিনা। তুই আমাকে যা ভাবছিস, আমি সত্যি তাই কিনা, তাতে আমার নিজেরই ঘোরতর সন্দেহ আছে।'

'তোমার থাকে থাক, আমার নেই।' বলে চলে গিয়েছিল ছেলে।

পারুলের বড় একটা যা হয় না তাই হয়েছিল। পারুলের চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমায় কেউ বুঝতে পারল, আমায় সেই বোঝার মধ্য দিয়ে সে বিশ্বাস করল, এর থেকে আহ্লাদের কি আছে? আর সে স্বীকৃতি যদি আপন সন্তানের কাছ থেকে আসে, তার থেকে মূল্যবান বুঝি কিছু নেই।

তা স্বয়ং ভগবানই নাকি ওই স্বীকৃতির কাঙাল, তিনিও তাঁর গঠিত সন্তানদের কাছে ভিক্ষাপাত্র পেতে ধরে বলেছেন, 'তুই আমায় বোঝ্, আমায় জান্। আমি কী তা একবার উপলব্ধি কর্।' তবে? মানুষ কোন্ ছার!

কিন্তু ছেলের এই ছেলেটাকে নিয়ে মুশকিলেই আছে পারুল। এত গম্ভীর হয়ে গেছে সে, যেন পাথর কী কাঠ! ওর কোনখানটা দিয়ে যে একটু ঢুকে পড়ে মনটা ছুঁতে পারবে, বুঝতে পারে না।

গল্প বলে, ছড়া শেখোবার চেষ্টা করে নিজেদের ছেলেবেলার কাহিনী শুনিয়ে, ওরই বাবার ছোটবেলার দুষ্টুমির আর বায়না আবদারের বিশদ বর্ণনা করে ওই গাম্ভীর্যের পাষাণপ্রাচীরে এতোটুকু ফাটল ধরাতে পারছে না পারুল।

একেবারে যে হাসে না তা নয়, হাসির গল্প শুনে একটু হাসে। সদ্য শোক-গ্রস্ত মলিনচিত্ত মানুষ শিশুর হাসিখেলা দেখলে যেমন একটু প্রাণহীন হাসি হাসে, তেমন হাসি। যেন পারুল যে ওর জন্যে এতটা চেষ্টা করছে, সেটা বুঝে একবিন্দু কৃতজ্ঞতার কুণ্ঠিত হাসি।

পারুল বলে, 'তুই একটা বুড়ো। পুরো বুড়ো! তোর যত ভাল আর শৌখিন নামই থাকুক, আমি তোকে "বুড়ো" বলে ডাকবো, এই আমার সংকল্প।'

'বুড়ো' একটু বুড়োটে হাসি হেসে বলে, 'তা ডাক না। ভালই তো।'

পারুল রাগ দেখিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তুই এমন নিক্তিমাপা হাসি হাসতে শিখলি কোথা থেকে বল্ তো? আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের জোরে জোরে হাসিটা ছিল মহা দোষের, হেসে উঠলেই ধমক। তবু আমরা হেসে উঠতাম। আর তুই বাবা কেমন মেপে মেপে হাসি অভ্যেস করেছিস!'

বুড়ো তার উত্তরে আরো শীর্ণ হাসি হেসে বলে, 'আমি তো খুব হাসি।'

এর মধ্যে কোন্ ফাটল দিয়ে ঢুকবে পারুল?

আশ্চর্য সংযম ওইটুকু ছেলের!

এমন সাবধানে কথা বলে, যেন ওর 'অতীত' বলে কিছু নেই, কিছু ছিল না। ও যেন কেবলমাত্রই এই চন্দননগরের পারুলের 'বুড়ো'।

মা বাপ বোন, কি নিজের হারিয়ে ফেলা জীবনের কোন কথার ছন্দাংশও অসতর্কে কোনো সময় বেরিয়ে পড়ে না বুড়োর মুখ দিয়ে।

বুড়ো যেন ভুঁইফোঁড়।

পারুল হয়তো অন্যমনস্কের বশে কোনোদিন বলে বসে, 'এ সময় তুই কী খেতিস? ছুটির দুপুরে তুই কি করতিস?'

বুড়ো অবলীলায় বলে, 'মনে নেই।'

পারুল বলে, 'বুড়ো, তোর বাবার চিঠি এসেছে। তোর আর আমার একটা খামের মধ্যে, আয় আমরাও দুজনে দুটো চিঠি লিখে খামে পুরে পাঠাই। আমারটা লিখছি—তোরটা লেখ্।'

এইভাবেই ছড়িয়ে গুছিয়ে বলে।

তবু বুড়ো অম্লানমুখে বলে, 'তুমি তো সব খবরই লিখেছো—'

'ওমা! আমি লিখছি আমার ছেলেকে, আর তুই লিখবি তোর বাবাকে। দুটো বুঝি এক হল? আয় আয়, তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলে উত্তরটা লিখে ফেল, ডাকের সময় চলে যাবে।'

বুড়ো আসেও না, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, পড়েও না। হাতেই নেয় না, বলে, 'এখন লিখতে ইচ্ছে করছে না, তুমি পাঠিয়ে দাও।'

বলে, 'এখন অংক কষছি, পরে পড়বো।'

পারুল স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

পারুলের ওর আগের চেহারাটা মনে পড়ে যায়।

আগে আগে দু'-একদিনের জন্যে বাপ-মার সংগে বেড়াতে আসত, 'বাপী বাপী' করে কী বায়নাই করত!

'বাপী, আমায় এক্ষুনি বেড়াতে নিয়ে চল। বাপী, আমি এক্ষুনি নৌকো চেপে গংগায় ভাসবো। বাপী, তুমি যে বলেছিলে—একটা তিনকোণা এরোপ্লেন কিনে দেবে, এক্ষুনি দাও।'

বাপী বাপী বাপী!

বাপীর জীবন মহানিশা করে তুলতো, গলা ধরে ঝুলে পড়ে, পিঠের ওপর লাফিয়ে চড়ে বসে।

বাপী যদি বলত, 'এখন গংগার জোয়ার, এখন নৌকোয় চড়ে না।'

অবলীলায় বলত, 'মেরে হাড় ভেঙে দেব তোমার!'

'মা-মণি' সম্পর্কে অবশ্য একটু সমীহ ভাব ছিল। এমন কথা মাকে বলতে সাহস করত না। মা বলত, 'নিজের মান নিজে রাখতে জানে না, তাই ছেলের অতো সাহস!'

তবু মা-মণি-অন্ত প্রাণও তো ছিল।

আর ছোট্ট সেই বোনটার ওপর? আহা, একেবারে সাতখানা প্রাণ বোনের গুণপনায়, বোনের বোকামিতে আহ্লাদে বিগলিত।

পারুলকে ডেকে ডেকে উচ্ছ্বসিত সেই মন্তব্য মনে পড়ে যায় পারুলের।

'দিদি, দিদি, শোন। লিলিফুলটা এমন না বোকা! টফিটা ফেলে দিয়ে কাগজটাই খেতে লেগে গেছে।'

'দিদি দিদি, লিলিফুলটার বড় হবার কী দারুণ শখ দেখ, নিজের জুতো ফেলে রেখে বাপীর জুতো পরে বেড়াচ্ছে—'

উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ।

যে দু-তিনটে দিন থাকত, মুখর করে রাখত গংগাতীরের এই নিস্তরংগ

বাড়িখানা।

সেই ছেলেটাই!

সেই ছেলেটাই এ বাড়ির মৌন দেয়ালগুলোকে যেন ডবল ভারী করে তুলেছে। কেউ নেই, কেউ কথা বলার নেই, সে একরকমের শান্ত স্তব্ধতা, কিন্তু একজন আছে, যার হঠাৎ হঠাৎ বাঁশীর মত বেজে ওঠার কথা, ঝর্ণার মত কলকলিয়ে ওঠবার কথা, সে যদি নিথর হয়ে থাকে, সে স্তব্ধতায় দম আটকে আসে।

পৃথিবীর তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুড়িয়ে যাওয়া একটা শিশুর ভার যে কত গুরুভার, সেটা অহরহ অনুভব করছে পারুল। অনুভব করতে পারছে ওই স্তব্ধতার অন্তরালে কী যন্ত্রণার ঝড় বইছে।

এই তো ছিল গৌরবের উচ্চ রাজাসনে, হঠাৎ নেমে আসতে হল রিক্ত নিঃস্ব এক অগৌরবের রুক্ষ ভূমিতে। সেখানে কোথাও কোনোখানে স্নেহ নেই, মমতা নেই, ত্যাগ নেই।

না, ওদের জন্যে কেউ ত্যাগস্বীকারে রাজী নয়। ওরা গুঁড়ো হয়ে যাক, ওদের ওপরওয়ালা অটল থাকবে আপন হৃদয়সমস্যা নিয়ে।

পারুল মনে মনে বলে, 'সব যুগেরই বলি আছে, তোরাই এ যুগের বলি। আমাদের অন্ধকার যুগে আমরা ছিলাম অন্ধ কুসংস্কারের বলি, আর এই আলোর যুগে তোরা হচ্ছিস সভ্যতার বলি।'

তবু চেষ্টা করে পারুল।

ডাক দেয়, 'বুড়ো আয়, বুড়ীর মাথার পাকা চুল তুলে দে—'

'বুড়ো' বই হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায়। অহরহ হাতে বই। গল্পের বই নয়, পড়ার বই।

ওই বই-খাতাই যেন তার আত্মরক্ষার অস্ত্র।

যেন তলোয়ারের মুখে ঢাল। ডাকলে সব সময় বই নিয়ে এসে দাঁড়ায়।

এসে বলে, 'তোমার তো পাকা চুল নেই—'

'আছে রে আছে। ভেতরে আছে, খুঁজে দেখ।'

বুড়ো নির্লিপ্তভাবে বলে, 'ও তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না।' বলে চলে যায়।

পারুল ডাকে, 'বুড়ো আয়, একটা ফার্স্ট ক্লাস খাবার করছি, চটপট চলে আয়—'

বুড়ো এঘর থেকে বলে, 'আমার এখন খিদে পায়নি।'

'আরে বাবা, তুই আয়ই না, দেখলেই খিদে পেয়ে যাবে। এমন জিনিস, তুই নামই শুনিসনি—'

নিতান্ত অনিচ্ছুক মূর্তিতে এসে দাঁড়ায় ছেলেটা।

পারুল অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়ে বলে, 'বল্ তো এগুলো কী?'

নাতি ভাববার চেষ্টামাত্র না করে মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না।'

'জানবি কোথা থেকে? এসব হল সেকেলে জিনিস। আমার শাশুড়ী বানাতেন। তোর বাবা বলত, "ঠাকুমা, রোজ রোজ কেন বকুল-পিঠে কর না?" আসলে এর নাম হচ্ছে গোকুল-পিঠে, বুঝলি? তোর বাবা বুঝতে না পেরে বলত "বকুল-পিঠে"। এদিকে ওর মাসির নাম, মানে আমার বোনের নাম তো বকুল? তাই তোদের যিনি দাদু ছিলেন, তিনি বলতেন, তার চেয়ে বল না কেন "মাসি-পিঠে"!'

হি হি করে হাসতে হাসতে রস থেকে প্লেটে তুলে এগিয়ে ধরে পারুল।

কিন্তু ছেলেটা পারুলের মত চেষ্টাকৃত কৌতুকের আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে

নিস্তেজ গলায় বলে, 'পরে খাবো।'

আর কী করবে পারুল? আর কী করতে পারে?

স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়েই তো চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা জীবনে-পোড়-খাওয়া শিশুর নিরুত্তাপ নির্লিপ্ততার স্পর্শে চেষ্টাটা হাস্যকরভাবে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে নিজের কাছে।

তখন পারুলের ওই ছোট ছেলেটার কাছে নিজের বাচালতার জন্যে লজ্জা করছে, লজ্জা করছে কৃত্রিমতার জন্যে। মনে হচ্ছে, পারুল বুঝি এতক্ষণ ভাঁড়ামি করল!...কিন্তু ওই ছেলেটা কি তার গভীর বেদনার ঘরের বন্ধ দরজাটা একটু খুলে ধরবে, যেখান দিয়ে পারুল পারবে আস্তে আস্তে ঢুকে যেতে! সে ঘরে চুপ করে বসে থেকে ওর মনের বেদনার ভার নিতে পারবে পারুল!

তা দেবে না।

আশ্চর্য রকমের কঠিন হয়ে গেছে ছেলেটা।

অথবা নিজের ভিতরের সেই গভীর ক্ষতটাকে জগতের কাউকেই দেখাতে চায় না ও।

মনে মনে নিজের ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলে পারুল, 'তুই ভেবে সন্তোষ পাচ্ছিস, অন্ততঃ, ছেলেটাকে তুই পেয়েছিস, কিন্তু পরে বুঝবি ওটাকেই তুই একেবারে হারিয়েছিস্!'

এখন আর নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে শুধু একটা শান্ত উপলব্ধির জগতের স্বাদ গ্রহণের সময় নেই, এখন সারাক্ষণ শুধু এই। এখন পারুল মৃদু হাসির সঙ্গে ভাবে জগতে কিছুই অমনি পাওয়া যায় না, সব কিছুর জন্যেই মূল্য দিতে হয়। 'আমাকে ওদের প্রয়োজন হচ্ছে' এই পাওয়াটার জন্যে মূল্য ধরে দিতে হচ্ছে আমাকে, আমার সেই অনাহত অবকাশের গভীর স্বাদটিকে।

॥ ২৬ ॥

পারুলের অবকাশ গেছে বলে কি সেই আত্মমগ্নতায় ডুবে যাওয়া রোগটা তার বোনের ঘাড়ে এসে ভর করল?

বকুল তো কখনো এমন শুয়ে বসে অলসভাবে স্মৃতিচারণ করে না। বকুলের এত সময়ই বা কোথায়? বকুল তো কবে থেকেই অনামিকা দেবী নামের জামাটা গায়ে দিয়ে ছুটছে আর ছুটছে। বকুলকে পাঠকসমাজ এখনও ফেলে দেয়নি।

তবু বকুল জানে একদিন দেবে ফেলে। অনায়াসে ঠোঁট উল্টে বললে, 'না বাবা, ওঁর লেখা আর পড়া যায় না। সেই মনস্তত্ত্বের তত্ত্ব নিয়ে কথার ফেনা আর ফেনানো। যেন 'মানুষ' নামের জীবটার শুধু মনই আছে, রক্ত মাংসের একটা দেহ নেই!'

এ ধরনের মন্তব্য অন্যের সম্বন্ধে কানে এসেছে, অতএব বোঝা শক্ত নয়, অনামিকার সম্বন্ধেও এ মন্তব্য তোলা আছে। তখন শুধু সম্পাদকের খাতায় যে নিমন্ত্রণের তালিকা আছে, সেই তালিকার খাতিরেই মাঝে মাঝে এক একটা নিমন্ত্রণ পত্র আসবে, সামাজিক নিমন্ত্রণের মত। কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা কতকগুলো নাম মুখস্থ করে রেখেছে, সেইগুলোই তারা ভাল বোঝে। আধুনিক অতি-আধুনিকদের নাম মাথামোটা কারবারী লোকেদের কানে ঢুকতে দেরি হয়।

তখন সেই সামাজিক দায়ে লেখা ছাপা হলেও, পাঠক 'অনামিকা' নামের

ফর্মাটা উল্টে ফেলে চোখ ফেলবে অন্যত্র! প্রকাশকরা যাঁরা নাকি এখনও হাঁটাহাঁটি করছেন, তাঁরা বইটা ছাপতে নিয়েও ফেলে রেখে উঠ্‌তি নামকরাদের বইগুলো আগে ছাপবেন।

এ হবেই। এ নিয়তি।

এ নিয়তি তো চোখের সামনেই কত দেখছেন অনামিকা দেবী। লাইব্রেরীতে যাঁর বই পড়তে পেত না, লাইব্রেরীরা এখন তাঁর বই কিনতে চায় না, পয়সাটা মিথ্যে আটকে রাখবে না বলে। 'জনপ্রিয়'র দেবতা তো জনগণ! তাঁরা যদি একবার মুখ ফেরান, তাহলেই তো হয়ে গেল'!

অনামিকা দেবীর দেবতা এখনও হয়তো বিমুখ হননি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? অনামিকা চুপচাপ শুয়ে সেই দেবতাদের কথা চিন্তা করেন।

না, ভাগ্যের কাছে অকৃতজ্ঞ হবেন না তিনি। সামান্য সম্বল নিয়ে এই হাটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বিনিময়ে পেয়েছেন অগাধ অবিশ্বাস্য।

মন পূর্ণ হয়ে আছে কানায় কানায়। ওই ভালবাসার দানেই নিজের অক্ষমতার গ্লানি মুছে যায়, মনে হয় কী পেয়েছি আর না পেয়েছি তার হিসেব করতে বসে দুঃখ ডেকে এনে কী হবে? যা পেয়েছি তার হিসেব করার সাধ্য আমার নেই।

ভিড় করে আসে অনেক মুখ।

ভালবাসার মুখ।

ভিড় করে আসে নিজের সৃষ্ট চরিত্ররাও। এরা আর ছায়া নয়, মায়া নয়, বঞ্চনা নয়, আস্ত এক-একটা মানুষ।

অনামিকা জনেন, প্রকৃতপক্ষে ওরা অনামিকার সৃষ্টিও নয়। ওরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে। ওদের নিজস্ব সত্তা আছে, ওরা নিজের গতিতে চলে। অনামিকাই ওদের নিয়ন্তা এমন ভুল ধারণা অনামিকার নেই।

হয়তো অনামিকার পরিচিত জগতের কারও কারও ছায়ার মধ্যে থেকে তারা বিকশিত হয়ে ওঠে, কলম তার অনুসরণ করে চলে মাত্র। অনামিকার ভূমিকা স্রষ্টার নয়, দর্শকের।

তিনি যে শুধু এই সমাজকেই দেখে চলেছেন তা নয়, তাঁর রচিত চরিত্রদেরও দর্শক তিনি।

তাই পারুলের অভিযোগে অক্ষমতা জানিয়ে চিঠি লেখেন অনামিকা, 'বকুল নিজে এসে ধরা না দিলে বকুলের কথা লেখা হবে না সেজদি! সে আজও পালিয়ে বেড়াচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কোনদিনই তার কথা লেখা হবে না, কারণ বকুল বড় মুখচোরা, বড় কুণ্ঠিত। নিজেকে প্রকাশ করতে সে লজ্জায় মারা যায়।'

অনামিকার ভক্ত পাঠককুলের এখন আর অজানা নেই 'অনামিকা' বকুলের ছদ্মবেশের নাম, তাই তারা অনামিকার রচিত চরিত্রদের মধ্যে থেকে বকুলকে খুঁজে বেড়ায়। আগ্রহে উদ্ভাসিত মুখে প্রশ্ন করে, 'এর মধ্যে কে বকুল?'

অনামিকা মৃদু হেসে বলেন, 'জানি না ভাই। আমিও তো সে বকুলকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

কিন্তু অনামিকা কি শুধু বকুলকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আবাল্যের এই সাধনায় আরও একটা জিনিস কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন না। খুঁজে বেড়াচ্ছেন না কেন এই তাঁর জানা জগতের সমাজে আর জীবনে এত বেদনা, এত অবিচার, এত নিরুপায়তা?

আর খুঁজে বেড়াচ্ছেন না ঝকঝকে রাংতামোড়া জীবনের অন্তরালে কী

শ্মশানের ভস্মরাশি?

তবু আজ মনে হচ্ছে হয়তো আরও দেখার ছিল। দুঃসহ বেদনাভারাক্রান্ত পৃথিবীকে যতটা দেখেছেন অনামিকা, হয়তো ততটা দেখাননি তার আলোর দিকটা।

আলোও আছে বৈকি।

আছে আনন্দ, আছে বিশ্বাস, আছে প্রেম, আছে সততা।

শুধু তারা তীব্র শিখায় চোখ ধাঁধায় না বলেই হয়তো চোখে কম পড়ছে। অনামিকার মনে পড়ে সেই ছেলেটার মুখ। যে একদিন তার প্রথম কবিতা ছাপা হওয়া পত্রিকাখানা নিয়ে দেখাতে এসেছিল। তার মুখে যেন বিধাতার আশীর্বাদের আলো।

এমন কত ছেলেই তো আসে।

আজকের ছেলেদের প্রধান হবিই তো সাহিত্য।

রাশি রাশি ছেলে আসে তাদের নতুন লেখা নিয়ে। অবশ্যই শুধুই যে দেখাতে আসে তা নয়। আসে একটা অবোধ আশায়। ভাবে উনি ইচ্ছে করলেই ছাপিয়ে দিতে পারবেন।

'উনি'র ক্ষমতা সম্পর্কে বোধ নেই বলেই ভাবে। আর শেষ পর্যন্ত ওঁকে সহানুভূতিহীনই ভাবে। হয়তো কোথাও জায়গা না পেয়েই ওরা নিজেরা জায়গা তৈরি করে নিতে চায়, তাই রোজ রোজ পত্রিকার জন্ম হচ্ছে দেশে।

দু'এক সংখ্যা বেরিয়েও যদি তার সমাধি ঘটে ঘটুক। তবু তো কয়েকটি ছেলের চিন্তার শিশুগুলি আলোর মুখ দেখতে পেল।

বাংলাদেশের শিশুমৃত্যুর হার নাকি কমে গেছে। পবিত্র-শিশুরা হয়তো সেই 'হার' বজায় রাখার চেষ্টা করছে। ওই ক্ষীণকায় পত্রিকাগুলি হাতে নিয়ে ওরা যখন আসে, তখন ওদের মুখে যে আহ্লাদের আলো ফোটে, সেই কি তুচ্ছ করবার?

তবু সেই একটা ছেলেকে খুব বেশী মনে আছে। অথচ আশ্চর্য, নামটা মনে নেই। মনে আছে চেহারাটা, শ্যামলা রং, পাতলা লম্বা গড়ন, চুলগুলো রুক্ষু-রুক্ষু, কপালে একটা বেশ বড়সড় কাটার দাগ, আর তীক্ষ্ন নাকওয়ালা মুখেও একটা আশ্চর্য কমনীয়তা।

তার কবিতা তাদের নিজেদের পত্রিকায় বেরোয়নি, বেরিয়েছিল একটি নামকরা পত্রিকায়। কেমন করে এই অসাধ্য সাধন করেছিল যে তা সে-ই জানে। কেবলমাত্র লেখার গুণের জোরেই যে এটা হয়ে ওঠে না সে তো সকলেরই জানা।

'গুণ'টা যে আছে সেটা তাকিয়ে দেখছে কে?

তা হয়ত তার ভাগ্যে এমন কেউ দেখেছিলেন, যাঁর হাতে সেই 'গুণ'টুকুকে আলোয় এনে ধরবার ক্ষমতা ছিল। যাই হয়ে থাক, ছেলেটির সেই মুখ ভোলবার নয়।

বলেছিল, 'জানেন, জীবনে যদি আমার আর একটাও লেখা ছাপা না হয়, তাহলেও দুঃখ থাকবে না আমার!'

অনামিকা বলেছিলেন, 'সে কী!'

'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে। আমার পারিবারিক জীবনের কথা আপনি জানেন না। সেখানে অনেক বঞ্চনা, অনেক দুঃখ, অনেক অপমান। তবু মনে হচ্ছে —সব কষ্ট সহজে সইবার ক্ষমতা আমার হবে আজ থেকে।'

কথাগুলো অবশ্যই অতি আবেগের, তবু কেন কে জানে হাসি পায়নি, অতি আবেগ বলেও মনে হয়নি। যেন ওর মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয় কাজ করছে।

কবিতাটা প্রেমেরই অবশ্য, তবে আধুনিক ভঙ্গীতে তো সেই প্রেমকে ধরা-

ছোঁয়া যায় না, তবু অনামিকার মনে হয়েছিল ছেলেটা কি ওই কবিতার মধ্যে দিয়ে তার প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল?

নামটা মনে নেই এই দুঃখ।

নতুন নতুন কিছু শক্তিশালী কবি দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু তাদের চেহারাটা তো দেখতে পাচ্ছেন না। কে জানে কার কপালে রাজটীকার মত সেই কাটার দাগটা!

ছেলেদের মধ্যে এই 'সাহিত্যে'র হবি যতটা বেশী, মেয়েদের মধ্যে তার সিকির সিকিও নয়।

তবে মেয়েদের মধ্যে থেকেও কি খাতার বোঝা নিয়ে কেউ আসে না? খাতার বোঝা আর প্রত্যাশার পাত্র নিয়ে?

আসে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখেছেন অনামিকা দেবী, তারা 'মেয়ে' নয়, প্রায় কেউই, তারা সংসারের পোড়-খাওয়া গৃহিণী, অবমানিতা বধূ। হয়ত প্রৌঢ়া, হয়ত মধ্যবয়সী।

সারাজীবনের তিল তিল সঞ্চয় ওই খাতাগুলি।

কিন্তু ওগুলির যে কোনোদিনই আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই, সেকথা তাদের বলতে কষ্ট হয়। আর সত্যি বলতে—তখন হঠাৎ নিজেকে ভারী স্বার্থপর মনে হয় অনামিকা দেবীর।

যেন তিনি অনেকের প্রাপ্য ভাগ দখল করে বসে আছেন। প্রাচুর্যের আহার্য-পাত্র সামনে নিয়ে বসে দরিদ্রের দীন অন্নপাত্র চোখে পড়ে গেলে যেমন লাগে, অনেকটা যেন তেমনি।

সেই বৌটির কথা মনে পড়ছে, তার নামও মনে আছে। অথচ খুব সাধারণ নাম—সবিতা। তার লেখাও অবশ্য তেমনি। বলতে গেলে কিছুই নয়, কিন্তু তার ধারণা ছিল, পাঠকদের চোখের সামনে আসতে পাচ্ছে না বলেই সে লেখার জয়-জয়কার হবার সুযোগ পাচ্ছে না। অতএব যেমন করেই হোক—

এই মূঢ় প্রত্যাশায় বৌটা বাপের বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে গহনা বিক্রী করে একটা চটি বই ছেপে বসলো।

তারপর আর কি!

লাঞ্ছনা গঞ্জনা ধিক্কারের শেষ নেই।

তার স্বামী বলেছিল, যে মেয়েমানুষ এতখানি দুঃসাহস করতে পারে, সে পর-পুরুষের সঙ্গে বেরিয়েও যেতে পারে।

ফলে এই হল, বেচারী বৌটা তার সারাজীবনের যত প্রাণের বস্তু সব আগুনে ফেলে দিল, আগুনে ফেলে দিল সেই পাঁচশো কপি বইও।

সবিতার সেই মুখটা মনে পড়ে।

এসে বলেছিল, 'মাসিমা, নিজে হাতে ছেলেকে চিতায় দিয়ে এলাম।'

অনামিকা বলেছিলেন, 'ছি ছি, এ কি বলছ! সন্তানের মা-তুমি—'

ও বলেছিল, 'সে সন্তান তো আমার একার নয় মাসিমা! সে তার বাপের, তার বংশের, তার পরিবারের, তার সমাজের! এইটুকুই ছিল আমার একান্ত নিজের।'

এই সব ব্যর্থ জীবনের কতটুকুই বা প্রকাশ হয়!

দিন চলে দিনের নিয়মে, ঋতুচক্র আবর্তিত হয় চিরন্তন ধারায়, জাগতিক কাজকর্মগুলিও চলে অনাহত গতিতে।

সমাজজীবনের বহুবৈচিত্র্যময় লীলাখেলার খাজনাটিও অব্যাহত ধারায় যুগিয়ে চলতে হয় সমাজবন্ধ জীব হতভাগ্য মানুষকে।

কোথায় কার কখন আসছে শ্রান্তি-ক্লান্তি, আসছে বিতৃষ্ণা-বিমুখতা, কে তার দিকে তাকিয়ে দেখে? কে বোঝে কে হাঁপিয়ে উঠেছে, মুক্তি চাইছে!

'না, সে কেউ ভাবে না, বোঝে না, দেখে না।'

সমাজে খাজনার বড় দায়।

আপনার যখন এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় একা বসে আপন নিভৃত জীবনের সুখ দুঃখের স্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, তখন হয়তো আপনাকে অমোঘ এক বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আলো বাজনা শব্দ আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার আহ্লাদে শতমুখ হতে হবে আপনাকে।

হয়তো কোন দিন আপনার এক অকারণ খুশীর মন নিয়ে জানলার ধারে বসে কবিতা পড়তে বাসনা হচ্ছে, তখন হয়তো আপনার আত্মীয়-কন্যার নবজাত শিশুটির মুখ দেখতে ছুটতে হবে দূরবর্তী কোন নার্সিং হোমে!

অথবা হয়তো কোন এক উজ্জ্বল বৈশাখের বিকেলে আপনার কোন প্রিয় বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে একটু আড্ডা দিয়ে আসতে, তখন পিসতুতো পিসিমার শবযাত্রার সঙ্গে শোভাযাত্রী হয়ে গিয়ে পৌঁছতে হবে মহাশ্মশানে।

মোট কথা নিজেকে নিয়ে একা পড়ে থাকবার উপায় নেই। সমাজের ট্যাক্স যোগান দিয়ে চলতেই হবে।

অতএব অনামিকাকে 'পুলক সঙ্ঘে'র বার্ষিক সাহিত্যসভার উদ্বোধনে যেতে হয়েছিল তখন, যখন 'শম্পা' নামের একটা চিরকালের মেয়ের মুখটা স্মরণ করে প্রাণটা হাহাকার করছে। সে প্রাণ ছুটে যেতে চাইছে তার সন্ধানে।

কিন্তু নতুন করে হঠাৎ কেন এই হাহাকার?

তা আছে কারণ।

আজই বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে—'আমি মরিনি বেঁচে আছি।'

হ্যাঁ, নাম-সম্বোধনহীন শুধু ওই একটি লাইন। এ চিঠির দাবিদার কে জানার উপায় নেই, কোথাও কারও নাম নেই। ঠিকানার অংশটুকুতে শুধু গোটা গোটা করে লেখা ঠিকানাটুকুই।

তবে?

এই চিঠিটুকুকে 'আমার' বলে দাবি কে করতে পারে?

হিসেবমত কেউই পারে না। অথবা ওই ঠিকানার বাসিন্দারা সকলেই পারে।

তবু অনামিকার মনে হচ্ছিল, আমিই দাবিদার।

কিন্তু কোন্খান থেকে চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে কিছুতেই ধরা গেল না। 'কালিমাবিহীন' স্বাধীন সরকারের ডাক-বিভাগ যথারীতি স্ট্যাম্পের উপর একটি অস্পষ্ট ছাপের ভগ্নাংশটুকু মাত্র দেগে দিয়ে কর্তব্য সমাধা করেছে।

যেন ওই এক লাইন লেখাটা পাঠিয়ে যে মজা করেছে, সেই দুষ্টু মেয়েটা ডাক-কর্মচারীদের শিখিয়ে দিয়েছে 'স্পষ্ট' করে ছাপ মেরো না, আমি তাহলে ধরা পড়ে যাব।

অথচ ওই কথাটুকু তার লিখে জানাবার ইচ্ছেটি হয়েছে এতদিনে।

'আমি মরিনি, আমি বেঁচে আছি।'

এ কার হাতের লেখা? এ কোন্ স্বর্গলোকের কথা?

ছোড়দা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'অন্য পাড়া থেকেও পোস্ট করা অসম্ভব নয়।'

ছোটবৌদি সেই অক্ষর কটাকে পাথরে খোদাই করার মত মনের মধ্যে খোদাই করে ফেলেও, আর একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলেন, 'আচ্ছা বকুল, হাতের লেখাটা ঠিক তার বলে মনে হচ্ছে তোমার? কোন বাজে লোকের কারসাজি বলে মনে হচ্ছে না তো?'

'কী যে বল! ওর হাতের লেখা ভুল হবে? মনটা ভাল কর বৌদি, খবর যখন একটা দিয়েছে—'

যখন এই প্রসঙ্গ নিয়ে অনামিকার সঙ্গে তাঁর ছোড়দা-ছোটবৌদির আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই এই পুলক সঙ্ঘের গাড়ি এল।

অমোঘ অনিবার্য এই গাড়ি।

'যেতে পারব না' বলার প্রশ্ন ওঠে না।

অনামিকা বলে গেলেন, 'আচ্ছা, তোমরা চেষ্টা করে দেখো—'

অনামিকা বেরিয়ে গেলেন।

পুলক সঙ্ঘের সমস্ত পুলকের ভার বহন করতে হবে এবার।

চলন্ত গাড়িতে ভাবতে ভাবতে চলেন অনামিকা, ওই খবর দেওয়াটার মধ্যে কোন্ মনস্তত্ত্ব কাজ করছে!

ও কি খুব কষ্টে পড়েছে? তাই আর না পেরে ফিরে আসতে চাইছে?

ও কি অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে এতদিনে—

ওর কি হঠাৎ সবাইয়ের জন্যে মন কেমন করে উঠেছে?

চশমাটা খুলে মুছলেন অনামিকা।

আর যখন আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে গিয়ে বসলেন, তখন সহসা মনে পড়ে গেল একদিন আমি 'নির্মল মারা গেছে' শুনেও সভায় এসে অবিচল ভাবে সমস্ত কাজ করে গিয়েছিলাম।

অথচ আজ ও বেঁচে আছে খবর পেয়ে এত ভয়ানক বিচলিত হচ্ছি যে কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। কবে এত দুর্বল হয়ে গেলাম আমি?

তবু অভ্যাসগত ভাবে হয়েও গেল সব।

মঞ্চ থেকে নেমে আসতে আসতে ছেঁকে ধরল অটোগ্রাফ-শিকারীর দল। আর তাদের আবদার মিটিয়ে যখন ঠিক গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'আমার একটা অটোগ্রাফ!'

কে? কে?

কে বলল একথা?

অনামিকা গাড়ির দরজাটা ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে আশপাশের ভিড়ের দিকে তাকালেন। অনামিকার মনে হল সব মুখগুলো যেন একরকম। ঝাপসা ঝাপসা!

'এই তোমার বৈকালিক রাশ গোছানো থাকল, দয়া করে ঠিক সময় খেয়ে নিও—'

সত্যবানের সামনে টুলে একটা কৌটো নামিয়ে রেখে বলল শম্পা, 'এসে যেন দেখি না কৌটো খোলা হয়নি।'

সত্যবান ভুরু কুঁচকে বলল, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু "বৈকালিক রাশ" কথাটার মানে?'

'মানে? মানে তো অতি সোজা। "প্রাতরাশ" মানে জান? নাকি তাও জান না?

'সেটা জানি।'

'তবে আর কি। সকালের জলখাবার যদি "প্রাতরাশ" হয়, বিকেলেরটা "বৈকালিক রাশ" হবে না কেন?'

সত্যবান ওর আলো-ঝলমলে মুখের দিকে অভিভূত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠে, 'শম্পা!'

'বলুন স্যার?'

'এত দুর্দশার মধ্যে এত আহ্লাদ কোথা থেকে আসে তোমার শম্পা?'

'দুর্দশা!'

শম্পাও ভুরু কুঁচকে বলে, 'তা বেশ, দশাটা যদি দুর্দশাই হয়, যদিও আমি তা মানি না, ওটা আপনাদের ধারণার ব্যাপার, তাহলেও বলি—"আহ্লাদ" জিনিসটার বাসা কোথায় বলুন তো মশাই? ওটা কি বাইরের কোন দোকানে মেলে? নাকি আশপাশের গাছে ফলে?'

'তোমার কথা শুনলে আমার অবাক লাগে শম্পা! আমার ভয় করে।'

'ভয় করে? সেটা আবার কী?' শম্পা সর্বাঙ্গে আহ্লাদ ঠিকরে বলে, 'অবাক লাগতে পারে, এমন অবাক করা একখানা মেয়ে দৈবেই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভয়?'

'ভয়ই তো। মনে হয় হঠাৎ একদিন দেখব এই সবই স্বপ্ন, তুমি আর আমার সামনে নেই।'

'সামনে না থাকাই স্বাভাবিক।' শম্পা তেমনি করে হাসে, 'পিছনে থাকলে ঠেলার সুবিধে।'

'সেই তো! সারাজীবন আমায় ঠেলে নিয়ে যাবে এ আমি ভাবতেই পারি না।'

'তোমায় সেদিন কী পড়তে দিয়েছিলাম?' শম্পা মাষ্টার মশাইয়ের ভঙ্গীতে গম্ভীর গলায় বলে, 'পড়নি রাজকুমারী ও বামনের গল্প!'

'পড়েছি। ওসব পড়াশুনোর মধ্যে কোন সান্ত্বনা পাই না। কোনমতেই নিজেকে তোমার পাশে ভাবতে পারি না।'

শম্পা বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, আচ্ছা, তুমি কি চাও বল তো? আমাকেই তোমার যোগ্য করে নিতে কোনও কৌশল প্রয়োগ করব? বেশ, কী করা যায় বল? পা-দুটো কেটে ফেলা? উঁহু, ওতে সুবিধে হবে না। চার চাকার গাড়ি না থাক, দু-চাকার সাইকেলটাও দরকার। একজনের অন্ততঃ পা থাকা বিশেষ প্রয়োজন। হাত? ওরে বাবা, হাত বাদ দিলে তোমার মুখের সামনে নাড়ব কী?...চোখ? ওটা গেলে "কটাক্ষ" গেল। এক পারা যায়, সুর্পণখার মতো নাকটা কানটা খতম করে ফেলা। বল তো তাই করা যাক। তাহলে যদি তুমি

কিছু-কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাও!'

'শম্পা!'

'এই দেখ! বেরোবার সময় এই এক নাটক! যাচ্ছি একটা শুভকাজে, আর ওই সব কাণ্ড! পুরুষ মানুষের চোখে "অশ্রুধারা"—এ আমার বরদাস্ত হয় না বাপু!'

সত্যবান অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'তুমি কেন আমাকে ভালবাসতে এলে শম্পা?'

'ওই তো!' শম্পা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'ওইটাই তো আমিও ভেবে মরি। কী মরণদশা হল আমার যে, তোমার মতন একটা উজবুক বুদ্ধুকে ভালবাসতে গেলাম। যাক গে, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই!'

'চারা নেই কে বললে? তুমি তো অনায়াসেই—'

'দেখ এবার কিন্তু আমি রেগে যাব। আমার রাগ তুমি জান না। বাবা বলল, আমার বাড়িতে বসে এসব চলবে না। বললাম, বেশ চালাব না। চলে এলাম এক বস্ত্রে।'

'সেই তো! তোমার ওই ভয়ঙ্কর ইতিহাসটাই আমাকে সর্বদা ভয় পাওয়ায়।'

'তবে হে প্রভু, আপনি এখন বসে বসে ভয় পান, আমি একটু বেরিয়ে পড়ি।'

সত্যবান বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'এত আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলেছ?'

'বলব কেন?'

'না বলতে চাও বলবে না।'

'উঃ, কী রাগ বাবুর! বলব, বলব, ফিরে এসে বলব। এখন চলি, কেমন? খেও। আর ওই বইটা পড়ে ফেলো।'

'কোনটা? বই তো অনেক চাপিয়ে রেখেছ!'

'আহা, বললাম না রবীন্দ্রনাথের "নৌকাডুবি"টা পড়ে ফেলো। কিছুই তো পড়নি এযাবৎ। পড়ে দেখো। দেখবে একমাত্র বই পড়ার মধ্যেই জীবনের সব দুঃখকষ্ট ভোলা যায়। তোমায় আমি ওই নেশায় নেশাখোর করে তুলব দেখো!'

হাসতে হাসতে আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে চলে যায় শম্পা।

... ...

ঝাপসা ঝাপসা অনেকগুলো মুখের মধ্যে থেকে একখানা মুখ ঝলসে উঠল।

রোগা কালো শুকনো একটা মুখ!

তবু বুঝি আকাশ ভরা চন্দ্র-সূর্যের আলো ভরা।

বিশ্বাস করতে কিছুটা সময় লাগল।

হয়তো সে সময় ঘড়ির হিসেবে এক সেকেণ্ডের সামান্যতম ভগ্নাংশ মাত্র, তবু থমকে থেমে থাকা ক্ষণকাল বুঝি অনন্তকালের স্বাদবাহী।

ওই মুখের অধিকারিণীর হাতে সত্যি কোন অটোগ্রাফ খাতা ছিল না, তবু হাতটা বাড়ানো ছিল। রোগা পাতলা নিরাভরণ একখানা হাত।

অনামিকা ওই হাতখানাকে শক্ত হাতে চেপে ধরে বললেন, 'উঠে আয়।'

... ...

'হাসতে হাসতে বেরোলে, আর কাঁদতে কাঁদতে ফিরলে যে?' সত্যবান ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাতের বইটা মুড়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে প্রশ্ন করে, 'কী হল?'

শম্পা হাতের ব্যাগটা দেওয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখার ছুতোয় দেয়ালমুখো হয়ে বলে ওঠে, 'কাঁদতে কাঁদতে! বলেছে তোমাকে!'

বলে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে ওর নিজস্ব কলকণ্ঠের ঝঙ্কার ফোটে না। ঝঙ্কারের চেষ্টাটাই ধরা পড়ে শুধু।

সত্যবান আর কথা বলে না। বইটা মুড়েই বসে থাকে চুপচাপ।

শম্পা বলে, 'খেয়েছিলে?'

সত্যবান কুণ্ঠিত গলায় বলে, 'না—মানে, খুব বেশী খিদে পায়নি—'

শম্পা এবার ফিরে দাঁড়ায়, বলে ওঠে, 'খুব বেশী খিদের মত ভয়ানক কিছু দিয়ে খাওয়া হয়েছিল কি?'

'না না, মানে মোটেই খিদে পায়নি।'

শম্পা এবার ওর কাছাকাছি টুলটায় বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা তোমার জ্বালায় আমি কী করবো বলতে পার?'

'করবার কিছু নেই। নিজের হাতেই খাল কেটে কুমীর এনেছ।'

শম্পা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সেকালের রাণী-মহারাণীরা কেন যে একটা গোঁসাঘর রাখতেন, সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। যে কোন সম্ভ্রান্তচিত্ত মহিলার ওটা একান্ত প্রয়োজন।'

'একান্ত প্রয়োজন?'

'নিশ্চয়। সব সময় মহারাজদের চোখের সামনে থাকতে হলেই তো প্রেস্টিজ পাংচার! কখন যে রাণীর হাসতে ইচ্ছে হয় আর কখন যে কাঁদতে ইচ্ছে হয়—'

সত্যবান কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'সব সময় ওই প্রেস্টিজটা আঁকড়েই থাকতে হবে তার কী মানে আছে?'

'হুঁ! বাক্যিটাক্যি তো বেশ রপ্ত করে ফেলেছ দেখছি। তাহলে বলি—প্রেস্টিজটাই তো মানুষ। ওটা ছাড়া আর কী রইল তার? চারখানা হাত পা, চক্ষু কর্ণ নাসিকা, রক্ত মাংস হাড়, এসব তো পশুজাতিরও থাকে।'

'ওটা তোমার তর্কের কথা—', সত্যবান বলে, 'আমার তো মনে হয় তোমাদের ওই প্রেস্টিজ জিনিসটা পোশাকী জামা-কাপড়ের মত। তবে? নিজেদের লোকের কাছে ওটা রক্ষা করার এত কী দায়?'

শম্পা মাথা নেড়ে বলে, 'নো নো। নিজের লোক কেন, সব থেকে দায় নিজের কাছেই রক্ষা করার।'

সত্যবান মলিনভাবে বলে, 'এই জন্যেই তোমাকে আমার ভয় করে। মনে হয় তোমার মনের নাগাল একজন্মে কেন, সাতজন্ম ঘুরে এলেও পাব না।'

'উঃ, নিজের সম্পর্কে কী বিরাট ধারণা! যাক এখন খাবারটা খাবেন মহাশয়? নাকি এটাও নাগালের বাইরের বলে মনে হচ্ছে?'

সত্যবান আস্তে বলে, 'তা হচ্ছে না। হয়ও না। তুমি যখন দয়া করে নিজে অনেকটা নেমে এসে নাগালের মধ্যে দাঁড়াও, তখন মনে হয় হয়ত এইবার সব সহজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? তার পরেই তো আবার ভয়।'

'উঃ! এবার তো দেখছি তুমিই আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছ! এই সব ভাব তুমি?'

'ভাবনা ছাড়া আর তো কোন কাজ নেই!'

'তার মানে এখন থেকে আমায় ভাবনায় পড়তে হচ্ছে। যাক, খাওয়ার প্রশ্নটা তাহলে ধামাচাপা পড়ল?'

'রাত তো হয়েই গেছে। একেবারে খেয়ে নিলেই হবে।...বরং ততক্ষণ তোমার আজকের—কী বলে, অভিযান না, তার গল্প শুনি।'

শম্পা নিজস্ব ভঙ্গীতে ঝলসে ওঠে, 'অভিযান! ওরে ব্বাস! এরপর হয়ত তুমিই

আমার অভিধান হয়ে দাঁড়াবে। তা অভিযানই বটে!'

হঠাৎ একটু থামল, চুপ করে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সহসা ওর সেই 'অভিযানে'র স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যায়।

এখন ওর মুখের পাশের দিকটা দেখা যাচ্ছে—যেন বড় বেশী চাঁচাছোলা। চোয়ালের হাড় কি আগে দেখা যেত শম্পার?

সত্যবান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'কী রোগাই হয়ে গেছ তুমি?'

'পিসিও তাই বলছিল,' কেমন যেন আচ্ছন্ন অন্যমনস্ক গলায় বলে শম্পা, 'আমি অবিশ্যি তা মানি না। কোন কালেও আমি মোটকা ছিলাম না। পিসিকে তাই বললাম। তবে মার জবরদস্তিতে নিত্য খানিকটা করে দুধমাখন, মাছ ডিম, মিষ্টান্ন ইত্যাদি পেটের মধ্যে চালান করতে বাধ্য হতাম তো! তার একটা এফেক্ট থাকবেই।'

'পিসির কাছে গিয়েছিলে তুমি?'

সত্যবান একটু পরে বলে কথাটা।

শম্পা তেমনি অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'পিসির কাছে?'

'হ্যাঁ পিসির কাছে? মা-বাবার সঙ্গে দেখা হল?'

শম্পা সচেতন হয়।

শম্পা একটু নড়েচড়ে বসে. 'দূর! আমি কি ওখানে, মানে বাড়িতে গিয়েছিলাম নাকি? সকালে রুটি আনতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি দোকানের পাশের একটা দেয়ালে প্ল্যাকার্ড সাঁটা—"পুলক সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে অভিনব আয়োজন, শ্যামা নৃত্যনাট্য, বিচিত্রানুষ্ঠান, শিল্পী অমুক অমুক, সভানেত্রী দেশবরেণ্য সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা অনামিকা দেবী!"...ঠিকানাটা দেখে হাত-পা স্রেফ হিম। বুঝতে পারছ কেন? একেবারে দোরের কাছে! কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থেকে কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। তখন অবশ্য বলিনি তোমায়, ভাবলাম কি জানি বাবা, সভানেত্রীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কিনা। বলে খেলো হব!... তা বুদ্ধির জোরে শেষ অবধি পৌঁছলাম।...একেবারে সভা অন্তে গাড়িতে ওঠার সময় দেখি—অটোগ্রাফ-শিকারীরা ছেঁকে ধরেছে, আমিও হাত বাড়িয়ে বললাম—'আমায় একটা অটোগ্রাফ'...খাতা-ফাতা অবিশ্যি ছিল না, ওই আর কি। দেখলাম পিসি বিভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাচ্ছে, তারপর না খপ্ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'উঠে আয়।'

'কোথায় উঠে আয়?'

'এই দেখ, কোথায় আবার? গাড়িতে!'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, বাধ্য মেয়ের মত উঠেই পড়লাম। পুলক সঙ্ঘের একটা ছোঁড়া বোধ হয় গাড়িতে, অত গেরাহ্যি করলাম না। করবই বা কি! তখন তো পিসি-ভাইঝি দুজনেই বাকশক্তিরহিত।...একটু পরে পিসি বলল, "তোকে কী করব? ঠাসঠাস করে গালে চড়-মারব, না চুলের মুঠি ধরে মাথা ঠুকে দেব?"... আমি বললাম, "এই কি দেশবরেণ্যা সাহিত্যিকার ভাবের অভিব্যক্তি?"

পিসি বলল, "হ্যাঁ"।

তারপর না অনেকক্ষণ পরে আমি বলে উঠলাম, 'আমি কিন্তু আমার আস্তানা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি'—অতঃপর নাটকের দুই নায়িকার মধ্যে এই মত কথোপকথন হল।—

'কোথায় তোর আস্তানা?'

'পুলক সঙ্ঘের কাছাকাছি। অনেকটা চলে এসেছি।'

'এখন কে ছাড়ছে তোকে?'

'ধরে ফেলার কথা তো ওঠে না বাপু। নিজেই ধরা দিয়েছি।'

'অশেষ দয়া তোমার। এখন চল বাড়ি।'

'আজ থাক্ পিসি—'

'কেন, আজ থাক্ কেন? তোর মা-বাপের অবস্থাটা ভেবে দেখিস কোন দিন?'

'ওনারা তো ডাঁটুস!'

'সেই ডাঁট তুই রাখতে দিয়েছিস লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা মেয়ে?'

'ওরে ব্বাস! তুমি যে অনেক নতুন নতুন ভাষা শিখে ফেলেছ দেখছি ইতিমধ্যে—

'তুমি অনেককে অনেক শিখিয়েছ পাজি নিষ্ঠুর মেয়ে!'

'তুমি বুঝি এই গালমন্দগুলো শোনাবার জন্যে টেনে গাড়িতে তুললে?'

'তা ছাড়া আবার কী! এ তো কিছুই নয়, আরও অগাধ আছে। এতদিন ধরে আর কী জমানো সম্ভব ছিল তোর জন্যে!'

'তা হলে যা যা আছে তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও। অর্থাৎ তূণে যত বাণ জমা করে রেখেছে, সব মেরে তূণ খালি করে ফেল। আমাকে আরও বেশী দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে ফিরতে বড় ভুগতে হবে পিসি। তখন আর তোমার 'পুলক সঙ্ঘ' বিপুল পুলকে আমাকে আমার মাটকোঠায় পৌঁছতে যাবে না।'

'মাটকোঠা! মাটকোঠায় থাকিস তুই?' পিসি যেন আছাড় খেল।

দেখে হেসে বাঁচি না।

বললাম, 'তবে কি আশা করেছিলে? দালানকোঠা?'

'না, তোমার সম্পর্কে আশা-টাশা আর কিছু করে না কেউ। কিন্তু ইতিহাসটা কী?'

'ইতিহাস? বিশদ বলতে গেলে সাত দিন সাত রাতেও ফুরোবে না। সংক্ষিপ্ত ভাষণে হচ্ছে, সেই হতভাগা ছোঁড়াটা! যাকে জাম্বুবান বলে জানতে। তার একজন 'প্রাণের বন্ধু' পার্টি-বিরোধে ক্রুদ্ধ হয়ে তার প্রতি বোমা নিক্ষেপ করে ইহকালের মত পদগৌরব শেষ করে দেওয়ায়—'

'তার মানে?'

'মানে অতি সোজা। হাসপাতাল থেকে যখন বেরোল, চিরকালের চেনা পা দুটো নেই।'

'শম্পা!'

'আহা-হা, অমন আর্তনাদ করে উঠো না, রাস্তার লোক কী ভাববে! আচ্ছা আরও সংক্ষেপে সারি—প্রাণের বন্ধু ছাড়াও আলটু-বালটু কিছু বন্ধু ছিল তার, তাদের সাহায্যে দিব্যি সমুদ্রপার হয়ে কূলে উঠেছি—'

'কূলে উঠেছি মানে? তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না শম্পা, স্পষ্ট করে খুলে বল্ সব।'

'পিসি, আর বলতে গেলে তোমার ভাইয়ের বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়তে হবে। আমায় নামিয়ে দাও, বাসে করে চলে যাই!

'বাড়ি যাবি না?'

'আজ থাক্ না।'

পিসি হঠাৎ একটু চুপ করে থেকে আস্তে বলল, 'সেই ভাল, তুই নিজেই যাস।'

তারপর ওই পুলক সঙ্ঘকে বলল, 'কথায় কথায় অনেকটা চলে এসেছি, একে তোমাদের পাড়াতেই পৌঁছতে হবে—'

গাড়ির ব্যাপারে অনেক বারণ করলাম, শুনল না, বলল, 'হাত ছাড়িয়ে রাস্তায় ঝাঁপ দিতে পারিস তো দে। ছেলেটা আর কি করবে, এখানে গলির মুখে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল! অবিশ্যি পিসি ট্যাক্সি-ভাড়াটা দিয়েছিল।'

'এই বস্তির ধারে দিয়ে গেল?'

'উপায় কী? বাসাটা না দেখে প্রাণ ধরে চলে যেতে পারে কখনও? এখন ভাবছি কাজটা ভাল করলাম, না মন্দ করলাম!'

'কোন্ কাজ?'

'এই যে হঠাৎ ধরা দেওয়া! কি জানো, হঠাৎ কী রকম যে একটা লোভ হল!'

ঠিক এই একই কথা ভাবছিল তখন বকুল নামের একটা মানুষ।

'কাজটা ভাল করলাম, না মন্দ করলাম?'

যদি শম্পার মা-বাপ জেনে ফেলে শম্পার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল অথচ আমি তাঁদের বলিনি, কী বলবেন তাঁরা আমায়?

কিন্তু আমি কেমন করে বলব, ওগো তোমাদের মেয়ে নিজে যেচে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে আবার পালিয়ে গেছে। তোমাদের কাছে আসতে চায়নি!

ঘুম হয় না সারারাত।

॥ ২৮ ॥

ডায়েরি লেখা পারুলের আবাল্যের অভ্যাস।

ওই অভ্যাসের জন্যে অমলবাবু নামের ভদ্রলোকটি ক্ষেপে যেতেন। তাঁর ধারণা ছিল স্বামীকেও দেখতে দেওয়া হবে না এমন কিছু লেখা স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত। কিন্তু পারুল এমন অদ্ভুত আশ্চর্য ভাবে ধিক্কার দিয়েছিল যে, জোর করে চেয়ে নিয়ে পড়া সম্ভব হতো না।

অমলবাবু বলেছিলেন, 'কী লেখা হয় ওতে যে, মাঝরাত্তিরে উঠে লিখতে ইচ্ছে করে? ওটা তো তোমার পদ্যর খাতা নয়?'

পারুল হেসে গড়িয়ে পড়েছিল, 'ওমা তুমি আমার পদ্যর খাতাটা চিনে রেখেছো? আমার সম্পর্কে তোমার এতো লক্ষ্য?'

'লক্ষ্যের কিছু অভাব দেখেছো?' বলেছিলেন অমলবাবু।

পারুল হাসি থামিয়ে বলেছিল, 'তা বটে! লক্ষ্যের অভাব? নাঃ, বরং একটু অভাব থাকলে মন্দ হতো না!'

অমলবাবু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'হুঁ, তা এ খাতাটা কিসের?'

'দেখছোই তো ডায়েরির।'

'ডায়েরি! গেরস্থর ঘরের মেয়েছেলের ডায়েরি লেখবার কি আছে?'

'কিছুই নেই। পাগলামি মাত্র।'

'কই দেখি কী নিয়ে পাগলামি!'

বলেছিলেন অমলবাবু হাতটা বাড়িয়ে।

সেই সময় পারুল বেদম হেসে উঠেছিল, 'এমা! দেখবে কি বল? পরের চিঠি পড়ো পড়ো, তাই বলে অন্যের ডায়েরী দেখবে? নাঃ, তুমি বাপু বড়ো বেশী গাঁইয়া! আমার সামনে যা বললে, আর কারুর সামনে বলো না। এটাকে এই তোমার সভ্যতার ওপর ছেড়ে দিয়ে যেখানে সেখানে ফেলে রাখছি, দেখো-টেখো

না যেন।'

'এমন গোপন জিনিস যে স্বামীকেও দেখানো চলে না?'

'দেখানো কেন চলবে না?' পারুল কৌতুকে চোখ নাচিয়ে বলেছিল, 'আমি তোমায় ভয় করি নাকি? তাই তুমি পাছে আমার গোপন কথা জেনে ফেল বলে ভয় পাব? অপরের ডায়েরি দেখাটাই অসভ্যতা। সভ্য সমাজের কতকগুলো আইন আছে মান তো?'

'মানি না' একথা বলতে পারেননি অমলবাবু, তাই বেজার মুখে বলেছিলেন, 'ওসব হচ্ছে বিলিতিয়ানা কথা। বাঙালী-বাড়িতে আবার এই সব!'

পারুল সঙ্গে সঙ্গে মুখটা খুব অমায়িক করে বলেছিল, 'ওমা তাই তো! বাঙালীদের সে সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারতে হয় না তা তো মনে ছিল না। তবে তো দেখছি খাতাটাকে গভীর গোপনে লুকিয়ে রাখতে হবে।'

বলেছিল কিন্তু তা রাখেনি।

ভাঁড়ার ঘরের তাকে ফেলে রেখেছিল।

অথবা সেটাই অমলবাবুর পক্ষে দুর্গম-দুস্তর ঠাঁই বলেই ওই চালাকিটা খেলেছিল। ভাঁড়ার ঘরে চাবি দেওয়ার কড়া নির্দেশ অমলবাবুরই। চাকর-বাকরকে তাঁর দারুণ সন্দেহ।

পারুল যখন বলেছিল, 'সর্বদা চাবি দিয়ে রাখব, ভাঁড়ারে এমন কি আছে? টাকা না গহনা, নাকি শাল-দোশাল—? দুটো চাল ডাল তেল নুন বৈ তো নয়।' তখন অমলবাবু পারুলকে 'ন্যাকা' আখ্যা দিয়েছিলেন।

অতএব পারুল একনিষ্ঠ চিত্তে ভাঁড়ারে চাবি লাগায় এবং সে চাবি কোথায় যে রাখে কে জানে! আঁচলে চাবি বাঁধার যে একটা চিরন্তন রীতি আছে বাঙালী মেয়েদের, সেটা আবার পারুলের হয়ে ওঠে না। আঁচলে চাবি বাঁধার অভ্যাস তার এতাবৎকাল নেই।

পারুল যখন ভাঁড়ারে থাকে, কাজকর্ম করে, তখন কিছু আর সামনে থেকে ফস করে টেনে নেওয়া যায় না। আর পারুল যখন বাড়িছাড়া হয়ে কোথাও যায়, চাবিটা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অবিশ্যি কোথায় আর যেত পারুল, হয়তো পাশের বাড়ির 'কনক মাসিমা'র কাছে। মফঃস্বলে যে রকম পাড়া-বেড়ানোর প্রথা, পারুল তেমন বেড়াতে পারত না অমলের ভয়ে নয়, নিজের বিতৃষ্ণায়। ওটা ওর নিজের রুচিতেই ছিল না।

সময়ের মত মূল্যবান আর কি আছে? সেই সময়টাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে মানুষ! বই খাতা কিছুও যদি না থাকে, নিজের মনটা নেই? তাকে নিয়েই কাটিয়ে দেওয়া যায় না বাড়তি পেয়ে যাওয়া সময়টুকু?

শুধু কনক মাসিমার সঙ্গে রুচির কিছু মিল ছিল বলেই মাঝে মাঝে যেত।

তবু ওরই ফাঁকে একদিন দু-একটা পাতায় চোখ বুলিয়ে ফেলেছিলেন অমলবাবু, ছুতো করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে তাকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, বৌয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্কের ভাবে খাতাটার পাতা উল্টে।

কিন্তু দেখে লাভ হয়নি কিছু, একখানা পৃষ্ঠার পুরো পাতাটার নীচে মাত্র একটি লাইন, 'মানুষ নামের জীবটা কী হাস্যকর! বিধাতার সৃষ্টির গলদ!'

পরের পৃষ্ঠায় সেইভাবে লেখা, 'অথবা জাতটা নিজের যথার্থ পরিচয় ভুলে মেরে দিয়ে নিজেকে হাস্যকর করে বসে আছে। বিধাতার সৃষ্টিতে গলদ ছিল না।'

আর একটা পৃষ্ঠায় লেখা, 'আজকের মধ্যরাত্রির আকাশটা কী অপূর্ব! চাঁদ না-থাকা আকাশ কী অসম্ভব সুন্দর!'

এই জিনিস লিখে মানুষ সময় নষ্ট করে? আবার সেটা অন্যকে দেখানো চলে না? রাবিশ!

পারুল এখনও মাঝে মাঝে ডায়েরি লেখে।

এখনো তেমনি ছিরিছাঁদের অভাব। আর ভঙ্গীটাও তেমনিই।

যেন মুখোমুখি বসে কারও সঙ্গে কথা বলছে।

আজ লিখছিল, 'মনের মধ্যে বেশ একটু অহঙ্কার জন্মে গিয়েছিল, তোমাদের নীতিনিয়মের ওই সব বহুবিধ দায়ের বোঝা আমি আর বয়ে মরি না।...অহঙ্কার ছিল, 'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি ছুটিনে কাহারো পিছুতে। মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে'। সে অহঙ্কারটা ভাঙতে বসেছে।...অহঙ্কার ছিল, 'যাঁর বেড়ি তাঁরে ভাঙা বেড়িগুলি ফিরায়ে বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ উঠেছি।'

কিন্তু এখন যেন টের পাচ্ছি সব বেড়ি ভাঙা সহজ নয়। সমাজের দায়, সংসারের দায়, চক্ষুলজ্জার দায়, মমতার দায়, সব কিছু ত্যাগ করলেও, একটা দায় কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না। সেটা হচ্ছে মানবিকতার দায়।...ওই যে ছেলেটা টেবিলে মাথা ঝুঁকিয়ে একমনে স্কুলের পড়া তৈরী করছে, ওর মনের মধ্যে কী ঝড় তুফান উঠছে তার চিন্তায় আমার মনে প্রবল তুফান উঠছে। স্থির থাকা দায় হচ্ছে।

আচ্ছা, এটা কি স্নেহের দায়?

ছেলেটার মায়ায় পড়ে গেছি বলেই?

পাগল! ওসবের ধার পারু বামনী ধারে না। আজ যদি ওর মা-বাপের শুভমতি হয়, কাল আর ভাবি না—'আজকের দিনটা থাকুক আমার কাছে ছেলেটা।'...যদিও আমার প্রতিবেশিনীরা এখন মহোৎসাহে বেড়াতে আসতে শুরু করেছেন, এবং এই কথাটি বলতে পেয়ে আনন্দের সাগরে ভাসছেন, 'এইবারে দিদি আমাদের জব্দ হয়েছেন! এখন রাজা ভরতের দশা হল। হরিণছানাটির জন্যে সব দরকার হচ্ছে। সব আহরণ করতে হচ্ছে।'

আবার আর এক দল হিতৈষীও যাঁরা সখেদে বলেন, 'দেখছেন তো দিদি যুগের ধর্ম! মা-বাপ ওই দামাল বয়েসের ছেলেকে বুড়ো ঠাকুমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে। একটা ছেলের কী কম হ্যাঁপা? আহা, আবার ওর জন্যে মাছ-মাংসের পত্তন করতে হচ্ছে। তবে এও বলি দিদি, আপনার আবার বেশী মায়া! কেন দুধ ঘি ছানা মাখনে কি পুষ্টি নেই? তাই আপনি ওই ক্ষুদে ছেলেটার জন্যে এতকাল পরে ওই সব ছুঁয়ে মরছেন! আর মাছটা যদিও বা করলেন, মাংস, ডিম, এতো কেন?...তাছাড়া যতই করে মরুন, শেষ অবধি কি ওই ছেলে আপন হবে? হবে না দিদি, এই আমি আপনাকে স্ট্যাম্পো কাগজে লিখে দিতে পারি, কার্যকালে ঠিকই আমে-দুধে মিশে যাবে, আঁটি আঁস্তাকুড়ে রবে। নিজেই মরবেন মায়ায়।'

শুনে শুনে খুবই হাসি পায় বুঝলে?

মায়া নামক বস্তুটার সংজ্ঞা কী তাই ভাবতে চেষ্টা করা। অভিধানে আছে 'বিভ্রান্তি,'...'অলীক,' 'যেটা যা নয় তাই দেখা,' 'দৃষ্টিভ্রম' ।—আবার এও আছে —'মমতা' 'স্নেহ'। কোনটা সঠিক মনে হয় তোমার?

কাকে যে সম্বোধন করে লিখছে কে জানে।

লিখছিল, হঠাৎ নীতিটা পড়তে পড়তে উঠে এল।

বিনা ভূমিকায় বলল, 'বাবাকে লিখে দাও আমায় বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিতে।'

পারুল প্রায় চমকে উঠল!

তবু সামলে নিয়ে বলল, 'কেন হে মহারাজ, হঠাৎ এই আদেশ্ কেন?'

'এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

'সে তো না লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু বোর্ডিঙে গেলেই ভাল লাগবে মনে হয়?'

'লাগাতে চেষ্টা করব।'

'তা এখানেই সেই চেষ্টাটা করে দেখ না।'

'না।'

উদ্ধত উত্তর দিল ছেলেটা।

'তবে তো লিখতেই হয় বাবাকে। তা তুই নিজেই লেখ্ না।'

রাজা, পারুল যাকে 'মহারাজ' বলে, তেমনি উদ্ধতভাবে বলে, 'না, তুমি লিখে দাও।'

'বাঃ! তোর বাবা, তুই লিখবি না কেন?'

'বলছি তো, না!'

ছেলেটার সুকুমার শিশুমুখে একটা অনমনীয় কাঠিন্য।

পারুলও একটু কাঠিন্য দেখায়।

বলে, 'কিন্তু আমি কেন লিখতে যাব বল্? তোর এখানে অসুবিধে হচ্ছে তুই সেটা জানাবি—'

রাজা লাল-লাল মুখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি বলেছি এখানে অসুবিধে হচ্ছে?'

'ওমা, তা না হলে হঠাৎ বোর্ডিঙে ভর্তি করার কথা উঠবে কেন? আমি তো সাত দিন সাত রাত বসে ভাবলেও এটা মাথায় আনতে পারতাম না। আমি হঠাৎ এমন কথা লিখলে বাবা ভাববে আমিই তোকে ভাগাতে চেষ্টা করছি।'

'কক্ষনো ভাববেন না। বাবা তোমায় চেনেন না বুঝি?'

'চেনেন বুঝি!' পারুল সকৌতুকে বলে, 'আমি তো জানতাম আমায় কেউ চেনে না।'

রাজা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'তোমার কথার মানে বোঝা যায় না।'

পারুল এবার শান্ত গলায় বলে, 'আচ্ছা রাজা, তোকে যদি আমি বাবাকে লুকিয়ে তোর মার কাছে রেখে আসি?'

রাজা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'তোমরা সবাই মিলে আমায় এত জ্বালাতন করছ কেন? শুধু বোকার মত কথা!'

না, কেঁদে ফেলে না, শুধু মুখটা আগুনের মত হয়ে ওঠে।

পারুল কি এই ছোট্ট ছেলেটাকে ভয় করবে?

হয়তো ভিতরে ভিতরে ভয়ই আসে পারুলের। তবু সাবধানে হালকা গলায় বলে, 'বুড়োদের দশাই ওই, বুঝলি? সবাইকে জ্বালাতন করে মারে, আর বোকার মত কথা বলে। তা যাকগে, সত্যিই বলছি শোন্, আমি ঠিক করেছি তোর বাবাকে না বলে-টলে চুপিচুপি তোকে নিয়ে—'

ব্যাপারটা যেন খুব কৌতুকের এইভাবে বলে পারুল, 'তোকে নিয়ে—সোজা তোর মায়ের কাছে! ব্যাস, বাবা যখন এসে বলবে, কই মা, রাজা কই? আমি তখন বেশ বোকাটি সেজে বলব, কি জানি বাপু, সে যে সুটকেস-ফুটকেস নিয়ে কোথায় কেটে পড়ল একদিন—'

রাজা এই ছেলে-ভুলনো কথায় দারুণ চটে যায়, অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে, 'বেশ তোমায় লিখতে হবে না, আমিই বাবাকে লিখে দিচ্ছি, বোর্ডিঙে ভর্তি করে

দিয়ে যেতে।'

পারুল গম্ভীর হয়।

শান্ত গলায় বলে, 'দেখ্ রাজা, তোর বাবার খামখেয়ালীর জন্যে সবাই মিলে কষ্ট পাবি কেন? মার জন্যে তোর কত মন কেমন করছে—'

কথার মাঝখানে রাজা বলে ওঠে, 'ছাই করছে।'

'করছে রে করছে। আচ্ছা বেশ, না হয় নয়, কিন্তু বোনটির? বোনটি তো তোকে দেখতে না পেয়ে—'

'তোমরা আমায় একটু শান্তি দেবে?' বলে ঘর ছেড়ে চলে যায় রাজা।

পারুল চুপ করে বসে থাকে সেই দিকে তাকিয়ে। আর ডাকাডাকি করে না ওকে। সাহস হয় না।

একটু পরে নিজেই ফিরে আসে ছেলেটা, একটুকরো কাগজে ক'লাইন লিখে পারুলের সামনে ফেলে দিয়ে বলে, 'এই নাও। তোমার চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দিও।'

পারুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সেই লাইন-দুটোর ওপর।

'আমায় বোর্ডিংে ভর্তি করে দেবে। তোমার যা খরচ হবে, আমি বড় হয়ে শোধ করে দেব।'

সেই রাত্রে পারুল তার সেই ছিরিছাঁদহীন খাতাটায় লিখে রাখে, 'একটা খামখেয়ালী পুরুষ পরিণাম-চিন্তাহীন একটা খেয়ালের বশে একটা মেয়ের স্বামী সংসার সন্তান সব কেড়ে নিয়েছে, ভেবেছিলাম অন্ততঃ সন্তানটাকে ফেরত দেব তাকে, দেখছি আর উপায় নেই। আর ফেরত দেওয়া যাবে না।'

হ্যাঁ, পুরুষটাকেই দোষ দিল পারুল, নিজের ছেলে হলেও। হয়তো পুরুষকেই বিচক্ষণ হতে হবে এই সহজাত ধারণায়।

॥ ২৯ ॥

মায়ের চিঠি চিরদিনই গভীর ভালবাসার বস্তু। যেদিন আসত, সেদিন যেন শোভনের চোখেমুখে আহ্লাদের আলো জ্বলত, আর ছোট্ট একটু চিঠি পড়তেই কতখানি যে সময় লাগত!

পারুল হয়তো জানত না এমন ঘটনা ঘটে। রেখা এই নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়ত না, বলত, 'পড়ে পড়ে তো মুখস্থ হয়ে গেল, আর কতবার পড়বে?'

শোভন অপ্রতিভভাবে বলত, 'না, একটা জায়গা ঠিক পড়া যাচ্ছে. না, অক্ষরটা কেমন জড়িয়ে গেছে।'

রেখা চোস্ত গলায় বলত, 'অক্ষর জড়িয়ে যাবার কোন প্রশ্নই নেই। তোমার মার হাতের লেখা তো ছাপার অক্ষরের মত।'

শোভন যে কেন অপ্রতিভ হত তা শোভনই জানে। শোভন তো অনায়াসেই বলতে পারত, 'তোমার মার চিঠিও তুমি কম বার পড় না।'

কিন্তু ওই সহজ কাজটা পেরে উঠত না শোভন, তাড়াতাড়ি চিঠিটা তুলে রেখে দিত।

অথচ পেরে উঠলে হয়তো জীবন এমন জটিলতার পথে গিয়ে পৌঁছত না। যতই তুমি ভদ্র হও, মার্জিত হও, মাঝে-মধ্যে প্রতিবাদে মুখর হবারও দরকার আছে।

অপ্রতিবাদ অন্যায় দুঃসাহসের জন্মদাতা।

এখন রেখা এখানে নেই, মায়ের চিঠি একশোবার পড়লেও কেউ ব্যঙ্গ হাসি হেসে উঠবে না, তবু একবার মাত্র পড়েই চিঠিখানা টেবিলে ফেলে রেখে পাথরের মত বসে আছে কেন শোভন?

মা তো তীব্র কোন তিরস্কার করেনি চিঠির মাধ্যমে, কোন ধিক্কার বাক্যও পাঠায়নি। তবু ওই চিঠিটা জ্বলন্ত আগুনের মত লাগছে কেন তার? শুধু ওই চিঠিটার জন্যে? নাকি তার সঙ্গের ওই একটুকরো কাগজের এক লাইন লেখাটুকুই অগ্নিবাহী?

রাজাকে ভাবতে চেষ্টা করছে শোভন, ওই লেখাটার সঙ্গে মেলাতে পারছে না কিছুতেই! শোভন এখন রাজার জন্যে যা করবে, রাজা বড় হয়ে তার পাই-পয়সাটি পর্যন্ত শোধ করে দেবে, এখন থেকে বাপকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখল রাজা।

অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করল, এটা কোন ব্যাপারই নয়, একেবারেই ছেলে-মানুষের ছেলেমানুষী। ওখানে যে থাকতে ভাল লাগছে না, এটা হয়তো ঠিক, অথচ এখানে আসার উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না, তাই বোর্ডিঙের কথা মাথায় এসেছে।

আর ওই প্রতিশ্রুতিটা, স্রেফ প্রস্তাবটাকে জোরালো করবার জন্যে। পাছে বাবা বলে বসে—'ও বাবা, বোর্ডিং? সে তো দেদার খরচের ব্যাপার। যা-তা জায়গায় তো দিতে পারবো না—'

তাই আগে থেকেই সে পথ বন্ধ করে দেবার চালাকিটি খেলেছে।

কিন্তু চেষ্টা করে ভাবা ভাবনাটাকে কি বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? না তার থেকে নিশ্চিন্ততার ফল মেলে?

ভাবনাটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, আর একটা অজানা ভয় যেন গ্রাস করতে আসছে শোভনকে। হ্যাঁ ভয়, ভয়ই।

চাঁদের টুকরোর মত এক টুকরো ছেলে রাজার হাতের এক টুকরো লেখা যেন শোভনের সর্বনাশের ইশারা বহন করে এনেছে।

অনেকক্ষণ পাথরের মত বসে থেকে মায়ের চিঠিখানা আবার তুলে নিল শোভন. নিয়ে পড়তে লাগলো। মা লিখেছে—

'শোভন, ছেলেটার যন্ত্রণা আর চোখে দেখতে পারছিলাম না। তাই মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি জেগেছিল। ভেবেছিলাম, আমার কপালে যা থাকে থাক, পরে তুই আমায় জেলেই দিস আর ফাঁসিই দিস, মার কাছ থেকে কেড়ে-আনা ছেলে-টাকে চুপিচুপি আবার তার মার কাছেই ফেরত দিয়ে আসি। তুই তার স্বামী কেড়ে নিয়েছিস, সংসার কেড়ে নিয়েছিস, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পরিচয় কেড়ে নিয়েছিস. আবার সন্তানটাকেও নিলি ভেবে বুকে বড় বাজছিল, কিন্তু দেখলাম, দুষ্টু বুদ্ধিটা মাঠে মারা গেল, আর উপায় নেই। ফেরত দেওয়া যাবে না।

তা বলে ভাবিস না জিনিসটা তোরই রয়ে গেল!

না, সে আশা করিস না শোভন।

ওর জগতে আর মাও নেই, বাপও নেই। একটা নির্দোষ নিশ্চিন্ত শিশুকে শুধু তোদের দুর্মতির খেয়ালে একসঙ্গে পিতৃমাতৃহীন করে ছেড়েছিস।

ওই কচি বাচ্চাটাকে এখন সেই ভয়ঙ্কর শূন্যতার, আর ভয়ঙ্কর ভারী একটা পাথরের ভার নিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে রাখতে চলতে হবে।

ভগবানের হাতের মার তবু সহ্য হয়, মানুষের মারটা অসহ্য।

কিংবা হয়তো সবটাই ভগবানের হাত থেকে আসে, মানুষ নিমিত্তটার ভাগী

হয় মাত্র।

যাক গে বাহ্নল্য কথা, ছেলেটাকে তুই দেখেশ্নেে একটা বোর্ডিঙেই ভর্তি করে দে, জবরদস্তি করে তোর ইচ্ছেটা ওর ওপর চাপাতে চেষ্টা করিস না, শেষরক্ষা হবে না।

এখন কি মনে হচ্ছে জানিস, তোর সেই পরলোকগত পিতৃদেব অমলবাব্নর সঙ্গে তোর আসলে কোনই তফাৎ নেই।

তিনিও লোক হিসেবে কিছ্ন খারাপ ছিলেন না, ভদ্র মার্জিত সৎ! শ্নধ্ন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী-প্নত্রকে নিজের তৈরী নক্সার ছাঁচে ঢালাই করতে চেয়েছিলেন, তারা যে আসলে মালমশলা নয়, রক্ত-মাংসের মান্নষ—এটা খেয়াল করেননি...তুইও করলি না, করছিস না।

এখন আর তোর মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার ওই স্মৃতিশক্তি জিনিসটা একট্ন বেয়াড়া রকমের বেশী, তাই সব মনে থাকে, মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ছে, রেখা যখন তোর কাছে এল, তখন রেখা গঙ্গামাটি দিয়ে শিব গড়ে প্নজো করতো। ওর বাপের বাড়িতে ওসবের চল ছিল। ওর ওই শিবপ্নজো নিয়ে তুই এমন হাসি-ঠাট্টা শ্নর্ন করলি যে, ও বেচারী লজ্জাটজ্জা পেয়ে বন্ধ করে দিল।—তারপর ঘর করতে এসে শোবার ঘরের আলমারির মাথায় লক্ষ্মীর পট আর ঘট বসিয়ে দ্নবেলা শ্নধ্ন একট্ন ধ্নপ জ্বালতো, সেও তোর হাসি ঠাট্টার ঘায়ে একদিন উড়ে গেল।

সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, আমিও এসব দেখে হেসেছি, কিন্তু সেটা মনে মনে। তুই ম্নখের ওপর হাসলি।—তার পর কলসীর মধ্যে থেকে দৈত্য বেরলো।

তোর যত পদোন্নতি হতে থাকল, ও তত মডার্ন হতে থাকল। ক্রমশঃ গ্নর্নমারা বিদেয় 'পি এইচ ডি' হয়ে গেল তোর বৌ। তুই ওর নাগাল পেলি না আর।

ওর এখনকার যা র্নপ, সে তোরই সৃষ্টি। এখন তুই হঠাৎ 'ভারতীয় ভাবধারা'য় ভিজতে বসলি, সনাতনী হলি, আর সম্নদ্রে-গিয়ে-পড়া নদীকে ফের পাহাড়ের গ্নহায় এনে ফেলবার বায়না ধরলি! যা হয় না তা হওয়াবার চেষ্টা করলে এমনই হয় শোভন! কাঁচা মাটিকে ছাঁচে ফেলে প্নড়িয়ে শক্ত করার পর আর কি তাকে নতুন ছাঁচে ঢালা যায়? যায় না, শ্নধ্ন তুই যা করেছিস তাই করা যায়, ভাঙা যায়। কেউ ভেতরে ভাঙে, কেউ বাইরে ভাঙে।

আশীর্বাদ নিস।

—মা'

শোভন তার স্নন্দর কোয়ার্টার্সের বিরাট লনে বসেছিল—বাগানে পেতে বসার উপয্নক্ত স্নন্দর শৌখিন আসনে।

শোভনের পরনে দামী টেরিলিন ট্রাউজার, হালকা ফাইন নাইলনের ব্নশশার্ট, পায়ের চটিটাতে পর্যন্ত আভিজাত্যের ছাপ। শোভনের ওই কোয়ার্টার্সের মধ্যে ঢ্নকে গেলেও দেখা যাবে আগাগোড়াই স্নন্দর শৌখিন আর স্নর্নচিমণ্ডিত। ঐশ্বর্যের সঙ্গে র্নচির পরিচয়ও বহন করছে শোভনের সংসার।

শোভনের সংসার?

সেটা কী?

সে কি ওই বাড়িটা? ওই খাট আলমারি, সোফা ডিভান, ফ্রীজ, কুকিং-রেঞ্জ, ডিনার-সেট, ডাইনিং টেবল?...সংসার মানে ব্নককেসের ওপর সাজানো পিতলের ব্নদ্ধম্নর্তি (নিত্য যাকে ব্রাসো ঘষে চকচকে রাখা হয়), দেয়ালে টাঙানো নেপালী ঢাল, বারান্দায় ঝোলানো অর্কিড, জানলায় বসানো ক্যাকটাসের বৈচিত্র্য?

তাহলে অবিশ্যি বলতেই হয় শোভনের সংসার যথাযথই বজায় আছে। কারণ শোভনের সংসারে একাধিক সুদক্ষ ভৃত্য আছে, যাদের দক্ষতার শিক্ষা দিয়ে গেছে একদার সুদক্ষ গৃহিণী।

শোভন যদি এখন পূর্ব অভ্যাসে একটা পার্টি দেয়, তাহলে সুব্যবস্থায় এতটুকু চিড় খাবে না। তৎসত্ত্বেও যদি অতিথিরা মনে মনে ভাবে, শ্মশানের ভূমিতে নেমন্তন্ন খেতে এলাম কেন আমরা—তাহলে বলার কিছু নেই।

বসে থাকতে থাকতে একসময় বয় এসে প্রশ্ন করল, সাহেবের চা-টা এখানেই আনা হবে কিনা।

কর্মস্থল থেকে ফিরে শোভন যে বেশ পরিবর্তন করেনি, এসেই লেটারবক্সের চাবি খুলেছে, সেটা সে দেখেছে।

ওদের মহলে 'সাহেব' এবং 'মেমসাহেব'কে নিয়ে যে-সব আলোচনা হয়, ভাগ্যিস সাহেবের কর্ণগোচর হয় না!

শোভন বলল, 'না, ভিতরে যাচ্ছি।'

তারপর একসময় ভিতরে এল।

শোভনের কাছে একটা ফুলের মত মেয়ে আর দেবদূতের মত ছেলে ছুটে এল না, 'বাপী আজ তোমার এত দেরি হল কেন?' বলে অনুযোগ করল না, শুধু যেন সমস্ত পরিবেশটাই মৌন গম্ভীর একটা অভিযোগের মূর্তিতে তাকিয়ে বসে আছে।

আজ বাতাসও কি অসহযোগিতা করছে? পর্দাগুলো উড়ছে না কেন? টেবিল-ঢাকার কোণগুলো? ওগুলো এলোমেলো উড়লেও যেন মনে হয় কোথাও কোন-খানে প্রাণের স্পন্দন আছে।

দু-তিনটে ঘর চাবিবন্ধ আছে, মগনলাল খোলে, আবার ঝাড়মোছা করে বন্ধ করে রেখে দেয়। আচ্ছা, বাড়িটা কি হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেল! রেখা যে কেবলই বলত, 'আর একখানা ঘর বেশী থাকলে বাড়িটা সত্যিই আইডিয়াল হত!'

তার মানে জায়গায় কিছু ঘাটতি পড়ছিল। শোভন সেটা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব না করলেও এমনি অনুভব করত, সত্যি—সবটাই ভরা-ভর্তি।

দু-একটা মাত্র মানুষের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে এত বিরাট পার্থক্য ঘটে!

শোভন তো যে-সে কেরানীবাবু নয় যে, মন লাগছে না বলে কিছু না খেয়ে শুয়ে পড়ে থাকবে? শোভনকে ভৃত্যবর্গের কাছে 'সাহেবে'র সম্মানটা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

চায়ের পর্ব মিটিয়ে শোভন সামনের একটা ঘরের দরজা খুলল, পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। এটা ওদের দু ভাইবোনের খেলাঘর ছিল! দুজনের হলেও ঘরের বারো আনা অবশ্যই 'একজনে'র। তার দোলনা ঘোড়া, তার রেলগাড়ি মোটরগাড়ি উড়োজাহাজ, তার কুকুর খরগোস হাতী পাখি, আর বহু-বর্ণের বহু-মাপের বহু-বৈচিত্র্যময় পুতুলের মেলা।

আচ্ছা, খুকুর ওই পুতুলগুলোকে নিয়ে যায়নি কেন রেখা? রেখা কী নির্মম। শোভন তো রাজার খেলবার বস্তুগুলো যতটা পেরেছে, তার সঙ্গে দিয়ে এসেছে।

যদিও সেগুলোয় ব্যবহারের হাত পড়ছে না, গঙ্গার ধারের সেই বাড়িখানার একটা ঘরে বোঝাই হয়ে আছে। তবু ওর চোখের সামনে তো আছে!

আর ওই পুতুলগুলো?

ওদের আবার চোখ রয়েছে। বড় বড় বিস্ফারিত সব চোখ।

ওই চোখগুলো মেলে ওরা শোভনের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

পুতুলের চোখে কি দৃষ্টি থাকে? সে দৃষ্টিতে ব্যঞ্জনা থাকে? ভর্ৎসনা থাকে? তীব্র? করুণ?

শোভনের মনে হল, রয়েছে।

শোভন সেই তীব্রতার সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলো।

শোভনের কোথায় যেন কী একটা 'অসহ্য' হচ্ছিল, তাই শোভন ওই পুতুলের মালিককে চলে যেতে দিয়েছে। অথচ শোভন এগুলো সহ্য করে যাচ্ছে।

সহ্য করে যাচ্ছে, একটা মেয়ে-মনের ভালবাসায় তিল তিল করে গড়া এই সংসারটাকে, সহ্য করে যাচ্ছে প্রকাণ্ড ডিনার-টেবলটার একধারে বসে একা খাওয়া, বসবার ঘরের একটা ডিভানে তুচ্ছ একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে থাকা।

সহ্য করে যাচ্ছে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে একটা নিঃশব্দ প্রেতপুরীর মাঝখানে অভ্যস্ত নিয়মে ঘুরেফিরে কাজের জায়গায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হওয়া।

ক'দিন যেন একটা ঘোরে ছিল, ঠিক অনুভব করতে পারছিল না সত্যি কি ঘটে গেছে। আজ মায়ের চিঠি যেন প্রবল একটা নাড়া দিয়ে জানিয়ে গেল ঘটনার স্বরূপ কি!

॥ ৩০ ॥

বকুলকে যে হঠাৎ এমন একটা প্রস্তাবের মুখোমুখি হতে হবে, তা কোনদিন কল্পনা করে নি সে।

সেই অকল্পিত অবস্থায় ভাসমান নৌকোয় পা রেখে বকুল তার প্রায় অপরিচিত জ্যাঠতুতো দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একটু আগে বকুল যখন তাদের 'সাহিত্যচক্রে'র পুনর্মিলনের অধিবেশন সেরে বাড়ি ফিরেছিল, তখন বড়বৌদির ঝি খবর দিয়ে গিয়েছিল, 'পিসিমা, আপনাদের দর্জিপাড়ায় না কোথায় যেন কে জ্ঞাতি আছে, সেখান থেকে আপনার বুঝি কোন্ দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে অনেকক্ষণ বসে আছে।'

খুব ক্লান্ত লাগছিল ; আবার এখন কার সঙ্গে কী কথা কইতে হবে, কত কথা কইতে হবে কে জানে। বকুলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যখন তিনি এতক্ষণ বসে আছেন, তখন যে সহজে ছাড়বেন এমন মনে হয় না।

আর এমনও মনে হয় না, বকুলের উপকার হতে পারে বা লাভ হতে পারে, এ রকম কোন বিষয় নিয়ে এসে বকুলকে সেটুকু উপঢৌকন দেবার জন্যে বসে আছেন।

বাইরের কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুতে ধুতে ভাবতে চেষ্টা করল বকুল, কী হতে পারে? ও-বাড়ির সেই ছোটকাকার ছেলের মত কোন অসুবিধেজনক প্রস্তাব নিয়ে আসেননি তো? তাহলেই মুশকিল।

ও-বাড়ির সেই সেজদা, যাঁকে অন্য কোথাও দেখলে চট করে চিনে ফেলা শক্ত বকুলের পক্ষে, কারণ সব থেকে যারা নিকটজন তাদের সঙ্গেই সব থেকে দূরত্ব!

আসা-যাওয়ার পাটই নেই, ছেলে-মেয়ের বিয়ের সময় মহিলাদিগের 'প্রীতিভোজ' সম্বলিত কার্ডসহ যে নিমন্ত্রণপত্র এসে পৌঁছয়, তার সূত্রেই যা আসা-যাওয়া।

তবু বকুলের সেই খুড়তুতো ভাই এসে বলে উঠেছিল, 'তোমাকে একটা কাজ

করে দিতে হবে।'

সেদিনও বকুল বুঝেছিল কাজটা খুব সহজ নয়, হলে সেই ভদ্রলোক এসে এমনি বসে থাকতেন না।

নরম হয়ে বলেছিল, 'কি বলুন?'

তিনি খুব অমায়িক গলায় বলেছিলেন, 'আমাকে আবার "আপনি আজ্ঞে" কেন রে? আমি কি পর? কাকা আলাদা বাড়িতে চলে এসেছিলেন তাই অচেনা, নচেৎ একই বাড়ি। একই ঠাকুমার নাতি-নাতনী আমরা।'

বকুলের তখন মনে পড়েছিল, 'একই ঠাকুর্দা-ঠাকুমার বংশধর—' এই প্রসংগ উল্লেখ করে ইনি একদা তাঁর কাকাকে যৎপরোনাস্তি যাচ্ছেতাই করে গিয়েছিলেন বকুলের বিয়ে না দেওয়ার জন্যে। এতে নাকি তাঁদের বংশেও কালি পড়ছে, তাঁদের মুখেও চুনকালি পড়ছে।

অথচ বকুলের থেকে তিনি বয়েসে খুব যে বড় তাও নয়।

'সে যাক, সে তো তামাদি কথা', বকুল নম্র হয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা কী করতে হবে শুনি?'

অর্থাৎ 'তুমি আপনি' দুটোকেই এড়িয়েছিল।

দাদাটি বলে উঠেছিলেন, 'বিশেষ কিছু না রে ভাই, যৎসামান্য একটু কাজ। আমার ছোট ছেলেটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করছে, তোকে তার জন্যে একটা ক্যারেক্টর সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে।'

শুনে অবশ্যই বকুলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

বকুল প্রায় থতমত খেয়ে বলেছিল—'কিন্তু আমি তো তাকে চিনিই না, হয়ত দেখিওনি—'

দাদা বিগলিত হাস্যে বলেছিলেন, 'দেখেছ নিশ্চয়ই, বিয়ে-থাওয়া কাজেকর্মে, তবে সে হয়ত তখন হাফ প্যাণ্ট পরে জল পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে। আর চেনার কথা বলছিস? বলি আমাকে তো চিনিস? নাকি চিনিস না?'

এই নিতান্ত অন্তরঙ্গতায়—'তুই' 'তুই' শব্দটা কানে খটখট করে বাজছিল, বকুল তাতে মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিল। সত্যিই তো নিতান্ত আপনজন। এঁর বাবা আর আমার বাবা একই মাতৃগর্ভজাত।

বকুল বলেছিল, 'আপনাকে চিনি না, কী যে বলেন! কিন্তু এখনকার ছেলেদের সম্পর্কে চট করে কিছু বলা তো মুশকিল। কি ধরনের বন্ধুদের সঙ্গে মেশে, হয়ত আপনার নিজের ছেলেকে নিজেই ভাল করে চেনেন না সেজদা!'

সেজদা উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠেছিল, 'কেউ এসে কিছু লাগিয়েছে বুঝি? কিন্তু আমি এই তোমায় বলে দিচ্ছি বকুল, রকে বসে বলেই সে রকবাজ ছেলে? নিজের বাড়ির রকে বসে, ছেলেবেলা থেকে যাদের সঙ্গে চেনা সেই ছেলেরা এসে গল্প-গাছা করে এই পর্যন্ত। তারা যে যেমন হোক, আমার প্রভাংশু সে জাতেরই নয়।'

সেজদা তাঁর ছেলের জাতি সম্পর্কে নির্ভয়ে যত বড় সার্টিফিকেটই দিন, তাঁকে ফেরাতে হয়েছিল বকুলকে।

বলেছিল, 'একেবারে না চিনে এভাবে লিখতে অসুবিধে বোধ করছি সেজদা!'

সেজদা অপমানাহত হয়েই চলে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন, 'বাইরের জগতে তোমার একটু নামডাক আছে বলেই বলতে এসেছিলাম, নইলে সেজখুড়িমা আমাদের যে রকম অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন তাতে এ-বাড়িতে পা দেবার কথা নয় আমাদের।'

অনামিকা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সেই ক্রোধারক্ত মুখের দিকে, আর ক্ষণ-

পূর্বের বিগলিত-হাস্য-মুখটার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করছিলেন।

যাক, সেই তো এক ঘটনা ঘটে বসে আছে ও-বাড়ির সঙ্গে। আবার কী?

সেদিন ছোটবৌদি বলেছিল, 'লিখে দিলেই হত বাপু দু'লাইন, আপনার লোকের ছেলের একটু উপকার হত। কোন উপকারেই তো লাগি না।'

ছোড়দা বলেছিল, 'না না, ও ঠিক করেছে। জানা নেই কিছু নেই, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিলেই হল? এখনকার ছেলেরা তো দুধে-দাঁত ভাঙবার আগেই পলিটিক্স করছে। কে কোন্ পার্টিতে ঢুকে বসে আছে কে জানে!'

'বন্ধুবিচ্ছেদ হল এই আর কি!'

বলেছিল ছোটবৌদি।

তখন শম্পা ছিল।

তখন বিচ্ছেদ শব্দটর মানে জানত না ছোটবৌদি। ওকেই বিচ্ছেদ বলেছিল।

সে যাক, আজ আবার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে কোন্ পরিস্থিতিতে ফেলবেন কে জানে!

তবু এটা ভাবেনি। এটা অভাবনীয়।

ও বাড়ির বড়দা প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন, 'তোমার তো অনেক জানাশোনা, শুনলাম 'ম্যাজিসিয়ান অধিকারী' তোমায় খুব খাতির করে, আমার এই নাতনীটাকে যদি ওদের দলে ঢোকাবার একটু চান্স পাইয়ে দিতে পার!'

বকুলের মনে হয়েছিল বাংলা কথা শুনছে না, যে ভাষা শুনছে তা বকুলের অবোধ্য! বকুল অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'কোন্ দলে?'

'আহা ওই ম্যাজিকের দলে!'

বকুল প্রায় অভিভূতের মত বলে ফেলে, 'ও ম্যাজিক জানে?'

'আহা ম্যাজিক না জানুক, ম্যাজিকের দলে অনেক মেয়েটেয়ে নেয় তো। সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদের চাহিদা আছে। এই যে বেবির একটা ফটো সঙ্গে এনেছি, এটা তুমি দেখাবে।'

বড়দা পকেট থেকে একটি খাম বার করে তার থেকে সন্তর্পণে একখানি ফটো বার করে টেবিলে রাখেন।

বকুল তুলে নেয় হাতে করে। চেয়ে থাকে ছবিটার দিকে।

অনেকটা যেন তার দিদি চাঁপার মত দেখতে। বংশের গড়ন থাকে, কাছে দূরে কোথাও কোথাও সেটা ধরা পড়ে।

মেয়েটা যেন বড় বড় চোখে তাকিয়ে রয়েছে, ফটোটা তোলা ভাল হয়েছে।

বকুল কি বলবে ভেবে না পেয়ে একটা অবান্তর কথা বলে বসে, 'কোনখান থেকে তুলিয়েছেন ফটোটা?'

'ভারত স্টুডিও থেকে। কেন, ভাল হয়নি?'

'ভাল হয়েছে বলেই বলছি।'

'বললে তুমি কি মনে করবে জানি না বকুল, দেখতে আরও ভাল। এ ফটো যদি তুমি একবার দেখাও, লুফে নেবে। তাছাড়া অন্য কোয়ালিফিকেশন আছে! সেবার "সাইকেলে বাংলা বিজয়" করে এল জান বোধ হয়। ওদের দলে আরও পাঁচটা ছেলে ছিল, ও সেকেন্ড হয়েছিল। তাহলেই বোঝ।'

বকুল বুঝতে থাকে। বুঝতে বুঝতে ঘামতে থাকে।

তারপর আস্তে বলে, 'কিন্তু এত সুন্দর মেয়ে, বিয়েটিয়ে না দিয়ে

বড়দা উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'বিয়ে তো আর অমনি হয় না বকুল! আমার অবস্থা তুমি না জানলেও তোমার ভাইয়েরা জানে। ওর বাপ তো চিরকালই

নি-রোজগেরে। তাস-পাশা খেলে, পান খায়, ঘুরে বেড়ায়, আর রোজগারের কথা তুললেই বলে, আমার হার্টের অসুখ, বুক গেল! তবে? ঘরের কাঁড় যেখানে যা আছে খরচা করে বিয়ে না হয় দিলাম, তাতে আমার কী লাভ হল? উনি মহারানী রাজ্যপাটে গিয়ে বসলেন, আমার হাড়ির হাল আরও হ্যাঁড়ির হল। না না, এটি তোমায় করে দিতেই হবে বকুল, খুব আশা নিয়ে এসেছি! ওরা নাকি মাইনেপত্তর ভাল দেয়।'

বকুল আস্তে বলে, 'তাহলেও শুনতে খারাপ তো। অন্য কোথাও কোন কাজে যদি—'

বড়দা আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'অন্য কোথায় কী কাজ জুটবে ওর বল? স্কুল-ফাইন্যালটাও তো পাস করেনি। কেবলু এটা-ওটায় মন! আর শুনতে খারাপের কথা বলছ!...ওসব কথা আজকাল আছে নাকি? নেই। যে যাতে সুবিধে বুঝবে, তাই করবে, ব্যাস! ধিক্ দিতে সবাই পারে, ভিখ্ দিতে কেউ পারে না। আমার এক বন্ধুও সেদিন এই কথা বলেছে। বলেছে, "দেখ ভাই, আমি ঠিক করেছি মেয়েদের বিয়ের চেষ্টা আর করব না।" ওর আবার বুড়ো বয়সের সংসার, এখনও ঘরে আইবুড়ো মেয়ে। তাই বলে "বিয়ের চেষ্টা-টেষ্টা করছি না। সারাজীবন ধরে দাঁতে দাঁড় দিয়ে যেটুকু সংস্থান করেছি, তা কি ওই মেয়ে তিনটের চরণে ঢালতে?...না, ওসবের মধ্যে আমি নেই। বরং মেয়েদের বলি, এতকাল যে বাবার পয়সায় খেলি পরলি, লেখাপড়া শিখলি, এবার বুড়ো বাপকে তার শোধ দে।... তা বড় মেজ দুই মেয়েই যাহোক কিছু করছে, ছোট মেয়েটাই একবগ্‌গা, বলে, ওসব আমার ভাল লাগে না। আমি বলি, তবে কী ভাল লাগে? বাপের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে? যখন বাইরে থেকে টাকা আহরণ করে আনবার ক্ষমতা রয়েছে, তখন ঘরের টাকা ভেঙে বাইরে যাবি কেন?" আমিও তাই ভাবছি, জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে সে। তুমি ভাই নাতনীর জন্যে একটু চেষ্টা কর। বলো খুব চালাক-চতুর মেয়ে, যা শেখাবে তাই চটপট শিখে নেবে।'

বকুল হতাশ ভাবে বলে, 'কিন্তু আমার তো এমন কিছু জানাশোনা নেই।'

'এ তোমার এড়ানো কথা বকুল! আমি কি আর ভেতরের খবর না নিয়ে এসেছি? তুমি একবার বলে দিলেই হয়ে যাবে।'

হয়তো হবে। কিন্তু বকুল সেই বলাটা বলবে কী করে?

অনেকক্ষণ অনুরোধ-উপরোধের পর বড়দা বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে বললেন, 'তোমার লেখা বইটই আমি অবশ্য পড়িনি তবে বাড়িতে শুনিটুনি, বৌমাও বলেন খুব নাকি সংস্কারমুক্ত তুমি। অথচ এই একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কুসংস্কারে তুমি আমাদের ঠাকুমা মুক্তকেশী দেবীর ওপরে উঠলে! জীবিকার জন্যে মানুষের কত কীই করতে হয়, 'পছন্দ নয়' বলে কি আর বসে থাকলে চলে? আত্মীয়ের একটু উপকার করবে না তাই বলে? যাক, ও তো বলেছে নিজেই ওই অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে চেষ্টা করবে। তোমার নিজের ভাইঝিটি তো একটা কারখানার মজুরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, সেটায় মুখ হেঁট হচ্ছে না?'

চলে গেলেন তিনি। বকুল বসে রইল।

ভাবতে লাগল মানুষ মরে গেলেও কি তার সত্যি কোথাও অস্তিত্ব থাকে? মুক্তকেশী দেবী নামের সেই মহিলাটি কি কোথাও বসে তাঁর বংশের এই প্রগতি দেখছেন তাকিয়ে?

বকুল কি তাহলে সত্যিই খুব সংস্কারাচ্ছন্ন?

তবে বকুলের লেখা পড়লে সবাই তাকে একেবারে সংস্কারমুক্ত মনে করে কেন?

বকুল কি ভেজাল?

যা ভাবে তা লেখে না? অথবা যা লেখে তা ভাবে না?

নাকি বকুলের হিসেবে প্রগতি শব্দটার অন্য মানে? 'সংস্কার' শব্দটার অন্য ব্যাখ্যা?

বকুল অবাক হয়ে ভাবে, এত সহজে চিরকালীন মূল্যবোধগুলো এমন করে ঝরে পড়ছে কী করে? একদা যারা বংশমর্যাদা, কুলমর্যাদা, পারিবারিক নিয়ম ইত্যাদি শব্দগুলোর পায়ে জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়েছে, তারাই কেমন করে সেগুলো ভেঙে তার ভাঙা টুকরোগুলোকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে?

তবু বকুল বার বার ওই 'মুক্তকেশী দেবী' শব্দটার আশেপাশে ঘুরতে লাগল। একদার প্রতাপ কোথায় বিলীন হয়ে যায়, সম্রাটের রাজদণ্ড শিশুর খেলনা হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। জীবনের ব্যাখ্যা অহরহ পরিবর্তিত হয়, সত্য অবিরত খোলস বদলায়। অথচ তার মধ্যেই মানুষ 'অমরত্বের' স্বপ্ন দেখে। 'চিরন্তন' শব্দটাকে অভিধান থেকে তুলে দেয় না।

'সুবিধে'কে বলে 'সংসারমুক্তি', 'স্বার্থ'কে বলে 'সভ্যতা'।

আমরা 'অচলায়তন' ভাঙতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা হাতুড়ি শাবল গাঁইতির যথাযথ ব্যবহার শিখিনি, তাই আমরা আমাদের সব কিছু ভেঙে বসে আছি।

আজকের যুগ ওই গাঁইতি শাবল হাতে নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলছে, আর যথেচ্ছ আঘাত বসাচ্ছে। কথাগুলো বাতাসে উড়ে যাচ্ছে আর আঘাতে আঘাতে পায়ের তলার মাটিতে সুদ্ধ ফাটল ধরছে।

কিন্তু এসব কথা হাস্যকর।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, 'যা হচ্ছে তাই ঠিক। এই প্রগতি, এই সভ্যতা।'

কলমের আগায় লিখতে হবে, 'এ কিছু না, এ শুধু সূচনা, আরও চাই। আরও এগোতে হবে, শেষ পর্যন্ত "শেষে" গিয়ে পৌঁছতে হবে।'

কিন্তু কোথায় সেই শেষ?

'শেষ নাহি যার শেষ কথা কে বলবে?'

॥ ৩১ ॥

আমাদের মাতামহী—যাঁর নাম ছিল সত্যবতী দেবী, তিনি নাকি একদা এই প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনের ঘর ছেড়ে পৃথিবীর আলোয় বেরিয়ে পড়েছিলেন, 'বিয়েটা কেন ভাঙা যায় না?'

বলেছিলেন, 'এই কথারই জবাব খুঁজতে বেরিয়েছি আমি।'

পারুল আর বকুল দুজনে যেন একই সঙ্গে একই কথা ভাবে। এই একটা আশ্চর্য!

পারুল তার খেয়াল-খুশির ডায়েরিতে লিখে চলে, 'কিন্তু সে কি আজকের এই বিয়ে? যে বিয়ে "ভালবাসা"র পতাকা উড়িয়ে লোকলোচনের সামনে জয়ের গৌরব নিয়ে নিজেদেরকে মালাবন্ধনে বাঁধে?'

সত্যবতী দেবীর নয় বছরের মেয়ে সুবর্ণলতাকে নাকি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর এই মহৎ কর্মের নায়িকা ছিলেন সুবর্ণলতার পিতামহী, সত্যবতীর শাশুড়ী! সত্যবতী বলেছিলেন, 'এ বিয়ে বিয়ে নয়—

পুতুল খেলা'—

কিন্তু আজকের এই সভ্য সমাজের 'ভালবাসার বিয়ে'। এরই বা পুতুল খেলার সঙ্গে তফাৎ কোথায়? খেলতে খেলতে পুরনো হয়ে গেলে, বৈচিত্র্য হারালে, আবার অন্য পুতুল নিয়ে খেলা শুরু, এই তো!—আর যদি নতুন করে শুরু না-ও কর, খেলাটাই ত্যাগ করলে। খেলাটা ভাঙলে পুতুলটা আছড়ে ফেলে দিলে।

আমাদের বিদ্রোহিণী মাতামহী কি এই চেয়েছিলেন? তিনি কি আজ শোভনের এই মুক্তি দেখে উল্লসিত হতেন? বলতেন, 'যে বিয়ে মিথ্যে যে বিয়ে অর্থহীন, তার বোঝা বয়ে চলা মূঢ়তা মাত্র? শোভন ঠিক করেছে?'

কিন্তু তাহলে সত্যি বিয়ে কোন্‌টা?

আজ যা সত্য, আগামী কালই তো তা মিথ্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কলমটা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল পারুল, বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গঙ্গার ধারের সেই বারান্দা। পড়ন্ত বিকেলে গঙ্গার সেই অপূর্ব শোভা, জলে বাতাসের কাঁপন, তিরতির করে বয়ে চলেছে! অথচ গতকালই কালবৈশাখীর ঝড়ে কী তোলপাড়ই হচ্ছিল!

প্রকৃতি শক্তিময়ী, প্রকৃতি ঝড়ের পর আবার স্থির হতে জানে।

মানুষ মোচার খোলার নৌকোর মত ভেসে যায়, ডুবে তলিয়ে যায়।

রাজা চলে গেছে।

মার কাছেও নয়, বাপের কাছেও নয়, চলে গেছে আসানসোলের এক বোর্ডিং স্কুলে।

অদ্ভুত অনমনীয় ছেলে!

কিছুতেই কলকাতায় থাকবে না সে।

অবশেষে রামকৃষ্ণ মিশনের ওই আসানসোল শাখায় ব্যবস্থা করতে হয়েছে শোভনকে।

পারুল হতাশ হয়ে বলেছিল, 'কী দিয়ে গড়া রে তোর ছেলে শোভন? পাথর, না ইস্পাত?'

শোভন শুকনো গলায় বলেছিল, 'অথচ শুধু আবদেরে আহলাদে ছেলে ছাড়া কোনদিনই অন্য কিছু ভাবিনি ওকে।'

পারুল মনে মনে বলেছিল, 'তার মানে তোমরাই গড়লে ওকে। পিটিয়ে ইস্পাত করলে।'

আশ্চর্য, চলে গেল যখন একটুকু বিচলিত ভাব নেই। সেই বালগোপালের মত কোমল সুকুমার মুখে কী অদ্ভুত কাঠিন্যের ছাপ! এরপর থেকে হয়তো এই একটা জাতি সৃষ্টি হবে। যারা মা-বাবাকে অস্বীকার করবে, বংশপরিচয়কে অস্বীকার করবে, হৃদয়বৃত্তিকে অস্বীকার করবে। কঠিন মুখ নিয়ে শুধু নিজে-দেরকে তৈরী করবে, পৃথিবীর মাটিতে চরে বেড়াবার উপযুক্ত ক্ষমতা আহরণ করে'। আর সে ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে বাপকে বলবে, 'আমাকে লেখপড়া শেখাতে তোমার যা খরচ হয়েছে তা শোধ করে দেব।'...অথবা বলবে, 'যা করেছ, করতে বাধ্য হয়েই করেছ। পৃথিবীতে এনেছিলে কেন আমাদের? তার একটা দায়িত্ব 'নেই?'

হয়ত ওইটুকুই তফাত থাকবে মানুষের জীবজগতের সঙ্গে। পশুপক্ষীরা তাদের জন্মের জন্যে মা-বাপকে দায়ী করতে জানে না, মানুষ সেটা জানে।

* * *

পারুল অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরে চলে এল। কলমটা নিয়ে আবার লিখল—'কিন্তু এটাই কি চেয়েছিলেন সত্যবতী দেবী? তাঁর সব কিছুর বিনিময়ে এই জবাবটা খুঁজে এনেছিলেন পরবর্তীকালের জন্যে?'

পারুলের মনে পড়তে থাকে শোভনের সেই সমারোহময় জীবনের ছবিটি। বৌ ছেলে মেয়ে আর অগাধ জিনিস নিয়ে হয়ত একদিন কি একবেলার জন্যে মার কাছে এসে পড়া। একদিনের জন্যেও কত জিনিস লাগে ওদের ভেবে অবাক হত পারুল। বৌ হেঁটে গেলে বোধ হয় বুকে বাজত শোভনের, বৌয়ের এতটুকু অসুবিধা দূর করতে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে দ্বিধা করত না, আর অভিমানিনীর মুখটি এতটুকু ভার হলে, যেন নিজে চোর হয়ে থাকত. কাঁটা হয়ে থাকত, মা পাছে তার বৌয়ের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতির মর্মটি বুঝতে না পেরে ভোঁতা কোন কথা বলে বসেন!

শোভনের জীবনে বৌয়ের প্রসন্নতা ছাড়া আর কিছু চাইবার আছে তা মনে হত না। শোভনের হৃদয়ে বৌ ছাড়া আর কোন কিছুর ঠাঁই আছে কি না ভাবতে হত।

পারুল আবার লেখে, 'ভাবতাম অন্যদিকে যা হোক তা হোক, এই হচ্ছে প্রকৃত বিয়ে। একটা ভালবাসার বিয়ের সুখময় দাম্পত্য জীবনের দর্শক হয়েছি আমি, এ ভেবে আনন্দ বোধ হত।...দেখেছি আমাদের মায়ের জীবন, দেখেছি নিজেদের আর সমসাময়িকদের। কেউ ফাঁকিটা মেনে নিতে না পেরে যন্ত্রণায় ছটফটিয়েছে, কেউ ফাঁকির সংগেই আপোস করে ঠাট বজায় রেখে চালিয়েছে।... তবে 'সত্য' বলে কি কোথাও কিছু ছিল না? তা কি হয়? কি জানি! আমার ভাই-ভাজেদের তো দেখেছি, মনে তো হয়নি এরা ফাঁকির বোঝা বয়ে মরছে। বাইরে থেকে কি বোঝা যায়? মোহনের কথা মনে পড়তে থাকে।

বহুকাল আসেনি ছেলেটা, সেই নাসিকে বদলি হবার পর থেকে আর এদিকে আসেনি। মনে তো হয় সুখী সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদে ভরপুর হয়ে দিন কাটাচ্ছে সে। তাই পরিত্যক্ত আত্মীয়স্বজনদের একটা চিঠি লিখে উদ্দেশ করতেও মনে থাকে না। কিন্তু কে জানে—মোহনের জীবনেও তলে তলে কোথাও ভাঙন ধরবে কিনা!

ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তো বাইরে থেকে কিছুই ধরা পড়ে না!

মোহনের জন্যে হঠাৎ ভারী মন কেমন করে উঠল। হয়ত শোভনের ব্যর্থ বিধ্বস্ত মুখখানাই মনটাকে উদ্বেল করে তুলেছে। রেখার জন্যেও খুব মন কেমন করে উঠেছে।

কতবার মনে হয়েছে, আমি কি রেখার কাছে যাব? তাকে বলব—কিন্তু কী বলবে ভেবে পায়নি পারুল। ওদের জীবনের ভার ওদেরই বহন করতে হবে। আর কারও কোন ভূমিকা নেই সেখানে।

বকুল এ ঘরে আসতেই বকুলের ছোড়দা বলে উঠল, 'ও বাড়ির বড়দা কেন এসেছিলেন রে?'

বকুল অবাক হয়ে বলে, 'ওমা তুমি বাড়িতে ছিলে? তবে যে দেখা করলে না?'

'দূর, ছেড়ে দে! ওসব দেখাদেখা করার মধ্যে আমি নেই।' বলেই ছোড়দা হঠাৎ মুখটা ফেরায়, ধরা গলায় বলে, 'লোকের কাছে দেখাবার মত মুখ কি আর আমার আছে বকুল?'

বকুল হেসে উঠে বলে, 'অন্ততঃ ওঁর কাছে ছিল। ওঁর মতে, এ যুগে "নিন্দে"র বলে কিছু নেই।'

তারপর বড়দার আসার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করে।

ছোড়দা একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, 'অথচ মনে হত ওই বাড়িটা অচলায়তন। মুক্তকেশী দেবীর অস্থি পোঁতা আছে ও ভিটেয়।'

'থাকলে সেই পোঁতা অস্থিতে অবশ্যই শিহরণ লাগছে।'

'আর আমরা কত নিন্দিত হয়েছি! আমাদের মা ওদের মত নয় বলে কত লাঞ্ছনা গেছে তাঁর উপর দিয়ে!'

বকুল আস্তে বলে, 'আজও যাচ্ছে ছোড়দা। যারা একটু অন্যরকম হয়, তাদের ওপর দিয়ে লাঞ্ছনার ঝড় বয়েই থাকে! পরবর্তীকালে তোমার বংশধরেরাই হয়ত তোমাকে মুক্তকেশী দেবীর যোগ্য উত্তরসাধক বলে চিহ্নিত করবে।'

ছোড়দা একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমি নিজের ভুল সংশোধন করতে চেয়ে ছিলাম বকুল! সুযোগ পেলাম কই?'

'সত্যি চেয়েছিলে?'

ছোড়দার চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোদের ছোটবৌদির কষ্ট আর চোখে দেখতে পারা যাচ্ছে না।'

'শুধু ছোটবৌদির?'

'আমার কথা থাক্ বকুল!'

'কিন্তু এ সমস্যার সমাধান তো তোমাদের নিজেদের হাতে ছোড়দা!'

'সে কথা তো অহরহই ভাবছি, কিন্তু ভয় হয় যদি আমাদের ডাককে অগ্রাহ্য করে! যদি ফিরিয়ে দেয়!'

বকুল মৃদু হেসে বলে, 'ওখানেই ভুল করছ ছোড়দা। তুমি যদি বল, "তুই আমায় কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবি না। আমিই তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যাবই।" দেখ কি হয়! কিন্তু মনে জেনো—ওর ভালবাসাকে অমর্যাদা করে নয়। ও যাকে জীবনে নির্বাচন করে নিয়েছে, তোমাদের কাছে হয়তো তার অযোগ্যতার শেষ নেই, কিন্তু যোগ্যতা অযোগ্যতা কি বাইরে থেকে বিচার করা যায় ছোড়দা?'

'ওর ঠিকানাটা তো তোরই হাতে!'

'তোমার হাতেও চলে যেতে পারে ছোড়দা, যদি তুমি সত্যিকার ক্ষমার হাতটা বাড়িয়ে দিতে পার ওর দিকে।'

ছোটবৌদি এসে দাঁড়াল।

বলল, 'ও-বাড়ির নির্মলের বৌ তোমায় ডেকেছে বকুল।'

বকুল চকিত হয়।

আশ্চর্য, এখনও বকুল 'নির্মল' নামটা শুনলেই চকিত হয়! জগতে অনেক রহস্যের মধ্যে এ এক অদ্ভুত রহস্য, অনেক আশ্চর্যের মধ্যে এ এক পরম আশ্চর্য।

অবশ্য বকুলের এই গভীরে তলিয়ে থাকা চেতনায় চকিত হওয়া বাইরের জগতে ধরা পড়ে না। বকুল সহজ ভাবে বলে, 'কেন ডেকেছে জান?'

'ঠিক জানি না। তবে ওর সেই নাতিটাকে তো তার বাবা নিজের কাছে নিয়ে গেছে, মাকেও বোধ হয় নিয়ে যেতে ব্যস্ত। মজাটি জান? ছেলেটার হাত কাটা গেছে বলে পার্টিতে আর ঠাঁই হয়নি। তারা নাকি বলেছে, অমন একটা চিহ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। ছেলেটা বলেছে, আর একটু শক্ত হয়ে উঠি, দেখে নেব ওদের। বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওদের বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি দিয়ে ছাড়ব।'

বকুল অন্যমনস্কের মত বলে, 'তাই বুঝি?'

'তাই তো। অলকা বৌমা যে গিয়েছিল একদিন। আর যারা সব আছে বাড়িতে তাদের সঙ্গে যে খুব ভাব বৌমার। ওখান থেকেই শুনে এসেছে।'

'নির্মলদার বৌ ভাল আছে?'

জোর করেই মাধুরী-বৌ না বলে নির্মলদার বৌ বললো বকুল। যেন সকলকে দেখাতে চাইল (হয়ত নিজেকেও), ওই নামটা উচ্চারণ করা বকুলের কাছে কিছুই নয়। খুব সাধারণ।

ছোটবৌদি বলল, 'মোটেই নাকি ভাল নেই। চেহারা দেখলে নাকি চেনা যায় না। এই যা যাচ্ছে, আর ফিরবে বলে মনে হয় না।'

* * *

কাছে গিয়ে খাটের ধারে বসে পড়ে বলে বকুল, 'তা চেহারাটা তো বেশ ভালই করে তুলেছ, ছেলের কাছে গিয়ে আর তাকে ভোগাবার দরকার কি? আর দু-দশদিন এখানে থাকলেই তো সরাসরি ছেলের বাবার কাছে চলে যেতে পারতে।'

'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বকুল—', মাধুরী-বৌ একটু হেসে বলে, 'অহরহই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন এই ঘর থেকে এই খাটবিছানা থেকেই তাঁর কাছে চলে যেতে পারি। তা ছেলের আর তর সইছে না। হয়তো ভাবছে লোকনিন্দে হচ্ছে, কর্তব্যের ত্রুটি হচ্ছে—'

বকুল একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'শুধু ওই ভাবছে? আর কিছু ভাবতে পারে না?'

মাধুরী-বৌ শীর্ণ হাতখানা বকুলের কোলে রেখে বলে, 'আর কি ভাববে?'

'কেন, মার কষ্ট হচ্ছে, মার অসুবিধে হচ্ছে, মার জন্যে মন কেমন করছে—'

মাধুরী-বৌয়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা দেখা দেয়। ব্যঙ্গতিক্ত অবজ্ঞার হাসি।

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।

এরকম হাসি হাসতে জানে মাধুরী-বৌ?

কিন্তু কথাটা খুব ভদ্রই বলে মাধুরী। বলে, 'তেমন হলে তো ভালই।'

'ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ, তোমার কত কাজ, তার মধ্যে অকারণ ডেকে বিরক্ত করলাম—'

'বাজে সৌজন্যটুকু ছাড় তো। বল কী বলবে?'

'বলব না কিছু—'

মাধুরী আস্তে বলে, 'একটা জিনিস দেব।'

বকুলের এখনও বুক কেঁপে ওঠে, এ কী লজ্জা, এ কী লজ্জা!

মাধুরী-বৌ যদি তার স্বামীর একটা ফটোই বকুলকে দিতে যায়, ক্ষতি কি?

বকুলের হঠাৎ কেন কে জানে ওই কথাই মনে এল।

কিন্তু ফটো নয়। খাতা।

অথবা ফটোও।

খাতার শেষ পৃষ্ঠায় ফটোও সাঁটা আছে।

'ওঁর এই ডায়েরির খাতাটা—', মাধুরী বালিশের তলা থেকে খাতাটা বার করে বলে, 'ভেবে আর পাই না নিয়ে কী করি! হাতে করে ওই হাতের লেখাগুলো নষ্ট করতেও পারিনি প্রাণ ধরে, অথচ ভয় হচ্ছে সত্যিই যদি হঠাৎ মরে-টরে যাই, কে দেখবে কে পাতা ওলটাবে—তাই শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, যার জিনিস তাকেই বরং দিয়ে দিই।'

বকুল খাতাটায় হাত ঠেকায় না, অসহায় ভাবে বলে, 'যার জিনিস মানে?'

অথচ বকুল প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছে, বকুল অনামিকা দেবীর খোলস এঁটে রাজ্য জয় করে বেড়াচ্ছে।

মাধুরী বিছানায় রাখা খাতাটা বকুলের কোলে রেখে দিয়ে বলে, 'যা বললাম, ঠিকই বলছি। পাতায় পাতায় যার নামের নামাবলী, তারই জিনিস, তার কাছে থাকাই ঠিক।'

হঠাৎ মাধুরীর কোটরগত চোখের রেখায় রেখায় জল ভরে আসে। বকুল অপরাধীর মত কাঠ হয়ে বসে থাকে।

মাধুরীই আবার লজ্জার হাসি হেসে বলে, 'শরীরটা খারাপ হয়ে নার্ভগুলো একেবারেই গেছে। কথা বললেই চোখে জলটল এসে পড়ে। সত্যিই খাতাটা তোমার জন্যে তুলে রেখেছিলাম।'

বকুল ওর রোগা হাতটা হাতে নিয়ে আস্তে বলে, 'ভেবে বড় সুখ ছিল, অন্ততঃ তোমার মধ্যে কোন শূন্যতা নেই, ফাঁকি নেই!'

মাধুরী রোগা মুখেও তার সেই অভ্যস্ত হাসিটি হেসে বলে, 'নেইই তো। সবটাই পূর্ণ, শুধু সেই পূর্ণতার একটা অংশ তুমি। তোমার ওপর আমি বড় কৃতজ্ঞ বকুল, তুমি আর সকলের মত ঘর-সংসার স্বামী-পুত্তুর নিয়ে মত্ত হওনি। তেমন হলে হয়তো এ খাতা কবেই ছিঁড়ে ফেলে দিতে হত।'

বকুল হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'বর জোটেনি তাই ঘর-সংসারেরও বালাই নেই। তার মধ্যে ত্যাগের মহত্ব না খোঁজাই ভাল মাধুরী-বৌ। বরং তোমার কাছেই আমার—যাক, থাক সে কথা। সব কথা উচ্চারণে মানায় না। তবে "যাবার দিন" এসে না গেলে তো যাওয়া হয় না, অতএব সে দিনটা ত্বরান্বিত করার সাধনা না করাই উচিত!'

'নাঃ, তা করিনি। এমনিই কি মানুষের অসুখ-টসুখ করে না?...আচ্ছা ভাই, ওর খাতা পড়ে মনে হত—অবিশ্যি আগে কোনদিনই পড়তাম না, তখন ভাবতাম সকলেরই একটুখানি নিভৃত জায়গা থাকা উচিত। কিন্তু যাবার আগে খাতাটা আমায় দিল। বলল, "পড়ে দেখো। যাবার আগে তোমার কাছে নির্মল হয়ে যাই।" নিজের নামটা নিয়ে অনেক সময় ঠাট্টা করতো তো।...তা পড়তে পড়তে মনে হত, "তোমাদের কথা" নিয়ে কিছু লেখার কথা ছিল তোমার, লিখেছ কোথাও? তোমার কত বই, সব তো আর পড়িনি, জানতে ইচ্ছে করছে, কী লিখেছ তাতে?'

বকুল আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'নাঃ, সে আর কোনদিনই লেখা হয়নি মাধুরী-বৌ! লিখব ভাবলে মনে হত, লেখবার মতো আছে কী? এ তো জগতের নিত্য ঘটনার একটা টুকরো। কোথায় বা বিশেষত্ব, কোথায় বা মৌলিকত্ব, তারপর হঠাৎ—'

বকুল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তখন মনে হল, আর লিখেই বা কী হবে?

...আসল কথা, নিজের কথা লেখা বড় শক্ত। তাদের কাছেই ওটা সহজ, যারা "নিজের কথা"র ওপর অনেক রংপালিশ চাপিয়ে জৌলুস বাড়াতে পারে, যাতে জিনিসটা মূল্যবান বলে মনে হয়। সেটা তো সবাই পারে না।'

মাধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ওইটা নিয়ে ওর একটু অভিমান ছিল।'

বকুল মাধুরীর হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলে, 'হয়তো সেটাই ভাল হয়েছিল মাধুরী-বৌ। হয়তো লিখলে ওর মন উঠত না। প্রত্যাশার পাত্রটা খালিই থেকে যেত, অভিমানের সুখটা থেকেও বঞ্চিত হত, যা হয়। হয়নি সেটাই ভাল।'

'তবু সময় পেলে একটু দেখো, তারপর ছিঁড়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো, যা তোমার খুশি। জগতের আর কারুর চোখে পড়লে মাধুরী নামের মেয়েটাকে হয়তো করুণা করতে বসবে। ভাববে, আহা বেচারী, বোধ হয় কিছুই পায়নি। তাদের তো বোঝানো যাবে না, এমন হৃদয়ও থাকে, যারা ফুরিয়ে যায় না, ফতুর হয়ে যায় না।'

মাধুরী-বৌ ক্লান্তিতে চোখ বোজে।

বকুল ওই বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে আর একটা মুখ মনে করতে চেষ্টা করে।

নামটা যেমন স্পর্শ করে যায়, মুখটা তেমন সহজে ধরা দেয় না।...অনেকটা ভাবলে তবে—

কিন্তু সেই সরল-সরল ভীরু-ভীরু নির্বোধ মুখটার মধ্যে এমন কিছু আশ্বাস পায় না বকুল, যা মাধুরী পেয়েছে।...সত্যিই কি পেয়েছে? না, ও শুধু ওর আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা-করা মূর্তি।...

একটু পরে চোখ খুলে মাধুরী বলে, 'আজ তোমায় ডেকেছি সব কথা বলতে। অনেক প্রশ্ন করতে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার এই এত বড় জীবনে আর কখনও কোন ভালবাসা আসেনি?'

বকুল হেসে ওঠে, 'ওরে বাবা! এ যে দারুণ প্রশ্ন! চট করে তো মনে পড়ছে না।'

'ভেবে ভেবে মনে কর। এত প্রেমের কাহিনী লিখলে, আর...'

'হয়তো সেই জন্যেই লিখতে লিখতে আর সময়ই পেলাম না। তাছাড়া—' বকুল একটু সহজ পরিহাসের মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গে 'ইতি' টানে, 'তোমার মতন সুন্দরী তো নই যে, মুগ্ধ ভক্তের দল পতঙ্গের মত ছুটে আসবে?'

'প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলে।'

'তা সেটাই ভাব। তাতেও আমার প্রেস্টিজ বজায় থাকল।'

বলে উঠে দাঁড়ায় বকুল।

'খাতাটা নিয়ে যাও।'

'সত্যই নিতে হবে?'

'বাঃ, তবে কি শুধু শুধু তোমায় ডেকে কষ্ট দিলাম? তোমার কাছে দিয়েই নিশ্চিন্ত হলাম।'

॥ ৩৩ ॥

মাধুরী-বৌয়ের কাছ থেকে খাতাখানা এনে ড্রয়ারে পুরে রাখল বকুল। বকুলের ড্রয়ারে কখনও চাবির পাট নেই, তার জন্যে কোনদিন কোন অভাবও অনুভব করেনি।

আজই হঠাৎ মনে হল, যেন ওটাকে চাবির মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পারলেই ভাল হয়। না, কেউ বকুলের ড্রয়ারে হাত দেবে এ ভাবনা আর নেই, অনেক দিন হয়ে গেল, সেই 'সামাল-সামালে'র স্বাদ ভুলে গেছে বকুল।

লিখতে লিখতে আধখানা ফেলে রেখে গেলেও টেনে-উটকে পড়ে নিত শম্পা। এখন বকুলের টেলিফোনে কদাচ কারও হাত পড়ে, বকুলের টেবিলে ড্রয়ারে হাত পড়ে না। এ বাড়িতে আরও ছেলেমেয়ে আছে, কিন্তু তারা বকুলের অচেনা। তারা এদিক মাড়ায় না।

তবু বকুলের মনে হল চাবি বন্ধ করে রেখে দিলে বুঝি স্বস্তি হত। যদিও খুলে দেখেনি এক পাতাও। থাক্, কোন এক সময়ের জন্যে থাক্। আজ তো এক্ষুনি আবার বেরিয়ে যেতে হবে।

'দেশবন্ধু হলে' বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের আজ বিশেষ বার্ষিক অধিবেশন। সাহিত্যে অধোগতি হচ্ছে কিনা এবং যদি হয়ে থাকে তো প্রতিকার কী? এই নিয়ে তোড়জোড় আলোচনা চালানো হবে।

এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করা অনামিকা দেবীর অবশ্যকর্তব্য।

ঘণ্টা-তিনেক ধরে অনামিকা দেবী এবং আরও অনেক দেব-দেবী বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পন্থা নিরূপণ করে শেষ রায় দিয়ে যখন বেরোচ্ছেন, তখন একটি মেয়ে অনামিকার কাছে এসে নমস্কার করে দাঁড়াল।

অনামিকা চমকে উঠলেন, 'বৌমা? শোভনের বৌ! তুমি এসেছিলে এখানে?'

'হ্যাঁ।'

'কখন এসেছ? কোন্‌খানে বসেছিলে? দেখতে পাইনি তো?'

'আপনারা দেখতে পাবেন, এমন জায়গায় বসতে পাব?' শোভনের বৌ রেখা একটু হাসল, 'আমাদের কি সেই টিকিট?'

'কী মুশকিল! এর আবার টিকিট কি? সঙ্গে কেউ আছে নাকি?'

'তা তো আছেই। কারও শরণাপন্ন না হলে তো প্রবেশপত্র মিলত না। আমার এক কবি মাসতুতো দাদার শরণাপন্ন হয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ। তুমি সাহিত্য-টাহিত্য বেশ ভালবাস, তাই না?'

রেখা মৃদু হেসে বলে, 'সাহিত্যকে ভালবাসি কিনা জানি না, তবে একজন সাহিত্যিককে অন্ততঃ ভাল লাগে, তাই দেখতে এলাম তাঁকে।'

অনামিকা হাসলেন।

কিন্তু—অনামিকা মনে মনে ভাবলেন, এটা কী হল? রেখা কি নরম হয়ে গেছে? রেখা কি বকুলকে মাধ্যম করে ওদের চিড়-খাওয়া জীবনটাকে মেরামত করে ফেলতে চায়?

অনামিকা ঠিক বুঝতে পারলেন না। অনামিকা সাবধানে বললেন, 'খুব রোগা হয়ে গেছ!'

রেখা বলল, 'কই?'

'নিজে নিজে কি বোঝা যায়? ছেলেমেয়ে ভাল আছে?'

বলেই মনে হল জিজ্ঞেস না করলেই ভাল ছিল। কোথায় ছেলে, কোথায় মেয়ে, কে জানে!

কিন্তু রেখা বৌমা সে কথা বলল না।

সে শুধু মলিন একটু হেসে বলে, 'ভালই আছে বোধ হয়। খোকাকে তো শুনেছি আসানসোলে মিশন স্কুলের বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিয়েছে।'

অনামিকা একটু থেমে বলেন, 'শুনেছ!'

রেখার মুখে এখনও হাসি। বলে, 'তাই তো। মায়ের কাছে চন্দননগরে ছিল, তারপর মার চিঠিতে জেনেছি।'

চারিদিকে লোক।

তবু এও এক ধরনের নির্জনতা।

অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে নিভৃতে কথা বলা যায়।

অনামিকা শান্ত মৃদু গলায় বলেন, 'মার চিঠিতে জানতে হল খবরটা?'

রেখা অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

অনামিকা বকুল হয়ে গেলেন না, অনামিকা দেবীই থেকে মৃদু মার্জিত গলায় বললেন, 'সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়াটা কি এত সহজ রেখা?'

রেখা চোখ তুলে তাকিয়ে বলে, 'শক্তই বা হল কই?'

অনামিকা তাকিয়ে দেখেন।

রেখার এমন প্রসাধনবর্জিত মুখ কবে দেখেছেন অনামিকা? রেখার পরনে একখানা সাদা টাঙাইল শাড়ি, রেখার মুখে উগ্র পেন্টের আতিশয্য নেই।

মনটা মমতায় ভরে গেল।

আস্তে বললেন, 'রেখা! খুব জটিল অঙ্ক কষতে তো সময় লাগে!'

রেখাও মৃদু ভাবে বলে, 'তা তো লাগেই। হয়ত সারাজীবন ধরেই কষতে হবে।'

অনামিকা বলেন, 'তোমাদের যুগকে আমরা খুব বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান ভাবতাম বৌমা!'

রেখা চুপ করে রইল।

অনামিকা আবার বললেন, 'আর কিছুতেই কিছু হয় না বোধ হয়?'

রেখা বলে, 'সে হওয়ার কিছু মূল্য আছে মাসিমা?'

'তা বটে। খুকু স্কুলে ভর্তি হয়েছে?'

'কবে!'

অনামিকা আবহাওয়া হালকা করতে বলেন, 'তোমার মা বাবা ভাল আছেন?'

'ওই পরিস্থিতিতে যতটুকু ভাল থাকা সম্ভব। একটা শোধ হয়ে যাওয়া ঋণের বোঝা আবার যদি নতুন করে ঘাড়ে চাপে, ভাল থাকা কি সম্ভব?'

অনামিকা আর কি বলবেন?

এই নিষ্প্রভ মৃতকল্প পরিস্থিতিতে কোন্ কথা বলবেন?

রেখা আবার বলে, 'শম্পাকে মাঝে মাঝে দেখি—'

'শম্পা—'

'হ্যাঁ। একসময় শুনেছিলাম ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ভাবলাম আপনি তো এখানে আসছেন আজ, খবরটা দিই।'

অনামিকা একটু হেসে বলেন, 'ঠিক তোমার মত করেই ওকেও একদিন আবিষ্কার করেছিলাম।'

'ওঃ। পেয়েছেন খবর?'

'হুঁ। কিন্তু তুমি ওকে মাঝে মাঝে কোথায় দেখ?'

'আমি যে অফিসে কাজ করি, সেই অফিসের বিল্ডিংয়েই বোধ হয় কোন এক জায়গায় শম্পাও কাজ করে!'

অনামিকা শম্পার খবর জানেন। অনামিকা রেখার খবরটাই নতুন করে জানলেন। বললেন, 'তুমি কাজ করছ?'

'না করলে চলবে কেন মাসিমা? বাবা রিটায়ার করেছেন, তার ওপর আবার এই ভার—'

'অধিক সমস্যা সমাধানেই কি এ ভারের লাঘব হয় বৌমা!'

'জানি হয় না। তবু কঠোর বাস্তব বলেও তো একটা কথা আছে মাসিমা? সেখানে সব দরকার।'

অনামিকা এখন একটু কঠিন গলায় বললেন, 'সেই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটা কি তার স্ত্রী-কন্যার খরচটাও দেয় না? সেটা দিতে তো বাধ্য সে?'

রেখা হেসে ফেলে।

বলে, 'না মাসিমা, আপনাদের ছেলে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা নয় যে, যা করতে বাধ্য তা করবে না। বরং অনেক সাধ্যসাধনাই করেছে ওটা দেবার জন্যে।'

অনামিকা শান্ত হয়ে যান।

বলেন, 'ওঃ! কিন্তু তোমাকে তো খুকুকে মানুষ করে তুলতে হবে?'

রেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'মানুষ হবেই। গরীবের মেয়ের মত মানুষ হবে।'

অনামিকা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'তোমাদের চিত্তের দারিদ্র্য ওদের জীবনে এই দারিদ্র্য ডেকে আনল!'

রেখা বললে, 'আমাদের ভাগ্য! অথবা ওদেরই ভাগ্য!'

'রেখা, আমরা সেই যুগকে দেখেছি, যে যুগে মেয়েরা পড়ে মার খেত। আমরা তোমাদের যুগকেও দেখছি। তফাতটা খুব বুঝতে পারছি না। যুগের হাওয়া যুগের বিদ্যে বুদ্ধি বিচক্ষণতা, কোন কিছুই তো লাগছে না।'

রেখা দৃঢ় গলায় বলে, 'লাগাতে আরও হয়ত দু-চারটে যুগ কেটে যাবে মাসিমা!'

অনামিকা আরও মৃদু গলায় বলেন, 'হয়ত তোমাদের কথাই ঠিক। হয়ত সেই যুগ আসছে—যখন কেউ কারুর কাছে "হৃদয়ে"র প্রত্যাশা করবে না—'

'হৃদয়!' রেখা হেসে ওঠে।

বলে, 'ওরে বাবা, ওসব দুর্লভ দামী জিনিস কি আর ব্যবহারে লাগানো যাবে মাসিমা? সোনার ভরি তিনশো টাকায় ওঠা পর্যন্ত বাজার কেমিক্যালের গহনায় ভরে গেছে দেখছেন তো? এখন আর ওতে কেউ লজ্জা অনুভব করে না। সোনা মুক্তো হীরে না জুটলে কাঁচ পুঁতি সীসেতেই কাজ চালাবে এটাই ব্যবস্থা। অলঙ্কারটা তো রইল?'

'কিন্তু সে অলঙ্কারের মূল্যটা কোথায়?'

'কোথাও না।' রেখা শান্ত গলায় বলে, 'মূল্যবোধটারই যে বদল হয়ে যাচ্ছে।'

সাহিত্য-সভাতেও কিছুটা আকর্ষণীয় আয়োজন রাখতে হয়। নিছক সাহিত্যে লোক জমে না। এতক্ষণ তাই স্টেজে এক নামকরা মূকাভিনেতার মূক অভিনয় চলছিল। বোধ করি কোন কৌতুককর ঘটনার অভিব্যক্তি। শেষ হতেই হাসির স্রোত আর হাততালির স্রোত বয়ে গেল।

এরপর ইলেকট্রিক গীটার বাজবে!

অনামিকা বললেন, 'ওই যমযন্ত্রণাটা আর সহ্য হবে না, এবার উঠি।'

'আমিও উঠি।' রেখা বলে, 'যাচ্ছি মাসিমা! শম্পার খবর তাহলে জেনেই ছিলেন! ঈশ্বর করুন ওর বিশ্বাসটা বজায় থাক্।'

রেখা চলে যায়।

অনামিকা প্রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন হতে পারে মানুষের? এর আগে যে রেখাকে দেখেছেন বিয়ে-বাড়িতে বা কোন উৎসব-সভায়, সেই রেখা কি এই মেয়ে? ওর মুখের সেই তেল-পিছলে-পড়া অহমিকার কোটিংটা ধুয়ে মুছে গেল কী করে? অথচ ঠিক নম্র নতমুখী নয়।

আর এক ধরনের অহমিকার প্রলেপ পড়েছে ওর মুখে। বিষণ্ণতার সঙ্গে অনমনীয়তার।

হয়ত এরাই ঠিক। তবু মনের মধ্যেটা যেন হাহাকার করে ওঠে। মাধুরী-বৌয়েরাই কি তাহলে ভুল?

তা হয়তো ভুলই।

নইলে এই খাতাখানা সে প্রাণ ধরে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি, পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত তার হাতেই তুলে দিয়েছে, পাতায় পাতায় যার নাম লেখা।

কিন্তু বরের হাতের লেখায়, পাতায় পাতায় পাড়ার একটা মেয়ের নাম লেখা খাতাখানা তো চিরদিন সহ্য করেও এসেছে মাধুরী। চিরদিন তো মাধুরী সব-ফুরিয়ে-যাওয়া বুড়ী হয়ে যায়নি?

কিন্তু বকুল তো এ খাতাখানা কিছুতেই ধৈর্য ধরে আগাগোড়া পড়ে উঠতে পারছে না। বকুল কেবলই পাতা ওলটাচ্ছে। বকুলের মনই বসছে না।

বকুলের মাঝে মাঝে কাঁচা ভাষায় উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতা দেখে হাসিও পেয়ে যাচ্ছে।

'বকুল-বকুল! তুমি আমার জীবনের স্থির লক্ষ্য। তুমি আমার ধ্রুবতারা! ...আমার সব কিছুর মধ্যে তুমি।...বকুল...যখন একা থাকি...চুপিচুপি তোমার নাম উচ্চারণ করি...।'

বকুল পৃষ্ঠার কোণে লেখা সাল তারিখটা দেখল।

বকুল একটু হেসে খাতাখানা বন্ধ করল।

বকুল ভাবল, রেখা-বৌমা ঠিকই বলেছে—যে বস্তু এক সময় পরম মূল্যবান থাকে আর এক সময় তা নিতান্তই মূল্যহীন হয়ে যায়, প্রতিক্ষণেই মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে।

॥ ৩৪ ॥

'বোম্বাইতে বাঙালী চিত্রাভিনেত্রীর শোচনীয় জীবনাবসান।'...

খবর বটে, তবে দৈনিক খবরের কাগজের নয়। একটা বাজে-মার্কা সাপ্তাহিকে ফলাও করে ছেপেছে খবরটা। কারণ এ পত্রিকার মূল উপজীব্যই সিনেমা-ঘটিত রসালো সংবাদ।... এরা চিত্রজগতের তুচ্ছ থেকে উচ্চ পর্যন্ত সব খবর সংগ্রহ করে ফেলে নিজেদের রুচি অনুযায়ী ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় পরিবেশন করে কাগজের কাটতি বাড়ায়। অতএব এদের কাছে নামকরা আর্টিস্টদের প্রণয় এবং প্রণয়ভঙ্গের খবরও যেমন আহ্লাদের যোগানদার, আত্মহত্যার খবরও

তাই।

দুটো তিনটে সংখ্যা এখন ওই নিয়ে ভরানো যাবে। খড়-বাঁশের কাঠামোর উপর মাটির প্রলেপই শুধু নয়, রং-পালিশও এদের আয়ত্তে। তা এদেরও এক-রকম শিল্পী বলা যায়।

এ পত্রিকা প্যাকেট খুলে পড়বার কথা নয়, নেহাৎই এই 'ডাক'টায় কোন চিঠি-পত্র আসেনি বলেই'অনামিকা দেবী'র নামে সযত্নে প্রেরিত এই হতচ্ছাড়া পত্রিকা-খানার মোড়ক খুলে পাতা উল্টে চোখ বুলোচ্ছিল বকুল, হঠাৎ একটা পৃষ্ঠায় চোখ আটকে গেল।

এ ছবিটা কার?

মদির হাস্যময় এই মুখের ছবি কি আগে কোথাও দেখেছে বকুল? কিন্তু তখন এমন মদির হাস্যের ছাপ ছিল না!

হ্যাঁ, এ মুখ বকুলের দেখা, কিন্তু আর দেখবে না কখনও। দেখা হবে না কোনদিন।

বার বার পড়লো বকুল ওই ছবির নীচের ছাপানো সংবাদটা, কিন্তু যেন বোধ-গম্য হচ্ছে না। ছায়া-ছায়া লাগছে।

বোম্বাইতে বাঙালী চিত্রাভিনেত্রীর শোচনীয় জীবনাবসান।...বম্বের বিখ্যাত নবাগতা চিত্রাভিনেত্রী লাস্যময়ী যৌবনবতী শ্রীমতী রূপছন্দা গত সোমবার তাঁর নিজস্ব ফ্ল্যাটে—অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

শ্রীমতী রূপছন্দা তাঁর ফ্ল্যাটে একাই বাস করলেও বহুজনের আনাগোনা ছিল। শ্রীমতী রূপছন্দার বেপরোয়া উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রাপদ্ধতি পরিচিত সমাজকে ক্রমশই বিরূপ করে তুলছিল, রূপছন্দা তার ধার ধারতেন না।

তবে সম্প্রতি কেউ কেউ তাঁর জীবনের একটি রহস্যময় ঘটনার কথা উল্লেখ করছেন। আত্মহত্যার দুদিন পূর্বে নাকি তিনি জুহুর উপকূলে এক নির্জন প্রান্তে গভীর রাত্রি পর্যন্ত একা বসেছিলেন এবং সেখানে নাকি একবার এক গেরুয়াধারী সাধুকে দেখা গিয়েছিল।

ওই সাধুর সঙ্গে এই মৃত্যুর কোন যোগ আছে কিনা সে রহস্য অজ্ঞাত, পুলিস সেই সাধুকে অনুসন্ধান করছে।...

শ্রীমতী রূপছন্দার নৈতিক চরিত্র যাই হোক, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি নানা সদ্-গুণের অধিকারিণী ছিলেন, দুঃস্থ অভাবগ্রস্তদের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল সহানুভূতি। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁকে প্রতারণাও করেছে, কিন্তু শ্রীমতী রূপছন্দার দানের হাত অকুণ্ঠই থেকেছে।...পরবর্তী সংখ্যায় 'রূপছন্দার মৃত্যুরহস্য' বিশদভাবে জানানো হবে।

*　　　*　　　*

জীবনের প্রারম্ভ দেখে কে বলতে পারে সেই জীবন কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, কী ভাবে শেষ হবে!

জলপাইগুড়ির সেই নম্র নতমুখী বধূ নমিতা, বম্বের এক বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে, ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে ঘুমের বড়ি খেয়ে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে গেল।...

কিন্তু নমিতা যা যা চেয়েছিল সবই তো আহরণ করতে পেরেছিল। অর্থ, প্রতিষ্ঠা, নাম, খ্যাতি, স্বাধীনতা। চেয়েছিল তার পুরনো পরিচিত জগৎকে দেখিয়ে দিতে, সে তুচ্ছ নয়, মূল্যহীন নয়। তবু নমিতা ওই ঘুমের বড়িগুলো আহরণ করতে গেল কেন?

আবছা ভাবে সেই নতমুখী মেয়েটাকেই মনে পড়ছে, যে বলেছিল, 'আমায় নিয়ে গল্প লিখবেন? আমি আপনাকে প্লট দিতে পারি।'

অনামিকা দেবী সেই আবেদন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই কি নমিতা আরও ঘোরালো প্লটের যোগান দিতে বসেছিল?

কিন্তু এই ঘোরালো প্লটটাকে নিয়েই কি লিখতে বসবেন অনামিকা দেবী?

কি লিখবেন?

আজকের সমাজে কি আর এ প্লট নতুন আছে? কোন্‌টা থাকছে নতুন? নতুন হয়ে আসছে, মুহূর্তে পুরনো হয়ে যাবে! এ তো সর্বদাই ঘটছে।

তবু বকুল যেন একটা অপরাধের ভার অনুভব করছিল। কিন্তু নিয়তিকে কি কেউ ঠেকাতে পারে?

অনেকক্ষণ বসেছিল, হঠাৎ নিচের তলায় খুব জোরে জোরে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

এমন দুপুর রোদে হঠাৎ শাঁখের শব্দ কেন? বাড়িতে কি কোন মঙ্গল অনুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল? অন্যমনস্ক বকুল সে খবর কান দিয়ে শোনেনি, অথবা শুনে ভুলে গেছে?

কিন্তু কারই বা কি হতে পারে?

'বিয়ে পৈতে ভাত'—এর যোগ্য কে আছে?...অলকার মেয়ের বিয়েটিয়ে নয় তো? হয়তো বকুলকে বলবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

আহা তাই যেন হয়।

তা না হলে ওই মেয়েটাও হয়তো একটা ঘোরালো গল্পের প্লট হয়ে উঠবে।

বকুল কি ওই শাঁখের শব্দে নেমে যাবে? হেসে হেসে বলবে, 'কি গো, আমায় বাদ দিয়েই জামাই আনছ?'

স্বাভাবিক হবে সেটা?

নাকি সাজানো-সাজানো দেখাবে?

যাই হোক, বকুল নেমেই এল, আর নেমে এসেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে স্তব্ধতা তখনও ভাঙল না, যখন একখানা ঝড়ের মেঘ এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'পিসি!'

বকুল অবাক হয়ে দেখতে থাকে, বড় দালানে বাড়ির সবাই এসে দাঁড়িয়েছে, অপূর্ব অলকা বাদে।...রয়েছেন বড় বৌদি, বড় বৌদির বৌ আর মেয়েরা। রুগ্ন সেজ বৌদিও। নানা বয়সের কতকগুলো ছেলেমেয়ে।

তাছাড়া অনেকগুলো ঝি-টি।

বাড়িতে এত ঝি আছে তা জানত না বকুল।

জানতো না এতো ছেলেমেয়ে আছে।

হঠাৎ মনে পড়ল বকুলের, আমি কী-ই বা জানি? কতটুকুই বা জানার চেষ্টা করি!

শম্পার চোখে জল, শম্পার মা-বাবার চোখে জল! এমন কি দালানের মাঝখানে যাকে একটা হাতল দেওয়া ভারী চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেই সত্যবানের চোখেও যেন জল।

শুধু বকুলের চোখটা যে শুকনো-শুকনোই রয়েছে সেটা বকুল নিজেই অনুভব করছে।

বকুলের হঠাৎ নিজেকে কেমন অবান্তর মনে হচ্ছে। যেন এখানে বকুলের কোন ভূমিকা নেই।...

অথচ থাকতে পারত। বকুল সে সুযোগ নেয়নি।

ইচ্ছে করেই তো নেয়নি, তবু বকুলের মুখটা দারুণ অপ্রতিভ-অপ্রতিভ লাগছে।

দেখে মনে হচ্ছে আজকের এই নাট্যদৃশ্যের নায়িকা স্বয়ং বকুলের ছোট বৌদি। এই তো ঠিক হল, এটাই তো চেয়েছিল বকুল। তবু বকুল ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতা অনুভব করছে। যেন বকুলের একটা বড় জিনিস পাবার ছিল, বকুল সেটা অবহেলায় হারিয়েছে।

বকুল বোকা বনে গেছে।

বকুল অবাক হয়ে দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে দেখছে, ছোট বৌদি তার সদ্যলব্ধ জামাইয়ের সামনে জলখাবারের থালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।...'

দেখছে, ছোড়দা অনুরোধ করছেন, 'আহা বেশী আবার কি? ওটুকু খেয়ে নাও। ভাত খেতে বেলা হবে।'

এর আগে নাটকের যে দৃশ্যটা অভিনীত হয়ে গেছে সেটা বকুলের অজানা. তাই বকুল বোকা বনে যাচ্ছে।

মস্ত একটা পাহাড় দাঁড়িয়ে ছিল সমস্ত পথটা জুড়ে, সমস্ত শুভকে রোধ করে। ওই অনড় অচলকে অতিক্রম করা যাবে, এ বিশ্বাস ছিল না কারুর।

দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কারণ বাধাটা মনের।

মনের বাধা ভাগ্যের সমস্ত প্রতিকূলতার থেকে প্রবল। মানুষ সব থেকে নিরুপায় আপন মনের কাছে। সে জগতের অন্য সমস্ত কিছুর উপর শক্তিশালী প্রভু হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু নিজের মনের কাছে শক্তিহীন দাসমাত্র।

তাই অভিমানের পাহাড় হিমাচল হয়ে উঠে জীবনের সব কল্যাণকে গ্রাস করে বসে।

এতদিন ধরে সেই পাহাড়টা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে অলঙ্ঘ্যের ভূমিকা নিয়ে। কেউ একবার ধাক্কা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করেনি, দেখি অতিক্রম করা যায় কিনা। না পাহাড়ের ওপারের লোক, না বা এপারের।

অথচ ভিতরে ভিতরে ভাঙন ধরেছে, অনমনীয়তার খোলস খুলে পড়েছে। তবু দূরত্বের ব্যবধান দূর হচ্ছে না।

আবার মন অনন্ত রহস্যময়ী!

কখন এক মুহূর্তে তার পরিবর্তন ঘটে। যাকে ভাবা হয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য পাথরের পাহাড়, সহসাই তা মেঘের পাহাড়ের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন অভিমান হয়ে ওঠে আবেগ। যা কিছুতেই পারা যাবে না বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা হয়েছে, তখন তা কত অনায়াসেই পার হয়ে যায়।

তা নইলে শম্পাকে কেমন করে তার বাবার কোলে মুখ রেখে বসে থাকতে দেখা যায়, আর তার বাবাকে বসে থাকতে দেখা যায় শম্পার সেই মাটকোঠার বাড়ির নড়বড়ে বারান্দায়, ততোধিক নড়বড়ে চৌকিটার ওপর।

শম্পার মাকেও দেখা যায় বৈকি। দেখা যায় আরও আশ্চর্য পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর জামাইয়ের পিঠে হাত রেখে বসে আছেন, সে হাতে স্নেহস্পর্শ।

অথচ মুহূর্তেই ঘটে গেছে এই অঘটন! এ অঙ্কে বকুল নেই।

তখন সকালের রোদ এই বারান্দাটায় এসে পড়েছিল। নতুন শীতের আমেজে সেই রোদটুকু লোভনীয় মনে হয়েছিল, তাই শম্পা সত্যবানকে টেনে নিয়ে এসে

বসিয়ে চায়ের তোড়জোড় করছিল।

তখন শম্পা নিত্যদিনের মতই টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে, আর সত্যবান নিত্যদিনের মতই অনুযোগ করছে—'একজনের রুটিতে অত পুরু করে মাখন মাখানো মানেই তো অন্যজনের রুটিতে মাখন না জোটা?'

ঠিক সেই সময় বংশী এসে বলল, 'এই শম্পা, তোকে কারা যেন খুঁজতে এসেছে।'

'কা-রা।'

শম্পার হাত থেকে মাখনের ছুরিটা পড়তে পড়তে রয়ে গেল।

'আমাকে আবার কারা খুঁজতে আসবে বংশীদা? পিসি কি? সঙ্গে কে?'

'তা কি করে জানব? তোর প্রাণের পিসিকে দেখার সৌভাগ্য তো হয়নি কোনদিন। তা তুই তো বলিস পিসি চিরকুমারী, তাই না? ইনি তো বেশ সিঁদুর-টিঁদুর পরা! যাক, কে কী বৃত্তান্ত সেটা এখানে বসে চিন্তা না করে নেমে চল্ চটপট!'

'বংশীদা, আমার কী রকম ভয়-ভয় করছে! তুমি বরং জিজ্ঞেস করে এস কে ওঁরা। সত্যিই আমায় খুঁজতে এসেছেন কিনা।'

'আমি আর পারব না। কারণ ওসব কথা হয়ে গেছে। চল্ বাবা চটপট! তোর "ভয়"! এ যে রামের মুখে ভূতের নাম।'

সত্যবান আস্তে বলে, 'দেখেই এসো না শম্পা!'

শম্পা চৌকিটায় বসে পড়ে শুকনো গলায় বলে, 'দুজন কে কে বংশীদা? দুজনই মহিলা?'

'আরে বাবা, না না। একজন মহিলা আর একজন তাঁর বডিগার্ড। আর না—হয়ত একজন—'

হঠাৎ চুপ করে যায় বংশী।

খুব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'এই দেখ, এঁরা চলেই এসেছেন।...যা সিঁড়ি, আপনারা উঠতে পারলেন?'

পুরুষটি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে ওঠেন, 'পারতেই হবে। না পারলে চলবে কেন?' তারপর প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই চৌকিতে বসে পড়েন।

তার পরের ঘটনাটা অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সরল।

এবং তার পরের দৃশ্য আগেই বলা হয়েছে।

এখন এই অসুবিধে চলছে, শম্পা কিছুতেই মুখ তুলছে না। সেই যে বাবার কোলে মুখ গুঁজে পড়েছিল, তো সেই পড়েই আছে।

বংশী বার বার বলেছে, 'শম্পা ওঠ। বাবাকে-মাকে প্রণাম কর। মার দিকে তাকাও।'

শম্পা সে-সব শুনতে পেয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।

বংশী শম্পাকে 'তুই' করেই কথা বলে, এখন এঁদের সামনে এঁদের মেয়েকে 'তুই' করতে যেন সমীহ আসছে বংশীর, নিজেকে ভারী ক্ষুদ্র তুচ্ছ মনে হচ্ছে তার।

যেন এবার অনুভব করতে পারছে বংশী, সে এবার অবান্তর হয়ে যাবে শম্পা নামের মেয়েটার জীবন থেকে, অবান্তর হয়ে যাবে তার বন্ধুর জীবন থেকেও।

এতদিন পরে এঁরা এসেছেন বাধা অতিক্রমের প্রস্তুতি নিয়ে, শম্পাকে পরাজিত করবার সংকল্প নিয়ে। এঁরা হেরে ফিরে যাবেন না।

তারপর?

তারপর বংশী থাকবে, আর থাকবে তার এই মাটকোঠার বাসার অন্ধকার

অন্ধকার ঘরখানা আর এই নড়বড়ে বারান্দাটা।

কিন্তু তখন কি কোনদিনই আর এখানে সকালের রোদ এসে পড়বে? বিকেলের বাতাসটুকু বইবে?

*　　　*　　　*

শম্পা বলেছিল, 'বংশীদা, আমার সঙ্গে চল। আমি কেমন সাহস পাচ্ছি না।'

বংশী হেসে উঠেছিল, 'তোর বাপের বাড়িতে তুই যাচ্ছিস, আমি যাব ভরসা দিতে?'

শম্পার মা-বাবাও অনুরোধ করেছিলেন বৈকি। বলেছিলেন, 'এতটুকু দেখেই বুঝতে পারছি তুমিই ওদের সহায়, তোমাকেও যেতে হবে।'

কিন্তু বংশী কি করে যাবে?

তার যে ঠিক এই সময়ই ভীষণ কাজ রয়েছে!

ওঁরা মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছেন, জামাইয়ের কোন ওজর-আপত্তিই কানে নিচ্ছেন না, মেয়ের তো নয়ই। বলছেন, 'বার বার ভুল করেছি, আর ভুল করতে রাজী নই।'

এর মাঝখান থেকে বংশী তার ভীষণ দরকারী কাজের জন্যে চলে গেল। শম্পা বলল, 'আর কোনদিন দেখা করবে না বংশীদা?'

বংশী হেসে উঠে বলল, 'এই দেখ, এরপর কি আর বংশীদাকে মনেই থাকবে তোর?'

শম্পা শান্ত গলায় বলল, 'আমাকে তোমার এমনিই অকৃতজ্ঞ মনে হয় বংশীদা?'

বংশী বলল, 'না না, ও আমি এমনি এমনি বললাম। জানিসই তো আমি ও সব উঁচুতলার লোকদের দেখলে ভয় পাই।'

'তোমার বন্ধুও পায়।'

'ওকে তো তুই মানিয়ে নিবি।'

বলে পালিয়ে গিয়েছিল বংশী।

হ্যাঁ, মানিয়ে নেবার ক্ষমতা শম্পার আছে।

তাই বলে মা-বাবার পাগলামির হাওয়ায় গা ভাসাতে পারে না।

মা বলেছিল, 'লোকজন নেমন্তন্ন করে ঠিকমত বিয়ের অনুষ্ঠান করি—

শম্পা জোরে হেসে উঠে বলে দিল, 'দোহাই তোমার মা, আর লোক হাসিও না।'

'এ রকম তো আজকাল কতই হচ্ছে,' মার গলাটা ক্ষীণ শোনালেও, শোনা গিয়েছিল, 'আমাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বর বাড়িতে হচ্ছে। কতদিন আগে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, আবার নতুন করে গায়েহলুদ-টলুদ সব করে ভাল করে বিয়ে হচ্ছে।'

'তাদের অনেক সাধ মা, আমার আর বেশী ভালয় সাধ নেই।'

শম্পার বাবা নিশ্চিন্ত ছিলেন ওরা এখানেই থাকবে, তাই নিজেদের ঘরটাকে ঝালাইটালাই করছিলেন মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে।

নিজেদের?

পাশের ওই ছোট ঘরখানাই যথেষ্ট।

কিন্তু শম্পা সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'বাবা গো, একেই তো ওই এক অপদার্থর গলায় মালা দিয়ে বসে আছি, তার ওপর যদি আবার "ঘরজামাই" বনে যায়, তাহলে তো আমার মরা ছাড়া আর গতি থাকবে না। ঘরজামাই আর পুষ্যিপুত্তুর এরাই তো শুনেছি জগতের ওঁচা।'

শম্পা হেসে উঠেছিল, 'না বাবা, ওটা আর করছি না, ওতে তোমাদের প্রেস্টিজটা বড্ড প্যাংচার হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। তবে দেখেশুনে একটা কোঠা ঘরে গিয়েই উঠতে হবে। সেই জন্যেই তো বলছি একটা ভাল চাকরি আমার বিশেষ দরকার। দাও না বাবা একটা মোটা মাইনের চাকরিবাকরি করে। কত তো কেষ্ট-বিষ্টুর সঙ্গে চেনা তোমার।'

'চেনা দিয়ে কোন কাজ হয়, এই তোর ধারণা?'

'হয় না বলছ? তবে নিজেই উঠে-পড়ে লাগি বাবা? দেখো তখন কী একখানা ছবির মতন সংসার বানাব।'

শম্পার চোখে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি।

শম্পার মুখে দৃঢ়তার ছাপ।

কিন্তু এমন অঘটনটা ঘটলো কোন্ যোগসূত্রে? শম্পার মা-বাপ তার মাট-কোঠায় ঠেলে গিয়ে উঠলো কি করে?

সে এক অভাবিত যোগাযোগ।

অথবা বিধাতার ভাবিত। আপন কাজ করিয়ে নেবার তালে অনেক কৌশল করেন তিনি। আর তার জন্যেও থাকে অন্য আয়োজন।

সেই আয়োজনের চেহারাটা এই—

শম্পার মা রমলা বিকেলবেলা কোথায় যেন কোন্ মন্দিরে গিয়েছিল। সেখানে নাকি ভরসন্ধ্যেবেলা কোন কালীসাধিকার উপর দেবীর 'ভর' হয়, তিনি সেই ভরের মুখে আর্তজনের সর্বপ্রকার আকুল প্রশ্নের উত্তর দেন। রোগ-ব্যাধি থেকে শুরু করে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ, মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, মামলার ফলাফল, সবই তাঁর এলাকাভুক্ত।

রমলা গিয়েছিল তার আকুল প্রশ্ন নিয়ে।

এই অলৌকিকের সংবাদদাত্রী হচ্ছে বাড়ির বাসনমাজা ঝি। রমলা কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপিচুপি তার সঙ্গে চলে গিয়েছিল।

চিরদিনের আত্মসম্ভ্রমবোধ-সচেতন, মর্যাদাবোধ-প্রখর, স্বল্পবাক্ রমলার এমন অধঃপতন অবিশ্বাস্য বৈকি। ঝিয়ের সঙ্গে এক রিকশায় বেড়াতে বেরুনো ভাবা যায় না। তা ছাড়া এতো সাহস ওই ঝি-টা পেলো কখন যে, রমলার কাছে এই অলৌকিক কাহিনী ফেঁদে বসে তাকে নোওয়াতে পারলো?

ঝি ডেকে কাজের নির্দেশ দেওয়া ব্যতীত কবে তাদের সঙ্গে বাড়তি দুটো কথা বলেছে রমলা?

অথচ এখন তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখীর মতো—

বিধাতা যাকে অন্য গড়ন দিতে চান, তাকে দুঃখের আগুনে পোড়ানোই যে তাঁর কাজ।

শুধু তো ওই হৃদয়হীন মেয়েটাই নয়, আর একজনও যে তিলে তিলে ক্ষয় করছে রমলাকে অনেক দিন ধরে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ক্রমশঃ মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে—সাগরপারে চলে যাওয়া আর এক হৃদয়হীন সন্তান না আসছে ফিরে, না দিচ্ছে চিঠি। যদি বা কখনো দেয়, সে একেবারে সংক্ষিপ্তের পরের নমুনা।

মা-বাপের অনেক অভিযোগ অনুযোগ, উদ্বেগ, আকুল প্রশ্নের উত্তরে লেখে, এতো ভাবনার কী আছে? মরে গেলে কেউ না কেউ দিতই খবর। জানোই তো আমি চিঠির ব্যাপারে কুঁড়ে।'

অথবা কখনো কখনো অনেকগুলো পয়সা খরচ করে একটা টেলিগ্রাম করে বসে তার কুশল সংবাদ জানাতে।

চিঠি লেখার আলস্যের সপক্ষে তো কুঁড়েমির যুক্তি, আর ফিরে না আসার সপক্ষে?

পড়তে গিয়েছিলি তুই পাঁচ বছরের কোর্স, সাড়ে ন বছর হয়ে গেল আসিস না কেন, এর উত্তর?

তা সে তার জীবনের ঘটনাপঞ্জীতেই প্রকাশিত। পড়ার শেষে বছর খানেক ভ্রমণ করেছে।

ইয়োরোপ আমেরিকার মোটামুটি দ্রষ্টব্যগুলি দেখে নিতে নিতে—পেয়ে গেছে চাকরি। যে চাকরিটি এখন উঠতে উঠতে আকাশ ছুঁচ্ছে। দেশে ফিরে এলে তার দশ ভাগের এক ভাগ মাইনের চাকরি জুটবে?

তবে?

কোন্ সুখে ফিরে আসবে সে? কিসের আশায়? শুধু মা-বাপকে চোখের দেখা দেখতে? অত ভাবপ্রবণ হলে চলে না।

রমলার নিজেরই দাদা আর জামাইবাবু রমলাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, 'পাগল ছাড়া আর কেউ বলবে না ছেলেকে—তুই চলে আয় তোর ওই রাজ্যপাট ছেড়ে। এসে আমাদের সঙ্গে নুনভাত, ফেনভাত খেয়ে "চাকরি চাকরি" করে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়া। তোর এই অস্থিরতার কোনো মানেই হয় না রমলা!'

রমলা স্বামীর কাছে তীব্র হয়েছে, 'তুমিও একথা বলবে? কটা টাকার জন্যে খোকা চিরকাল পৃথিবীর ওপিঠে পড়ে থাকুক?'

অভিযুক্ত আসামী বলে উঠতে পারেনি, 'না না, আমি একথা বলি না। আমারই কি খোকাকে একবার দেখবার জন্যে প্রাণ যাচ্ছে না?'

যেটা বললে পিতৃহৃদয়ের পরিচয় দেওয়া যেতে পারতো।

কিন্তু কি করে দেবে সে পরিচয়?

চাকরির বাজারের হালচাল জানে না সে?

তাই সে শুকনো গলায় বলে, 'না বলেই বা উপায় কি? ওকে আমি মাথার দিব্যি দিয়ে ফিরিয়ে এনে ওর উপযুক্ত কোনো কাজ জুটিয়ে দিতে পারবো? সেখানে রাজার হালে রয়েছে—'

'শুধু রাজার হালে থাকাটাই সব? মা বাপ, নিজের দেশ, সমাজ, এসব কিছুই নয়?'

'সেটা তার বিবেচ্য।' মানু হতাশ গলায় বলেছে, 'মানুষ মাত্রেই তো এটাই জানে রাজার হালে থাকাটাই সব।'

'আমি এবার ওকে দিব্যি দিয়ে চিঠি দেব।' রমলা উত্তেজিত গলায় ঘোষণা করেছিল এবং দিয়েও ছিল সে চিঠি।

ঈশ্বর জানেন কী দিব্যি দিয়েছিল সে। কিন্তু সে চিঠির আর উত্তরই এলো না। প্রত্যাশার দিনগুলি ঝাপসা হতে হতে ক্রমশই মিলিয়ে যাচ্ছে।

এরপর যদি রমলা সরাসরি দেবীর মুখ থেকে আপন বিদীর্ণ হৃদয়ের প্রশ্নের উত্তর পাবার আশ্বাস পায়, তাহলে ছুটে যাবে না সেখানে? সে আশ্বাসটা কার কাছ থেকে পাচ্ছে তা কি বিবেচনা করে দেখতে বসবে? ওই বাসনমাজা ঝিটাকেই তখন তার কাছে দেবীর অংশ বলে মনে হয়েছে।

অথচ মাত্র কিছুদিন আগেও কি রমলা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো সে এমন একটা গ্রাম্য কাজ করতে পারবে?

অলকার গুরুভক্তির বহর দেখে সে মনে মনে হেসেছে।

রমলার শাশুড়ী যখন বেঁচেছিলেন, তখন রমলা বরের বদলির চাকুরিসূত্রে বাইরে বাইরে ঘুরছে, জানে না শাশুড়ী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন কি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। কিন্তু কলকাতায় হেড্ অফিসে বদলি হয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকা অবধি বড় জা'কে দেখছে। দেখেছে তাঁর নীতি-নিয়ম।

কারো অসুখ করলে বড়গিন্নী ডাক্তারের ওষুধের থেকে অনেক বেশী আস্থা রাখেন 'মাকালীর খাঁড়া ধোওয়া জল' অথবা 'মসজিদের জলপড়া'র উপর।

রমলা মনে মনে ওই 'বড় জা'কে মুখ্যু গাঁইয়া ছাড়া আর কিছু ভাবেনি কখনো।

কিন্তু তখন তো রমলা টাটকা।

তখন রমলার ছেলে টকাটক করে ফার্স্ট হয়ে হয়ে ক্লাসে উঠছে, তখন রমলার ছবির মত মেয়েটা নেচে-গেয়ে সারাদিন অনর্গল ছড়া আবৃত্তি করে বাড়ি মাত করে রাখছে। তখন রমলা কেমন করে জানবে সন্তানের মাকে ভূত ভগবান সবই মানতে হয়, মানতে হতে পারে।

বুদ্ধদেবার কক্ষে 'দেবী' রমলার কোন প্রশ্নের কী উত্তর দিলেন, তা রমলাই জানে আর দেবীই জানেন, তবে বাড়ি ফিরলো রমলা যেন কী এক আশা-প্রত্যাশায় ছল-ছল করতে করতে।

ঘরে ঢুকে দেখলো স্বামী চুপচাপ বিছানায় বসে। থমকে বললো, 'এভাবে বসে যে?'

মানু সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'একা একা কোথায় গিয়েছিলে?'

'একা নয়।' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ছোটবৌ।

তারপর হঠাৎ নিজে থেকেই বলে উঠলো, 'গিয়েছিলাম এক জায়গায়, পরে বলবো।'

'খোকার একটা চিঠি এসেছে বিকেলে, তোমায় খুঁজছিলাম—'

খোকার চিঠি এসেছে!

রমলা বিহ্বলভাবে তাকিয়ে বলে, 'খোকার? খোকার চিঠি এসেছে? সত্যি এসেছে? ওগো তাহলে তো জগতে অবিশ্বাসের কিছু নেই। এইমাত্র জেনে এলাম শীগগির খবর আসবে। আর আজই—কই, কোথায় চিঠি, দাও? কাকে লিখেছে?' রমলার কণ্ঠে ব্যস্ততা।

মানু আস্তে বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বার করে দিয়ে বলে, 'তোমার চিঠি, আমি কিন্তু খুলে দেখেছি, ধৈর্য ধরা শক্ত হচ্ছিল—'

'তার জন্যে এতো কৈফিয়ৎ দেবার কী আছে? কী লিখেছে? ভাল আছে তো?'

'ভাল? হ্যাঁ—ভাল আছে বৈকি।'

মানুর গলার স্বরে বিদ্রূপের ছায়া।

রমলার নিয়ম ছেলের চিঠি এলে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরে বসে ধীরেসুস্থে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। যত সংক্ষিপ্ত চিঠিই হোক, বার বার না পড়লে যেন হয় না রমলার।

আজ কিন্তু ওই চোখ বুলিয়ে নিয়েই বসে পড়ে রমলা, দ্বিতীয়বার আর পড়তে পারে না। রমলার মুখটা সাদা দেখায়।

'তোমার দিব্যি দেওয়ার প্রতিক্রিয়া—'

মানু তেমনি বিদ্রূপ আর হতাশার স্বরে বলে, 'আমি জানতাম। এই রকমই

যে একটা চিঠি আসবে এ আমার জানা ছিল। তা যাও ছেলের নেমন্তন্নে ছেলের বাড়ি ঘুরে এসো। কত বড় আশ্বাস দিয়েছে—রাহা খরচ পাঠাবে! এই ছেলের কাছে তুমি কাঁদুনি গাইতে গেছলে? মান রাখলো তার?'

রমলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে বলে, 'সে দেশটা এতো ভালো লেগে গেল তার যে, জন্মভূমিতে একবারের জন্যেও আসতে ইচ্ছে করছে না?'

ও পক্ষ থেকে এর আর কোনো উত্তর এলো না।

রমলা আবার বললো, 'সেখানে বাড়ি কিনেছে, গাড়ি কিনেছে, সে দেশের "নাগরিক" হয়ে বসেছে, তাহলে বিয়েটাই কি করতে বাকি আছে?'

'না থাকাই সম্ভব।'

'আমার দু-দুটো সন্তানকেই হারিয়ে ফেললাম! বিদেশে পড়তে না পাঠালে এমন হতো না—'

'শম্পাকে আমরা বিদেশে পড়তে পাঠাইনি!'

'ওর কথা আলাদা, ওকে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে! ওর খবর পেয়েও চুপ করে বসে থেকেছো!'

রমলাও যে ওই অপরাধের শরিক তা মনে পড়িয়ে দেয় না তার স্বামী। এখনো তেমনি চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে।

হয়তো মনে মনে ভাবে, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেলাম না, এই দুঃখ!

এই কথা ভাবেনি, প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ তখুনি এসে যাবে।

এলো এক অদ্ভুত যোগাযোগ।

নইলে 'পুলক সঙ্ঘে'র সেই ছেলের দলের একজন তাদের স্মারক পুস্তিকাখানা আজই অনামিকা দেবীকে দেবার জন্যে আসবে কেন? আর ঠিক সেই সময়টাতেই তাদের অনামিকা দেবী বাড়িতে অনুপস্থিত থাকবেন কেন?

অবশ্য এমন অনুপস্থিত তো ব্যরো মাসই থাকে বকুল। ছেলেটা শুধু বইখানা দিয়েই চলে গেলে,কিছুই ঘটতো না। কিন্তু ঘটতেই হবে যে!

লগ্ন এসে গেছে সেই অঘটন ঘটনা ঘটবার।

তাই ছেলেটা বইটাকে চাকরের হাতে না দিয়ে বাড়ির কারুর হাতে দিয়ে যাবার বায়না নেয়, আর সেটা দেবার পর সেই বাড়ির লোককে বলে যায়, 'ওঁকে বলে দেবেন সেদিন যে মেয়েটিকে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন, তাঁকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলাম। আর বলবেন, সামনের মাসে যদি আমাদের ম্যাগাজিনের জন্যে একটা—'

কিন্তু শেষাংশটা কে শুনেছে?

কানের পর্দায় আছড়ে পড়ছে শুধু 'যে মেয়েটিকে'!

কে সেই মেয়ে? কেমন দেখতে?

কি রকম বয়েস?

কোথায় পৌঁছে দিয়েছিলে? একটা মাটকোঠায়?

কোথায় সেই মাটকোঠা? দেখিয়ে দেবে চল! দেখিয়ে দেবে চল!

এখন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই তো। এখন ছাড়া আবার কখন? তোমায় আমি ছাড়ব নাকি? ট্যাক্সিতে?

তাছাড়া আবার কী? চলো চলো, দেখে আসি চিনে আসি, সত্যি কিনা বুঝে আসি। তারপর দেখবো প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি কিনা।

রমলা বলেছিল, 'আমিও যাবো।' কিন্তু রমলা তখন যেতে পায়নি।

যদি ঠিক না হয়? যদি রমলাকে ভেঙে গঁড়ো হয়ে ফিরতে হয়? তার চাইতে একেবারে নিশ্চিত হয়ে প্রস্তুতি নিয়ে ভোর সকালে—

দেখা যাক সে মেয়ে আবার কেমন করে হারিয়ে যায়!

॥ ৩৫ ॥

রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের সেই বাড়ি।

কত জন্মমৃত্যুর সাক্ষী, কত উৎসব আর উত্তেজনা, আলোড়ন আর আয়োজনের হিসেবরক্ষক, কত সুখদুঃখের নীরব দর্শক! তার এই চারখানা দেওয়ালের আড়ালে তিনপুরুষ ধরে যে জীবনযাত্রা প্রবহমাণ, তার ধারা আপাতদৃষ্টিতে হয়ত স্তিমিত নিরুচ্চার, তবু মাঝে মাঝে সেখানে ঘূর্ণি ওঠে।...হয়ত এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতার সেই চিরবিদ্রোহী গৃহিণী সুবর্ণলতার আত্মার নিষ্ফল বেদনা এর প্রতিটি ইঁটের পাঁজরে পাঁজরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে বলেই সেই রুদ্ধশ্বাস বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। তবু এদের নিত্যদিনের চেহারা বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত। নিত্যদিন ঘড়ির একই সময়ে এদের রান্নাঘর থেকে উনুন-ধরানোর চিহ্ন বহন করে ধোঁয়া ওঠে, একই সময়ে চাকর যায় বাজারে, রান্নার শব্দ, বাসন মাজার শব্দ, বাটনা বাটার শব্দ আর মহিলাদের অসন্তোষ এবং অভিযোগে মুখর কণ্ঠের শব্দ জানান দেয়, এরা আছে, এরা থাকবে।

হয়ত পৃথিবীতে এরাই থাকে, যাদের দিন-রাত্রিগুলো একই রকম!

শুধু এদের উৎসবের দিনগুলো অন্যরকম, মৃত্যুর দিনগুলো অন্যরকম!

সেই অন্যরকমের ছায়া নেমেছে আজ এ-বাড়ির আকাশে।

বাড়ির এদিকের ঘরে যখন বহু দুঃখ বহু যন্ত্রণা আর বহু প্রত্যাশার শেষে একটি পুনর্মিলনের নাটক অভিনীত হচ্ছে, আর এক ঘরে তখন বিচ্ছেদের মর্মান্তিক দৃশ্য।

মর্মান্তিক, বড় মর্মান্তিক!

এ-বাড়ির সেই ছটফটে ঝলমলে বেপরোয়া উদ্দাম মেয়েটা একেবারে স্থির হয়ে গিয়ে শুয়ে আছে নীল মুখ আর মুদ্রিত চোখ নিয়ে। তার ঘরের মধ্যে শরাহত বাঘের মত যে মানুষটা এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল অবধি এলোমেলো পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, তার চোখের আগুন নিভে এসেছে, বোঝা যাচ্ছে একটু পরে ঘাড় লটকে পড়বে ও।

আর ওই নিথর-হয়ে-যাওয়া মেয়েটার বিছানায় লুটোপুটি করে বিছানাটাকে আর নিজেকে বিধ্বস্ত করে যে মানুষটা কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় বেশী করে কেঁদে উঠছে, তার আর এখন মনে পড়ছে না হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, 'আমি কী কাজ করে ফেলেছি!' তার এখনকার মন তীব্র আর্তনাদে বলে উঠতে চাইছে, 'আমার খুকু, আমার বেবি, আমার কৃষ্ণা, আমার সর্বস্বই যদি চলে গেল, তবে আর আমার মিথ্যার জাল বুনে বুনে মুখরক্ষার চেষ্টার দরকার কী দায়?'

ওই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন লোকটা অলকাকে শাসন করতে এসেছিল, বলেছিল, 'চুপ! একদম চুপ করে থাক। এতদিন আমি চুপ করে থেকেছি, এবার থেকে তোমার পালা।'

কিন্তু পারেনি অলকা নামের ওই 'অতি আধুনিকা' হবার চেষ্টায় বিকৃত হয়ে

যাওয়া মানুষটা। যে নাকি ওই সুবর্ণলতার বংশধরের বৌ। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের এই বাড়িটার খানিকটা অংশে যার আইনসঙ্গত অধিকার।

হ্যাঁ, সেই আইনসঙ্গত অধিকারের বলেই অলকা তার পেন্ট-করা মুখ আর রং লাগানো ঠোঁট বাঁকিয়ে বলত, 'আমার ঘরে আমি যা খুশি করব, কারুর কিছু বলতে আসার অধিকার নেই! বেশ করব আমার মেয়েকে আমি নাচাব গাওয়াব, 'সমাজে' ছেড়ে দেব।...এ বাড়ির এই ঘুণ-ধরা দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে যে 'সনাতনী' সংস্কার এখনও বসে আছে আর এ সংসারের জীবনযাত্রার ওপর চোখ রাঙাতে আসছে, তাকে আমি মানি না, মানব না। তোমরা হচ্ছ কূপমণ্ডূক. তোমাদের কাছে অগ্রসর পৃথিবীর খোলা হাওয়া এসে ঢোকে না।...তোমাদের বাড়িতে নাকি এক প্রগতিশীল লেখিকা আছেন. অন্ততঃ শুনতে পাই বাইরের জগতে পাঠকসমাজে তাঁর নামের ওই বিশেষণ, কিন্তু আমি তো তাঁর প্রগতির কোন চিহ্নই দেখি না। তিনি তোমাদেরই মত সংস্কারে আচ্ছন্ন।...না হলে আমাকে এত লড়তে হত না, আমি একটু অনুকূল বাতাস পেতাম।...আমি কোন আনুকূল্য পাইনি কারও কাছে, সারাজীবন প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে নৌকাকে কূলের দিকে নিয়ে চলেছি। এমন কি তুমি স্বামী. তুমিও আমার প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকটি ব্যাপার অপছন্দর দৃষ্টিতে দেখে এসেছ। কোনদিন সাহায্য সহায়তা করনি। তবু দেখ, আমি কি হেরে গেছি? না হার মেনেছি?...না, হার আমি মানব না। আমার জীবনে যা পাইনি, আমি যে জীবন পাইনি, সেই জীবন, সেই পাওয়া আমার মেয়েকে আমি দেব।'

প্রায় এইরকম নাটকীয় ভাষাতেই কথা বলে এসেছে অলকা এযাবৎ! অপূর্ব চুপ করে থেকেছে, চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছে। প্রতিবাদ তুললেই অলকা এমন ঝড় তোলে যে বাড়িতে মানসম্মান বজায় থাকে না।

অথচ আজকালকার দিনে এই রাস্তার ওপরকার বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে মানসম্মান নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়াও সহজ নয়।

তাই চুপ করে থাকতে হয়েছে অপূর্বকে। এবং অলকা ওই চুপ করিয়ে রাখার আত্মপ্রসাদে ডগমগ করতে করতে একটা অজানা জগতের দিকে অন্ধের মত ছুটেছে। সেই ছোটাটার বাহন তার মেয়ে। সে মেয়েটা এখন জবাব দিয়েছে।

না, আর কোনদিন তাকে নিয়ে ছুটতে পারবে না অলকা।

এখন তাই অপূর্বর দিন এসেছে।

কথা বলার দিন।

আগুনের ডেলার মত দুই চোখে ওই শোকাহতার দিকে তাকিয়ে নির্মমারিকের মত বলেছে 'চুপ! চুপ! চুপ করে থাক! টুঁ শব্দ নয়!'

কিন্তু সে শব্দ তো করেই বসে আছে তার আগে অলকা। মাতৃহৃদয় কি একবারও হাহাকারে ফেটে না পড়ে পারে?

অলকা আত্মগ্লানিতে হাহাকার করে উঠে বলেছে, 'আমি কী করলাম! আমি কী করলাম! আমি লোকলজ্জার ভয়ে আমার সোনার খুকুকে হারালাম। ওরে খুকু কেন আমি তোর নিষ্ঠুর বাপকে ভয় করতে গেলাম! কেন তোকে নিয়ে এদের সংসার ছেড়ে চলে গেলাম না!'

তারপর আর বলতে পায়নি অলকা।

চিরদিনের মুখরা ওই মেয়েটাকে চিরদিন 'চুপ করে থাকা' মানুষটা চুপ করিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাতে আর কী লাভ হল?

ওই একবারের হাহাকারেই তো সংসারসুদ্ধ লোক জেনে ফেলেছে ঘটনাটা কী। জেনে ফেলেছে ঝি-চাকরেরাও। অতএব পাড়ার লোকেও জেনে ফেলল বলে।

এ সংসারের অন্য সদস্যরা সাধ্যপক্ষে অলকার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াতো না। অলকার ঔদ্ধত্য, অলকার স্বেচ্ছাচার, অলকার বিশ্বনস্যাৎ ভাব সকলকেই দূরে সরিয়ে রাখত।

কিন্তু আজ আর অলকার সে গৌরব নেই। আজ অলকার মুখের রং গেছে মুছে, চোখের কাজল গেছে ধুয়ে, উদ্ধত উচ্চচূড়া খোঁপাটা গেছে ভেঙে লুটিয়ে, অলকা পরাজিতের চেহারা নিয়ে পড়ে আছে।

তবে আর আসতে বাধা কি?

একটি বিধবা কন্যার আর একটি মৃতা কন্যার সন্তানসন্ততিকুল নিয়ে এবং বাতের যন্ত্রণা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন মেজ জেঠি স্বয়ং, যিনি অলকার মুখই দেখতেন না। এসেছেন বড়গিন্নী তাঁর জ্বালাভরা প্রাণ নিয়ে। ছেলের বৌ কোনদিনই তাঁকে মানুষ বলে গণ্য করত না, গুরুজন বলে সমীহ করত না, তিনিও তাই ওই 'ভিন্ন হয়ে যাওয়া' ছেলে, ছেলের বৌয়ের ছায়াও মাড়াতে আসতেন না।

কিন্তু আজকের কথা স্বতন্ত্র।

আজ ওই প্রতিপক্ষের সকল দর্প চূর্ণ!

যাকগে নিজের প্রাণ ফেটে, তবু তিনি মনের অগোচরে নিরুচ্চার উচ্চারণে বলে বসেছেন, 'হে নারায়ণ, দেখলাম "দর্পহারী" নামই তোমার আসল নাম!'

ঘরের একাংশে কোণের দিকে ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে শম্পা আর তার মা-বাবা...যে শম্পা বহুদিন পরে আজই প্রথম আবার এ-বাড়িতে এসে আহ্লাদে বেদনায়, বিস্ময়ে, কৌতূহলে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিল। সহসা উঠল ওই আর্তনাদ বাতাস বিদীর্ণ করে।

'আমি কী করলাম! আমি কী করলাম!'

'ভগবান, তুমি কী করলে! তুমি কী করলে!' এ শোকের সান্ত্বনা আছে! 'আমি কী করলাম!' এ শোক সান্ত্বনার বাইরের।

শম্পা অবাক হয়ে যেন নিজের ভাগ্যও দেখছিল। এতদিন কিছু হল না, ঠিক আজই ঘটল এই দুর্ঘটনা!

শম্পা একটা অদ্ভুত বিষাদ-বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই নীল-হয়ে-যাওয়া মেয়েটার স্তব্ধ দেহটার দিকে তাকিয়ে।

ওই মেয়েটা শম্পার আশৈশবের সঙ্গিনী নয়, চিত্তজগতের সখী নয়, এমন কি সম্পর্কসূত্রে যে বন্ধনটুকু থাকা উচিত সে বন্ধনেরও গ্রন্থি ছিল না পরস্পরের মধ্যে। তবু তারা দুজনে প্রায় সমবয়সী, দুজনে একই ছাদের নীচে থেকেছে জন্মাবধি।...

যখন অপূর্ব তার স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে রান্নাঘর আলাদা করে ফেলেনি তখন শম্পা আর ওই মেয়েটা একসঙ্গে খেয়েছে, একত্রে বসেছে।

এতদিন শম্পা অনুপস্থিত ছিল, জানতে পারেনি ওদের ওই কাঁচের পার্টিশান দেওয়া ঘরের আড়ালে কী ঘটেছে, সে ঘটনা কোন্ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। ...আজ এইমাত্র এসে চরম পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিছু ভাববার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে শম্পা, শুধু আচ্ছন্ন হয়ে তাকিয়ে আছে।

আর এ-বাড়ির আর একজন সদস্যা?

অলকা নামের ওই প্রগতিশীল মহিলাটির কাছে যে নাকি চিরদিন ব্যঙ্গের পাত্রী?

সেই লেখিকা বকুল?

এ-বাড়িতে যে বেমানান, এ-বাড়িতে যে নিজেকে গুটিয়ে রাখার ভূমিকাতেই অভ্যস্ত?

তা তাকেও এখানে আসতে হয়েছে বৈকি।

সম্পর্কের দায়ে নয়, হৃদয়ের দায়েই।

বকুলেরও মনের মধ্যে কোন্‌খানটায় যেন চিন্‌চিন্‌ করছে।

আমরা মেয়েটাকে তাকিয়ে দেখিনি। আমরা আমাদের কর্তব্য করিনি। ওকে ওর ওই নির্বোধ আর আধুনিকতার বিকারগ্রস্ত মায়ের হাতে সমর্পণ করে রেখে দিয়েছি। ওর এই পরিণামের ভয়াবহ আশঙ্কা কি আমাদের মনের মধ্যে উঁকি মারেনি?

মেরেছে।

তবু আমরা 'ওর ছাগল ও যেদিকে ইচ্ছে কাটুক' বলে দায়িত্ব এড়িয়ে বসে থেকেছি। সেই ভয়াবহতাই এসে চিলের মত ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল মেয়েটাকে।

আর কিছু করার নেই। ভুল সংশোধনের আর কোন উপায় নেই।

না আমাদের, না ওর মার। কিন্তু ওর বাপই কি নির্দোষ?

সে কি তার কর্তব্য করেছে? নাকি একটা নিষ্ঠুর হিংস্রতায় বসে বসে অপেক্ষা করেছে কবে ওর মার দর্পচূর্ণ হয়?

অসম্ভব...এ হয়তো অসম্ভব, তবু চুপ-করিয়ে-দেওয়া অলকা মাঝেমাঝেই বাঁধ ভেঙে কথা বলে উঠেছে। তীব্র অভিযোগের কথা, 'জানি জানি, খুব আহ্লাদ আজ তোমার! আজ তোমার শত্রুর হার হয়েছে। বরাবর তুমি আমায় শাসিয়েছ, "এত বাড়াবাড়ির প্রতিফল একদিন পাবে।" পেলাম সে প্রতিফল। এখন আহ্লাদ হবে না তোমার? লড়াইয়ে জেতার আহ্লাদ!'

বকুল এগিয়ে আসে।

যে বৌটা চিরদিনই ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তার কথাকে নস্যাৎ করে এসেছে, তাকেই দৃঢ়স্বরে বলে, 'এসব কী কথা হচ্ছে অলকা?...শুধু তোমারই কষ্ট হচ্ছে? অপুর হচ্ছে না?'

অলকা মুখ তুলে লাল-লাল চোখে বলে, 'উপদেশ দিতে এসেছেন? দিন পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করছেন? করবেন বৈকি। তবে "এ দিন" আপনাদের পেতে হত না। ওই যে নিষ্ঠুর লোকটা, যার দুঃখে সহানুভূতি আসছে আপনার, তার জন্যেই এই "দিন" পাওয়া আপনাদের। আমি আপনাদের ওই পচা সমাজকে মানতাম না, আমি "কলঙ্ক"কে কেয়ার করতাম না, শুধু ওর ভয়ে—হ্যাঁ, শুধু ওর ভয়েই খুকু আমার—'

বকুল আস্তে আস্তে সরে গেল।

ওই অনুতাপে জর্জরিত বিকারগ্রস্ত মানুষটা এখন প্রায় পাগলের সামিল। ওর কথায় কান দেওয়া চলে না।

এখন উদ্ধার হতে হবে এই বিপদ থেকে।

এ মৃত্যু শোকের পবিত্রতা নিয়ে আসেনি, এসেছে বিপদের ভয়াবহতা নিয়ে।

বকুল বাইরে এসে ডাকল, 'ছোড়দা!'

যা করবার ওই ছোড়দাকেই করতে হবে।

তারপর বকুল দালানের এধারে, যেখানে উঁচু দেয়ালে এ-বাড়ির প্রাক্তন কর্তা প্রবোধচন্দ্র আর তাঁর গৃহিণী সুবর্ণলতার ছবি টাঙানো আছে, সেধারে চলে এল।

সেদিকে তাকিয়ে রইল না, অন্য আর এক দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, মা,

তুমি কি অহরহ এই মুক্তিই চেয়েছিলে? এই শৃঙ্খলমুক্তি? তোমার প্রাণ কুটে চাওয়ার ফল কি এই?

॥ ৩৬ ॥

বকুলের এ প্রশ্নের প্রতিধ্বনি উঠেছে সুবর্ণলতার আরও একটা আত্মজার কণ্ঠে।...'কিন্তু এইটাই কি চেয়েছিলাম আমরা? আমি, তুমি, আমাদের মা দিদিমা, দেশের অসংখ্য বন্দিনী মেয়ে? এটাই কি সেই স্বাধীনতার রূপ? যে স্বাধীনতার জন্যে একদা পরাধীন মেয়েরা পাথরে মাথা কুটেছে, নিরুচ্চার আর্তনাদে বিধাতাকে অভিসম্পাত করেছে? এ কি সেই মুক্তির আলো, যে মুক্তির আশায় লোহার কারাগারে শৃঙ্খলিতা মেয়েরা তপস্যা করেছে, প্রতীক্ষা করেছে?...না বকুল, এ আমরা চাইনি।'

বকুলের সামনে টেবিলের ওপর যে খোলা চিঠিটা পড়ে রয়েছে, তার উপর পৃষ্ঠার এই কটা লাইনের দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রয়েছে বকুল। যেন অক্ষর গুনে গুনে পড়ছে।

তারপর কলমটা তুলে নিল, নিল প্যাড্‌টা। লিখতে লাগল আস্তে আস্তে। কে জানে ওই চিঠিটারই জবাব দিচ্ছে, না নিজের প্রশ্নেরই জবাব খুঁজছে!

'কিন্তু আমাদের "চাওয়া" নিয়েই কি পৃথিবী চলবে? এই অনন্তকালের পৃথিবী কখনও কি কারুর 'চাওয়ার' মুখ চেয়ে চলেছে, চলার পথ বদল করেছে, অবহিত হতে থমকে দাঁড়িয়েছে?...প্রকৃতি তার অফুরন্ত সম্পদের ডালি নিয়ে যে ঋতুচক্রে আবর্তিত হচ্ছে, সে কি কারও চাওয়ার ওপর নির্ভর করে?...জগতে যা কিছু ঘটে চলছে, সে কার ইচ্ছায়? যা কিছু অসঙ্গতি, যা কিছু ভালমন্দ, কার তপস্যায়, কার মাথা কোটায়? কারুর নয়, কারুর নয়, মানুষের ভূমিকা কাটা সৈনিকের।

আমরা ভেবে মরছি—আমি করছি, তুমি করছ, ওরা করছে, এরা করছে, কিন্তু সেটা কি সত্যি?

পৃথিবী তার আপন নিয়মে চলে, প্রকৃতি তার আপন নিয়মে চলে, সমাজও তার আপন নিয়মে চলে। মানুষ সেখানে নিমিত্ত মাত্র। তবু মানুষ বদ্ধপরিকর হয়ে সংকল্প করে, এটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করব। তাই অহরহই তোড়জোড়, অহরহই তাল ঠোকা আর অহরহই মাথা ঠোকা। ওই 'তাল ঠোকা'র দল আপন বুদ্ধির অহঙ্কারে সমাজের একটা ছাঁচ গড়ে ফেলে সেটাকেই চালাতে চায়, আর না চললে আর্তনাদ করে মরে, গেল, গেল, সব রসাতলে গেল! যেমন বন্যায় যখন গ্রাম, নগর, ফসলের ক্ষেত ডোবে, আর্তনাদ ওঠে—'গেল, সব গেল!' কিন্তু ও আর্তনাদে মহাকালের কিছু যায় আসে না, পৃথিবীর কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন থাকে না।

যা ক্ষতি, সে ক্ষতি ব্যক্তি-মানুষের। যা লাভ-লোকসান সে জনাকয়েক লোকের। তারা যেমনটি চেয়েছিল পেল না, যে জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল সেটা হল না, সেটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। শুধু এই। তার বেশি কিছু নয়। সেই ধ্বংসের ওপর আবার নতুন ফসল ফলে, আবার নতুন গ্রাম শহর গড়ে ওঠে।

আমরা আপন কল্পনায় সমাজের একটা ছাঁচ গড়েছিলাম। আমাদের সর্বাঙ্গের শৃঙ্খল যেখানে যেখানে অসহনীয় যন্ত্রণায় পীড়িত করেছে, সেখানটায় বন্ধন শিথিল করতে চেয়েছিল। ভেবেছিলাম এই শেকলে নাটবল্টু, কব্জা স্ক্রু এগুলো

একটু আলগা হোক, কিন্তু আমাদের চাওয়াই তো শেষ চাওয়া নয়! আরও চাওয়ার পথ ধরে ওই স্ক্রু, কব্জা, নাটবল্টুগুলো খুলে খুলে ছিটকে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে। ...যাবেই। কারণ আর এক নতুন ছাঁচ জন্মাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

এইভাবেই এই অনন্তকালের পৃথিবীর অফুরন্ত জীবজগৎ মহাকালের খাজনা যুগিয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবছে চেষ্টা করছে, প্রত্যাশা করছে, তপস্যা করছে, লড়াই করছে, তারপর কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তাই এক যুগে যা 'নির্ভুল ছাঁচ'—পরবর্তী যুগে তা ভুলে ভর্তি। বহু চিন্তাবিদের চিন্তার ফল, বহু কল্যাণকামীর কল্যাণ-চেষ্টা, আর বহু তাপসের তপস্যার ফল যে সমাজব্যবস্থা, তাকে দেখে দেখে পরবর্তীকাল ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে অবজ্ঞা করে।

ভাবে কী বোকা ছিল ওরা! কী মূর্খ!

তবু সমাজ চিরদিনই 'জীবন' নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাবে। কারুর চাওয়ার ধার ধারবে না।

চিঠিই হয়তো লিখছে বকুল। তার সেজদি পারুলের চিঠির জবাব।

না হলে সামনের খোলা চিঠির পাতা ওল্টানো কেন? ওপিঠে যা লিখেছে পারুল, সেটা আবার একবার দেখতে বসল কেন?

ভুল করে হয়তো উল্টো পিঠটা উল্টেছে বকুল, তাই আগের কথাগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

পারুল সব সময় ধরে ধরে পরিষ্কার করে লেখে, এখনও এই উত্তাল প্রশ্নেও তার হাতের লেখায় দ্রুততার ছাপ তেমন নেই, যেমন থাকে বকুলের লেখায়। 'অনামিকা দেবী' হয়ে অনেক লিখতে হয় বকুলকে, তাই ও যখন 'বকুলের কথা' লিখতে বসে, তখন দ্রুততা আর ব্যস্ততার ছাপ।

পারুলের বাইরের জীবন চিরদিনই শান্ত ছন্দে আবর্তিত। শুধু পারুলের ভিতরের জীবন চির-অশান্ত।

তবু পারুল মুক্তোর মত অক্ষর লিখতে পারে। লিখেছে—

'একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে গেল কিছুদিন আগে। তোকে ছাড়া আর কাকে বলব!'

হঠাৎ খবর পেলাম শোভনের ভয়ানক অসুখ, অফিসে হঠাৎ চৈতন্য হারিয়ে চেয়ারেই পড়ে গিয়েছিল, হসপিটালে নিয়ে গেছে। অফিসেরই একটি চেনা ছেলে, আমি যখন একবার গিয়েছিলাম 'মাসিমা, মাসিমা' করত, খবরটা সে-ই পাঠিয়েছে।

বুঝতেই পারছিস, কী অবস্থায় কী ভাবে ছুটে গিয়েছি!

গিয়ে দেখি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে এনেছে।

আর দেখলাম রেখা সেবা করছে।

খবরটা ওকেও দিয়েছিল।

আমার ছুটে চলে যাবার জন্যে তো সঙ্গী যোগাড়

যেটুকু দেরি হয়েছিল, ওর তো তা হয়নি। ও নিজেই ......

মনের অগোচর পাপ নেই বকুল, সেই প্রায়-অচৈতন্য ছেলেটাকে দেখেও আমার মন বলে উঠল, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন, এ কথাটা কোনদিন বিশ্বাস করতাম না, আজ করলাম। শোভনের এই মৃত্যুতুল্য অসুখই শোভনকে আবার 'জীবনে'র স্বাদ ফিরিয়ে দিল। অসুখের বদলে আবার সুখ ফিরে পেল শোভন।

মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু 'মাতৃ-অধিকারে'র দাবি নিয়ে

ছেলের শিয়রে বসতে গেলাম না। বহিরাগতের মতই শুধু কাছে একটু বসলাম, শুধু বউকে জিজ্ঞেস করলাম, কী অবস্থা, কী ওষুধ খাচ্ছে, ডাক্তার কী বললে, আবার ডাক্তার কখন আসবে। জিজ্ঞেস করলাম কদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। শুধু জিজ্ঞেস করিনি—'তুমি কবে এলে, কখন এলে?'

যেন ও আছে।

যেমন বরাবর ছিল।

ওর আসনে গিয়ে ও যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন আর কেন মনে পড়িয়ে দিই, 'একদিন তুমি স্বেচ্ছায় এ আসন ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে!'

শোভনের তৃষিত দৃষ্টি যে সব সময় বউকেই খুঁজছে, এ নিয়ে মনে কোন অভিমান জমে ওঠেনি বকুল, জমে ওঠেনি কোন ক্ষোভ।

মনে হয়েছিল, বাঁচলাম। আমি বাঁচলাম।

'ভালবাসা'র সত্যি চেহারা দেখে বাঁচলাম। বাঁচলাম বউমাকে আবার চাকর-টাকরকে বকতে দেখে, বাড়ি অগোছালো করে রেখেছে কেন বলে। বাঁচলাম বৌমা আবার রান্নাঘর ভাঁড়ারঘরের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে।

শোভনের যা কিছু খাওয়ার দরকার বউমাই করে, এবং এমন নিপুণ ভাবে করে যে স্বীকার করতে লজ্জা হয় না, আমার দ্বারা এর সিকিও হত না।

আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠেছিল শোভন, ওর মুখে নতুন স্বাস্থ্যের ও লাবণ্যের সঙ্গে যে আশা আর আনন্দের লাবণ্য ফুটে উঠেছিল সেটা দেখে বর্তে যাচ্ছিলাম।

বুঝলাম, বউয়ের আসা, দুজনের মধ্যেকার ভুল-বোঝাবুঝির অবসান, এটাই ওর পক্ষে মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করেছে।

ভাবলাম এবার পালাই।

বেশী স্বাদ পাবার লোভে কাজ নেই। শুধু সেই হতভাগা ছেলেটাকে বোর্ডিং থেকে আনবার কথা বলে যেতে পারলেই—

সেদিন শোভন বেশ ভাল আছে, ভাবলাম এইবার বলি। যেতে গিয়ে দেখি বিছানায় বসে কাগজ পড়ছে শোভন, বউমা কাছে চেয়ারে বসে, শোভনেরই বোধ হয় জামায় বোতাম বসাচ্ছে।

চলে এলাম।

ছন্দভঙ্গ করতে ইচ্ছে হল না। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম।

খানিক পরে এঘরে এসে দেখি বউমা শোভনের আলমারি খুলে যত পোশাক বার করে রোদে দিয়েছে, আলমারির দেরাজ খোলাটোলা।

আহ্লাদের চাঞ্চল্য বড় বেশী চাঞ্চল্য বকুল, সেই আহ্লাদটা যেন নিজের মধ্যে বইতে পারছি না!

এই সময়ে বউমা এ ঘরে এল।

বলে উঠলাম, 'এইবার একটা পিয়নটিয়ন কাউকে বলে আমায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর বউমা। শোভন তো এখন বেশ ভালই আছে।'

বকুল রে, বোকা বনে গেলাম ওর জবাব শুনে!

পারুলবালা কখনও জীবনে এমন বোকা বনেনি!

অথচ ও খুব সহজ ভাবেই বললে, 'ভাল আছে, তবে এখনও তো কিছুটা দেখাশোনার দরকার আছে! আপনিও চলে যাবেন?'

'আপনিও' চলে যাব!

এ আবার কি ভাষা!

বোকার মত বলে ফেললাম, খুব বোকার মত বলে ফেললাম, 'আমিও মানে?'

রেখা বলল, 'আমি তো কাল চলে যাচ্ছি। ছুটি ফুরিয়ে গেল।'

তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার তো আর ছুটি ফুরনোর প্রশ্ন নেই। আরও কিছুদিন থাকলে ভাল হত।'

তবু এখনও পুরোটা বুঝতে পারিনি বকুল!

হয়তো অবচেতন মনের ইচ্ছেটাই পারতে দেয়নি!

চোখের সামনে প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটলে সেটা নিশ্চিত দেখেও যেমন বার বার মনে হয়, ওই বুঝি বুকটা নড়ছে, ওই বুঝি নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে, তেমনি অবোধ প্রত্যাশাতেই ভাবলাম, হয়ত হঠাৎ চলে এসেছে বলেই একেবারে পদত্যাগপত্র দিয়ে আসতে পারেনি, তাই ছুটি ফুরনোর প্রশ্ন। অথবা হয়তো, এমনি হঠাৎ ছুটে চলে এসেছিল সংকটাপন্ন অসুখের খবর শুনে, এসে দেখেছে কী ভুল করে দূরে বসে আছি!

ভালবাসার ঘরে ভালবাসার জনের কাছে নতুন করে বন্দী হয়ে গিয়ে আটকে গেছে। তবু সেখানকার ঋণটা শোধ করতে একবারও তো যেতে হবে।

তাই বললাম, 'ওঃ! তা ক'দিনের জন্যে যেতে হবে? সে ক'দিন তাহলে থাকব।'

রেখা আমার থেকে অনেক বেশী অবাক হয়ে বলল, 'ক'দিনের জন্যে মানে? এবার তো চলেই যাব!'

'চলে যাবে? এখান থেকে আবার চলে যাবে?'

রেখা হঠাৎ খুব হেসে উঠল।

হয়ত কান্নাটাকে হাসিতে রূপান্তরিত করে ফেলবার কৌশল ও শিখে ফেলেছে।

বোধ হয় সেই হাসিটাই হেসে বললে, 'ওমা! আপনি কি ভেবে রেখেছেন আমি চিরকালের জন্যে এখানে থাকতে এসেছি? হঠাৎ অসুখ শুনে—'

বললাম, 'হঠাৎ অসুখ শুনে থাকতে না পেরে ছুটে চলে আসাই তো "চিরকাল থাকবার" ইশারা বউমা! একবার ভুল করেছ তোমরা, আর ভুল করো না। এটাই তোমার চিরকালের জায়গা, চিরকালই থাকবে।'

ও আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'কী যে বলেন!'

বেশ অবলীলায়ই বলল।

আর কিছু বলে উঠতে পারলাম না বকুল। এই অবলীলার কাছে কী কাকুতি-মিনতি করব। কোন্ ভাষায়!

শোভনের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম।

বোধ হয় 'কেঁদে পড়লাম' বললেই ঠিক বলা হত। যা পারুলবালার জীবনে কখনও ঘটেনি।

বললাম, 'শোভন কী বলেছিস তুই বউমাকে?'

তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

এই মুখটা আবার কোথায় ফিরে পেল ছেলেটা, যে মুখটা প্রথম দিন এসে দেখেছিলাম! এ যেন সেই মুখ। সেই কালিপড়া শুকনো। হঠাৎ পাওয়া লাবণ্যটুকু কোথায় গেল? এত আকস্মিক এমন চলে যেতে পারে?

ওর মুখের সামনে এখনও খবরের কাগজখানা।

প্রায় আড়াল থেকেই শুকনো গলায় বললো, 'আমি কি বলব?'

রেগে গেলাম। বললাম, 'সামনে থেকে আড়াল সরা! স্পষ্ট চোখে চেয়ে বল, কিছু বলিসনিই বা কেন? কেন বলিসনি, তোমার যাওয়া চলবে না?'

শোভন বলল, 'যা হয় না, তা হওয়াবার চেষ্টাটা পাগলামি!'

'এইটাই সুস্থতা?' বললাম, 'তোর অসুখ শুনে রেখা কী ভাবে ছুটে এসেছিল তা দেখতে পেলি না তুই? তোর কি চোখ নেই? ভালবাসা চিনতে পারলি না?'

ও কি বললো জানিস?

বললো, 'চিনতে পারলেই বা কি? সকলের ওপর হচ্ছে প্রেসটিজ। যে জিনিসটা "ভেঙে গেছে" বলে সকলের সামনে ফেলে দিয়েছি, সেটাকে তো আর আবার সকলের সামনে তুলে নেওয়া যায় না!'

'কেন নেওয়া যায় না? শুধু ওই সকলের কাছে ধরা পড়ে যাওয়া—আমরা ভুল করেছিলাম, এই তো! আর কি? ওটা কে কদিন মনে রাখবে শোভন? কে কার কথা নিয়ে বেশিদিন মাথা ঘামায়? ওই সকলরা দুদিন বাদে ভুলে যাবে। আমি বলছি শোভন, তুই ওই একটা মিথ্যে একটু 'প্রেসটিজে'র অহঙ্কারে আবার ভুল করিসনি। তুই ওকে বল্!'

শোভন আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে দেয়ালে চোখ রেখে বললো, 'প্রেসটিজটা একা আমারই নয় মা। তবু বলেছিলাম।'

'বলেছিলি? শোভন, কী জবাব দিল ও?'

শোভনও তখন একটু হেসে উঠল। হেসে বলল, 'জবাবই দিল। বললো, আর হয় না।'

আর হয় না! আর হয় না!

মৃত্যুর কাছে যেমন অসহায়তা, যেমন নিরুপায়তা, এ যেন তেমনি। ওদের নিজের হাতের দণ্ডই ওদের কাছে মৃত্যুর মত অমোঘ।

অতএব রেখা এই সংসারকে গুছিয়ে দিয়ে যাবে, রেখা তার নিঃসঙ্গ স্বামীর কোথায় কী অসুবিধে সেটা নিরীক্ষণ করে দেখে তার সাধ্যমত প্রতিকার করে যাবে, রেখা বাকি জীবনটা কান্নাকে হাসিতে রূপান্তরিত করে হেসে হেসে পৃথিবীতে বেড়াবে, আর শোভন নামের ছেলেটা 'অনুশোচনা' নামের চাপা আগুনে তিল তিল করে পুড়ে, তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে, জীবনের সব আকর্ষণ হারাবে, আর অশান্ত যন্ত্রণায় ছটফটাবে! তবু কেউ ভাববে না, এত নিরুপায়তা কেন? উপায় তো আমাদের হাতেই ছিল। আমাদের হাতেই আছে। কারণ আমাদের ভালবাসাটা আছে। সেটা মরে যায়নি!

ভাবতে পারত যদি ওদের সে সাহস থাকত, থাকত সে শক্তি! যে শক্তিতে ওই 'সকলের' চোখকে অবহেলা করা যায়!

তার মানে কেউ কোথাও এগোয়নি বকুল, এগোচ্ছে না। আমরাও যেখানে ছিলাম, এরাও সেখানেই আছে।

রেখা চলে গেল। আমিও আর কয়েকদিন ছিলাম। বসে বসে ছেলেটার যন্ত্রণার মুখ দেখলাম, যে যন্ত্রণার ছায়া দেখেছি রেখার মুখেও।

এখন ফিরে এসেছি।

গঙ্গার এই তরঙ্গের সামনে বসে বসে ভাবছি, আমরা কি এই চেয়েছিলাম?

এই মুক্তি?

তুই তো জানিস আমাদের মাতামহী সত্যবতী দেবীর কথা!

তিনি নাকি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সংসারের গণ্ডি ছেড়েছিলেন, 'বিয়ে' জিনিসটা ভাঙবার নয় কেন? তিনি কি এখন কোনোখানে বসে তাঁর প্রশ্নের অনুকূল উত্তর পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠছেন? দেখছেন, ওটা 'ভাঙবার কিনা' এই প্রশ্নটাই আজ হাস্যকর হয়ে গেছে!

হয়তো বহু পুরনো, বহু ব্যবহৃত ওই বিয়ে প্রথাটাই আর থাকবে না পৃথিবীতে। হয়তো—'

বকুল এই চিঠির পৃষ্ঠাটা ঠেলে রেখে নিজের প্যাডে চোখ ফেললো।

আর অভ্যস্ত দ্রুততায় লিখে চললো, 'কিন্তু তাতে কী? এমন একটা কাল ছিল, যখন ও প্রথাটা ছিল না। এখনও এই পৃথিবীতেই এমন 'জগৎ' আছে, যেখানে এখনও বিয়ে প্রথাটা নেই, তারা স্রেফ্ জীবজগতের নিয়মে চলে।

অবশ্য কোন একটা নিয়ম মেনেই চলে। সে তো পশুপক্ষী কীটপতঙ্গও চলে। স্ত্রী-পুরুষের নিগূঢ় আকর্ষণের বন্ধনটা কেউ এড়াতে পারে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোন 'সভ্যতা'ই এ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের পথ বাতলাতে পারেনি। ওটা থাকবে, এবং দেশ কাল আর পাত্রের সুবিধা অনুযায়ী নতুন নতুন ব্যবস্থা তৈরী হবে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন 'সভ্যতা'।

নতুন মানুষরা তাকেই অনুসরণ করে চলবে। বলবে এইটা 'নির্ভুল'।

গৌরববোধ করবে, তখনকার বর্তমানের সভ্যতা নিয়ে, শিল্প নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে, সমাজনীতি রাজনীতি নিয়ে।

বলবে, 'দেখ এ অমর! এ অবিনশ্বর!'

মহাকাল অবশ্যই অলক্ষ্যে বসে হাসবেন। ওটাই যখন তাঁর পেশা।

একদা এই মানুষ জাতটা গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে নানান চেষ্টা শুরু করেছিল, শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা। আর কিছু না। শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি করে বেঁচে থাকা। ক্রমেই দেখল চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। বড় খুশী হয়ে উঠল। নিজের কৃতিত্বে মোহিত হল মুগ্ধ হল, অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে চলল। অবশেষে গুহা থেকে চাঁদে উঠল।...আরও ছুটছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। টের পাচ্ছে না তাদের চলার পথটা আবার গুহামুখো হয়ে যাচ্ছে!

যাবেই। যেতে বাধ্য। পথটা যে বৃত্তপথ।

তবু কালের হাতের ছোট্ট পুতুল এই মানুষগুলো তাদের ক্ষণকালের জীবনের সম্বলটুকু নিয়েই 'সামনে এগোচ্ছি' বলে ছুটবে।

ছুটবে, ছুটোছুটি করবে, লাফাবে, চেঁচাবে, মারবে, মরবে, লোভে ডুববে, হিংসায় উন্মত্ত হবে, স্বার্থে অন্ধ আর রাগে দিশেহারা হবে।

নিজের দুঃখের জন্যে অন্যকে দোষ দেবে, আর সম্পদের জন্যে আপন মহিমার অহঙ্কারে স্ফীত হবে।

যে জীবনটার জন্যে সামান্যতম প্রয়োজন, তার প্রয়োজনের সীমানা বাড়াতে বাড়াতে আরও 'অধিকের' পিছনে অজ্ঞানের মত ছুটবে, যে সোনার কণামাত্রও 'নিয়ে' যাবার উপায় নেই জানে, সেই সোনার পাহাড় গড়ে তুলতে জীবনের সমস্ত শ্রেয়গুলিকে জলাঞ্জলি দেবে।

এরই মধ্যে আবার কিছু মানুষ চিৎকার করে বলবে, 'চলবে না। চলবে না। এসব চলবে না।'

তবু চলবে।

কিছু মানুষ গম্ভীর গলায় বলবে, 'ওটা ঠিক নয়, ওটা অন্যায়, ওটা পাপ।'

যেন পাপপুণ্যের মাপকাঠি তাদের হাতে। যেন আজ যা চরম পাপ, আগামী কাল তা পরম পুণ্য হয়ে সভায় এসে আসন নেবে না। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাবে তারা। ভাববে তাদের হাতেই নির্ভুল ছাঁচ!

তা বলে কি কোথাও কিছু নেই!

আছে।

তবু কোথাও কিছু আছে।
তবু কোথাও কিছু থাকে।
থাকবে।

একান্ত তপস্যা কখনও একেবারে ব্যর্থ হয় না।

তাই সুবর্ণলতাদের সংসারে শম্পাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়। যারা সর্বস্বের মূল্যে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবন পাবার দুঃসাহস রাখে।

অতএব মস্ত লেখিকা অনামিকা দেবী এখনও কোন কোন দিন, যেদিন জীবনের সব কিছু নেহাৎ অর্থহীন লাগে, ছেলেমানুষের মত রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে খোঁজেন, আর আরও ছেলেমানুষের মত অসহায় গলায় বলেন, দেখ, যে লেখা আগামী কালই জলের আলপনার মত মিলিয়ে যাবে, সেই লেখাই লিখলাম জীবনভোর,—শুধু বকুলের কথাটা আর লেখা হল না...তোমার আর বকুলের কথা।

কী লিখব বল? তারা তো হার মেনে মরেছে। হার মানার কথা কি লেখা যায়? সেই হার মানার মধ্যে যে পাওয়া, তার কথা বলতে গেলে লোকে হাসবে। বলবে, 'কী অকিঞ্চিৎকর ছিল ওরা!' তবে?

প্রত্যক্ষে যারা জিতেছে, এখন তবে তাদের কথাই লিখতে হবে।...

এখন তাই শম্পার কথা লেখা হলো। যে শম্পা খেটে খেটে রোগা হয়ে যাওয়া মুখে মহোৎসাহের আলো মেখে বলে, 'আমার নতুন সংসার দেখতে গেলে না পিসি? যা গুছিয়েছি দেখে মোহিত হয়ে যাবে। দক্ষিণের বারান্দায় বেতের মোড়া পেতে ছেড়েছি। আর তোমার জাম্বুবানকে তো প্রায় মানুষ করে তুলেছি। চাকা-গাড়ি চড়িয়েই একবার সেজপিসির কাছে নিয়ে যাব ঠিক করেছি।'

—সমাপ্ত—